

ত্রিমুসমগ্র

হুমায়ুন আহমেদ



- হিমু রিমান্ডে
- হিমুর মধ্যদুপুর
- হিমুর নীল জোছনা
- হিমুর আছে জল
- হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরী
- হিমু এবং হার্ভার্ড Ph.D. বল্টু ভাই

প্রচ্ছদ • ধ্রুব এষ

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র • কামরুল হাসান মিথুন



হুমায়ুন আহমেদ

১৯৪৮-২০১২

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে

ହିମୁ ସମଗ୍ରୀ ୨



ହିମୁସମଗ୍ରୀ ୧

ହୁମାয়ুন আহমেদ



অমন্ন্য

৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

anannyadhaka@gmail.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



প্রকাশক □ মনিরুল হক

অনন্যা

৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ □ নভেম্বর ২০১২

দ্বিতীয় মুদ্রণ □ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সত্ত্ব □ লেখক

প্রচ্ছদ □ প্রক্রিয়া

কম্পোজ ইমেশন প্রিন্টার

৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ □ পাণিনি প্রিন্টার্স

১৪/১ তনুগঞ্জ লেন সূত্রাপুর ঢাকা

দাম □ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984 70105 0559 7

Himu Samagra/2 by Humayun Ahmed

Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100

Second Edition : February 2015, Cover Design : Dhrubo Esh

Price : 550.00 Taka Only

U.K Distributor □ Sangeeta Limited

22 Brick Lane, London

U.S.A Distributor □ Muktadhabra

37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Canada Distributor □ Anyamela

300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202

Canada Distributor □ ATN Mega Store

2976 Danforth Ave., Toronto

ঘরে বসে অনন্যা'র বই কিনতে ভিজিট করুন

দুনিয়ার পাঠ্যপ্রদর্শন হলোমারি www.holomari.com ~ www.sharmoi.com ~

প্র কা শ কে র ক থা

হিমুসমগ্র-২ প্রকাশিত হল। এর আগে ১৫টি হিমু-বই নিয়ে আমরা প্রকাশ
করেছিলাম হিমুসমগ্র, ২০০৬-এ। ১১৮৪ পৃষ্ঠার সেই বইয়ের ভূমিকায়
হুমায়ুন আহমেদ লিখেছিলেন, ‘হিমুকে নিয়ে কতগুলি বই লিখেছি নিজেও
জানিনা।’ আমরা এখন জানি হিমুকে নিয়ে লেখা হুমায়ুন আহমেদের
প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২১। প্রথম সংকলনের পর আরও ৬টি বই। পরের
এই ৬টি হিমু-বই নিয়েই বর্তমান হিমুসমগ্র-২। প্রকাশনালগ্নে যতটা আনন্দ
ঠিক ততটাই বিষাদে আমরা আচ্ছন্ন। কারণ হুমায়ুন আহমেদ আর কখনও
হিমু লিখবেন না!

দুর্দলীকর স্মাচক্ষণ ক্ষিণিত! এবিলজিকাল আর্ট্চৰ্চ জগতে।
www.amaiboi.com

সূচিপত্র

হিমু রিমাণে / ১

হিমুর মধ্যদুপুর / ১১

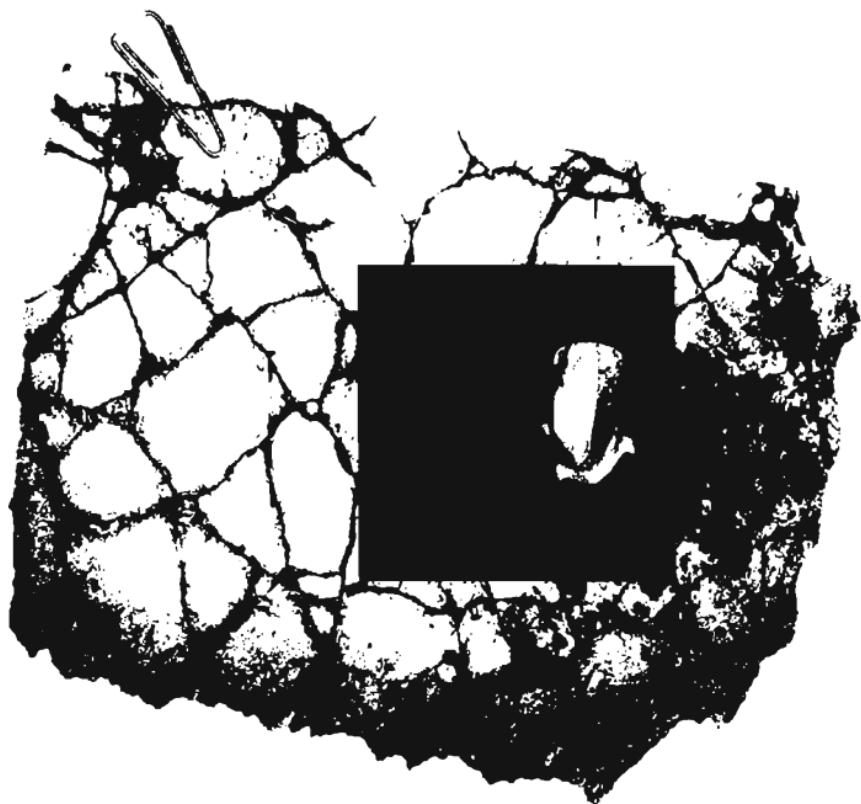
হিমুর নীল জোছনা / ১৮৩

হিমুর আছে জল / ২৫৯

হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরী / ৩৩৩

হিমু এবং হার্ডি Ph.D. বশ্ট ভাই / ৪১৫

ହିମୁ ରିମାଣ୍ଡେ



নাম কী?

হিমু।

ভালো নাম?

হিমালয়।

হিমালয়ের আগেপিছে কিছু আছে, না-কি শুধুই হিমালয়?

স্যার, হিমালয় এমনই এক বস্তু যার আগেপিছে কিছু থাকে না।

প্রশ্নকর্তা চশমার উপরের ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। চশমা
পরা হয় চশমার ভেতর দিয়ে দেখার জন্য। যারা এই কাজটা না করে
চশমার ফাঁক দিয়ে দেখতে চান তাদের বিষয়ে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন
আছে। আমি খানিকটা সাবধান হয়ে গেলাম। সাবধান হওয়া ছাড়া উপায়ও
নেই। আমাকে রিমাংডে নেয়া হয়েছে। ‘রিমাংড’ শব্দটা এতদিন শুধু পত্-
পত্রিকায় পড়েছি। অমুক নেতা রিমাংডে মুখ খুলেছেন। অমুক শিল্পপতি
গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন।— ইত্যাদি। রিমাংডে হালুয়া টাইট করে দেয়া
হয় এবং ব্রেইন হালুয়া করে দেয়া হয়। বিশেষ করে সেই অবস্থার
শেষপর্যায়ে আসামি যে-সব অপরাধ সে করে নি তাও স্বীকার করে।
উদাহরণ—

তুই মহাত্মা গান্ধিকে খুন করেছিস?

জি স্যার করেছি।

উনাকে কীভাবে খুন করলি?

কীভাবে করেছি এখন মনে নেই। একটু যদি ধরায়ে দেন তাহলে
বলতে পারব। তবে খুন যে করেছি ইহা সত্য।

গলা টিপে মেরেছিস?

এই তো মনে পড়েছে। জি স্যার, গলা টিপে মেরেছি।
উনার যে ছাগল ছিল সেটা কী করেছিস?
ছাগলের কথা মনে নাই স্যার, একটু ধরায়ে দেন। ধরায়ে দিলেই
বলতে পারব।

ছাগলটা কেটেকুটে খেয়ে ফেলেছিস কি-না বল।
অবশ্যই খেয়েছি স্যার। কচি ছাগলের মাংস অত্যন্ত উপাদেয়। এই
বিষয়ে একটা ছড়াও আছে স্যার। বলব?

কচি পাঁঠা বৃন্দ মেষ
দধির অগ্র ঘোলের শেষ।

পাঁঠার জায়গায় হবে ছাগল।

আমাকে যিনি প্রশ্ন করেছেন তার চেহারা অমায়িক। প্রাইভেট কলেজের
বাংলা স্যার টাইপ চেহারা। তবে কাপড়চোপড় দামি। হাফ শার্ট পরেছেন
বলে হাতের ঘড়ি দেখা যাচ্ছে। ঘড়িটা যথেষ্টই দামি, একশ দেড়শো টাকার
হংকং ঘড়ি না। ঘড়ি সবাই বাঁ-হাতে পরে, উনি পরেছেন ডান হাতে— এই
বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে না। আমার জ্ঞানগায় মিসির আলি সাহেব থাকলে চট
করে কারণ বের করে ফেলতেও প্রশ্নকর্তা গায়ে সেন্ট মেখেছেন, মাঝে
মাঝে সেন্টের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

রিমান্ডে যাদের নেয়া হয় তাদেরকে চোরকুঠির টাইপ ঘরে রাখা হয়।
সেই ঘরের কোনো দরজা জানালা থাকে না। উঁচু সিলিং থেকে লম্বা একটা
তার নেমে আসে। তারের মাথায় দিন-রাত চারশ পাওয়ারের লাইট জুলে।
ইলেক্ট্রিক শক দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। ট্রেতে কোয়েলের ডিম থেকে শুরু
করে রাজহাঁসের ডিম সাজানো থাকে। একটা পর্যায়ে সাইজমাফিক ডিমের
ব্যবহার শুরু হয়। এ ধরনের কথাবার্তা শুনেছি। বাস্তবে তেমন দেখছি না।
আমাকে ষে ঘরে বসানো হয়েছে তার দরজা-জানালা সবই আছে।
জানালায় রঙজুলা পর্দা আছে। মাঝে মাঝে পর্দা সরে যাচ্ছে, তখন
জানালার ওপাশে শিউলি গাছ দেখা যাচ্ছে। গাছভর্তি ফুল। এতদিন
জানতাম শিউলি ফুলের গন্ধ থাকে না। আমি কিন্তু মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি। তবে
এই গন্ধ আমার সামনে বসে থাকা স্যারের গা থেকে ভেসে আসা সেন্টেরও
হতে পারে।

কেউ যে আমাদের ঘরে ঢুকছে না, তাও না। কিছুক্ষণ আগেই এক অদ্রলোক ঢুকে বেশ উত্তেজিত গলাতেই বললেন, কবীর ভাই, মাছ কিনবেন? আমি একটা বোয়াল মাছ কিনেছি, দশ কেজি ওজন। হাকালুকি হাওরের বোয়াল। এমন টাটকা মাছ, লোভে পড়ে কিনে ফেলেছি। খাওয়ার লোক নাই। রেহানা মাছ খায় না। মাছের গন্ধেই না-কি তার বমি আসে। আমি ঠিক করেছি মাছটা চার ভাগ করে একভাগ আমি রাখব। বাকি তিনভাগ বিক্রি।

প্রশ্নকর্তা (অর্থাৎ কবীর সাহেব) বললেন, বোয়াল মাছ তো আমি খাই না। পাংগাস মাছ হলে কিনতাম।

এটা কী কথা বললেন? শীতকালে মাছের রাজা হলো বোয়াল! পাংগাস এর কাছে দাঁড়াতেই পারে না। একভাগ নিয়ে খান, ভালো না লাগলে দাম দিতে হবে না।

কত করে ভাগ?

চার হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি। এক হাজার করে ভাগ। দিব একভাগ? আপনার বাসায় পাঠিয়ে দেই? জীবিকে টেলিফোন করে বলে দেন— বেশি করে ঝাল দিয়ে ঝোল ঝোল করতে। আমি একটা সাতকড়া দিয়ে দিব। বড় মাছ তো, সাতকড়ার গঞ্জটা যে ছাড়বে!

দিন একভাগ।

কবীর সাহেব মানিব্যাগ খুলে পাঁচশ টাকার দুটা মোট দিলেন। তাকে খুব প্রসন্ন মনে হলো না। আমি তার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললাম, কবীর ভাই! এক কাপ চা খাওয়াতে পারবেন?

অদ্রলোক হতভম হয়ে তাকালেন। যেন তিনি তার জীবনে এমন অস্তুত কোনো কথা শুনেন নি। রিমাঙ্গের লোকদের এ ধরনের কথা বলা হয়তো নিষিদ্ধ। উনাকে ‘ভাই’ ডাকছি, এটাও মনে হয় নিতে পারছেন না।

চা খেতে চাও?

জি। দুধ-চা। এক চামচ চিনি।

অদ্রলোকের দ্রু কুঁচকে গেল। মনে হয় অল্লসময়ে জটিল কোনো চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বললেন, চা খাওয়াচ্ছি। যা জিজ্ঞাস করব ধানাইপানাই না করে উত্তর দিবে।

অবশ্যই দিব।

আসল নাম কী?

আমার একটাই নাম হিমালয়, ওরফে হিমু।

তুমি আয়না মজিদ।

বলেন কী স্যার?

চা খেতে চেয়েছিলে চা খাওয়াচ্ছি। আরাম করে যেন চা খেতে পার তার জন্যে হ্যান্ডকাফও খুলে দেয়া হবে। শর্ত একটাই, চা খেয়ে আমার সঙ্গে যাবে। লম্বু খোকনের ঠিকানায় আমাকে নিয়ে উপস্থিত হবে। পারবে না?

লম্বু খোকনের ঠিকানাটা দিলে অবশ্যই নিয়ে যাব।

কবীর সাহেব বেল টিপলেন। দু'কাপ চা এবং সিংগারা দিতে বললেন। তিনি নিজেই চাবি দিয়ে হ্যান্ডকাফ খুললেন।

বল্টু সাইজের যে ছেলেটা চুকল সে কিছুক্ষণ ভ্র কুঁচকে এবং ঠোঁট উল্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমার জন্যে চা আনতে হচ্ছে এটা সে নিতে পারছে না। তার মানসিক সমস্যা হচ্ছে।

কবীর সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, আয়না মজিদ, তুমি যে সহজ চিজ না আমরা জানি। আমরাও কিন্তু সহজ চিজ না। চরিশ ঘণ্টার মধ্যেই তুমি মুখ খুলবে। হড়বড় করে কপ্ত বের হতে থাকবে। ঝর্ণাধারার মতো। ঝর্ণাধারা চেনো?

আমি বললাম, চিনি স্যার। ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা। তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণ। সুন্দরী ঝর্ণা।

স্টপ!

চা চলে এসেছে। দুজনের জন্য এসেছে। রঙ দেখে মনে হচ্ছে চা ভালো হয়েছে। আমি চায়ে চুমুক দিলাম। চা যথেষ্টই ভালো। প্রথম চুমুক দেবার পরই মনে হয় এই চা পর পর দু'কাপ খেতে পারলে ভালো হতো।

আয়না মজিদ।

জি স্যার।

কবীর সাহেব কৌতুহলী হয়ে তাকালেন। আয়না মজিদ ডাকতেই আমি সাড়া দিয়েছি, এটাই তার কৌতুহলের কারণ। তিনি হয়তো ভাবছেন— চিড়িয়া খাঁচায় ঢুকে গেছে।

তোমার শিষ্যরা কি সব দেশে আছে, না-কি দু'একজনকে ইত্তিয়া পাচার করেছে?

আমি কাউকে পাচার করি নাই। যারা গেছে নিজের ইচ্ছায় গিয়েছে। ইত্তিয়া বেড়ানোর জন্যে ভালো।

তোমার বান্ধবী সুষমা কোথায়?

কোথায় আমি জানি না স্যার। সত্যই জানি না। সুষমা নামে আমার যে বান্ধবী আছে, এটাই জানি না। তবে আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই বান্ধবী। স্যার, সে কি আমার প্রিয় বান্ধবী?

কবীর সাহেব তার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন। মনে হচ্ছে তার চা-টা কুৎসিত হয়েছে। একই লটে বানানো দু'কাপ চায়ের একটা এত ভালো হলে আরেকটা জঘন্য হবার কারণ দেখছি না। কবীর সাহেব চায়ের কাপ নামিয়ে শীতল গলায় বললেন, তুমি ধানাইপানাই শুরু করেছ। ডলা ছাড়া মুখ খুলবে না, বুঝতে পারছি। ডলা এখন দেব না। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

দুপুরে লাঞ্ছ কি দেয়া হবে?

প্রশ্ন শুনে কবীর সাহেব মনে হলো ধাক্কার মতো খেলেন। ডলা সন্ধ্যাবেলা শুরু হবার কথা। তার মুখের কঠিন ভঙ্গি দেখে ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে—ডলার টাইম এগিয়ে আসবে।

কবীর সাহেব দাঁত কিড়মিড় করে ডলালেন, লাঞ্ছে বিশেষ কোনো ফরমাশ আছে? মোগলাই খানা কিংবা চাহুনজ?

আমি বললাম, যে বোয়াল মাছটা আজ দুপুরে ভাবি রান্না করবেন তার একটা পিস খেতে ইচ্ছা কৰছে। সাতকড়া দিয়ে মাংস খেয়েছি। বোয়াল খাই নি।

আমার স্পর্ধা দেখে কবীর সাহেব হতভম হয়ে গেলেন। কোনো কথা না বলে চায়ে পরপর তিনবার চুমুক দিলেন। প্রতিবারই মুখ বিকৃত করলেন।

বোয়াল মাছের পেটির একটা পিস কি স্যার খাওয়া যাবে?

একটা পিস কেন! আস্ত বোয়ালই খাওয়াবার ব্যবস্থা করছি।

স্যার অশ্বেষ ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক উঠে চলে গেলেন। ধড়াস করে শব্দ হলো। বাইরের দরজা লাগানো হলো। এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সময়। ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে’ টাইপ সঙ্গীত। অসাধারণ প্রতিভাব একজন মানুষ—সব পরিস্থিতির জন্যে গান লিখে রেখে গেছেন। ডায়রিয়া হয়ে কেউ বিছানায় পড়ে গেছে। নিজে নিজে ওঠার সামর্থ্য নেই। তার জন্যেও গান আছে—‘আমার এই দেহখনি তুলে ধর।’

দরজায় তালা লাগানো হচ্ছে। তালা লাগানোর অর্থ বেশ কিছু সময় আমাকে এই ঘরে থাকতে হবে। ঘরের দেয়ালে সন্তা ধরনের ঘড়ি আছে। ঘড়িতে নয়টা চল্লিশ বাজে। যখন প্রথম এই ঘরে আমাকে ঢোকানো হয়, তখনো নয়টা চল্লিশ বাজছিল। এই ঘড়ি বেচারার জীবন নয়টা চল্লিশে আটকে গেছে।

টেবিলে লোকনাথ ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা দেখতে পাচ্ছি। সময় কাটানোর জন্যে পঞ্জিকা পড়া যেতে পারে। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান। তিথি বিচার, লগ্ন বিচার। পঞ্জিকার নিচে ভালো রিডিং ম্যাটেরিয়াল পাওয়া গেল। টাইপ করা প্রতিবেদন। শিরোনাম ‘আয়না মজিদ’। কবীর সাহেব এই জিনিসই বারবার পড়ছিলেন। লাল কলম দিয়ে দাগ দিচ্ছিলেন। আয়না মজিদ পড়ে তার সম্পর্কে জানা কবীর সাহেবের জন্যে প্রয়োজন ছিল। আমার প্রয়োজন নেই। একটা ফাইল পাওয়া গেল। ফাইলে লেখা ৩৮৯৯, ভেতরে তিন-চারটা সাদা পাতা।

আয়না মজিদ-বিষয়ক লেখাটা ভাঁজ করে হাতে নিয়ে নিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছে এখানে বেশিক্ষণ থাকা হবে না। বের হব কীভাবে তাও বুঝতে পারছি না। বাদলের সঙ্গে একবার একটা হলিউডের ছবি দেখেছিলাম। ছবিতে ভয়ঙ্কর এক প্রিমিন্যালকে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাকে কোর্টে নেয়া হবে না। দু'জন পুলিশ অফিসার এই ঘরেই তাকে গুলি করে মারবে। প্রিমিন্যালটা হৃত্তির মতো বাঁধন খুলে ফেলল এবং ঘরের সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলতে লাগল। দরজা খুলে দু'জন পুলিশ অফিসার চুকল। প্রিমিন্যালটা (নাম হ্যারি) সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলতে ঝুলতে ফ্লাইং কিক লাগাল। অফিসার দু'জন একই সঙ্গে কুপোকাত। হ্যারি বাবু আকাশে একটা ডিগবাজি খেয়ে মেঝেতে ল্যাঙ্ক করলেন। দুই অফিসারের কোমর থেকে দুই পিণ্ড নিয়ে নিলেন এবং মিষ্টি করে বললেন, It's a beautiful day. গুলি করতে করতে প্রস্থান করলেন। বাদল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাপকা ব্যাটা! কী বলেন হিমুদা?

আমি বললাম, বাপকা ব্যাটা বললে কম বলা হবে। একই সঙ্গে সে দাদাকা নাতি।

আমার পক্ষে বাপকা ব্যাটা কিংবা দাদাকা নাতি হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে হলিউডি ব্যাপারটার একটা বাংলাদেশি রূপ দেয়া যেতে পারে। প্রথমে যা করতে হবে তা হলো টেবিলের উপর একটা চেয়ার

তুলতে হবে। আমাকে থাকতে হবে দরজার পেছনে। দরজা খুললে চলে যেতে হবে দরজার পেছনে। কবীর সাহেব দরজা খুলে টেবিলের উপর চেয়ার দেখে হতভস্ব হয়ে এগিয়ে যাবেন সেদিকে। এই ফাঁকে আমাকে শান্তভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিয়ে বের হতে হবে। মানুষ এবং বানর শ্রেণী তাকায় Eye level-এ, বাকি সব জন্তু তাকায় মাটির দিকে। এই তথ্য আমি পেয়েছি বাদলের কাছ থেকে। সে পেয়েছে National Geography চ্যানেল থেকে। বাদলের কাছেই জেনেছি বেচারা শুয়োর জীবনে কখনো আকাশ দেখে না। উপরের দিকে তাকানোর ক্ষমতাই তার নেই। শুয়োরকে এই কারণেই কেউ যদি চিৎ করে ফেলে সে হঠাতে আকাশ দেখে বিস্ময় এবং ভয়ে অস্তির হয়ে যায়।

দুই ঘট্টার উপর (আনুমানিক) বিম ধরে বসে আছি। আমার অবস্থা হয়েছে ঘড়ির মতো। সময় আটকে গেছে। পঞ্জিকা পড়ে অনেক কিছু জানছি, তবে এই জ্ঞান কোনো কাজে আসবে এরকম মনে হচ্ছে না। হিন্দু ললনাদের উমাচতুর্থী ব্রত পালন করা খুবই প্রয়োজন, এটা জানলাম। এই ব্রত পালন করতে হবে জ্যেষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্থীতে। কারণ এই দিনে সতী উমার জন্ম হয়।

জ্যেষ্ঠ শুক্ল চতুর্থ্যাত্ম জ্ঞানা পূর্ববুমা সতী ত্স্মাত্সা তপ্ত সংশোধ্যা স্ত্রীভি : সৌভাগ্যদায়িনী

পঞ্জিকা পড়ে সময় কাটানো ভালো বুদ্ধি বলে মনে হচ্ছে না। বিরক্তি লাগছে। বিরক্তি কাটানোর জন্যেই টেবিলে চেয়ার তুললাম। প্রথমে একটা চেয়ার, তার উপর দ্বিতীয় চেয়ার। কাজটা করতে ভালো লাগছে। নিষিদ্ধ কিছু করার আনন্দ পাচ্ছি। এখান থেকে বের হওয়া সহজ কাজ বলেই মনে হচ্ছে। পুলিশ একটা ভুল করেছে, ঘরে চুকিয়ে হাতকড়া খুলে দিয়েছে। কেউ যে এই অবস্থা থেকে পালাবার চিন্তা করতে পারে এটাও তাদের মাথায় নেই। থানার ভেতরে পুলিশরা বেশ রিলাক্ষড অবস্থায় থাকে। তারা চিন্তাও করে না এখানে অপরাধমূলক কোনো কর্মকাণ্ড হতে পারে।

আমেরিকার বিখ্যাত (না-কি কুখ্যাত?) খুনি এডগার ইলেকট্রিক চেয়ারে বসার আগে ক্রিমিন্যাল ভাই বেরাদারদের উদ্দেশ্যে বলে গিয়েছিল— নিখুঁত অপরাধ করতে হয় হালকা মেজাজে। সম্পূর্ণ টেনশনমুক্ত অবস্থায়। একটা দেয়াশলাই জ্বালানোতেও কিছু টেনশন কাজ করে। বারুদ ছিটকে পড়বে কি-না। একবারেই আগুন ধরবে কি-না। অপরাধ করবার সময় সেই হিমসমগ্র-২ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ হিমু রিমান্ডে ১৭

টেনশন থাকলেও চলবে না। গুলি কখনো দূর থেকে করবে না। দূর থেকে গুলি করা মানেই টেনশন। গুলি লক্ষ্যভেদ করবে কি করবে না তার টেনশন। এত ঝামেলার দরকার কী? বন্দুকের নল পেটে লাগিয়ে গুলি করো। একটা টিপস দিছি— বুকে গুলি করবে না। পাঁজরের হাড় যথেষ্ট শক্ত। রিভসে লেগে গুলি ফিরে এসেছে এমন নজির আছে।

আমি এডগার সাহেবের মতো টেনশনমুক্ত হবার চেষ্টা করলাম। প্রথম চেষ্টাতেই সফলতা। সম্পূর্ণ টেনশনমুক্ত অবস্থায় আমি দরজার পেছনে দাঁড়ানো। অপেক্ষার সামান্য টেনশন ছাড়া তখন আর আমার মধ্যে কোনো টেনশন নেই। আয়না মজিদ সাহেবের তথ্যাবলি সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি। বের হতে পারলে বিছানায় শয়ে আরাম করে পড়া যাবে। মহাপুরুষদের শিক্ষামূলক জীবনী পড়ায় আনন্দ নেই। আনন্দ ক্রিমিন্যালদের রঙিন জীবনীতে। মহাপুরুষরা কখনো ভুল করেছেন এমন পাওয়া যায় না। তাদের সমস্ত কাজকর্মই ডিস্টিল ওয়াটারের মতো শুক্র এবং স্বাদহীন।

তালা খোলার শব্দ হচ্ছে। আমি হামাগুড়ি পজিশনে চলে এলাম। তালা খোলার পরপর আমি যদি হামাগুড়ি দিয়ে কবীর সাহেবের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলি—‘হালুম!’ এতেও কিন্তু অন্দের লাফ দিয়ে উঠে ভীত গলায় বলবেন, এটা কী! কোনটা করব বুঝতে পারছি না। পালিয়ে যাবার চেষ্টা, না-কি হালুম গর্জন? সিন্ধান্তে শোচার আগেই দরজা খুলে গেল। কবীর সাহেব টেবিলের উপর ডাবল চেয়ার দেখে ‘এসব কী? এসব কী?’ বলে সেদিকে ছুটে গেলেন। আমি হামাগুড়ি দিয়ে দরজার বাইরে চলে এলাম। করিডোরে কেউ নেই। আমি পাঞ্জাবি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালাম এবং অতি অল্প সময়েই পগারপার। (প্রিয় পাঠক! পগারপার জিনিসটা কী? পগা নামক নদীর পার, না-কি পগা নামক বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির পার? তাই বা কেমন করে হয়? ব্যক্তি তো শাড়ি না যে পাড় থাকবে।)

ক্রিমিন্যালজিতে বলে একজন ক্রিমিন্যাল অবশ্যই তার ক্রাইমের জায়গাটা দেখতে যাবে। শুধু একবার যে যাবে তা-না, একাধিকবার যাবে। আমার পক্ষে ক্রাইমের জায়গা দেখতে যাওয়া মানে থানায় যাওয়া। এটা সম্ভব না। তবে ওসি সাহেবকে টেলিফোন করা সম্ভব। তাঁর কাছ থেকে একটা ঠিকানা বের করা প্রয়োজন—কবীর সাহেবের বাসার ঠিকানা। কবীর সাহেবের স্ত্রী দশ কেজি ওজনের বোয়াল মাছ রান্না করছেন। বোয়াল মাছের একটা পিস থেতে ইচ্ছা করছে।

ওসি সাহেব টেলিফোন ধরেই ধমক দিলেন, কে? কী চান?

আমি কঠস্বরে যতটুকু বিনয়ী হওয়া সম্ভব ততটুকু বিনয়ী হয়ে বললাম,
স্যার আমাকে চিনবেন না। আমি খুলনা থেকে এসেছি। আমার নাম
খালেক। খুলনা খালেক বলতে পারেন।

আমার কাছে কী?

খুলনার ওসি সাহেব আপনার জন্যে কিছু জিনিস পাঠিয়েছেন।
জিনিসগুলো থানায় নিয়ে আসব?

কী জিনিস?

এক বোতল মধু। জঙ্গলি ফুলের মধু আর সুন্দরবনের তিনটা বনমোরগ।
কী মোরগ?

স্যার তিনটা বনমোরগ। এইসব জিনিস আজকাল পাওয়া যায় না।
ওসি সাহেবের নাম কী?

মিজান।

চিনতে পারছি না তো। ব্যাচমেট মনে হয়। বনমোরগ কয়টা বললে?
স্যার তিনটা।

আমার ধারণা মোরগ পাঠিয়েছে ছাঁয়টা। তুমি একটা গাপ করেছ। হাঁস
মোরগ কেউ একটা তিনটা পাঠায় মা। জোড়া হিসাবে পাঠায়।

স্যার, আপনার অসাধারণ বুদ্ধি। বনমোরগ চারটাই পাঠিয়েছিলেন,
একটা পথে মারা গেছে।

আবার মিথ্যা! এইসব ধানাইপানাই পুলিশের সঙ্গে কথনো করবে না।
বাসার ঠিকানা দিচ্ছি, বনমোরগ চারটা বাসায় তোমার ভাবিব কাছে দিয়ে
আসবে।

জি আচ্ছা স্যার। এই সঙ্গে কবীর সাহেবের বাসার ঠিকানাটা যদি
দেন। উনার জন্যেও এক বোতল মধু পাঠিয়েছেন।

এস বি'র কবীর?

ইয়েস স্যার। উনাকে কি একটু টেলিফোনে দেয়া যাবে?

তাকে এখন দেয়া যাবে না। সে আছে বিরাট ঝামেলায়। তার আসামি
পলাতক। তার বাসার ঠিকানাও জানি না।

উনার বাসায় কোনো টেলিফোন কি আছে? টেলিফোন করে ঠিকানা
নিয়ে নিতাম।

একটু ওয়েট করো। দেখি পাই কি-না। বনমোরগগুলোর সাইজ কী?

মিডিয়াম সাইজ স্যার। বনমোরগ বেশি বড় হয় না। পা লম্বা হয়, মাংস হয় শক্ত, তবে খেতে অমৃত। ভাবিকে ঝোল করতে নিষেধ করবেন। ঝোল ভালো হয় না। কষানো মাংস ভালো। আর মাংসে যেন তরকারি না দেন। আলু ফালু দিলে স্বাদ নষ্ট হবে। মাংসের স্বাদ আলু খেয়ে ফেলবে।

একবার রিং হতেই কবীর সাহেবের স্ত্রী টেলিফোন ধরলেন এবং অস্বাভাবিক মিষ্টি গলায় বললেন, কে? টেলিফোনে আমরা প্রথম শব্দ শুনি ‘হ্যালো’। কিংবা ‘আসসালামু আলায়কুম’। সেখানে কেউ একজন টেলিফোন তুলেই যদি মিষ্টি স্বরে জানতে চায়, কে?—তখন অন্যরকম ভালো লাগে। আমি বললাম, কেমন আছেন আপু? ভাবিও না, আপাও না, সরাসরি আপু।

আমি ভালো আছি। তুমি কে এখনো তো বললে না।

আপু, অনুমান করুন তো। দেখি আপনার অনুমান শক্তি।

ভাই, আমার অনুমান শক্তি খুবই খারাপ।

আমার অনুমান শক্তি আবার খুবই ভালো। আজ আপনার বাসায় রান্না হয়েছে বিশাল সাইজের বোয়াল। সাতকড়া দিয়ে রেঁধেছেন।

সাতকড়া দেই নি তো! এই শোন, বলো তো তুমি কে? তুমি কবীরদের ফ্যামেলির কেউ?

উঁহ! কবীরদের ফ্যামেলির কেউ হলে আপনাকে ভাবি ডাকতাম। আপু ডাকলাম কেন?

তাও তো ঠিক। আমি এমন বোকা! এই শোন, কবীর তো বিশাল ঝামেলায় পড়েছে। একটু আগে টেলিফোন করেছে। কাঁদো কাঁদো গলা। তার কাস্টডি থেকে একজন আসামি পালিয়ে গেছে।

বলেন কী?

যে সে আসামি না—আয়না মজিদ। আয়না মজিদের নাম তো শুনেছ। তাকে ধরার জন্য এক লাখ টাকার পুরক্ষার ঘোষণা দেয়া আছে।

আয়না মজিদকে কি কবীর ভাই ধরেছিলেন?

হ্যাঁ। পুলিশের অনেক সোর্স আছে তো। সোর্সের মাধ্যমে খবর পেয়ে সে হাতেনাতে ধরেছে। আমি কী যে খুশি হয়েছিলাম! এক লাখ টাকা পেলে কত বড় উপকার যে হতো। কবীর আয়না মজিদকে কীভাবে ধরেছে বলব?

বাসায় এসে শুনি।

অবশ্যই। দুপুরে তুমি থাবে। ছোট একটা কাজ করতে পারবে? টক দৈ আনতে পারবে? তোমার ভাইয়ের অভ্যাস দুপুরে থাবার পর টক দৈ খাওয়া। আমার ধারণা ছিল ঘরে টক দৈ আছে। ফ্রিজ খুলে দেখি আছে ঠিকই, তবে ছাতা পড়ে গেছে।

আমি টক দৈ নিয়ে সাইক্লোন ‘সিডর’-র গতিতে চলে আসছি। আপু ঠিকানাটা বলুন।

ঠিকানা জানো না?

না।

তুমি তো আস্তুত হেলে। কাগজ-কলম আছে? ঠিকানা লেখো।

আমি ঠিকানা লিখলাম। টেলিফোনের কথাতেই বুঝতে পারছি অতি সরল একজন মহিলা। সরল না হলে যাকে চিনতে পারছে না তাকে অনায়াসে বলতেন না— টক দৈ নিয়ে এসো।

টক দৈ-এর সকানে আমি গেলাম ‘হাবীব এন্ড সন্স’ মিষ্টির দোকানে। দোকানের মালিক হাবীব ভাই। ময়রারা নাদুসনুদুস হয়। এটাই আর্কিমিডিসের সূত্রের মতো ধূৰ্ব। ইনি গ্রেগাপটকা। মাথায় চুল নেই। সারাক্ষণ বেজার মুখে থাকতে থাকতে শালে স্থায়ী বেজার ছাপ পড়ে গেছে। কোনো ছেলেপুলে নেই। বয়স পঞ্চাশ। এই বয়সে ছেলেপুলে হবে সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। তারপরেও মিষ্টির দোকানের নাম ‘হাবীব এন্ড সন্স’। এখনো আশায় আছেন কোনো একদিন দু'তিনটি ছেলে হবে। ছেলেদের নিয়ে ব্যবসা করবেন। মিষ্টি তৈরির যে বিদ্যা তিনি হালুইকর রয়েশ ঠাকুরের কাছ থেকে শিখেছেন সেই বিদ্যা ছেলেদের দিয়ে যাবেন। পুত্রের আশায় তিনি করেন নি এমন কাজ নেই। স্বামী মেয়ে শিয়ালের মাংস এবং স্ত্রী পুরুষ শেয়ালের মাংস খেলে ছেলেপুলে হয় শুনে গ্রামে গিয়ে এই চিকিৎসাও করিয়েছেন। দু'জনেরই কঠিন ডায়রিয়া হয়েছে, এর বেশি কিছু হয় নি।

হাবীব ভাই গত পাঁচ বছর ধরে আমার প্রতি কঠিন অভিমান লালন করছেন। তার ধারণা আমি একটা ফুঁ দিলেই তার সন্তান হবে। ফুঁ দিচ্ছি না বলে সন্তান হওয়াটা আটকে আছে। কিছুদিন হলো তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বক্ষ করে দিয়েছেন। সরাসরি কথা বলেন না, অন্যদের মাধ্যমে কথা বলেন। আমাকে দেখে তিনি খবরের কাগজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক কর্মচারীকে বললেন, যেন্ন, কাস্টমার আসছে চোখে দেখ না? কাস্টমার কী চায় জিজ্ঞাস কর।

আমি বললাম, বাকিতে এক কেজি টক দৈ দরকার, তবে টাকা দিতে পারব না। টাকা নাই। কুড়ি টাকার একটা নোট ছিল, টেলিফোন করে খরচ করে ফেলেছি।

হাবীব ভাই খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলে বললেন, আমাকে বাকি শিখায়। মশু, উনারে দশ কেজি টক দৈ দে।

আমি বললাম, দশ কেজি টক দৈ দিয়ে কী করব?

হাবীব ভাই বললেন, মশু, উনারে বল উনি যা ইচ্ছা করবেন। টক দৈ দিয়ে গোসল করবেন। সেটা তার ব্যাপার। আমার দৈ দেয়ার কথা, দৈ দিলাম। উনার ফুঁ দেওয়ার কথা— দিলে দিবেন, না দিলে নাই।

বাঁ হাতে পাঁচ হাঁড়ি ডান হাতে পাঁচ হাঁড়ি দৈ নিয়ে চলে যাওয়া যায় না। ভদ্রতাসূচক কিছু বলতে হয় কিংবা একটা ফুঁ দিতে হয়। আমি বেশ আয়োজন করেই ফুঁ দিলাম। হাবীব ভাইয়ের চোখে সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে গেল। পৃথিবীর সবচে 'অপ্রীতিকর দৃশ্য হলো পুরুষমানুষের চোখের পানি। আমি দ্রুত বের হয়ে এলাম।

কবীর সাহেবের স্তুর নাম শোভা। তাঁর স্বামী তাঁকে আদর করে ডাকেন 'গু'। তাদের নিয়ম হচ্ছে, প্রতি বুধবার একজন অন্যজনকে একটা চিঠি লিখবেন। কারণ বিয়ের আগের প্রেমপর্বে এই দিনে চিঠি চালাচালি হতো। নিয়মটা আমৃত্যু বজায় থাকতে হবে এরকমই তাদের প্রতিজ্ঞা। আজ বুধবার, চিঠি চালাচালির দিন। শোভা চিঠি লিখে ফেলেছেন। সেই চিঠি ড্রেসিং টেবিলে রাখা আছে। কবীর সাহেব দুপুরে খেতে এসে স্তুর চিঠি নিয়ে যাবেন, নিজেরটা রেখে যাবেন। সমস্ত তথ্য আমি শোভা আপার সঙ্গে দেখা হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেলাম। দশ মিনিটের মাথায় তিনি আমাকে 'তুই' বলে ডাকতে শুরু করলেন। আমাকেও আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসতে হলো।

তুই কী মনে করে দশ কেজি টক দৈ আনলি, এটা আমাকে বল।

তুমি না আনতে বললে?

আমি দশ কেজি আনতে বলেছি গাধা ছেলে? এত দৈ দিয়ে আমি কী করব!

গোসল করবে। দধিস্নান। দধিস্নান খুবই ভালো জিনিস। আমোঘা দধিস্নান করতেন।

আমোঘাটা কে?

মহর্ষি শান্তনুর স্ত্রী। দধিম্বান করে তিনি গর্ভবতী হন। সমস্যাটা কি জানো? সন্তান প্রসব করতে গিয়ে তিনি একগাদা পানি প্রসব করলেন। তাঁর স্থামী সেই পানিকেই পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। পুত্রের নাম দিলেন ব্রক্ষপুত্র। আমাদের ব্রক্ষপুত্র নদের এটাই ইতিহাস।

চুপ কর গাধা! বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেই যাচ্ছে। তুই কি ভাবছিস আমি বোকা?

অবশ্যই তুমি বোকা। অতিরিক্ত রূপবতীরা বোকা হয়, এটা জগতের স্বতঃসন্দ নিয়ম। তুমি যে বোকা তার আরেকটা প্রমাণ হচ্ছে রূপের প্রশংসা করায় তুমি আনন্দে আটখানার জায়গা এগারোখানা হয়ে গেছ। আরো প্রমাণ লাগবে?

লাগবে।

এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলছ, এখনো আমাকে চিনতে পার নি।

তোকে চিনেছি। চিনব না কেন! নামটা মনে আসছে না। নামটা বল তো?

বলব না।

টেলিফোন বেজে উঠল। শোভা আপু আনন্দে ঝলমল করতে করতে বললেন, ও টেলিফোন করেছে। ঠিক দুপুর বারোটায় সে একবার টেলিফোন করে।

তোমাদের প্রথম টেলিফোনে কথা হয়েছিল ঠিক দুপুর বারোটায়?

হয়েছে। তোর তো বুদ্ধি ভালো।

আপু, আমার কথা দুলাভাইকে বলবে না। আমি তাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই।

অবশ্যই বলব না। তুই আমাকে যতটা বোকা ভাবছিস তত বোকা আমি না। এই শোন, টেলিফোন নিয়ে আমি আড়ালে চলে যাব, তুই কিছু মনে করিস না।

বিয়ের পরেও প্রেম চালিয়ে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

শোভা আপুর টেলিফোন কথোপকথন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। তিনি মুখ অঙ্ককার করে আমার কাছে ফিরে এলেন। প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তোর দুলাভাই তো বিরাট বিপদে আছে।

কেন?

আয়না ঘজিদকে সে অ্যারেস্ট করেছিল, তোকে বলেছিলাম না? সে পালিয়ে গেছে। তোর দুলাভাই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল এই সময় পালিয়ে যায়। কেউ কেউ ধারণা করছে তোর দুলাভাই টাকা খেয়ে তাকে হেঁড়ে দিয়েছে।

বলো কী?

তুই তো তোর দুলাভাইকে চিনিস। তুই বল সে কি টাকা খাওয়ার মানুষ?

প্রশ্নই ওঠে না।

টাকা খেলে তো অনেক আগেই সে আমার চিকিৎসা করত।

আপা, তুমি এখন কাঁদতে শুরু করবে না-কি?

অবশ্যই কাঁদব। তোর দুলাভাইকে ওরা সাসপেন্ড করেছে। তদন্ত কমিটিও না-কি হচ্ছে। সে বলেছে দুপুরে খেতে আসতে পারবে না।

তোমাকে যে চিঠি লেখার কথা সেটা কি লিখেছে?

লিখেছে নিশ্চয়ই। জিজ্ঞেস করি নি। মৌলিফোন করে জিজ্ঞেস করব?

একটু পরে কর। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হচ্ছে। আর খাবার গরম কর। ক্ষিধে লেগেছে। স্বামীর শোকে তুমি ভাত খাবে না, এটা বুঝতেই পারছি।

গোসল করে আয় তারপর খাবি। বাথরুমে তোর দুলাভাইয়ের ধোয়া লুঙ্গি আছে। গামছা আছে।

শোভা বেচারি অসম্ভব মন খারাপ করেছে। তার মন ঠিক করার জন্যে ছেট্ট Tricks করলাম। এই ধরনের ট্রিকসে বোকা মেয়েরা অসম্ভব খুশি হয়। বুদ্ধিমতীরাও যে হয় না, তা না। আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, আপু, খুব লোভ হচ্ছে তুমি দুলাভাইকে চিঠিতে কী লিখেছ সেটা পড়তে। পড়তে দেবে?

থাপ্পড় খাবি। (আপুর মুখে এখন আনন্দ।)

বিয়ের এত দিন পরেও কীভালোবাসি করছ জানতে ইচ্ছা করছে।

চিঠি একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোকে পড়তে দেব কেন?

চিঠি পড়তে না দিলে কিন্তু আমি ভাত খাব না।

তুই কিন্তু এখন আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছিস। (আপুর চোখে রাগের চিহ্নও নেই। তিনি আনন্দে ঝলমল করছেন।) তোর মতলবটা এখন বুঝতে পারছি। তুই চিঠি নিয়ে বাথরুমে দুকে দরজা বন্ধ করে দিবি। আমার চিঠি যদি পানিতে ভিজে তাহলে কিন্তু তোর খবর আছে।

কী করতে হবে আপু বলে দিয়েছেন। আমি তাই করলাম। চিঠি নিয়ে
অতি দ্রুত বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। আপু দরজায় ধাক্কা দিয়ে
বললেন, চিঠির প্রথম চার লাইন পড়বি না। তোকে আল্লাহর দোহাই লাগে।

প্রথম চার লাইনে কী আছে?

যাই থাকুক, তুই কিন্তু পড়বি না।

আমি তো পড়ে ফেলেছি। তোমার চিঠির মূল হচ্ছে প্রথম চার লাইন।

তোর মাথা!

প্রথম চার লাইনে লেখা—

এই যে, বাবু সাহেব!

গুটগুট মুটমুট টেংটেং। শোন, তুমি কিন্তু ব্যাং। করো খ্যাং
খ্যাং। আমি রাগ করেছি। এত ছোট চিঠি কেন লেখ? আমি কি
বাচ্চা মেয়ে? সাতদিন পর একটা চিঠি। ইকি মিকি পিকি। লেক্কা
পেক্কা।

শোভা আপু আদর্শ বঙ্গ ললনাদের মতো যত্ন করে আমাকে খেতে
দিলেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তারপরেও তিনি একটা খবরের কাগজ
ভাঁজ করে হাতে নিয়ে আমার পাশে বসেছেন। খবরের কাগজ দিয়ে গরম
ভাতে হাওয়া দিচ্ছেন। আমি বললাম, শোভা আপু, টেলিভিশনে তো খবর
দিচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর প্রচার হয়। তারপরেও খবরের কাগজ টিকে
থাকবে। কেন বলো তো?

জানি না, কেন?

একটাই কারণ—খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস দেয়া যায়। টেলিভিশন
দিয়ে বাতাস দেয়া যায় না।

শোভা আপু সামান্য রসিকতাতেই হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে
যাবার উপক্রম করলেন। অতি কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, তুই এত দুষ্ট
কেন?

আমি বললাম, তুমিও তো দুষ্ট। প্রেমের চিঠিতে লিখছ— গুটগুট মুটমুট
টেংটেং। তোমার সব চিঠির শুরুই কি এরকম?

হ্যাঁ। বাবু সাহেবের সঙ্গে ফাজলামি করি। ফাজলামি করলে ও রেগে
যায়। ওকে রাগাতে ভালো লাগে। রাগলে তোতলামি শুরু হয়। তখন

আমাকে শোভা ডাকতে পারে না। আমাকে ডাকে— শো শো শো...। আমি
আরো রাগাবার জন্যে বলি— কো কো কো।

শোভা আপু আবার হাসতে শুরু করেছেন। এবারে হাসির পাওয়ার আগের
বারের চেয়েও বেশি। মনে হচ্ছে চেয়ার থেকে পড়ে একটা দুর্ঘটনাই ঘটাবেন।
আমি বললাম, আমার খাওয়া শেষ পর্যায়ে। তুমি দুলাভাইকে টেলিফোনে ধরে
দাও। তার সঙ্গে কথা বলে তাকে রাগিয়ে দিয়ে আমি বিদায় হব।

এখন চলে যাবি কেন? পান এনে দিছি। পান খেয়ে ঘূম দে। তোর
দুলাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে তারপর যাবি।

শোভা আপু, দুলাভাইয়ের সঙ্গে আরেক দিন দেখা করব। তবে তোমার
সঙ্গে সবসময়ই টেলিফোনে যোগাযোগ থাকবে।

আমার হাতে টেলিফোন। ওপাশে কবীর সাহেব। আমি বললাম, কে
দুলাভাই? গুটগুট মুটমুট টেংটেং?

কবীর সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, Who are you?
কে?

শোভা আপুর চিঠিটা কি লিখেছেন? আজ বুধবার, চিঠি দিবস।

গলা শুনে চিনতে পারছেন নহ? আমি আয়না মজিদ। বলেছিলাম না
দুপুরে বোয়াল মাছের এক কুকুরো খেতে চাই। আপনার বাসায় এসে
খেয়েছি— রান্না ভালো হয় নি। শোভা আপুর রান্নার হাত জঘন্য। বোয়াল
মাছের আঁশটে গন্ধ একেবারেই যায় নি।

কবীর সাহেব আবার বললেন, Who are you?
বললাম না, আয়না মজিদ।

ঘটাং করে শব্দ হলো। তিনি টেলিফোন রেখে দিয়েছেন। তার ভবিষ্যৎ
কর্মকাণ্ড চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি। তিনি চাচ্ছেন উড়াল দিয়ে নিজের
বাড়িতে চলে আসতে। সেটা সম্ভব না হওয়ায় লাফ দিয়ে জিপে উঠেছেন।
ড্রাইভারকে বলছেন, তাড়াতাড়ি চালাও, তাড়াতাড়ি। বারবার ঘড়ি
দেখেছেন। ঘাম হচ্ছে। ঘামে শার্ট ভিজে উঠেছে। তাঁর হার্টের সমস্যা
থাকলে টেনশনে ছেটখাটো স্ট্রোকের মতো হয়ে যাবার কথা।

আমি পান মুখে দিয়ে শোভা আপুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।
বিদায়ের আগে বললাম, আপু, তুমি এতক্ষণেও আমার নামটা মনে করতে
পারলে না। দুঃখ নিয়ে বিদায় নিছি।

তুই তোর নামের প্রথম অক্ষরটা বল, তাহলেই মনে পড়বে ।

নামের প্রথম অক্ষর ‘হি’ ।

হি দিয়ে কোনো নাম শুরু হয়? কেন আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস? হি দিয়ে কোনো নাম হয় না । হি দিয়ে হয় হিসাব । তোর নাম কি হিসাব?

হ্যাঁ, আমার নাম হিসাব ।

তোর নাম হিসাব হলে আমার নাম নিকাশ, আমরা দুই ভাই বোন মিলে হিসাব নিকাশ ।

শোভা আপু আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন । তার চোখ ছলছল করছে । আমি মনে মনে বললাম, You are the sister I never had. নিচু হয়ে শোভা আপুর পা স্পর্শ করলাম । তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, আচ্ছাহপাক, আমার এই পাগলা ভাইটাকে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করো ।

কোথায় যাওয়া যায় তাই ভাবছি । সরীসৃপের মতো গর্তে ঢুকে যেতে হবে । কয়েকদিনের জন্য out of circulation হয়ে যাওয়া । মাজেদা খালার বাড়ি কিংবা বাদলদের বাড়ি । নিতান্ত অপরিচিত কোনো বাড়ির কলিংবেল টিপে ভাগ্য পরীক্ষা করা যেতে পারে কলিংবেল টেপা হলো । গম্ভীর চেহারার এক অদ্রলোক দরজা খুলে উললেন, কী চাই?

আমি বলব, স্যার, দু'দিনে আপনার বাড়িতে থাকতে পারি? দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আয়না মজিদ বিষয়ে পড়াশোনা করব । আমার নিরিবিলি দরকার ।

বাদলের বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না । তার পরীক্ষা চলছে । আমার দেখা পেলে তার পড়াশোনা শুধু যে মাথায় উঠবে তা-না, মাথা ফুঁড়ে বের হয়ে যাবে । তারচে' বড় কথা বাদলের বাবা, আমার খালু সাহেব, আমাকে কঠিন এক চিঠি পাঠিয়েছেন । চিঠি না বলে তাকে হাতবোমা বলাই ভালো ।

(অতি জরুরি)

বরাবর

হিমু

বিষয় : বাদলের পরীক্ষা । তোমার কর্তব্য ।

হিমু,

তোমাকে কোনোভাবেই খুঁজে না পেয়ে এই চিঠি লিখছি । তোমার মতো ভবঘূরে মানুষকে চিঠি লিখতে

ରୁଚି ହଚେ ନା । ତାରପରେଓ ବାଧ୍ୟ ହୟେ ଲିଖଛି । କାରଣ ପ୍ରୋଜନ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମାନେ ନା ।

ବାଦଲେର ପରୀକ୍ଷା ଶୁରୁ ହଚେ । ତୁମି ନିଶ୍ଚଯଇ ଚାଓ ସେ ପାସ କରୁକ । ନା-କି ଚାଓ ନା? ଆମି ଚାଇ । ତୋମାର ଲେଜ ଧରେ ଢାକା ଶହରେ ମେ ହେଁଟେ ବେଡ଼ାକ ଏଟା ଆମି ଚାଇ ନା ।

ବାଦଲେର ପରୀକ୍ଷା ପାସେର ବ୍ୟାପାରେ ଆମି ଏଥିନ ତୋମାର ସାହାଯ୍ୟ ଚାଛି । ତୁମି ଆଗାମୀ ତିନ ମାସ ବାଦଲେର ୫୦ ହାଜାର ଗଜେର ଭେତରେ ଆସବେ ନା । ଏଟା ଆମାର ଅନୁରୋଧ ନା, ଆଦେଶ । କଠିନ ଆଦେଶ । ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରଲେ ଶୁଳ୍କ କରେ ତୋମାକେ ମେରେ ଫେଲତେଓ ଆମି ଦିଧା କରବ ନା । ତୁମି ଜାନୋ ଆମାର ଲାଇସେନ୍ସ କରା ପିନ୍ତଲ ଆଛେ । ...

କିଛୁକଣେର ଜନ୍ୟ ଈଶ୍ଵରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଶ୍ରୟେ ଗେଲାମ । ତିନି ସ୍ଟ୍ରିଟ ଲ୍ୟାମ୍ପେର ଆଲୋଯ ପଡ଼ାଶୋନା କରେଛେନ । ଆମିଓ ଏଥିନ ତାଇ କରଛି । ଲ୍ୟାମ୍ପେର ଆଲୋଯ ଆଯନା ମଜିଦେର ପ୍ରତିବେଦନ ମିଶ୍ରଯ ବସେଛି । ପା ଛାଡ଼ିଯେ ବସେଛି । ପାଶେଇ ରାନ୍ତା-ପରିବାରେର କିଛୁ ସଦସ୍ୟ ବାବା-ମା ଏବଂ ଦୁଆଇ ଛେଲେ । କମ୍ବଲ ମୁଡ଼ି ଦିଯେ ଘୁମାଚେ । କମ୍ବଲ ଦୁଟାଇ ନତୁନ । ଢାକା ଶହରେର କିଛୁ ମାନୁଷ ଆଛେନ ଯାରା ରାନ୍ତାବାସୀଦେର କମ୍ବଲ ଦିଯେ ଢେକେ ଦିତେ ପଢ଼ନ୍ କରେନ । ଏବା କମ୍ବଲ ଛାଡ଼ା କିଛୁଇ ଦେନ ନା । କେନ ଦେନ ନା ସେଟା ଏକଟା ରହସ୍ୟ ।

ଆମାର ପାଶେ ଶ୍ରୟେ ଥାକା ରାନ୍ତା ପରିବାରେର ସଦସ୍ୟଦେର ଏକଜନ ଜେଗେ ଗେଛେ । ଚୋଖ ବଡ଼ କରେ ଆମାକେ ଦେଖେଛେ । ଏର ବୟବ ଆଟ ନଯ ବହର । ଭାବୁକ ଧରନେର ଚେହାରା । ନରମ ବିଛାନାୟ ଟେଡ଼ି ବିଯାର ଜଡ଼ିଯେ ଶ୍ରୟେ ଥାକଲେ ଏକେ ଖୁବ ମାନାତୋ । ସେ ଆମାର ଦିକେ ତାକିଯେ କୌତୁଳୀ ଗଲାୟ ବଲଲ, କୀ କରେନ?

ଆମି ବଲଲାମ, ଲେଖାପଡ଼ା କରି ରେ ବ୍ୟାଟା ।

ଲେଖାପଡ଼ା କରେନ କ୍ୟାନ?

ଲେଖାପଡ଼ା ନା କରଲେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଯ ଚଡ଼ା ଯାବେ ନା । ଏଇ ଜନ୍ୟେଇ ଲେଖାପଡ଼ା । ତୋର ନାମ କୀ?

ମଜିଦ ।

বাহ ভালো তো । দুই এক মজিদ আর আমার হাতে আরেক মজিদ ।
ছেট মজিদ গভীর কৌতুহলে আমাকে দেখছে, আমিও কৌতুহল
নিয়েই পড়ছি আয়না মজিদ বৃত্তান্ত ।

আয়না মজিদ

প্রতিবেদন

পাঁচ শীর্ষ সন্ত্রাসীর একজন । তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
থেকে ঘোষিত পুরস্কার মূল্য নগদ এক লক্ষ টাকা । আইন প্রয়োগকারী
সংস্থারাও পুরস্কারের জন্যে বিবেচিত হবেন । তার বিষয়ে প্রদত্ত সমস্ত তথ্য
গোপন রাখা হবে ।

আয়না মজিদের উত্থান

কারওয়ান বাজারে পাইকারি তরকারি বিক্রেতা আব্দুল হালিম সাহেবের
সঙ্গে সাত বছর বয়সে হেল্পার হিসেবে কাজ শুরু করে । দশ বছর বয়সে
টাকা চুরির দায়ে চাকরি ছলে যায় । মাস তিনিকের মধ্যে সে চাকরি নেয়
দোতলা লক্ষ এম ডি যমুনায় । এমতিই যমুনা ঢাকা-পটুয়াখালি রঞ্টের লক্ষ ।
লক্ষের ভাতের হোটেলের অফিসিস্টেন্ট বাবুর্চি । এই চাকরি সে দুই বছর
করে । মূল বাবুর্চির সঙ্গে একদিন তার হাতাহাতি হয় । এক পর্যায়ে সে
বাবুর্চিকে (রুস্তম মিয়া, বাড়ি পিরোজপুর) ধাক্কা দিয়ে লক্ষ থেকে ফেলে
দেয় । মজিদের বিরুদ্ধে মামলা হয় । এক বছর সে হাজত খাটে । উপযুক্ত
সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় এবং রুস্তম মিয়ার ডেডবেডি খুঁজে না পাওয়ায়
মজিদ খালাস পেয়ে বের হয়ে আসে । শুরু হয় তার নতুন জীবন । গাড়ির
সাইড ভিউ মিরর চুরি করা ।

গাড়ির আয়না চুরিতে সে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে । চলন্ত গাড়ির
আয়নাও সে দৌড়ে এসে ডেঙে নিয়ে পালাতে পারত । আয়না চুরির
কারণেই সে ‘আয়না মজিদ’ নামে পরিচিতি লাভ করে ।

ছিনতাইকারী সরফরাজ হাওলাদার তাকে আশ্রয় দেয় । সরফরাজের
হাতেই তার অস্ত্রশিক্ষা শুরু হয় । মাত্র আঠারো বছর বয়সে সে সরফরাজকে
হত্যা করে এই বাহিনীর সর্বময় কর্তা হয়ে বসে । তখন তার পরিচয় হয়
কারওয়ান বাজারের আরেক উঠতি সন্ত্রাসী লম্বু খোকনের সঙ্গে । লম্বু খোকন

কারওয়ান বাজার এলাকার মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। লম্বু খোকনকে দলে টেনে নিয়ে সে মাদক ব্যবসার পুরো নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেয়।

সুষমা রানী ও তার স্বামী হেমন্তর হাতে ছিল মিরপুর এবং পল্লবীর হিরোইন, ফেনসিডিল ব্যবসা। আয়না মজিদ সুষমা রানীর সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে এবং এক রাতে হেমন্তকে গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডটি করে সে প্রকাশ্যে এক চায়ের দোকানের সামনে। গুলি করার পর সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে, আমার নাম আয়না মজিদ। কেউ আমারে ধরতে চাইলে ধরেন। কারো সাহস থাকলে আগায়া আসেন।

কেউ এগিয়ে আসে নি। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটি বেবিটেক্সিতে উঠে চলে যায়।

আওয়ামী লীগের আমলে সে যুবর্ণীগের সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর আশ্রয়ে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বিএনপিতে যোগ দেয়। হাওয়া ভবনের নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়। পুলিশের জনেক সাব ইস্পেষ্টারকে হত্যার অপরাধে তাকে ঘেফতার করা হয়। বিএনপির এক মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সে ছাড়া পায়।

গুলশান এলাকার একটি ফ্ল্যাট সে ভাড়া করে। এই ফ্ল্যাটে সে নানান পেশার গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে নিয়ে আসত। ভুলিয়ে ভালিয়ে এদেরকে আনার কাজটা করত সুষমা রানী। অসম্ভব রূপবর্তী এই তরুণীর ছলাকলায় অনেকেই পা দিয়েছেন। যারা পা দিয়েছেন তারাই বাধ্য হয়েছেন এই তরুণীর সঙ্গে নগ্ন ফটোসেশন করতে। এইসব ছবি ব্যবহৃত হতো ব্ল্যাকমেইলিং-এর কাজে। ব্ল্যাকমেইলিং ছাড়াও এইসব ছবি রাজনৈতিক স্বার্থেও ব্যবহৃত হতো। বাংলাদেশের বিখ্যাত কিছু মানুষের সঙ্গে সুষমা রানীর পর্ণোচ্চবি আছে।

গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এক রাতে অসংখ্য স্টিল ছবি এবং কিছু ভিডিও ছবিসহ সুষমা রানীকে গুলশানের ফ্ল্যাট থেকে ঘেফতার করে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট দেয়, কিন্তু বিচিত্র কারণে কোট সুষমা রানীকে জামিন দিয়ে দেয়। জামিনের পর থেকেই সুষমা পলাতক।

আয়না মজিদের বিরুদ্ধে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানায় ১৪টি হত্যা মামলা আছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের দুই ভাই হত্যা মামলা মিডিয়ার কারণে বহুল আলোচিত।

আয়না মজিদের বর্তমান বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। সে সুদর্শন এবং মিষ্টভাষী। তার ব্যবহার ভদ্র। তার বাবা ছামসু মাস্টার গলাচিপা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ে বাড়িচাপা পড়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী জাহেদা খানম মারা যান। মজিদকে লালনপালন করেন তার দূরসম্পর্কের চাচা মোবারক মিয়া। কাকার আশ্রয় থেকে মজিদ মিয়া পালিয়ে যায় সাত বছর বয়সে।

কারওয়ান বাজার টোকাইদের স্কুলে আয়না মজিদ লেখাপড়া শিখেছে। শিক্ষকদের ভাষ্যমতে ছাত্র হিসেবে সে মেধাবী ছিল।

পড়াশোনার প্রতি আয়না মজিদের আগ্রহের কথা অনেক সূত্রেই জানা গেছে। ইংরেজি শেখার জন্যে সে তিন বছর গৃহশিক্ষক রেখেছিল। সে যে এক বছর জেল হাজতে ছিল সেই সময়ের প্রায় সবটাই জেল লাইব্রেরির বই পড়ে কাটিয়েছে।

বড় সন্ত্রাসীদের দান খয়রাত করার অনেক উদাহরণ থাকলেও আয়না মজিদের তা নেই। তবে সে একবার প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার বই জেল লাইব্রেরিতে পাঠিয়েছিল। বইয়ের তালিকা ঘেঁটে দেখা যায় সবই বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ধর্মতত্ত্ববিষয়ক। গল্প-উপন্যাস না।

আয়না মজিদ বিষয়ে বিশেষ তথ্য

- ক) তার সানগ্লাস প্রীতি আছে। সারাক্ষণই সে সানগ্লাস পরে থাকে। রাতেও চোখে সানগ্লাস থাকে।
- খ) তার রিকশা প্রীতি আছে। গাড়িতে বা বেবিটেক্সিতে তাকে কমই চড়তে দেখা গেছে। বড় বড় অপারেশনে সে রিকশা করে গিয়েছে। অপারেশন শেষ করে রিকশা করে ফিরেছে। এই জাতীয় কাজের জন্যে তার নিজের কোনো রিকশা নেই। সবই ভাড়া করা রিকশা।
- গ) তার সুখাদ্য প্রীতি আছে। ভালো ভালো রেস্টুরেন্টে তাকে আয়োজন করে খেতে দেখা যায়।

- ঘ) বেশিরভাগ সময়ই তাকে একা চলাফেরা করতে দেখা যায়। বডিগার্ড ধরনের কাউকে তার আশেপাশে কখনো দেখা যায় নি।
- ঙ) সুষমা'র দেওয়া তথ্য অনুসারে তার ভয়াবহ মাইগ্রেনের ব্যথা আছে। ব্যথার প্রকোপ উঠলে এক নাগাড়ে দুই থেকে তিনদিন সে ছটফট করে। নানান চিকিৎসাতেও এই ব্যথা সারে নি। সে না-কি ঘোষণা দিয়েছে, যে তার মাইগ্রেনের ব্যথা সারিয়ে দেবে প্রয়োজনে তার জন্যে সে জীবন দিয়ে দেবে।
- চ) তার রহস্যপ্রিয়তা আছে। মানুষকে হতভম্ব করে সে মজা পায়। এই মজাটা বেশিরভাগ সময় সে করে পুলিশের সঙ্গে। সার্জেন্ট জহিরুলের কাহিনীটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

সার্জেন্ট জহিরুল বিজয় সরণীর কাছে ডিউটিরত ছিলেন। এই সময় জনেক সুদর্শন সানগ্লাস পরা ভদ্রলোক তাকে এসে বিনীত গলায় বললেন, মোটর সাইকেলে করে তাকে কি রাস্তা পার করে দেয়া সম্ভব? ট্রাফিকের জন্যে তিনি রাস্তা পার হতে পারছেন না। তার রাস্তার ওপাশে যাওয়া অসম্ভব জরুরি। ট্রাফিক সার্জেন্ট তাকে রাস্তা পার করে দেন। সানগ্লাস পরা ভদ্রলোক তখন তাকে আন্তরিক সম্মতি দেন। এবং বলেন, আমাকে কি আপনি চিনেছেন? আমি আয়না মজিদ। ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন। অ্যারেস্ট করলেই এক লাখ টাকা পুরস্কার এবং প্রমোশন পাবেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় ট্রাফিক সার্জেন্ট হতভম্ব হয়ে পড়েন। এই সুযোগে আয়না মজিদ ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

আয়না মজিদ প্রসঙ্গে আরেকটি বিশেষ তথ্য। তার কুকুর ভীতি প্রবল। রাস্তার অনেক কুকুরকে সে গুলি করে হত্যা করেছে। কুকুর হত্যার মোটিভ সম্ভবত কুকুর ভীতি।

আয়না মজিদ নৌকায় থাকতে পছন্দ করে। বুড়িগঙ্গায় তার নিজের নৌকা আছে। যেখানে সে রাতে বাস করে। অনেক চেষ্টা করেও নৌকা শনাক্ত করা যায় নি।

আমি আছি বাদলদের বাড়িতে ।

এ বাড়িতে বাস করা দূরের কথা, বাদলের ৫০ হাজার গজের মধ্যে
থাকাই আমার জন্যে নিষেধ ছিল । কোনো এক কারণে পরিস্থিতি ভিন্ন । খালু
সাহেব আমাকে দেখে হাসিমুখে বলেছেন, আরে তুমি! কেমন আছ?

জি ভালো ।

অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম । এসেছ যখন কয়েকদিন থাক ।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, জি আচ্ছা ।

খালু সাহেব আনন্দিত গলায় স্তুরি দিকে তাকিয়ে বললেন, এই শুনছ,
হিমু কিছুদিন থাকবে আমাদের সঙ্গে । গেস্টরুমটা খুলে দাও । বাথরুমে
সাবান, টাওয়েল আছে কি-না দেখ ।

খালাও গালভর্তি করে হাসলেন ।

যাকে বলে লালগালিচা অভ্যর্থনা । আমি বাদলকে আড়ালে নিয়ে
জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী রে! আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে
বলে মনে হচ্ছে ।

বাদল গলার স্বর কাঁপা কাঁপা অবস্থায় নিয়ে বলল, তুমি তো টানাটানি
করার মতোই মানুষ । সাধারণ কেউ জো না ।

তোর কাছে টানাটানির মানুষ । খালু সাহেব বা খালার কাছে না ।
তাদের কাছে Father driven, Mother broomed.

এর মানে কী?

Father driven মানে বাপে খেদানো । Mother broomed মানে
মায়ের ঝাড়ু দিয়ে বিতাড়ন ।

বাদল বলল, মানে টানে নিয়ে আমি মাথা ঘামাছি না । তুমি গেস্টরুমে
থাকতে পারবে না । তুমি থাকবে আমার সঙ্গে । খাটে ঘুমাবে, আমি
মেঝেতে কবল পেতে ঘুমাব । সারারাত গল্প করব । ছবি দেখব ।

গুড় ।

তুমি যে কয়দিন থাকবে আমি ইউনিভার্সিটিতে যাব না । চরিশ ঘণ্টা
তোমার সঙ্গে থাকব । আমাকে কেউ হাতি দিয়ে টেনেও তোমার কাছ থেকে
সরাতে পারবে না ।

কঁঠালের আঠা হয়ে যাবি?

অবশ্যই ।

আমাকে বিস্মিত করে খালা এসে জানতে চাইলেন, দুপুরে কী খাবি?

আমি বললাম, যা খাওয়াবে তাই খাব।

তোর কী খেতে ইচ্ছা করে বল? পথেঘাটে থাকিস, আত্মীয়স্বজনদের বাসায় এসে ভালোমন্দ খাবার ইচ্ছা হতেই পারে। হিমু, দশ পনেরো দিনের আগে নড়ার নামও নিবি না।

আমি বললাম, ঠিক করে বলো তো তোমাদের সমস্যাটা কী?

খালা আহত গলায় বললেন, তোকে সামান্য আদরযত্ন করার চেষ্টা করছি, এর মধ্যে তুই সমস্যা খুঁজে পেয়ে গেলি? আমি তোর খালা না?

বাদলের ঘরে টেলিভিশন ছিল না। সে গেস্টরুম থেকে টিভি নিয়ে এলো। আমার হাতে টিভির রিমোট ধরিয়ে বলল, শুয়ে শুয়ে টিভি দেখবে। টেবিলের উপর খবরের কাগজ।

আমি টিভি দেখি না। খবরের কাগজও পড়ি না।

এখন টিভি দেখবে, খবরের কাগজ পড়বে। অনেকদিন পর এই কাজটা করবে তো—আনন্দ পাবে। চা খাবে? চা দিতে বলি?

আমি বললাম, দে।

খবরের কাগজ পড়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম। সেকেন্ড হেডলাইন—‘সর্ষেতে ভূত’। পুলিশের হেফাজত থেকে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আয়না মজিদের পালিয়ে যাওয়ার কাহিনীর চমৎকার বর্ণনা।

সর্ষেতে ভূত

(নিজস্ব প্রতিবেদক)

শীর্ষ সন্ত্রাসী আয়না মজিদ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। তার পলায়ন নিয়ে নানান ধরনের রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে। পুলিশ যে ভাষ্য দিচ্ছে তা কারোর কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না।

পুলিশ বলছে, সকাল আটটা বিশ থেকে আয়না মজিদকে একটি বিশেষ কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে সে স্বীকার করে যে, সে-ই আয়না মজিদ। তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী লম্ব খোকন এবং তার কুকর্মের বান্ধবী সুষমা রানীর বিষয়েও সে গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য দেয়। তথ্যগুলো যাচাই-বাছাইয়ের জন্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা কিছুক্ষণের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদের বিরতি নেন। আয়না মজিদকে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় ঘরে রেখে তিনি ঘর তালাবক্ষ করে দেন। ফিরে এসে দেখেন আয়না মজিদ হাতকড়া খুলে জানালার ছিল কেটে পালিয়ে গেছে।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, হাতকড়া খোলার চাবি সে কোথায় পাবে? চাবি কি তাকে গোপনে দেয়া হয়েছিল? গ্রিল কাটার জন্যও যন্ত্র প্রয়োজন, এই যন্ত্র সে কোথায় পেয়েছে? গ্রিল কাটার শব্দ অবশ্যই হবে। থানায় এত লোকজন, কেউ শব্দ শুনতে পেল না! বিশেষ ক্ষণে সবাই একসঙ্গে বধির হয়ে গেল?

জিজ্ঞাসাবাদের সময় এক পর্যায়ে আয়না মজিদকে জামাইআদর করে চা ও গরম সিঙ্গাড়া খাওয়ানো হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তাও এই তথ্য স্বীকার করেছেন। হাতকড়া দিয়ে হাত পেছনে বাঁধা। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই অবস্থায় আয়না মজিদ চা সিঙ্গাড়া খাবে কীভাবে? আমরা কি ধরে নেব তদন্তকারী কর্মকর্তা মুক্তি তুলে তাকে খাইয়েছেন? দুর্ধর্ষ এক সন্ত্রাসীকে হঠাৎ জামাইআদর শুরু করা হলো কেন? কাদের নির্দেশে হঠাৎ আদর আপ্যায়ন?

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আয়না মজিদের পলায়নের পরপরই থানার ওসি সাহেবে একটা টেলিফোন পান। টেলিফোনে তাকে জানানো হয় যে, তার জন্যে মধু এবং বনমোরগ আসছে। বনমোরগের সংখ্যা নিয়ে দরকষাকৰ্ষিত হয়। ওসি সাহেবে চাচ্ছেন চারটা বনমোরগ, অপরপক্ষ দিতে চাচ্ছে তিনটা বনমোরগ। এই বনমোরগ কি আসলেই বনমোরগ? না-কি বনমোরগের আড়ালে অন্যকিছু?

আমরা মনে করি বনমোরগ সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। মধু কিংবা বনমোরগ কোনোটাই থাকা উচিত না। তদন্তকারী কর্মকর্তা এস কবীর সাহেবকে লোক

দেখানো সাসপেক্ষ করা হয়েছে। আমরা মনে করি বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। পর্দার আড়ালের রাঘববোয়ালদের বের করা উচিত। বনমোরগ বনে থাকবে, মধু থাকবে মধুর চাকে। এটাই শোভন। আইন প্রয়োগকারী কর্তব্যক্রিদের চারপাশে বনমোরগ ঘুরবে এবং ক্ষণে ক্ষণে কোঁকর কেঁ করবে এটা শোভন না। জাতি বনমোরগের হাত থেকে মুক্তি চায়। সর্বের ভূতের স্বরূপ উদ্ঘাটন চায়।

দুপুরে হেভি খাওয়াদাওয়া হলো। খালু সাহেব অফিসে যান নি। সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া। শুনলাম কয়েকদিন ধরেই তিনি অফিসে যাচ্ছেন না। তাঁর যে শরীর খারাপ তাও না। তবে চোখে ভরসা হারানো দৃষ্টি। হড়বড় করে অকারণে কথা বলে যাচ্ছেন। পৃথিবীর সবচে' স্বাদু খাবার কী— এই বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তাঁর মতে হরিয়াল পাখির মাংস পৃথিবীর সবচে' স্বাদু খাবার। কারণ এই পাখি বটফলখায়, মাছ খায় না। হরিয়াল পাখি কীভাবে রান্না করতে হয় সেই বেঙ্গিপিও দিলেন। সব পাখির মাংসে রসুন বেশি লাগে, হরিয়ালের ক্ষেত্রে লাগে না। কারণ এই পাখির শরীরেই রসুনটাইপ গন্ধ। নার্ভাস মানুষের নার্ভাসনেস কাটাতে অকারণে কথা বলে। খালু সাহেব কোনো কারণে স্লোভাস। ঘটনা কিছু একটা অবশ্যই আছে, তা যথাসময়ে জানা যাবে।

দুপুরে খাবার পর বাদলকে নিয়ে ছবি দেখলাম। ছবির নাম Hostel. বাদলকে নিয়ে ছবি দেখা বিরক্তির অভিজ্ঞতা। রানিং কমেন্ট্রির মতো সে বলে যাবে কোন দৃশ্যের পর কোন দৃশ্য আসছে।

হিমুদা, সুন্দর মেয়েটা দেখছো না, এক্ষুণি কাঁটা চামচ দিয়ে তার একটা চোখ তুলে ফেলা হবে। বাঁ চোখটা তুলবে।

কেন?

আনন্দ পাওয়ার জন্যে কাজটা করছে। অন্যকে কষ্ট দেয়ার মধ্যে আনন্দ আছে। আবার কষ্ট পাবার মধ্যে আনন্দ আছে। হিমুদা, তাকিয়ে থাক, এক্ষুণি চোখ তোলা হবে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

চোখ তোলার ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল রাত আটটায়। বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা। টানা চার ঘণ্টা ঘুম।

বাদল দ্বিতীয় একটা ছবি নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমার ঘুম ভাঙলেই
ছবি শুরু হবে। তোমাকে বিছানায় উঠে বসতে দেখে বাদল বলল, তুমি যে
ঘুমিয়ে পড়েছ এটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে। ছবি শেষ হবার পর
তাকিয়ে দেখি তুমি গভীর ঘুমে। ওই ছবির শেষ অংশটা দেখবে, না-কি
অন্য কোনো ছবি দেব?

নতুন একটা দে।

Horror?

হ্যাঁ।

তিনটা হরর ছবি কিনেছি। একটার চেয়ে আরেকটা ভালো। চল তিনটা
ছবিই আজ দেখে ফেলি। দেখবে?

চল দেখি।

হৃট করে তুমি চলে যাবে, তোমাকে নিয়ে আর ছবি দেখা হবে না।
ফ্লাক্ষভর্তি চা নিয়ে বসব। তোমার ঘুম পেলেই তোমাকে চা খাওয়াব। রাত
দশটার পর শুরু হবে ছবির অনুষ্ঠান।

দশটা না বাজা পর্যন্ত কী করব?

বাদল মনে হলো চিন্তায় পড়ে গেছে। দশটা না বাজা পর্যন্ত কী করা
হবে ভেবে পাচ্ছে না।

খালু সাহেবে বাদলকে বিপদ্ধক করলেন। আমাকে ছাদে ডেকে পাঠালেন।

ছাদে শীতলপাটি বিছিয়ে খালু সাহেব আসর শুরু করেছেন। পানি,
গ্লাস, বরফ এবং Teacher নামের হাইক্সির বোতল দেখা যাচ্ছে। খালু
সাহেবের হাতে গ্লাস। ছাদ অঙ্ককার বলে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না।
তিনি আনন্দিত কি-না তাও বুঝতে পারছি না। তবে দু'এক পেগ পেটে
পড়লেই তিনি আনন্দময় ভুবনে প্রবেশ করবেন।

হিম্ম। বোস বোস। তোমার সঙ্গে প্রায় সময়ই দুর্ব্যবহার করি, কিছু মনে
করো না। আমি চিন্তা করে দেখলাম, At the end of the day you are a
good person.

থ্যাংক যু।

থ্যাংক যু দিতে হবে না। You deserve this. তুমি লোক ভালো।
অবশ্যই ভালো। কেউ তোমাকে মন্দ বললে তার সঙ্গে আমি আর্ডমেন্টে
যাব।

খালু সাহেব, কটা খেয়েছেন?

দুটা। তাও স্মল পেগ। হাতে আছে তিন নম্বর। খেয়ে কোনো আনন্দ
পাচ্ছি না। টেনশন নিয়ে থাচ্ছি।

কেন?

অ্যালকোহলের বিরাট ক্রাইসিস যাচ্ছে। জিনিস পাওয়াই যাচ্ছে না।
প্রিমিয়াম হাইস্কির স্বাদ ভুলে গেছি। বাজারভর্তি নকল দু'নম্বরি জিনিস।
অনেকেই খেয়ে মারা গেছে।

বলেন কী!

পত্রিকা পড় না? অনেক নিউজ বের হয়েছে। তবে আসল নিউজ কেউ
সাহস করে ছাপছে না।

আসল নিউজটা কী?

পেঁয়াজ কাঁচামরিচের দাম বেড়েছে। পাওয়া যাচ্ছে না, এই নিউজ
আছে। কিন্তু অ্যালকোহল যে পাওয়াই যাচ্ছে না এই নিউজ নাই। আমি
চিন্তা করেছি বেনামে পত্রিকায় একটা চিঠি লিখব। লেখা উচিত কি-না তুমি
বলো।

অবশ্যই উচিত।

হেড়িং হবে ‘বিষাক্ত নকল মদ থেকে জাতিকে রক্ষা করুন’। হেড়িংটা
কেমন?

ভালো।

সেখানে কিছু সাজেশন থাকবে। যেমন, সরকারি পরিচালনায়
ন্যায্যমূল্যের মদের দোকান। যে-কেউ সেখান থেকে মদ কিনতে পারবে
না, শুধু লাইসেন্সধারীরা পারবে।

আপনার লাইসেন্স আছে?

অবশ্যই আছে। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে দেয়া লাইসেন্স।
দেখবে?

দরকার নেই।

অবশ্যই দরকার আছে। তুমি ভেবে বসে আছ আমি বিনা লাইসেন্সে
মদ থাচ্ছি। তা-না। আমি যখন নিজের বাড়ির ছাদে বসে মদ খাই তখনো
সঙ্গে লাইসেন্স থাকে।

ভালো তো।

খালু সাহেব হাতের গ্লাস দ্রুত শেষ করে চতুর্থটা নিলেন। তৃতীয় একটা শব্দও করলেন—আহ! সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তোমাকে ছেট্টি একটা কাজ করে দিতে হবে হিমু। পারবে না?

অবশ্যই পারব।

জটিল কোনো কাজও অবশ্যি না। একজনকে কিছু টাকা পৌছে দেয়া। দুই লাখ টাকা।

এখন দিয়ে আসব?

কাল সকালে নিয়ে যাও। ঠিকানা দিয়ে দেব। সেই ঠিকানায় যাবে। দরজায় টোকা দেবে। যে দরজা খুলবে তাকে বলবে, কাঁচাবাজারের খবর কী?

কিসের খবর কী?

কাঁচাবাজারের খবর কী কিংবা বাজারের খবর কী? বাজার শব্দটা থাকলেই হবে। যে দরজা খুলবে সে তোমাকে বসাবে। কিছুক্ষণ বসে থাকবে। পাঁচ মিনিট হতে পারে, আবার ধর এক ঘণ্টাও হতে পারে। যতক্ষণ উনি না আসছেন ততক্ষণ বসে থাকবে। উনি এলে তার হাতে প্যাকেটটা দেবে।

উনিটা কে?

উনি কে তোমার জানার প্রয়োজন নাই।

এতগুলো টাকা কাকে দিচ্ছি জানব না? তার কাছ থেকে রশিদ আনব না?

তোমাকে এইসব কিছু করতে হবে না। তুমি টাকা দিয়ে চলে আসবে। ঘরে ঢোকার password হলো বাজার। বাজার শব্দটা শুধু মনে রাখবে। বাজার না বলে তুমি যদি মার্কেট বলো তাহলে কিন্তু তোমাকে ঘরে ঢুকাবে না।

ডিটেক্টিভ উপন্যাসের মতো মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কী খোলাসা করুন তো খালু সাহেব। ঝেড়ে কাশন।

খোলাসা করব না। ঝেড়েও কাশব না।

খালু সাহেব এক টানে চতুর্থ শেষ করে পঞ্চমে গেলেন এবং হড়বড় করে পুরো ব্যাপারটা খোলাসা করলেন। কাকে টাকা দিতে হবে জানা গেল। কাকতালীয় হোক বা কোকিলতালীয় হোক, ঘটনার মূল নায়ক আমাদের আয়না মজিদ। এই সন্দেহ আমার গোড়া থেকেই হচ্ছিল।

ঘটনা হলো— দিন দশক আগে দুপুরবেলা খালু সাহেব একটা টেলিফোন পেলেন। টেলিফোনের ওপাশ থেকে বিনয়ী গলায় কেউ একজন বলল, স্যার ভালো আছেন?

খালু সাহেব বললেন, ভালো আছি, আপনি কে?

আমাকে চিনবেন না। আমি আপনার প্রতিবেশী। নতুন গাড়ি কিনেছেন দেখে ভালো লাগল। আলফার্ডো না?

জি।

চমৎকার গাড়ি। এরচে' ভালো মাইক্রোবাস হয় বলেই আমার মনে হয় না। কালো রঙ পেলেন না?

খোঁজ করেছিলাম, পাই নি।

মেরুন রঙটাও খারাপ না।

খালু সাহেব বললেন, আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনার পরিচয়টা?

আমার নাম মজিদ। সবাই আয়না মজিদ হিসেবে আমাকে চেনে। আপনিও নিশ্চয়ই চিনেছেন। স্যার, আমি সামান্য সমস্যায় পড়েছি। আমাকে একটু সাহায্য করতে হয়। একটু ঠিকানা লিখুন তো।

খালু সাহেব ভড়কে গেলেন। ঘন্ট্রের মতো ঠিকানা লিখলেন। আয়না মজিদ বলল, এই ঠিকানায় মুস্তর পরশুর মধ্যে এক লাখ টাকা পাঠিয়ে দেবেন। প্রতিবেশী যদি প্রতিবেশীকে না দেখে তাহলে কে দেখবে? প্রতিবেশী যদি প্রতিবেশীকে না চেনে তাহলে কে চিনবে? বাইবেলে আছে know thy neighbours. স্যার রাখি?

হতভয় খালু সাহেবের ব্লাড প্রেসার আকাশে উঠে গেল। শরীর ঘামতে লাগল। মাথা চক্র দিতে লাগল। তিনি পুলিশের কাছে পুরো ঘটনা বললেন। পুলিশ ঐ ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে দেখে বিধবা এক স্কুল শিক্ষিকা দুই বাচ্চা নিয়ে ঐ বাড়িতে থাকেন। তিনি পুলিশের কাছে ঘটনা শুনে কেঁদেকেটে অস্ত্রি।

খালু সাহেব স্বত্ত্বার নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক হলো। তিনি দিন পর আবার আয়না মজিদের টেলিফোন।

স্যার, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন তো? আমি আয়না। শুরুতে একটা ভুল ঠিকানা দিয়েছিলাম, কারণ আমি ধরেই নিয়েছিলাম আপনি পুলিশের কাছে যাবেন। এখন আসল ঠিকানা দিছি। কাগজ-কলম নিন।

পুলিশে খবর দিয়েছেন বলে এখন এক লাখ টাকা বেশি দিতে হবে।
কাউকে দিয়ে দু' লাখ টাকা যে ঠিকানা দিচ্ছি সে ঠিকানায় পাঠাবেন।
দরজায় সে কড়া নাড়বে। তার পাসওয়ার্ড হচ্ছে বাজার। বলবে বাজার।
ঠিক আছে? আপনাকে সময় দিচ্ছি। সাত দিন। সাত দিন চিন্তা-ভাবনার
সময় পাবেন।

সাতদিন তিনি এক নাগাড়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। অফিসেও যান নি।
এখন সিন্ধান্তে এসেছেন দু'লাখ টাকা দিয়ে ঝামেলামুক্ত হবেন।

হিমু, কটা খেয়েছি তোমার কি মনে আছে?

না।

সাতটা খেয়ে ফেললাম না-কি? বমিভাব হচ্ছে।

ভাব হলে বমি করে ফেলুন। আরাম পাবেন।

আমার আরামের দরকার নেই। আগামীকাল সাত দিন শেষ হবে, ওই
চিন্তাতেই সব আরাম হারাম।

আমি বললাম, চিন্তার কিছু নেই। ক্ষম ভোরে টাকা নিয়ে চলে যাব।
কলিংবেল বাজিয়ে বলব, কাচা বাজার এনেছি।

থ্যাংক যু। হিমু! At the end of the day you are a good person.
তুমি যে good person এই সুস্থানে লাস্ট একটা খাওয়া যাক।

বমির ভাব হচ্ছে বলছিলেন।

হলে হবে। তুমি কি মনে কর আমি বমি ভয় পাই?

না, সেরকম মনে করছি না।

দুষ্ট প্রকৃতির মানুষকে আমরা ভয় করতে পারি। বমিকে কেন ভয়
করব?

খালু সাহেব বমি শুরু করেছেন। তাকে অসহায় লাগছে। দেখে মনে
হচ্ছে এই মুহূর্তে বমি প্রক্রিয়াটাকে তিনি যথেষ্ট ভয় পাচ্ছেন।

হিমু!

জি।

আজ মনে হয় বমি করতে করতেই মারা যাব। জঘন্য মৃত্যু কী জানো?
ডায়রিয়ায় মারা যাওয়া হচ্ছে জগতের জঘন্যতম মৃত্যু। দ্বিতীয় জঘন্যতম
মৃত্যু হচ্ছে বমি করতে করতে মারা যাওয়া।

রাত এগারোটা। খালু সাহেবের বাড়ি নীরব। তিনি শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। বাদল horror ছবি নিয়ে তৈরি। ছবির নাম The Eye. আমি টেলিফোন হাতে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছি। শোভা আপুর সঙ্গে কথা বলছি। নগরীর ওই প্রান্তে কী হচ্ছে জানা দরকার।

শোভা আপু, ঘুমুচ্ছ?

ঘুমাবো কীভাবে? তুই যে পঁ্যাচ লাগিয়ে চলে গেলি। তোর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করব তাও জানি না। ঠিকানা দিয়ে যাস নি। এদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঘটনা কী? কোথায় পঁ্যাচ লেগেছে খুলে বলো, আমি পঁ্যাচ খুলে দিচ্ছি। পঁ্যাচ দেয়া কঠিন, খোলা সহজ।

তুই চলে যাবার পরপরই তোর দুলাভাই এসে উপস্থিত। চোখমুখ ফ্যাকাসে, ঘামে গায়ের শার্ট ভেজা। চেনা যায় না এমন অবস্থা। আমাকে বলল, আয়না মজিদ কোথায়?

আমি বললাম, আয়না মজিদ কোথায় আমি কী জানি? তোর দুলাভাই তোতলাতে তোতলাতে বলল, দুপুরে বাসায়তে খে বে বে খেয়েছে?

আমি বললাম, আমার ভাই খেয়েছে
সে কোথায়?

সে খাওয়া দাওয়া করে ছেঁজে গেছে।

শোভা! তুমি এই 'পৃথিবীর সবচে' বোকা মহিলা।

আমি কোন বোকামিটা করলাম?

তুমি যা কর সবই বোকামি।

এই বলে তোর দুলাভাই যা শুরু করল তারচে' বড় বোকামি কিছু হতে পারে না। আয়না মজিদকে খোঁজা শুরু করল। খাটের নিচে খোঁজে। বাথরুমে খোঁজে। ছাদে গেল। সেখানে খুঁজল। ছাদের পানির ট্যাংকের ডালা খুলে সেখানে খুঁজল।

আমি বললাম, পাগলামি করছ কেন?

সে বলল, পাগলামি করছি কেন যদি বুঝতে তাহলে 'পৃথিবীর সবচে' বোকা মহিলা টাইটেল পেতে না।

টাইটেল কে দিয়েছে?

আমি দিয়েছি। এখন আমার সামনে থেকে যাও। আমার সামনে ঘুরঘুর করবে না।

আমি শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে শয়ে রইলাম। রাতে আরেক কাও।
কী কাও?

রাতে পুলিশের তদন্ত টিম এসে উপস্থিত।
বলো কী?

তদন্ত করতে এসেছিলেন হামিদ সাহেব। তুই তো উনাকে চিনিস।
আমি কীভাবে চিনব?

উনিই তো বোয়াল মাছ পাঠিয়েছিলেন।
ও আচ্ছা।

উনার কী সব উন্টাপাণ্টা প্রশ্ন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, ভাবি,
আপনার বাসায় কি কেউ বনমোরগ দিয়ে গেছে?

আমি বললাম, না তো!

কেউ কিছু দিয়ে যায় নি? বনমোরগ, মধু, কিছু না?

আমার এক দূরসম্পর্কের ভাই এসেছিল। সে দশ হাঁড়ি টক দৈ নিয়ে
এসেছে।

দশ হাঁড়ি টক দৈ? ও মাই গড! জিনিস খুঁটি টক দৈ-এর ভেতরে।

কী জিনিস?

ভাবি, আমার যতদূর ধারণা ক্ষয় টাকা। পলিথিন দিয়ে টাকা মুড়িয়ে
তার উপর টক দৈ দিয়েছে। ওস্তান আদমি।

তারপর কী হলো শোন, অতিটি টক দৈয়ের হাঁড়ির দৈ বেসিনে ফেলে
বিশ্রী কাও।

টাকা পাওয়া গেছে?

পাগলের মতো কথা বলিস কেন? তুই কি দৈ-এর হাঁড়িতে করে টাকা
এনেছিস যে টাকা পাওয়া যাবে? ঘটনা এখানেই শেষ না। হামিদ সাহেব
কেঁচি দিয়ে তোষক বালিশ এইসব কাটা শুরু করলেন। বাড়ি ভর্তি হয়ে
গেল তুলায়। আচ্ছা শোন, ঠিক করে বল তো তুই আয়না মজিদ না তো?

না।

বদ আয়না মজিদটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। সে আমার সংসার
লগ্নভগ্ন করে দিয়েছে।

দুলাভাইকে দাও তো, কথা বলি।

ওর সঙ্গে কী কথা বলবি! ওকে তো পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।
জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

শোভা আপু কাঁদতে শুরু করলেন।

বাদলের কাছ থেকে একটা সানগ্লাস নিয়ে চোখে পরেছি। আমার পৃথিবীর রঙ
এখন খানিকটা বেগুনি। কাঁধে ঝুলছে চট্টের ব্যাগ। ব্যাগে লেখা—‘জন্ম
নিবন্ধন করুন’। জন্ম নিবন্ধনবিষয়ক কোনো সেমিনারে অতি সস্তা এই ব্যাগ
নিশ্চয়ই দেয়া হয়েছে। তারই একটা এখন আমার কাঁধে। ব্যাগে জন্ম
নিবন্ধনের কাগজপত্রের বদলে আছে চারটা পাঁচশ টাকার বাড়েল। আমার
গন্তব্য আয়না মজিদের আস্তানার দিকে।

বাদল বলল, হিমুদা, তোমাকে সানগ্লাসে অন্তুত লাগছে।

আমি বললাম, আরো অন্তুত লাগার জন্যে কী করা যায় বল তো?

মাংকি ক্যাপ পরবে? গরমের মধ্যে মাংকি ক্যাপ অন্তুত লাগবে।

দে একটা মাংকি ক্যাপ।

মাংকি ক্যাপ খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে একটা উলের লাল টুপি এবং
তার সঙ্গে মানানসই কটকটে লাল মাফলার পাওয়া গেল।

বাদল বলল, হাফপ্যান্ট পরবে? তুমি হাফপ্যান্ট পরে ইঁটছ— ভাবতেই
কেমন যেন লাগছে।

আমি বললাম, বের কর হাফপ্যান্ট আজ ‘অন্তুত দিবস’।

ঢাকা শহরের লোকজনের বিস্তৃত হ্বার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্ন
সাজে রাস্তায় নেমেছি, কেউ স্থিরেও তাকাচ্ছে না। আমাদের এই শহর
চরিত্রের দিক দিয়ে পৃথিবীর বড় শহরদের মতো হয়ে যাচ্ছে। কেউ কাউকে
দেখবে না। ব্যস্ত ভঙ্গিতে ইঁটবে। সবার মধ্যে ট্রেন ধরার তাড়া।

কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলেও একটা কুকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ
করলাম। কুকুরটা ঘিয়া কালারের। তার বিশেষত্ব হলো লেজটা কাটা।
রবীন্দ্রনাথ এরকম কুকুরকে দেখে লিখেছিলেন—

আজীয় কেহ নাই নিকট কি দূর

আছে এক লেজকাটা ভক্ত কুকুর।

লেজকাটা কুকুর মানুষের আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে। আমি
কুকুরটার নাম দিলাম ‘টাইগার’। নামটা তার পছন্দ হলো। ‘টাইগার’ বলে
ডাকতেই সে মহাউৎসাহে তার কাটা লেজ নাড়তে লাগল। আমি ইঁটছি, সে
পেছনে পেছনে আসছে। তাকে দুটা এনার্জি বিস্কুট কিনে খাওয়ালাম।
বিস্কুটের কারণে সে বডিগার্ড হিসেবে আমার সঙ্গে থাকা মহান দায়িত্ব

হিসাবে নিয়ে নিল। ঘেউঘেউ করে কুকুরের ভাষায় সে কিছু কথাবার্তাও বলতে থাকল। কুকুরের ভাষা আমরা এখন বুঝতে পারছি না। বিজ্ঞান একদিন পশ্চাত্ত্বার ভাষা বোঝার যন্ত্র বের করবে। সব মানুষ হয়ে যাবে কিং সুলায়মান। পশ্চাত্ত্বার কৌটপতঙ্গের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হবে। আমার পেছনে পেছনে যে কুকুরটা আসছে তার সঙ্গে গঞ্জগুজব করতে করতে আমি এগুব।

স্যার, বিশ্বুট দুটা যে আমাকে দিলেন, ভালো ছিল। খেয়ে আনন্দ পেয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ।

ওয়েলকাম।

আপনার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা করছে। আপনার অপছন্দের লোকজন কেউ থাকলে বলবেন, কামড় দিয়ে আসব।

তার দরকার নেই।

স্যার, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল, অভয় দিলে বলি।

বলো।

আপনারা আমাদের নেড়ি কৃত্তা বলেনকেন? নেড়ি শব্দটার অর্থ কি? নেড়ির বৃৎপন্তি জানতে চাও?

জি। কুকুরসমাজে প্রায়ই এটা নিয়ে আলোচনা হয়। গোল রাস্তা বৈঠক হয়। আপনারা করেন গোলচেবিল, আমরা টেবিল পাব কোথায়? আমরা গোল রাস্তা বৈঠক করি।

ভালো তো।

স্যার, যাচ্ছেন কোথায় জানতে পারি? ভাববেন না আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বলে জানতে চাচ্ছি। কোনো কষ্ট না। কৌতৃহল।

টপ টেরের আয়না মজিদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

যদি আপনি চান আমি তাকে কামড়ে ধরি, আমাকে ইশারা দিবেন। ঝাপ দিয়ে পড়ব।

সামান্য দুটা বিশ্বুটের জন্য এতটা করবে?

বিশ্বুট দুটা সামান্য, কিন্তু বিশ্বুটের পেছনের মমতা অসামান্য। এজন্যেই কবি বলেছেন—

ভালোবেসে যে সামান্য দেয়

তারে দিও তুমি শতগুণে।

বন্ধু সে তোমার অতি প্রিয় সে
এই কথা বলো মনে মনে । ।

কোন কবি বলেছেন?

আমাদের কুকুরসমাজের কবি । আমাদের সমাজে বড় বড় কবি-সাহিত্যিক আছেন । এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তার নাম ‘পিঠপোড়া ভুলো’ । গরম মাড় ফেলে উনার পিঠ পুড়িয়ে দিয়েছিল । এটা নিয়েও তার কবিতা আছে—

পিঠ পুড়িয়েছ তাতে কী হয়েছে
মন পোড়াতে পেরেছ কি?

অসাধারণ কবিতা না স্যার?

হ্যাঁ । উনি থাকেন কোথায়?

কোথায় থাকেন কাউকে বলেন না । কবি-সাহিত্যিক তো, ‘নির্কুকরতা’ পছন্দ করেন । আপনাদের যেমন ‘নির্জনতা’, আমাদের হলো ‘নির্কুকরতা’ । যেখানে কোনো কুকুর নেই সেখানে দেখা যাবে উনি উদাস মনে বসে আছেন ।

ঠিকানামতো উপস্থিত হয়েছি । একতলা বাড়ি । রেলিং আছে । দরজায় কলিংবেল নেই, পুরনো আঘাতের আংটা লাগানো । দরজার কড়া নাড়া হয়েছে । দরজা খুলেছে । যিনি দরজা খুলেছেন তার হাতে ম্যাচের কাঠি । কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছেন । গায়ের রঙ আলকাতরার কাছাকাছি । ছয়ফুটের মতো লম্বা । অতিরিক্ত লম্বা মানুষ মেরুদণ্ড বাঁকা করে খানিকটা ঝুঁকে থাকে । উনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন । পরনে সবুজ রঙের লুঙ্গি । কালো স্যাড়ো গেঞ্জি । কালো মানুষের দাঁত ঝাকঝাকে সাদা হয় । ইনার দাঁত কুকুরের দাঁতের মতো হলুদ এবং চোখা ধরনের । তবে চোখের সাদা অংশ অতিরিক্ত সাদা ।

আমি বললাম, ভাই সাহেব, ভালো আছেন? আপনি কি খোকন ভাই?
লম্বু খোকন?

তুমি কে?

আমার নাম হিমু । আর আমার সফরসঙ্গীর নাম টাইগার ।

চাও কী?

আয়না ভাইকে টাকা দিতে এসেছি। দুই লাখ টাঙ্গা আছে আমার কাঁধের ব্যাগে। দরজা খুললে একটা পাসওয়ার্ড বলার কথা। পাসওয়ার্ড বললে আপনি ভেতরে নিয়ে বসাবেন। পাসওয়ার্ড ভুল গেছি। কাজেই আপনার হাতে টাকা দিয়ে চলে যাই।

আসো ভেতরে।

টাইগার কি যাবে আমার সঙ্গে, না বাইরে দাঁড়িয়ে, থাকবে?
তোমাকে আসতে বলেছি তুমি আসো। বাজে পঁয়চাল বন্ধ।

অনেকক্ষণ হলো বসে আছি। আমার জন্যে চা এসেছে। গরম সমুচ্চা এসেছে। সমুচ্চা ঘরে তৈরি এবং সুস্বাদু। সাইজে; ছোট। পুরোটা একসঙ্গে মুখে দেয়া যায়।

যে ঘরে আছি তার আসবাবপত্র বলতে চারটা প্লাস্টিকের চেয়ার। এক কোনায় ডাবল তোষক বিছানো। তোষকের উৎপর কম্বল, একটা জামু সাইজ কোলবালিশ। কোলবালিশের ওয়াড লাল সিক্কের। কেউ একজন তোষকে রাত কাটিয়েছে। চাদর এলোমেলো। তোষকের পাশে চায়ের কাপে বেশ কিছু সিগারেটের টুকরা ভাসছে। প্রাণ্শৈলি পিরিচে মূরগির হাড়গোড়। সেখানে পিংড়া এবং মাছির মহোৎসব। একটা পিরিচে আধখাওয়া নানরঞ্জি। পিংড়া মাছি কেউ ফেস্টিকে যাচ্ছে না।

ভাই সাহেব, টাইগারকে কিছু খেতে দিয়েছেন? সে সমুচ্চা খুবই পছন্দ করে বলে আমার ধারণা।

লম্বু ভাই জবাব দিলেন না। চোখড়তি সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আয়না যজিদের কি আসতে দেবি হবে? দেবি হলে শয়ে রেস্ট নেই।
বিছানা তো করাই আছে।

কথা কম। No sound.

No sound কেন? sound আতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে sound থেকে। Big Bang. হিন্দু মিথলজি আবার এটাকে সাপোর্ট করছে। হিন্দু মিথলজিতে বলে ব্রহ্ম বিকট চিৎকার দিলেন। বিকট চিৎকার হলো 'নাদ'। সেই নাদের কারণে ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হলো।

চুপ।

আপনি চুপ বলে চিৎকার করলেন। লম্বনাদ করলেন। এর ফলে আমি চুপ করে গেলাম।

আর একটা কথা বললে থাবড়ায়ে দাঁত ফেলে দিব।

এই সময় ল-স্মৃ খোকনের একটা টেলিফোন এলো। তিনি কোনো কথা বললেন না। টেলিফোন কানে দিয়ে রাখলেন। কথাবার্তা শেষ হলে চিন্তিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন, ঘর থেকে বের হলেন। দরজা বন্ধ করলেন। তালা লাগানোর আওয়াজ পেলাম। তার মানে বেশ কিছু সময়ের জন্য আমাকে এখানে থাকতে হবে। এখন বিছানায় শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে কোনো বাধা নেই। আজকের দিনটাও ঘুমানোর জন্যে ভালো। মেঘলা আকাশ। বাতাসে হিম।

আমি আয়োজন করেই ঘুমুতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘূম। অনেক দিন পর বাবা স্বপ্নে দেখা দিলেন। তাঁর পরনে হাফপ্যান্ট। মাথায় নীল টুপি, গলায় মাফলার। কাঁধে জন্ম নিবন্ধনের ব্যাগ।

এই হিমু, তোর জন্ম নি বন্ধনটা করে ফেলি। ফরম ফিলাপ কর।

ফরম তুমি ফিলাপ করো। আমার বিষয়ে তো তুমি সবচে' বেশি জানো।

বাবা বিছানায় বসে ব্যাগ থেকে কাগজেপ্ত বের করতে করতে বললেন, অসময়ে শুয়ে আছিস কেন? শরীর খারাপ?

না।

কুকুর নিয়ে ঘোরা শুরু কৃত্রিমাইস। এটাও তো ঠিক না। তোকে বলেছি না, বস্তু পাতাবি না, শক্ত পাতাবি না। তোকে যা যা শিখিয়েছি তার কোনোটাই তো তুই পালন করছিস না। দুই লাখ টাকা ব্যাগে নিয়ে ঘুরছিস। Why? তুই থাকবি কপর্দিক শূন্য অবস্থায়। সরি বল।

সরি।

তোকে তালাবন্ধ করে রেখেছে না-কি?

হঁ।

বুদ্ধি খেলে বের হয়ে যা। তালা খোলা তো কোনো ব্যাপার না। না-কি আমি খুলে দিয়ে যাব?

দাও।

ঠিক আছে, যাবার সময় তালা খুলে দিয়ে যাব। এখন ফরম ফিলাপ কর। Identification mark কী বল।

পাছায় কালো জন্মদাগ আছে। এটা দেয়া কি ঠিক হবে?

কেন ঠিক হবে না! সত্য যত কঠিনই হোক, সত্য সত্যই। তুই একটু
সরে আমাকে জায়গা দে। শয়ে শয়ে ফরম ফিলাপ করি।

কিছু খাবে বাবা? টেবিলে সমৃচ্ছা আছে।

সমৃচ্ছা তো আমিষ খাবার। আমি আমিষ খাবার কেন খাব! আমি
নিরামিষাশি না? তুই কি আমিষ খাওয়া ধরেছিস?

হঁ।

হিমু, আমি আপসেট। ভেরি ভেরি আপসেট। কম্বলটা গায়ের উপর
তুলে দে না। ঠাণ্ডা লাগছে তো।

আমি বাবার গায়ে কম্বল টেনে দিলাম।

কোলবালিশটা দে। অনেক দিন কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমাই না।

আমি কোলবালিশ এগিয়ে দিলাম। বাবা কাগজপত্র ফেলে কোলবালিশ
নিয়ে ঘুমুতে গেলেন। তাঁকে খুব ঝান্ট দেখাচ্ছে। মনে হয় অনেকদিন
আরাম করে ঘুমান না। এখন কোলবালিশ জড়িয়ে সুখনিদ্রা।

ঘূম ভাঙ্গল ঘমঘম বৃষ্টির শব্দে। পাকা[ঁ] দালানকোঠায় বৃষ্টির শব্দ শোনা
যায় না। যখন শোনা যায় তখন ধরে মিলতে হবে আকাশ ফুটো হয়ে গেছে।

ঘর অঙ্ককার। টেবিল ল্যাম্প জুলছে। সময় বোৰা যাচ্ছে না। এসেছি
সকালে। এক ঘুমে রাত এনে ফেলব তা হয় না। প্লাস্টিকের চেয়ারে
পায়জামা পাঞ্জাবি পরা একজন সুপুরুষ মধ্যবয়স্ক মানুষ। হাতে সিগারেট।
ভুক্ত কুঁচকে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতের সিগারেট উঠানামা
করছে। ইনি ভয়ঙ্কর আয়না মজিদ ভাবতেই কেমন যেন লাগে। আমি উঠে
বসতে বসতে বললাম, আয়না ভাই! কয়টা বাজে?

আয়না ভাই আমার সম্মোধনে মোটেই চমকালেন না। যেন ধরেই
নিয়েছেন তাকে এই প্রশ্ন করা হবে। তিনি নির্বিকার গলায় বললেন, তিনটা
বাজতে সাত মিনিট।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, লম্বা ঘূম দিয়ে দিয়েছি। অনেকদিন
এ রকম আরামের ঘূম হয় না। আয়না ভাই, আপনার সামনের চেয়ারে যে
ব্যাগ ঝুলছে সেই ব্যাগে দুই লাখ টাকা আছে। নিয়ে নিন। আমি চলে যাই।
প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। বাসায় যাব, খাওয়াদাওয়া করব।

খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

থ্যাংক যু। আমার কুকুরটাকেও খাওয়াতে হবে। কুকুরটা আছে, না চলে গেছে?

আছে।

আয়না মজিদ হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আপনি ঘরের তালা কীভাবে খুললেন? তালা খুলে ঘরে শুয়ে থাকলেন কেন? চলে যান নি কেন? এই প্রশ্নগুলির জবাব চাই।

আমি খানিকটা হকচকিয়ে গেলাম। তালা সত্যি সত্যি খোলা হয়েছে এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। জগতে রহস্যময় ব্যাপার ঘটে। তবে স্বপ্নে বাবা এসে তালা খুলে ছেলেকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করে— এরকম রহস্যময় ঘটনা ঘটে না। স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, টেনশনে লম্বু খোকন ঠিকমতো তালাই লাগায় নি।

আপনি আমার প্রতিটি প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেবেন। জবাব দিতে থাকুন।

আমি বললাম, জবাব দেব কেন? আমি কি রিমাঙ্গে?

হঁ। রিমাঙ্গে।

আয়না ভাই শুনুন। আমি রিমাঙ্গে শীঁও রিমাঙ্গে আপনি। আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন।

আয়না মজিদের শরীর শক্ত হয়ে গেল। ঢোকে পলক পড়া বন্ধ। নিঃশ্বাসও মনে হয় বন্ধ। তিনি নিজেকে সামলানোর সময় নিচেছেন। তার ভেতরে ভয়ও মনে হয় কাজ করছে। তার মন বলছে প্রতিপক্ষ কঠিন। তাকে সাবধানে Handle করতে হবে। ভয়ঙ্কর মানুষ সবসময় ভয়ঙ্কর ভীতু হয়ে থাকে। তারা মানুষ ভয় পায় না, দৈবে ভয় পায়। ঘরের তালা খুলে যাওয়াটা আমার পক্ষে কাজ করছে। আয়না মজিদ সুপার ন্যাচারাল কিছু আশঙ্কা করছেন।

আপনার নাম হিমু?

আমার নাম একেকজনের কাছে একেক রকম। কেউ ডাকে হিমু। কেউ ডাকে হিমালয়। আবার কেউ কেউ আয়না মজিদও ডাকেন। এস বি ইসপেক্টর কৰীর সাহেবে আমাকে ডাকেন আয়না মজিদ।

আপনি সেই লোক যাকে পুলিশ আয়না মজিদ হিসাবে ধরেছে। এবং আপনি পুলিশ কাস্টডি থেকে পালিয়ে এসেছেন?

হঁ।

আপনার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে, এটা কি আপনি জানেন?
জানতাম না। আপনাকে দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে।
অবাক হচ্ছেন না?
আমি বললাম, না। প্রকৃতি একই চেহারার মানুষ সবসময় সাতজন
করে তৈরি করে।

কে বলেছে?

সবাই জানে। আপনি জানেন না, কারণ আপনি পড়াশুনা করার সময়
পান নি। খুন-খারাবিতে সময় চলে গেছে।

পুলিশ কাস্টডি থেকে কীভাবে পালিয়েছেন?

জানতে চান কেন?

বিদ্যাটা শিখে রাখতে চাই।

শিখলেও কাজে লাগাতে পারবেন না।

আসুন ভাত খাই, তারপর কথা বলব।

ভাত খাওয়ার পর আমি কোনো কথাই বলব না। পান মুখে দিয়ে
সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে যাব। আমাকে আটকে রাখার শেষ চেষ্টা করে
দেখতে পারেন।

আটকে রাখার চেষ্টা করলে কী হবে?

আমার কুকুর আপনাকে কাচা খেয়ে ফেলবে। তাকে দেখে আপনি
বিঅন্ত হয়েছেন। ভেবেছেন নেড়ি কুকুর।

নেড়ি কুকুর না?

পাগল হয়েছেন? আয়না মজিদ নেড়ি কুকুর নিয়ে ঘোরে না। খাবার
দিতে বলুন।

তোষকের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে আমাকে খেতে দেয়া হয়েছে।
রাজসিক খাবার না, তামসিক খাবারও না; প্রায় সাত্ত্বিক খাবার।

আলু ভাজি

বেগুন ভাজি

মাঝারি সাইজের চিংড়ি ভাজি

মুরগির পাতলা খোল

পোলাওয়ের চালের ভাত।

থেতে বসেছি আমি একা। আয়না মজিদ একা খান। তিনি আমার সামনে উপস্থিত আছেন। এখনো আগের মতোই প্লাস্টিক চেয়ারে বসা। হাতে সিগারেট।

তৎপৰ করে থাচ্ছি। প্রতিটি আইটেম অসাধারণ। যে বাবুর্চি এই রান্না রেঁধেছে তাকে ‘রন্ধন শ্রেষ্ঠ’ পদক অনায়াসে দেয়া যায়। আমি আন্তরিকভাবেই বললাম, মজিদ ভাই, খেয়ে খুবই আরাম পেয়েছি। যে বাবুর্চি রেঁধেছে সে বাবুর্চি না। মহান শিল্পী— পিকাসো গোত্রের শিল্পী।

আয়না মজিদের মুখের কাঠিন্য অনেকখানি কমে গেল। আমি বললাম, আমার যদি ফাঁসির হৃকুম হয় তাহলে শেষ খাবার হিসেবে আজ যা যা খেয়েছি তা-ই থেতে চাইব। বাবুর্চির নামটা জানতে পারিঃ?

আমি রেঁধেছি।

আপনি?

লঞ্চের রেস্টুরেন্টে কাজ করার সময় রান্না শিখেছি। এখন বেশির ভাগ সময়ই আমাকে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হয়। সময় কাটাবার জন্যে প্রায়ই রান্না করি।

লাস্ট সাপার হিসেবে আপনি কী খেতে চাইবেন? মনে করুন আপনি জানেন আগামীকাল ভোরে আপনার স্মর্ত্য। রাতের খাবার আপনার জীবনের শেষ খাবার। আপনি কী খেতে চাইবেন?

আয়না মজিদের চোখমুখ আবার কঠিন হয়ে গেল। চোখ তীক্ষ্ণ। বুঝতে পারছি এই প্রশ্নের জবাব পাব না।

আয়না ভাই! অনুমতি দিন, উঠি?

আয়না মজিদ কিছু বললেন না। বাইরে বৃষ্টি এখনো পড়ছে। লক্ষণ ভালো না। ঝড় হতে পারে। আবহাওয়া অফিস কোনো নম্বর ঝুলিয়ে দিয়েছে কি-না কে জানে! হয়তো বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসছে কোনো সর্বনাশ।

টাইগার তার জায়গাতেই আছে। তার সামনের টিনের থালা দেখে অনুমান করতে পারি তাকে খাওয়া দেয়া হয়েছে। সে আমাকে দেখে কাটা লেজ নাড়িয়ে নিচুস্থরে কিছুক্ষণ ঘেউঘেউ করল। যার অর্থ সম্ভবত— ‘স্যার! কোথায় ছিলেন? টেনশান হচ্ছিল তো। আমরা কি এখন চলে যাব? সঙ্গে ছাতা দেখছি না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাবেন? আমার অসুবিধা নেই। আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। ঠাণ্ডা বাধিয়ে বসেন কি-না।’

আমি এগুচ্ছি। আমার পেছনে পেছনে টাইগার। টাইগারের পেছনে ছাতা মাথায় লম্বু খোকন। আমি কী করি, কোথায় যাই, এই বিষয়ে হয়তো তাকে রিপোর্ট করতে হবে। লম্বু খোকন আমাকে এখন সমীহ করছে। আগে তুমি তুমি করে বলছিল। এখন আপনি। আপনি, তুমি, তুই থাকায় আমাদের অনেক সুবিধা। সামাজিক অবস্থান এক সম্মোধনেই স্পষ্ট।

জাপানি ভাষায় আপনি, তুমি, তুই ছাড়াও আরো এক ধরনের সম্মোধন আছে—‘অতি আপনি’। যারা বিশেষ সম্মানের তাদের জন্যে এই সম্মোধন।

লম্বু খোকন এগিয়ে এসে আমার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। বিনয়ী স্বরে বলল, হিমু ভাই! একটা কথা বলব?

আমি বললাম, বলো শুনি।

সে আপনি শুরু করেছে, আমি নেমে গেছি তুমিতে।

আপনার ঘরের তালা আমি বন্ধ করেছিলাম। তালাবন্ধের কাজ তো আজ প্রথম করি নাই। অনেকবার করেছি। তালা দেওয়ার পর আমি কয়েকবার টেনে দেখি সব ঠিক আছে কি-না। সবই ঠিক ছিল। সেই তালা আপনি কীভাবে খুললেন?

মন্ত্র পড়ে খুলেছি।

মন্ত্রটা কী?

মন্ত্রটা হচ্ছে রবি ঠাকুরের গান। আবেগের সঙ্গে গাইতে হবে—‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।’

লম্বু খোকন হতাশ গলায় বলল, ও!

আমি বললাম তুমি আমার পেছনে পেছনে কেন আসছ? আমাকে follow করা তোমার ঠিক হবে না। আমি কিছু কাওকারখানা করব যা দেখে তুমি ভড়কে যাবে। রাতে ঘুম হবে না। শরীর খারাপ করবে।

আপনি কী করবেন?

প্রশ্নের জবাব দিলাম না। কারণ আমি কী করব নিজেই জানি না। ভেবেচিন্তে উদ্ভৃত কিছু বের করতে হবে। এমন কিছু করতে হবে যা লম্বু খোকনের মাথার ভেতর ঢুকে যায়। কিছু কিছু মানুষের মাথায় গানের লাইন ঢুকে যায়। দিনের পর দিন মাথার ভেতর সেই গান বাজতে থাকে। লম্বু খোকনের মাথায় আমি অঙ্গুত কোনো দৃশ্য তুকিয়ে দিতে চাচ্ছি।

বামৰাম বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রমনা পার্কে ঢুকে পড়লাম। পার্ক জনশূন্য।
বেঁকেও পলিথিনের ওভারকোট ধরনের পোশাক পরা এক ঝালমুড়িওয়ালা
বিরস মুখে বসে আছে। বৃষ্টির দিন ঝালমুড়ি উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু কোনো
খাদক দেখছি না।

অন্তুত দৃশ্যের আইডিয়া মাথায় এসে গেছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে
উক্ষণ এবং উত্তেজিত মন্তিক্ষে এই দৃশ্য সহজেই ঢুকে যাবে। লম্বু খোকনের
মন্তিক্ষ তালাবিষয়ক জটিলতায় যথেষ্ট উত্তেজিত। সেই উত্তেজনা আরো
কিছুটা বাড়িয়ে কাজে নামতে হবে।

খোকন।

জি।

তোমার বাবা জীবিত না মৃত?

উনি মারা গেছেন। হার্ট অ্যাটাক।

কখন মারা যান?

সন্ধ্যার আগে আগে।

ঠিক এই সময়, তাই না?

জি।

সেদিনও বৃষ্টি বাদলা ছিল?

জি ছিল।

সেদিন দুপুরে তোমার বাবা তার জীবনের শেষ খাওয়াটি খান। ঠিক
না?

জি।

কী খেয়েছিলেন তুমি নিশ্চয়ই জানো। মৃত্যুর পর শেষ খাওয়া নিয়ে
অনেকবার আলোচনা হয়। জানা থাকার কথা।

কচুর লতি দিয়ে চিংড়ি মাছ।

খলসে মাছের টক সালুন।

পাটশাক ভাজি আর মাঘের ডাল।

উনি যদি জানতেন এটাই হবে তার দীর্ঘজীবনের শেষ খাওয়া তাহলে
তিনি কী খেতে চাইতেন?

সেটা তো জানি না।

তুমি তোমার জীবনের শেষ খাওয়া কী খেতে চাও? চিন্তা করে বের
কর।

খোকন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। তার মস্তিষ্ক চিন্তা করতে শুরু করেছে। মস্তিষ্ককে একই সঙ্গে দু'ধরনের আবেগ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। সুখাদ্যের সুখকর চিন্তার আবেগ এবং মৃত্যুর গভীর বেদনার আবেগ। মস্তিষ্ক দুই বিপরীত আবেগে উত্তেজিত হতে শুরু করেছে। এখন আমার জন্যে উপযুক্ত সময় কাজে নেমে যাওয়া। আমি কাজে নেমে গেলাম। মাঝারি আকৃতির একটা বকুল গাছকে ঘিরে চক্রাকারে হাঁটতে শুরু করলাম। টাইগার আমার পেছনে পেছনে হাঁটছে। কাজটায় সে আনন্দও পাচ্ছে।

সবকিছুই চক্রাকারে ঘোরে। পৃথিবী ঘোরে সূর্যের চারদিকে। ইলেক্ট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘোরে। আমি ঘূরছি বকুল গাছের চারদিকে। বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে।

বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে লম্বু খোকন। তার ঠোঁট কাঁপছে। মনে হয় বিড়বিড় করে কিছু বলছে। ঝালমুড়িওয়ালা মন্ত্রে হয় ভয় পেয়েছে। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে। যাবার পথে একবার সে তাকাল, তার ঢোকে স্পষ্ট ভয়ের ছায়া।

লম্বু খোকন হাত ইশারা করে আমাকে ডাকছে। আমি এগিয়ে গেলাম। লম্বু খোকন বিড় বিড় করে বললে, হিমু ভাই, ঘটনাটা কী?

আমি বললাম, কোন্ ঘটনা জানতে চাচ্ছেন?

আপনার বিষয়ে জানতে চাই। আপনি কে?

আমি বললাম, বিরাট ফিলসফির প্রশ্ন করে ফেলেছেন—আমি কে? হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ চেষ্টা করেছে ‘আমি কে?’ প্রশ্নের উত্তর বের করতে। পারে নি। একজন কেউ উত্তর বের করে ফেললেই সবার বেলায় সেটা খাটবে। আপনিও উত্তরের চেষ্টা করতে পারেন। বকুল গাছের চারপাশে চক্র দেবেন এবং বলবেন, আমি কে? আমি কে? একদিনে হবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। রবার্ট ক্রস টাইপ চেষ্টা। রবার্ট ক্রস কে জানেন?

জি না।

নিজেকে জানলেই উনাকে জানবেন। লম্বু ভাই বিদায়। আবার কোনো একদিন বকুলতলায় দেখা হবে।

আমি লম্বু খোকনকে হতভম্ব অবস্থায় রেখে চলে এলাম।

টাইগার এখন বাদলের হেফাজতে। বাদল মহাউৎসাহে তার গায়ে লাক্স সাবান ঘষছে (লাক্স সুপার স্টাররা মন খারাপ করবেন না)। টাইগারের দাঁত ব্রাস করার জন্যে ব্রাস কেনা হয়েছে। শ্মোকার'স পেস্ট কেনা হয়েছে। টাইগার সব যন্ত্রণা সহ্য করছে। কিছু যন্ত্রণা মনে হয় উপভোগও করছে, বিশেষ করে দাঁত মাজা পর্ব। পেস্টটা পছন্দ করে থাচ্ছেও।

বাদল লাইব্রেরি থেকে কুকুর বিষয়ে দুটা বই এনেছে। একটার নাম Dogs Life. এই বইয়ে একটা কুকুরের বড় হওয়া বিতৎ করে লেখা। অন্য বইটার নাম Training a Dog। বাদলের মতে দ্বিতীয় বইটা অসাধারণ। কুকুরকে ট্রেনিং দেয়ার জন্যে বিভিন্ন সাইজের বল এবং সাইকেলের চাকা আনা হয়েছে। সাইকেলের চাকা কোন কাজে লাগবে এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

একজন কাঠমিন্ট্রিকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে। প্লাইটড কেনা হয়েছে। কাঠমিন্ট্রি কুকুরের ঘর বানাচ্ছে। সেই ঘরের ডিজাইনও বাদলের। ডিজাইনে বিশেষত্ত্ব আছে। ছাদের একটা অংশ কাচের। যাতে ঘরে আলোর সমস্যা না হয়।

আমি সময় কাটাচ্ছি বই পড়ে। বাদলের আনা ভূতের DVD দেখে শেষ করে ফেলেছি। বই পড়া ছাড়া গতিশূন্য। এখন যে বইটি পড়ছি তার নাম Impossibility. লেখকের নাম জন ডি. বোরো। কঠিন বই। বইয়ের বিষয়বস্তু হলো জগতের অনেক রহস্যই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না। যত চেষ্টাই করা হোক না, বেশির ভাগ তথ্যই আমরা জানব না। যারা বিশ্বাস করেন বিজ্ঞান সব রহস্য ভেদ করে ফেলবে এই বই তাদের জন্যে বিরাট দৃঃসংবাদ।

এক সপ্তাহের উপর হলো, খালু সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে না। তিনি বিচিত্র কারণে আমাকে এড়িয়ে চলছেন। ছাদের আসরেও আমার ডাক পড়ছে না। খালাও চাচ্ছেন আমি যেন বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাই। যদিও মুখের উপর বলছেন না। ইশারা ইঙ্গিতে বলছেন। স্বল্পবুদ্ধির কারণে তাঁর ইশারা ইঙ্গিত স্থূল ধরনের। উদাহরণ—

হিমু, তুই তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শরীর নষ্ট করে ফেলেছিস। হেঁটে বেড়ানো যার অভ্যাস তার কি আর শুয়ে সময় কাটালে চলে? আমি তোর কষ্টটা বুঝতে পারছি। এই বাড়িতে থেকে তুই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছিস না। এক কাজ কর, আগে যেখানে ছিল সেখানে চলে যা। নিজের মনে থাক।

খালা, এখানে ভালোই আছি। তবে তোমাদের অসুবিধা হলে ভিন্ন কথা। বাড়তি একজনকে তিনবেলা খাওয়ানো—

কী কথা বললি হিমু! ছিঃ। তুই মন মরা হয়ে বিছানায় শয়ে থাকিস, হাঁটাহাঁটি করতে পারিস না, এইজনে বলছি।

এখন থেকে তোমাদের বাড়ির ছাদে হাঁটাহাঁটি করব। হাসিখুশি থাকব।

খালা মুখ কালো করে বললেন, তাহলে তো ঠিকই আছে।

খালু সাহেব স্তুল বা সৃষ্টি কোনো ইশারা ইঙ্গিতে গেলেন না। সরাসরি বললেন, বিদেয় হও। আমাকে তার ব্যক্তিগত বারে (ছাদ, পাটি বিছানা, দুটা বালিশ।) ডেকে নিয়ে গেলেন।

গল্পীর গলায় বললেন, হিমু, আমার এখানে কতদিন আছ?

দু'মাস হতে চলল।

দু'মাসের বেশি হয়েছে। এই দু'মাসে বাদলের অবস্থা দেখেছ? পড়াশোনা নেই, ছবি দেখা আর রাত জাগা। এখন আবার কুকুর নিয়ে মেতেছে। এই কুকুরও তো তুমি এনেছ?

জি।

বিশেষ কোনো জাতের কুকুর?

জি-না। নেড়ি কুকুর। ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে জীবন কাটাচ্ছিল, ডেকে নিয়ে চলে এসেছি।

জানতে পারি কেন?

বেচারাকে একটা বেটার লাইফ দেবার ইচ্ছা থেকে কাজটা করেছি। কুকুর হচ্ছে মানুষের বেস্ট ফ্রেন্ড। তার এ-কী কৃৎসিত জীবন! ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে খাদ্যের অনুসন্ধান।

খালু সাহেব গ্লাসে পর পর কয়েকটা চুম্বক দিয়ে বললেন, কুকুর এনেছ, কয়েকদিন পর বিড়াল আনবে, বাঁদর আনবে। বাসাটা হবে মিনি চিড়িয়াখানা। বাদল চিড়িয়াখানার মহাপরিচালক। আমি তো এটা এলাউ করব না। এখন আমি তোমাকে একটা কঠিন বাক্য বলব। কঠিন বাক্য কঠিনভাবেই বলা উচিত।

কঠিন বাক্যটা কী?

কাল সকালে তুমি চলে যাও। তুমি আমার একটা কাজ করে দিয়েছ, তার জন্যে থ্যাংকস। কাজটা এমন জটিল কিছু না। আমার অফিসের পিওনকে দিয়েও করাতে পারতাম।

আমাকে চলে যেতে বলছেন?

হ্যাঁ। Tomorrow morning. নাশতা খেয়ে চলে যাবে। তোমার খালার
কাছে আমি একশ টাকা দিয়ে রাখব, রিকশা ভাড়া।

আমি বললাম, আয়না মজিদের সঙ্গে আবার যদি যোগাযোগের দরকার
পড়ে তখন কী করবেন? আমি একেক সময় একেক জায়গায় থাকি।
প্রয়োজনের সময় আমাকে তো খুঁজে পাবেন না।

প্রয়োজন হবে না। আয়না মজিদের সঙ্গে দু'লাখ টাকায় সেটেলমেন্ট
হয়ে গেছে। সে আমাকে ধাঁটাবে না।

কিন্তু খালু সাহেব, আয়না মজিদ বুবো গেছে আপনি ভীতু প্রকৃতির।
এবং আপনার কাছে টাকা আছে। আবার সে আপনার কাছে টাকা চাইবে।
এবং চাইতেই থাকবে। আপনাকে মোটামুটি ছিবড়া করে ছাড়বে।

হিমু! তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে এ বাড়িতে পার্মানেন্ট থাকার ব্যবস্থা
করার চেষ্টা চালাচ্ছ। আমার বুদ্ধিকে আভার এস্টিমেট করা তোমার ঠিক
হয় নি। তোমাকে আগামীকাল ভোরে যেতে বলেছিলাম, আমি ডিসিশান
চেঙ্গ করলাম।

থেকে যাব?

না! তুমি এখনই যাবে।

খালু সাহেব মানিব্যাগ খুলো একশ টাকার একটা নোট বের করলেন।
থমথমে গলায় বললেন, এই নোও রিকশা ভাড়া।

আমি বললাম, বাদল কাঁটাবনে গেছে টাইগারের গলার বেল্ট কিনতে।
সে ফিরুক। বাদলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাই।

তোমার কথার পঁয়াচে আমি পড়ব না। তুমি এখনই যাবে।

অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস। শুয়ে বসে ঘুমিয়ে শরীর তবদা মেরে গেছে।
হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। রিকশা বা সিএনজি নিতে ইচ্ছা করছে। হাত উঁচিয়ে
রিকশা ডাকলাম। রিকশাওয়ালা কাছে এলো না। দূরে থেকেই উদাস গলায়
বললেন, যাইবেন কই আগে বলেন।

কোথায় যাব এখনো ঠিক করা হয় নি। রিকশায় উঠে ঠিক করব।

যামু না।

তুমি বরং ঠিক কর কোথায় যাবে। সেখানে আমাকে নামিয়ে দিয়ে
আস। তুমি যেখানেই নামাবে সেখানেই যাব।

বললাম তো যামু না ।

একশ' টাকা ভাড়া পাবে । যেখানেই নিয়ে যাও একশ' টাকা ।

রিকশাওয়ালা বিরক্ত মুখে চলে যাচ্ছে । সে আমার উপর ভরসা করতে পারছে না । সে ভাবছে আমি ঝামেলার মানুষ । সবাই ঝামেলার মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় ।

হেঁটে হেঁটে বিজয় সরণি পর্যন্ত চলে এসেছি । ট্রাফিক সিগন্যালের লালবাতি জুলেছে । দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে ঘিরে নানান বাণিজ্যের চেষ্টা হচ্ছে । নতুন আইটেম পপকর্ন । প্যাকেট ভর্তি পপকর্ন, দাম দশ টাকা । অনেকেই পপকর্ন নিয়ে ছোটাছুটি করছে । কেউ কিনছে না । ফুলের বাজারও মন্দা । রাত বাজে দশটা । এই সময় কেউ ফুল কিনে না । হ্যারি পটারের বই হাতে কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে । তারা মুখে বলছে— পটার! পটার! শুনতে ভালো লাগছে ।

মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোককে দেখলাম পারিবারিকভাবে ফুল বিক্রির চেষ্টা করছেন । তাঁর চেহারা এবং গায়ের কাপড় স্কুল টিচার টাইপ । ঢোক্ষে চশমা । তার হাতে গোলাপ ফুলের একটা তোড়া । তিনি প্রতিটি গাড়ির জানালার কাছে যাচ্ছেন । বিড়বিড় কর্মের কী সব বলছেন । ভদ্রলোকের পেছনে তার স্ত্রী এবং ছয়-সাত বছরের একটা মেয়ে । তারা মনে হচ্ছে লজ্জায় মরে যাচ্ছে । পরিবারিকভাবে ফুল বিক্রির চেষ্টা এই প্রথম দেখলাম । তারা মনে হয় সঙ্গে করে সংসারও নিয়ে এসেছেন । স্ত্রীর কাঁধে ব্যাগ । হাতে চামড়ার স্যুটকেস । মেয়ের হাতে ব্যাগ । ভদ্রলোকের এক কাঁধে ব্যাগ । এক হাতে বিশাল পুঁটলি । ভেতর থেকে বালিশ উঁকি দিচ্ছে ।

সবুজ লাইট জুলেছে । গাড়ি হাঁস হাঁস করে চলে যাচ্ছে । গোলাপের তোড়া বিক্রেতা ভদ্রলোক স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন । আমি তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম ।

গোলাপ ফুলের এই তোড়াটার দাম কত?

ভদ্রলোক আচমকা আমার কথা শুনে হকচকিয়ে গেলেন । চিন্তিত ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন ।

দাম কত জানেন না?

ভদ্রলোক বিড়বিড় করে বললেন, যা মনে চায় দিবেন ।

একশ' টাকা দিলে চলবে?

জি জনাব । অনেক শুকরিয়া ।

আমি একশ' টাকার নোটটা বের করে এগিয়ে দিলাম। গোলাপের তোড়া হাতে নিতে নিতে বললাম, ঢাকা শহরে কবে এসেছেন?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না।

থাকেন কোথায়?

এই প্রশ্নের জবাবও পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক এবং তার স্ত্রী দু'জনেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বাচ্চা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, নাম কী?

পারহুল।

তোমার বাবার নাম কী?

ফজলুর রহমান।

আমি ফজলুর রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, ফজলুর রহমান সাহেব, কাগজ কলম থাকলে একটা ঠিকানা লিখুন। ঢাকা শহরে যদি থাকা খাওয়া বিষয়ে বিরাট কোনো সমস্যায় পড়েন তাহলে এই ঠিকানায় চলে যাবেন। এটা একটা ভাতের হোটেলের ঠিকানা। মালিকের নাম মোল্লা। সবাই ডাকে 'মোল্লা মামু'। তাকে বলবেন হিমু পাঠিয়েছে। হিমু নাম মনে থাকবে?

থাকবে জনাব।

ভদ্রলোক পকেট থেকে বুলপয়েন্ট কলম এবং নোট বই বের করলেন। ঠিকানা লিখছেন। তার চোখে পানি এসে গেছে। চোখের পানি চশমার ফ্রেমের নিচ দিয়ে গাল পর্যন্ত চলে এসেছে। ভদ্রলোক পাঞ্চাবির হাতায় চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, এখন গেলে কি মোল্লা ভাইকে পাওয়া যাবে?

অবশ্যই যাবে। তার হোটেল রাত একটা পর্যন্ত খোলা থাকে। তাকে কী বলবেন মনে আছে তো?

জি জনাব, মনে আছে।

আমি ফুলের তোড়া নিয়ে চলে আসছি। তিনজন বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তাদের চোখে বিস্ময় এবং ভয়। বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারছি। ভয়ের কারণ স্পষ্ট না। একশ' টাকার নোটটা বাচ্চা মেয়েটার হাতে।

হাবীব এড সঙ্গ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দরজা বন্ধ হচ্ছে। হাবীব ভাই ক্যাশ মিলাচ্ছেন। একজন মিষ্টি ডিপফ্রিজে তুলছে। এক কর্মচারী মেঝে ঝাঁট

দিচ্ছে। এই অবস্থায় ফুলের তোড়া হাতে আমার প্রবেশ। হাবীব ভাই টাকা গোনা বঙ্গ রেখে তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটল। তিনি আবার টাকা গোনায় মন দিলেন। দোকানের একজন কর্মচারী (নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, চেহারা অপরিচিত) আমার সামনে পিরিচ ধরে বলল, মিষ্টি খান স্যার।

পিরিচে একটা লালমোহন, একটা লাড্ডু এবং নিমকি।

আমি বললাম, মিষ্টি কিসের রে?

স্যারের সন্তান হবে। আজ ডাঙ্গার বলেছে। এই কারণে মিষ্টি। যে কাস্টমারই আসছে তারেই মিষ্টি দিচ্ছি।

হাবীব ভাই বিরক্ত গলায় বললেন, উনাকে হিস্টরি বলার দরকার নাই। উনি জাইনা শুইনা ফুল নিয়ে আসছে। গাধা! কিছু বুঝস না।

মিষ্টি খেয়ে আমি হাবীব ভাইয়ের সঙ্গে রওনা দিলাম। রাতে তার বাসায় থাকব, খাওয়াদাওয়া করব। রাত্তায় নেমেই হাবীব ভাই বললেন, আপনি যে আসবেন জানতাম। এইজন্যে দোকান বঙ্গ করতে দেরি করছি। অন্যদিন দোকান বঙ্গ করি দশটায়, আইজ বাজে বারোটা। আপনার ভাবিকে বলে এসেছি আপনার পছন্দের রান্না যেন করে।

আমার পছন্দের রান্না কী?

আমি জানি না। আপনার ভাবি জানে। খাইতে বইসা পছন্দের জিনিস না পাইলে দোকানে আগুন ধরায়ে দিব।

ভাবি কেমন খুশি?

নিজের চোখে না দেখলে বুঝবেন না কেমন খুশি। ডাঙ্গারের রিপোর্ট নিয়া যে কান্দন শুরু করেছে গিয়া দেখবেন এখনো মনে হয় সেই কান্দন চলছে। মেয়েছেলে কাঁদতেও পারে।

আপনি কেমন খুশি?

হিমু ভাই, এইটা একটা প্রশ্ন করলেন! আমি আকাশ-পাতাল খুশি।

আপনার চোখে পানি কই?

কথায় কথায় কানলে পুরুষ মানুষের চলে? এদিকে আবার হইছে ঝামেলা। আপনার ভাবির সঙ্গে ঝগড়া।

কী নিয়ে ঝগড়া?

নাম নিয়া। সে ঠিক করেছে তার দুই ছেলের নাম রাখবে আলাল-দুলাল। আমার মত নাই।

দুই ছেলে না-কি?

আপনে জানেন না? আমারে কেন জিগান? ফুঁ যখন দিছেন তখনই তো জানেন। আপনের কাজ কারবার আর কেউ না জানুক, আমি জানি, আপনের ভাবি জানে। কেউ কি আপনারে খবর দিছে যে আইজ ডাঙ্কারের রিপোর্ট আসছে?

না, খবর দেয় নি।

আইজ ফুল নিয়া আপনি চইলা আসলেন কী মনে কইরা। জিনিসটার মধ্যে রহস্য আছে না?

সামান্য রহস্য অবশ্য আছে।

এই তো পথে আসছেন। এখন বলেন আলাল-দুলাল নাম কি চলে? নাম শুনলেই মনে হয় ফকিরের পুলাপান। আজ আপনার মোকাবিলায় নাম নিয়া ফয়সালা হবে। আপনের ভাবির ধারণা সে যেটা বলবে সেটাই ঠিক হবে। ইহা ভুল। সংসারের প্রধান আমি। আপনের ভাবি না।

হাবীব ভাইয়ের বাড়িতে পৌছলাম। ভাবির হাতে ফুলের তোড়া দিলাম। বিনীত গলায় বললাম, আজকের এই শুভ দিনে আপনার জন্যে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি আনা উচিত নহল। ভাবি, আপনি তো জানেন আমি গরিব মানুষ।

আমার কথায় হাবীব ভুক্ত মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, হিমু ভাই যে একেকটা কথা বলে, রাগে শরীর জুইলা যায়। বউ, কাগজ কলম দেও দেখি, হিমু ভাইরে আমি দোকান লেইখা দিব। এখন আমার দুই ছেলে আছে। ছেলে নিয়া ভিক্ষা করব। দুই ছেলে নিয়া ভিক্ষা করার মধ্যেও আনন্দ।

ভাবি শাড়ির আঁচলে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, আলালের বাপ! হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে আসেন।

হাবীব ভাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কী নামে ডেকেছে শুনছেন? মেয়েছেলের ফিচকা বুদ্ধি! কী যে করি। একেকবার বনেজসলে চইলা যাইতে মনে চায়। দুই ছেলে নিয়া যখন নিরূদ্দেশ হব তখন টের পাইবা।

রাতে খাওয়া শেষ করে ঘুমতে গেছি। ভাবি যত্নের চূড়ান্ত করেছেন। নিজের হাতে মশারি গুঁজে দিয়েছেন। টেবিলে পানির জগ, গ্লাস। ফ্লাক্ষভর্তি চা। রাতে যদি ক্ষিধে লাগে তার জন্যে টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে পাটিসাপটা পিঠা।

আমি মশারির ভেতর শুয়ে আছি। হাতে বই— Impossibility. টেবিল
ল্যাস্পের আলোয় রহস্যময় বিজ্ঞানের বই পড়তে আরাম লাগছে। বৃষ্টি শুরু
হয়েছে। হাবীব ভাইয়ের বাড়ির ছাদ টিনের। বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভালো
লাগছে।

বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের এলো বান।

বৃষ্টির কারণে বইয়ে মন বসছে না। আবার বই থেকে চোখ সরাতেও
পারছি না—

অতি ক্ষুদ্র বস্তি অন্তুত আচরণ করে। ক্ষুদ্র বস্তির অবস্থান এবং গতি
একই সঙ্গে কখনোই জানা যায় না। একটা অনিশ্চয়তা থাকবেই। এই
অনিশ্চয়তা প্রথম বের করেন Heisenberg. তাঁর নাম অনুসারে এই সূত্রের
নাম Heisenberg Uncertinily Principle. অনেক থিওসফিস্ট মনে করেন
ঈশ্বরের অবস্থান এই অনিশ্চয়তায়।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙ্গল কচকচ শব্দে। চেয়ারে বসে
ঢিফিন কেরিয়ার খুলে অপরিচিত এক ঝুঁঁশী চেহারার বিদেশী কপ কপ করে
পাটিসাপটা থাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আমি এইগুলা কী খাচ্ছি?

পাটিসাপটা পিঠা থাচ্ছেন। আপনি কে জানতে পারি?

আমার নাম হাইজেনবার্গ।

বলেন কী স্যার! আপনি তো বিখ্যাত লোক।

আইনস্টাইনের মতো বিখ্যাত না। অথচ আইনস্টাইনকে আমি
হিসাবের মধ্যেই ধরি না। মূল বিষয়গুলি আমরা সাজিয়ে দেই— সে এইটা
ব্যবহার করে। বিরাট গাধা!

গাধা না-কি?

অবশ্যই। তার গাধামির নমুনা শোন— হঠাৎ একদিন বলল, ঈশ্বর পাশা
খেলেন না। ভাবটা এরকম যেন ঈশ্বর তার ইয়ার বক্তু। তাকে কানে কানে
বলে গেছেন— আমি পাশা খেলি না।

উনি কি খেলেন?

অবশ্যই। ঈশ্বর স্বয়ং নিয়মের বাইরে যেতে পারবেন না।

স্যার, আপনি তো পিঠা সবগুলো খেয়ে ফেলছেন। ক্ষিধা লাগলে আমি
কী খাব?

সরি। ফ্লাক্সে কি চা? এক কাপ চা দাও তো খাই।
আপনি নিজে ঢেলে নিয়ে থান। আরাম করে শুয়ে আছি, উঠতে পারব
না।

হাইজেনবার্গ সাহেব চা নিলেন। চায়ে চুম্বক দিয়ে গল্পীর হয়ে গেলেন।
আমি বললাম, কিছু চিন্তা করছেন স্যার?

হ্যাঁ।

কী নিয়ে চিন্তা করছেন?

ল্যাপটপ নিয়ে নিয়ে চিন্তা করছি। আমার সময় এই বিষয়টা কেউ
জানত না।

আপনারা সাইনটিস্টরা কি মৃত্যুর পরেও গবেষণা করে যাচ্ছেন?

এছাড়া কী করব! তবে আইনস্টাইন মাঝে মধ্যে বেহালা টেহালা
বাজায়। ভাব করে যেন বিরাট বেহালা বাদক—ইয়াভুদি ম্যানহাইল। অনেকে
আবার বিরাট সমবাদারের মতো তাঁর বেহালা শুনতে যায়। বেতালায় মাথা
নাড়ে। যেমন মাঝে প্রাক্ক। বিরাট গাধা। প্রথম শ্রেণীর গাধা।

তাই না-কি?

অবশ্যই। বিজ্ঞানীরা যখন গাধা হয় প্রথম শ্রেণীর গাধা হয়।
আইনস্টাইন যখন অনিশ্চয়তা সূত্রে আমার বিপক্ষে চলে গেল তখন ম্যাঝে
প্রাক্কও চলে গেল। ভাবল বুজ্জু সাথে থাকি। গাধামি করেছে কি-না তুমি
বলো।

অবশ্যই গাধামি করেছে।

আমি তো তার সঙ্গে কথাই বলি না। তার সঙ্গে কথা বলা মানে সময়
নষ্ট।

পরকালে সময় বলে তো কিছু নেই। কাজেই সময় নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন
উঠে না।

কথাটা মন্দ বলো নি। তুমি উঠে বসো—সময় কী এই নিয়ে আলোচনা
করি।

স্যার, ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আপনি আজ চলে যান,
অন্য একদিন আসুন। গল্প করব।

এখন তো যেতে পারব না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি থামলে চলে যাব।

বাতিটা নিবিয়ে দিন না স্যার। আপনার হাতের কাছে সুইচ।

ঘরের বাতি নিভে গেল। আমি চাদরে মাথা ঢেকে ঘুমুতে গেলাম।

হাবীব ভাইয়ের বাড়িতে প্রথম প্রভাত। মশারির ভেতর থেকে এখনো বের হই নি। কিম ধরে বসে আছি। আয়েশি কিম, কাটতে সময় লাগবে। মশারির ভেতরেই আমাকে এক পিস খবরখানি দিয়ে চা দেয়া হয়েছে। চারটা খবরের কাগজ দেয়া হয়েছে। এ বাড়িতে খবরের কাগজ রাখা হয় না। আমার জন্যে হাবীব ভাই কিনে এনেছেন। আমাকে জানিয়েছেন উন্নতমানের নাশতার ব্যবস্থা হচ্ছে। একটু সময় লাগবে। উন্নত মানের নাশতার বিবরণও শুনিয়েছেন—

পরোটা
নান রঞ্জিট
খাসির চাপ
পায়া

পরোটা ঘরে বানানো হচ্ছে। বাকি আইটেম পুরনো ঢাকার পালোয়ানের দোকান থেকে আসছে। এদের খাসির চাপ এবং পায়া না-কি বিশ্বসেরা।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে যে কাগজটা আছে তারা মনে হয় বিশেষ ধর্ষণ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ধর্ষণ সংবাদ (সচিত্র), কলেজছাত্রী শিপ্রার প্রতিষ্ঠানবিষয়ক স্টেরি। শিপ্রার বক্তব্য। একজন ইউপি চেয়ারম্যানের বক্তব্য, ওসি সাহেবের বক্তব্য। শেষের পাতায় ধর্ষণ সংবাদ (সচিত্র)। ভেতরের পাতায় মফস্বল ধর্ষণ সংবাদ।

অন্য আরেকটি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ধাক্কার মতো খেলাম। প্রথম পাতায় বাদলদের বাড়ির ছবি। খবরের শিরোনাম—‘কুকুরের হাতে বন্দি’।

খবর পড়ে জানা গেল ‘টাইগার’ নামে একটি হিংস্র এবং প্রায় বন্য কুকুরের হাতে গৃহের সবাই বন্দি। গৃহের সকল সদস্য সারারাত ছাদে কাটিয়েছে। কুকুরটাই না-কি সবাইকে তাড়া করে ছাদে তুলেছে এবং নিজে ছাদের সিঁড়িতে ঘাঁটি গেড়েছে। ছাদ থেকে কাউকে নামতে দিচ্ছে না। কাউকে ছাদে উঠতেও দিচ্ছে না। ছাদে যারা বন্দি তাদের উদ্ধারের জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দেয়া হয়েছিল। দমকল বাহিনীর লোকজন পানির পাইপ হাতে ছাদে উঠতে গেলে কুকুরের তাড়া খেয়ে দ্রুত নামার সময় দু'জন পা পিছলে গুরুতর আহত হয়। এই দু'জন পঙ্কু হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

কুকুরের ছবি তোলার জন্যে একটি বেসরকারি টিভির ক্যামেরাম্যান
কুকুরের কামড় খেয়েছেন এবং তার মূল্যবান ক্যামেরা হারিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগের একজন শিক্ষক ড. ফজলে
আবেদ কুকুরের ছবি এবং তার কর্মকাণ্ডের বিবরণ শুনে মন্তব্য করেছেন যে,
এটি কোনো সাধারণ কুকুর না। বিশেষ প্রজাতির এলসেশিয়ান কুকুর। এবং
উচ্চতর ট্রেনিংপ্রাণী কুকুর। ড. ফজলে আবেদের ধারণা র্যাব তাদের ডগ
ক্ষোয়াড়ে যে সব কুকুর রেখেছে টাইগার তাদেরই একজন। ডগ ক্ষোয়াড়
থেকে পালিয়ে সে তার স্বাধীন কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে।

র্যাবের প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য
করতে অস্বীকার করেন। নাম না প্রকাশ করার শর্তে জনৈক র্যাব কর্মকর্তা
বলেন, তাদের ডগ ক্ষোয়াড়ের একটি ডগ গত এক মাস ধরে মিসিং। একটি
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে দুর্ধর্ষ
এক কুকুর জনজীবনে হৃষকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবহেলার কৈফিয়ত কে
দেবে?

কঠিন প্রতিবেদন। এমন প্রতিবেদন পঁচড়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না।
আমি হাবীব ভাইয়ের মোবাইল থেকে যোগাযোগ করলাম। প্রথম রিং-এ
খালু সাহেব ধরলেন। ধরেই খ্যাক করে উঠলেন, কে?

আমি বললাম, আমি হিম্মত!

খালু সাহেবের গলায় হাহাকার ধ্বনি, তুমি খবর কিছু জানো?
কী খবর?

সারারাত হৈচে। মাতামাতি। এখন সবগুলো টিভি চ্যানেলে খবর
দেখাচ্ছে আর তুমি কিছু জানো না! আমরা তোমার ঐ ভয়ঙ্কর কুকুরের
হাতে বন্দি। সবাই এখন ছাদে। রাতে কেউ ডিনার করতে পারে নি।

ব্রেকফাস্টের অবস্থা কী?

পাশের বাড়ির ছাদ থেকে পলিথিনের ব্যাগে নাশতা ভরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
মারছে। তুমি টিভি খোল। টিভি খুললেই Live দেখতে পাবে। তোমার
কাছে আমার অনুরোধ—খবর পরে দেখবে। এই খবর অনেকবার রিপিট
করবে। তুমি এসে তোমার কুকুর নিয়ে যাও। আমার কোনো কারণে যদি
তুমি আমার উপর অসম্মত হয়ে থাক, Forgive me. মানুষ মাত্রই ভুল
করে। নাও বাদলের সঙ্গে একটু কথা বলো।

বাদল টেলিফোন হাতে নিয়েই ফিসফিস করে বলল, হিমুদা! বিরাট ড্রামা। সো এক্সাইটিং। আমার আনন্দে লাফাতে ইচ্ছা করছে। টিভি চ্যানেলে এর মধ্যে আমি একটা ইন্টারভু পর্যন্ত দিয়েছি। চ্যানেলের লোকরা কী বলছে জানো? আমাদের না-কি Air lift করা হবে। হেলিকপ্টার দিয়ে দড়ি বেঁধে এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে নেয়া হবে। এতে ওদের বিরাট পাবলিসিটি। তুমি যেখানে আছ সেখানে টিভি আছে না? চ্যানেল আই ছাড়। ওদের লাফালাফিই সবচেই' বেশি।

নাশতা খেতে খেতে টিভি দেখছি। ফর্সা, রোগা, মাথায় টাক এক মুবক উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে—সুপ্রিয় দর্শক! সামান্য একটা কুকুর কী পরিমাণ বিপর্যয়ের জন্য দিতে পারে তা ব্যক্ষে দেখুন। কুকুরের হাতে বন্দি অসহায় একটি পরিবারের সাহায্যে এসেছে আপনাদের প্রিয় চ্যানেল—চ্যানেল আই। হৃদয়ে বাংলাদেশ। আমাদের ব্যবস্থাপনায় একটি হেলিকপ্টার কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হবে। আমরা মানবিক কারণে একটি অসহায় পরিবারকে উদ্ধার করব।

সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন চ্যানেল আই সবসময় অসহায় মানবতার স্বার্থে কাজ করেছে। অতীতে করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। আমি হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পাচ্ছি—তো দেখা যাচ্ছে হেলিকপ্টার।

মোটামুটি মুঝ হয়েই হেলিকপ্টারের উদ্ধার দৃশ্য দেখলাম। দড়িদাঢ়া নামছে, খালু সাহেব হাত পা ছুড়ে না না করছেন। টিভি ক্যামেরা হঠাত খালু সাহেবকে বাদ দিয়ে টাইগারকে ধরল। টাইগার এতক্ষণ ছাদে ছিল না। মজা দেখতে সেও চলে এসেছে।

টিভির কমেন্টেটারের উত্তেজিত গলা শোনা যাচ্ছে— সুপ্রিয় দর্শক, উদ্ধার কাজে বিঘ্ন ঘটতে যাচ্ছে বলে আমরা ধারণা করছি। দুর্ধর্ষ হিংস্র টাইগারকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বিপর্যয়ের মূল হোতা যে টাইগার তাকে ছাদে দেখা যাচ্ছে। সে কী করবে বোৰা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে ছাদে ছুড়ে ফেলা পলিথিনের প্যাকেট সে শুঁকে শুঁকে দেখছে।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্ধার কাজে দমকল বাহিনীর সদস্যরা চলে এসেছেন। তাদের মই উঠে আসছে। দু'মুখি উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে।

সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলি, আমরা দমকল বাহিনীর উদ্ধার অভিযানের ভিডিও করতে গিয়ে উদ্ধার অভিযানের চরম সংকটময় মুহূর্ত কিছুক্ষণের জন্যে

আপনাদের দেখাতে পারি নি। এখন দেখুন— দড়িতে করে যে ভদ্রলোককে হেলিকপ্টারে তোলা হচ্ছিল তাঁর দড়িদাঢ়ায় কোনো একটা সমস্যা হয়েছে বলে তিনি উল্টো হয়ে অতি বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুলছেন। আমরা আশঙ্কা করছি, যে-কোনো মুহূর্তে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে। এই ভদ্রলোক ছিটকে পড়বেন ছাদে।

সুপ্রিয় দর্শক, কিছুক্ষণের বিজ্ঞাপন বিরতি। বিরতির পর আপনাদের আমরা আবার নিয়ে আসব রোমাঞ্চকর এই উদ্ধার অভিযানে।

বিজ্ঞাপন শুরু হলো। মনে হচ্ছে আজ আবুল হায়াত দিবস। প্রতিটি বিজ্ঞাপনই তাঁর। প্রথমে লিপটন তাজা চায়ের গুণগান করলেন। তারপর তাঁকে দেখা গেল নাসির গ্লাসের গুণগান করতে। নাসির গ্লাসের পর সিংহ মার্কা শরিফ মেলামাইন। আবুল হায়াত দর্শকদের সাবধান করলেন কেউ যেন সিংহমার্কা না দেখেই শরিফ মেলামাইন না কেনে। সিংহমার্কার পরেই তিনি চলে এলেন গরু মার্কায়। গরুমার্কা টেউটিন বিশ্বমানের। জানা গেল গরুমার্কা টেউটিন ছাড়া অন্য কোনো টেউটিন তিনি ব্যবহার করেন না। টিন পর্ব শেষ হবার পরই সিমেন্ট পর্ব।

সিমেন্টের বিজ্ঞাপনটা দেখার শখ ছিল। দেখা হলো না। নাশতা খাওয়া শেষ হয়েছে, আমার উঠে পড়া দরকার। টাইগারকে উদ্ধার করতে হবে। তাকে যেখান থেকে এনেছি যেখানে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। বাদলদের বাড়িতে রাখা যাবে না। ঐ ঘাড়ি এখন টাইগারের জন্যে অতি বিপদজনক স্থান। টাইগারকে উদ্ধার কীভাবে করব তাও বুঝতে পারছি না। টাইগারের জন্যে কোনো উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার আসবে না। তার জন্যে আসবে মিউনিসিপালিটির কুকুর ধরা গাড়ি। তার যে এখন জীবনসংশয় তা বুঝতে পারছি, তবে ভরসার কথা— বাদল আছে। বাদল তার নিজের জীবন থাকতে টাইগারের কিছু হতে দেবে না। তার পরেও কিছু বলা যায় না।

আমার বাবা (মহাপুরুষ গড়ার কারিগর) তাঁর উপদেশমালায় মৃত্যুবিষয়ক অনেক কথাবার্তা লিখে গেছেন। সেখানে অতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণ জীবাণুর মৃত্যু বিষয়েও লেখা আছে—

জীবাণুর জন্ম মৃত্যু

জীবাণু অতি নিম্নপর্যায়ের প্রাণ। যেহেতু প্রাণ আছে
কাজেই মৃত্যুও আছে। মুহূর্তেই লক্ষ কোটি জীবাণুর জন্ম

হয়, আবার মুহূর্তেই মৃত্যু। অতি ক্ষণস্থায়ী জীবনকালে তাহারা কী ভাবে? তাহাদের চেতনায় চারপাশের জগৎ কী? এই বিষয়ে বাবা হিমু, তুমি কি কখনো চিন্তা করিয়াছ? আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে জীবাণুর চিন্তা-চেতনা অর্থহীন। তাহাদের ক্ষণিক জীবনে চিন্তা-চেতনার স্থান নাই। এই যুক্তি মানিয়া মানব সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু বলি। মহাকাল এবং বিশ্বক্ষাণের কাছে মানব সম্প্রদায়ের ক্ষণিক জীবনও তুচ্ছ। সেই বিবেচনায় তাহাদের চিন্তা-চেতনাও অর্থহীন।

মানব সম্প্রদায়ের উচিত নিজেদেরকে জীবাণুর মতোই চিন্তা করা। কিন্তু অহংবোধের কারণে তাহারা তা করে না। বরং অমরত্বের কথা ভাবে। পাবলো নেরুদার বিখ্যাত কবিতা *Fin del mundo*-র প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—

তাজ্জব, মোৎসার্ট কি-না লম্বার্ল তোফা ফ্রককোটে
আমাদের শতকেও নাছেড়বান্দার মতো টিকে আছেন,
এখনো বাহারি সায়েজ জমকালো, পরিপাটি পূর্ণসু
সঙ্গীতে;

বিগত শতক জুড়ে, মনে হয়, আর কোনো আওয়াজও
বুঝি বা কানে আসে নি।

এখন সন্ধ্যা।

আমি দাঁড়িয়ে আছি আয়না মজিদের বাসার সামনে। আমার সঙ্গে টাইগার। তাকে অনেক ঝামেলা করে উদ্বার করতে হয়েছে। মিউনিসিপালিটির কুকুর ধরা গাড়িতে তাকে ভরে ফেলা হয়েছিল। গাড়ির ড্রাইভার এবং তার অ্যাসিস্টেন্টকে টাকা খাইয়ে বাদল কুকুর উদ্বার করেছে। টাকার পরিমাণ কত বাদল বলছে না। মনে হয় বেশি। গাড়িতে টাইগার যে ভঙ্গিতে বসেছিল এখনো সিঁড়ির গোড়ায় সেই ভঙ্গিতে (হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের মতো) থাবা গেড়ে বসে আছে। তাকে দেখে মনে

হচ্ছে সে মোৎসাট্টের কোনো মহান সঙ্গীত শুনছে। সঙ্গীত ভেসে আসছে বক্ষ দরজার ওপাশ থেকে। আমি খানিকটা দিধাগ্রস্ত—দরজার কলিংবেলে হাত রাখব কি রাখব না। কলিংবেল নতুন লাগানো হয়েছে। নতুন কলিংবেল বলে দেয় ভাড়াটে বদল হয়েছে।

আয়না মজিদ টাইপ লোকজন জলেভাসা কলমির মতো এক জায়গায় কখনো থাকবে না। তাদের ভাসতে হবে। কলিংবেলে হাত রাখতে হলো না, দরজা খুলে গেল। আয়না মজিদ বললেন, ভেতরে আসুন।

আমি ঘরে ঢুকলাম। টাইগারও আমার গা ঘেঁসে ঘরে ঢুকল। বেচারা ভালো ভয় পেয়েছে। এখন সে আমাকে ছাড়বে না। আয়না মজিদ বললেন, টেলিভিশনে যাকে দেখেছি এই কি সে?

আমি হাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

ঘরের ভেতরটা অঙ্ককার। বাতি জ্বালানো হয় নি। কোনো কিছুই পরিকার দেখা যাচ্ছে না। এই অঙ্ককারেও আয়না মজিদের চোখে কালো চশমা। সে কোনো দিকে তাকাচ্ছে না; বা জ্ঞানৌ তাকাচ্ছে কি-না বুঝতে পারছি না।

বসুন।

আমি বললাম, কোথায় বসবো?

মেঝেতে বসুন।

আমি টাইগারের পাশে বসলাম এবং টাইগারের মতোই থাবা গেড়ে বসলাম। অঙ্ককারে এই দৃশ্য রহস্যময় লাগার কথা। তবে কালো চশমার কারণে আয়না মজিদ কিছু দেখবে বলে মনে হয় না। আমি বললাম, ঘর অঙ্ককার কেন?

কারেন্ট নাই এইজন্যেই অঙ্ককার। আমি ঘর অঙ্ককার করে লুকিয়ে বসে থাকার মানুষ না।

মোমবাতি নাই?

থাকার কথা। কোথায় আছে জানি না।

যে জানে সে কোথায়?

আয়না মজিদ জবাব দিল না। আমি আয়োজন করে কাঁধে ঝুলানো চট্টের ব্যাগ থেকে মোমবাতি এবং দেয়াশলাই বের করলাম। আমার ব্যাগে একেক সময় একেক জিনিস থাকে। আজ আছে মোমবাতি-দেয়াশলাই,

এক কৌটা গোলমরিচ, থাম্বার জয় নামের জনৈক পদাৰ্থবিদের একটা বই,
নাম Ultimate Nothing.

আমাকে ব্যাগ থেকে মোমবাতি বের করে জ্বালাতে দেখে আয়না মজিদ
কিছু বলল না। অন্য যে-কেউ প্রশ্ন করত— আপনি কি সব সময়ই ব্যাগে
মোমবাতি দেয়াশলাই রাখেন?

আয়না মজিদ শান্ত গলায় বলল, আপনি কি আপনার এই কুকুরটা
আমার কাছে বিক্রি করবেন?

করব।

দাম কত?

আমি বললাম, দামের ব্যাপারটা পরে আলোচনা করব। আগে ঠিক
করুন এই বিপজ্জনক কুকুর আপনি চান কি-না। এই কুকুর সর্বক্ষণ
আপনার সঙ্গে থাকবে। লোকজন তখন আপনাকে ডাকবে কুকুর মজিদ।
আপনার জন্যে সম্মানহানিকর।

লোকে আমাকে কী ডাকল তা নিয়ে মাথা ঘামাছি না। কুকুরটা আমি
রাখতে চাই।

রেখে দিন।

মালিকানা বদল কি সে সহজে মানবে?

আমি বললেই মানবে।

এখনই বলুন।

টাইগারের দিকে তাকিয়ে আমি গন্তীর গলায় বললাম, টাইগার, এখন
থেকে আয়না মজিদ তোমার মাস্টার। যাও মাস্টারের কাছে গিয়ে বসো।

টাইগার এই কাজটা করল। কেন করল সে-ই জানে। কুকুর মানুষের
কথা বুঝতে পারে না। বোঝার কোনো কারণ নেই। তবে জগতে অনেক
কাকতালীয় ঘটনা ঘটে। ঘটে বলেই জগৎ এত রহস্যময়।

আয়না মজিদ বলল, এই কুকুর কি আপনার কথা বুঝতে পারে?

আমি জবাব দিলাম না। নৈঃশব্দ রহস্যময়। প্রকৃতিও রহস্যময়তা
পছন্দ করে। আয়না মজিদ বলল, আপনি কি রাতে আমার সঙ্গে ডিনার
করবেন?

হ্লঁ।

কী খেতে চান?

বিয়েবাড়িতে যেমন ঘোল ঘোল করে বড় বড় পিসের খাসির মাংসের
রেজালা করে সেরকম রেজালা ।

সঙ্গে আলু থাকবে?

হঁয় থাকবে। চাক চাক করে বড় বড় আলু ।

রেজালা কী দিয়ে খাবেন? চিকন চালের ভাত, না পোলাও?

অবশ্যই পোলাও ।

কলিজা দিয়ে আলুর চপের একটা প্রিপারেশন আছে। প্রচুর ধনেপাতা
দিয়ে করা হয়। পোলাওয়ের সঙ্গে খেতে ভালো হয়। করব?

করুন ।

বোরহানি করব?

না ।

তাহলে সালাদ করি? টমেটো, কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজের সালাদ ।

করুন। ঘরে নিশ্চয়ই বাজার নেই। টাকা দিন বাজার করে নিয়ে আসি।
আমার সঙ্গে টাকা থাকে না ।

আপনাকে বাজার করতে হবে না। ভোলো মাংস আপনি চিনবেন না।
আমার পরিচিত কসাই আছে, মাংস দিয়ে যাবে ।

আমি তাহলে হাঁটাহাঁটি করে স্ফুর্ধা চাগিয়ে আসি ।

আসুন ।

আপনি কি ইংরেজি পড়তে পারেন?

কেন জিজ্ঞেস করছেন?

আপনার জন্যে একটা ইন্টারেস্টিং বই নিয়ে এসেছিলাম। বইটা
ইংরেজিতে লেখা, নাম Ultimate Nothing. ইংরেজি পড়তে পারলে বইটা
আপনাকে দিতাম ।

ইংরেজি পড়তে পারি। বইটার বিষয়বস্তু কী?

বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশাল এই বস্তুজগৎ আসলে শূন্য। শূন্যের বেশি কিছু না।
তার মানে?

পড়ে দেখুন। আপনি বই পড়তে পছন্দ করেন এই তথ্য আমি জানি ।

আমার বিষয়ে আর কী জানেন?

আপনি অতি ভয়ঙ্কর এই তথ্য জানি। তথ্যটা কি ঠিক আছে?
ঠিক আছে ।

কে বেশি ভয়ঙ্কর—আপনি না লম্বু খোকন?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রিসিটি চলে এলো। টাইগার বসেছিল। চারপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গা ঝাঁকা দিল। আয়না মজিদ চোখ থেকে সানগ্লাস খুলল। তার চোখ ঝকঝক করছে। প্রথম যখন দেখেছি তখন চোখ ঝকঝকে দেখি নি।

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, আমি কি রাতে খাবার সময় একজন গেস্ট নিয়ে আসতে পারি?

আয়না মজিদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, পারেন।

কাকে আনতে চাই জানতে চান?

না।

পুলিশের কাউকেও তো নিয়ে আসতে পারি। যেমন কবীর সাহেব। উনি ভালো খাওয়াদাওয়া পছন্দ করেন। তবে তাঁর জন্যে খাবার শেষে টক দে লাগবে।

আয়না মজিদ তাকিয়ে আছে। এর তাকানোয় বিশেষত্ব আছে। বিশেষত্বটা আগে ধরতে পারছিলাম না, এখন ধরলাম। আয়না মজিদ যখন তাকায় তখন চোখে পলক ফেলে না। চোখে পলক ফেলার সময় হলে চোখ ফিরিয়ে নেয়। পলক ফেলার অংশটি সেই কারণে চোখে পড়ে না।

হিয়!

জি।

আপনার যাকে ইচ্ছা তাকে আনতে পারেন। আমি বুবতে পারছি আপনি খেলা খেলতে চান। আপনি ভালো খেলোয়াড়। আমিও কিন্তু খারাপ না।

আমি বললাম, ডিনার কখন দেয়া হবে? কাঁটায় কাঁটায় সেই সময় আসব। আগেও না পরেও না।

রাত দশটায়। যাকে আনবেন তার জন্যেই আমি তৈরি থাকব।

আয়না মজিদের কথাবার্তায় কাঠিন্য চলে এসেছে। কথাও বলছে দ্রুত। সে এক ধরনের টেনশন বোধ করছে। খেলার জন্যে সে তৈরি। ভয়ঙ্কর কোনো খেলাই সে আশা করছে। তাকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না।

পাঠক, অনুমান করুন তো আমি আয়না মজিদকে ভড়কে দেবার জন্যে কাকে নিয়ে ডিনার খেতে আসব? দেখি আপনাদের অনুমান শক্তি।

যেসব পাঠক নাটকীয়তা পছন্দ করেন তারা ধরেই নিয়েছেন আমি ডিএসবি ইসপেষ্টের কবীর সাহেবকে নিয়ে আসব। এতে হাইড্রামা তৈরি হবে ঠিকই, তবে সম্ভাবনা একশ ভাগ যে এই ড্রামা হাতের মুঠো থেকে বের হয়ে যাবে। Out of control situation. তাছাড়া আয়না মজিদ এই নাটকীয়তার জন্যে তৈরি থাকবে। কবীর সাহেবকে এনে তাকে চমকানো যাবে না।

অতিথির সঙ্গানে বের হয়েছি। Guess who is coming to the dinner?

এক ঠেলাওয়ালা পেলাম। সে তার ঠেলা লাইটপোস্টের সঙ্গে তালাচাবি দিয়ে আটকাচ্ছে। ঠেলাওয়ালার চেহারা ইন্টারেস্টিং। অবিকল আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। জুলজুলে তীক্ষ্ণ চোখ, গাল ভাঙা। আব্রাহাম লিংকনের মতোই রোগা এবং লম্বা। আমি দরাজ গলায় বললাম, কেমন আছেন ভাই?

ঠেলাওয়ালা গভীর সন্দেহ নিয়ে আমাকে দেখছে। আব্রাহাম লিংকন এভাবে তাকাতেন না।

রাতের খাবার আমার সঙ্গে খাবেন? ভালো আয়োজন আছে।

না।

না, কেন?

পুলাপানে বইসা আছে, আমি মাংস পাকাব তারা খাইব।

মাংস কিনেছেন?

হঁ।

ঠেলার ভেতরই খবরের কাগজে মোড়া মাংস। একটা তেলের শিশি। আরেকটা পেঁটুলা দেখা যাচ্ছে, মনে হয় চাল।

আপনার পুলাপান কয়জন?

খামাখা এত কথা জিগান ক্যান? আপনে কে?

ঠেলাওয়ালা দাঁড়াল না। হনহন করে যাচ্ছে। আমি তার পেছনে পেছনে যাচ্ছি। মানুষের অঙ্গুত শ্বাবের একটি হলো অনুসরণ। ঠেলাওয়ালা দাঁড়িয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বলল, আপনের মতলব তো ভালো ঠেকতাছে না। পিছে পিছে আসেন ক্যান? আর এক পাও আইছেন কি ইটের চাক্কা দিয়া ডেলা দিয়ু।

আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। ঘণ্টাখানিক হাঁটাহাটি করে একজন
রাতের অতিথি পাওয়া গেল। চার থেকে পাঁচ বছর বয়সী মেয়ে, নাম
বকুল। সে তার দাদার সঙ্গে গান গেয়ে ভিক্ষা করে। বকুলের দাদা একটা
গানই জানে, ‘পীরিতি করবায় সুমনে’। দাদার তিনদিন ধরে জুর। ভিক্ষায়
যেতে পারে নি। বকুলের খাওয়া প্রায় বন্ধ। এ নিয়ে বকুলকে তেমন চিন্তিত
মনে হচ্ছে না। সে তিন-চারটা পাথর জোগাড় করেছে, তাই নিয়ে নিবিট
মনে খেলছে। পাশেই তার দাদা সারা শরীর চাদরে ঢেকে শুয়ে আছে।
খোলা আকাশের নিচে যে শুয়ে আছে তা-না। মাথার উপর নীল পলিথিনের
ছাদ। এক কোনে ইটের চূলা। কিছু হাঁড়িকুড়ি। লাল রঙের প্লাস্টিকের
বালতি। বকুল এবং বকুলের দাদা আমার পরিচিত। তাদের পলিথিনের
ঘরে একবার ডালভর্তা দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম।

বকুল, কী করো?

খেলি।

রাতে খাওয়া হয়েছে?

না।

চল আমার সঙ্গে, তোর দাওয়াত।

বকুল পাথর ফেলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। চাদরের ভেতর থেকে তার
দাদা বলল, হিমু ভাইজান, এবে মিয়া যান। আমি আর পারতেছি না। অপারগ।
আপনে অনেক দয়া করেছেন। আরেকটু করেন। আপনের পায়ে ধরি।

শরীর কি বেশি খারাপ?

জে। মরণ রোগে ধরেছে। মরণ রোগে ধরলে পানি তিতা লাগে।
আমার লাগতাছে। কলের পানি মুখে দিলে মনে হয় চিরতার পানি। হিমু
ভাই, আপনার সাথে কি টেকা পয়সা কিছু আছে?

দশ টাকার একটা নোট আছে।

একটা গান গাই। গান শুইন্যা দশটা টেকা দিয়া যান।

গাও।

বৃন্দ চাদরের ভেতর থেকে গান ধরল-

‘পীরিতি করবায় সুমনে। ও সখী, পীরিতি করবায় সুমনে!

আয়না মজিদ বকুলকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। আমাকে
বলল, এ আপনার গেস্ট!

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম । .

আয়না মজিদ বকুলকে বলল, এই তোর নাম কী? বকুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার নাম বকুল। আপনের নাম কী? বলেই সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল টাইগারের উপর। যেন অনেক দিন প্রায় সে তার পুরনো বান্ধবের দেখা পেয়েছে। ঝাঁপাঝাঁপি আদর মনে হয় টাইগারের পছন্দ হয়েছে। সে পেটের ভেতর থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বের করছে। বকুল এখন ঘোড়ার মতো কুকুরটার পিঠে চড়ার চেষ্টা করছে। টাইগারের তাতে তেমন আপত্তি আছে বলেও মনে হচ্ছে না। আয়না মজিদ তাকিয়ে আছে বকুলের দিকে। তার চেথের দৃষ্টিতে পরিবর্তন লক্ষ করলাম। এখন সে ঘনঘন পলক ফেলছে।

বকুল আয়না মজিদের দিকে ফিরে বলল, এই কুন্টাটার নাম আছে?

মজিদ বলল, না।

বকুল বলল, আমি এর নাম দিলাম ভুলু। এই ভুলু, গান শুনবি?

ভুলু ঘোঁ জাতীয় শব্দ করতেই বকুল গান শুরু করল—

পীরিতি করবায় সুমনে

ও সখী, পীরিতি করবায় সুমনে!

মেয়েটির গলা তীক্ষ্ণ, ধরেছেও অনেক চড়ায়। সারা ঘর ঝনঝন করছে। দুই লাইন গেয়েই বকুল খেলায় ফিরে গেল। এবার সে খেলছে আরব্য রঞ্জনীর রূপকথার খেলা। কুকুরের লেজ ধরে টেনে সোজা করার চেষ্টা। এই কাজ সে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে করে যাচ্ছে।

আয়না মজিদ আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, আপনি আসলে কী চাচ্ছেন পরিষ্কার করে বলুন।

আমি বললাম, কিছু তো চাচ্ছি না।

অবশ্যই চাচ্ছেন। অবশ্যই আপনি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। বেছে বেছে এমন একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছেন যার নাম বকুল।

বকুল নামে কোনো সমস্যা আছে?

আমার একটা ছোট বোন ছিল, নাম বকুল। তার একটা পোষা কুকুর ছিল নাম ভুলু।

বাংলাদেশে অসংখ্য বকুল নামের মেয়ে আছে। এ দেশের বাচ্চারা তাদের পোষা কুকুরের নাম হয় ভুলু রাখে কিংবা টাইগার রাখে।

বকুল নদীতে দুবে মারা গিয়েছিল। নদীর যেখানে বোনের লাশ ভেসে
উঠেছিল তার পোষা কুকুর ভুলু রোজ সেখানে যেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে
থাকত।

পশ্চদের আবেগ ভালোবাসার প্রকাশ মাঝে মাঝে তীব্র হয়।

আয়না মজিদ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আপনি পাশ কাটাবার
চেষ্টা করবেন না। আপনি নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছেন। লম্বু
ঝোকন আপনার পরিকল্পনার অংশ। আপনি কি জানেন সে রোজ রাতে
একটা বকুল গাছের চারপাশে ঘূরপাক খায়?

জানতাম না। এখন জানলাম।

এই ঘূরপাক খাওয়া আপনি তার মাথায় ঢুকান নি? সে বলেছে
আপনাকে এই কাজ করতে দেখেছে বলেই সে করে।

মানুষ অনুকরণশ্রিয়। সে অনুকরণ করতে পছন্দ করে। একজন লম্বা
মানুষের আশেপাশের সব মানুষ উঁচু হয়ে দাঁড়াতে চায়। কাউকে হাসতে
দেখলে আমাদের মুখ হাসি হয়ে যায়। আপনার রাগী রাগী মুখ দেখে
আমার মুখও খানিকটা রাগী রাগী হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা।

আয়না মজিদের চোখ আবার আগেস্থ মতো হয়ে গেছে। পলক পড়া
বন্ধ। মানুষের এই অবস্থাকে বলে সুপ্রভাব। সাপের চোখের পাতা নেই
বলে সে পলক ফেলে না। বকুলের দিকে এখন সে ফিরেও তাকাচ্ছে না।
ফিরে তাকালে মজা পেত। বকুল কুকুরের পিঠে চড়ে বসেছে। দু'হাতে
কুকুরের গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। আমি বললাম, আপনার বোন বকুল
কি তার কুকুরের পিঠে চড়তো?

হ্যাঁ চড়তো।

তাহলে এই দৃশ্য দেখে আপনার আনন্দ পাওয়া উচিত। আপনাকে
দেখে মনে হচ্ছে আপনার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

খাবার দিচ্ছি, খেয়ে মেয়ে নিয়ে বিদায় হয়ে যান।

টাইগারকে রেখে যাব?

হ্যাঁ।

ওর নাম এখন কী? টাইগার না-কি ভুলু?

আয়না মজিদ জবাব দিল না।

প্রচুর খাবার সাজিয়ে আমি আর বকুল বসেছি। বকুল চোখ বড় বড়
করে খাবারগুলো দেখে হঠাত হাত গুটিয়ে বলল, খামু না।

আমি বললাম, খাবে না কেন?

বকুল জবাব দিল না। তার চোখ মুখ শক্ত। পরিষ্কার বোৰা যাচ্ছে ক্ষুধার্ত এই মেয়েটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়ানো যাবে না। আমি বললাম, চল তাহলে উঠে পড়ি। তোকে ফেলে একা তো খেতে পারি না। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া শোভন না।

আয়না মজিদ শীতল গলায় বলল, খুব শিগগির আবার দেখা হবে।

আমি বললাম, কুকুরটা নগদ টাকায় কিনবেন বলেছিলেন। টাকা কি এখন দেবেন?

কত টাকা?

এক লাখ টাকা।

একটা নেড়ি কুস্তার দাম এক লাখ?

নেড়ি কুস্তা বলে তাকে অবহেলা করা ঠিক না। সে এখন টিভি স্টার।

আয়না মজিদ বলল, টাকা দিচ্ছি নিয়ে যান।

যে কুকুর নিয়ে বকুলের এত মাখামাখি আবার সময় বকুল তার দিকে ফিরেও তাকাল না। কুকুর বেচারা প্রচুর শ্লেষ নাড়ল, দৃষ্টি আকর্ষণের নানান চেষ্টা করল। লাভ হলো না। পশুরা কখনোই বিচিত্র মানব জাতিকে বুঝতে পারে না।

বকুলকে তার আস্তানায় নিয়ে গেলাম। তার দাদাজান সেখানে নেই। আরেক ভিস্কু পরিবার আস্তানা দখল করে বসে আছে। ইটের চুলায় আঙুন জুলছে। হাঁড়িতে কী যেন ফুটছে। বৃদ্ধা এক ভিস্কু দাঁত-মুখ খিচিয়ে বলল, চান কী?

আমি বললাম, এই জায়গাটা তো আমাদের।

বৃদ্ধা কঠিন গলায় বলল, আপনের নাম লেখা আছে? দেখান কোনখানে নাম লেখা?

আমি বকুলের দিকে তাকিয়ে বললাম, বকুল কী করা যায়?

বকুল উদাস গলায় বলল, জানি না।

বৃদ্ধা আবারো ঝাঁঝিয়ে উঠল, আপনেরা ফুটবেন? না ফুটলে খবর আছে।

আমি বকুলের হাত ধরে হাঁটা ধরলাম। কোথায় যাওয়া যায় তা নিয়ে মাথা ঘামাছি না। সবার গত্বয়ই পূর্বনির্ধারিত। ক্লাসিকেল মেকানিঞ্চ তাই

বলে। শোভা আপু চোখ কপালে তোলার চেষ্টা করতে করতে বললেন, তুই
পাকিয়েছেন হাইজেনবার্গ সাহেব। তিনি অনিষ্টয়তা নিয়ে এসেছেন। তাঁর
কারণেই সর্ব গন্তব্যে কিছু অনিষ্টয়তা।

শোভা আপু চোখ কপালে তোলার চেষ্টা করতে করতে বললেন, তুই
এত রাতে! সঙ্গে এই পিচ্ছি কে? এই পিচ্ছি তোর নাম কী?

আমার নাম বকুল, তোমার নাম কী?

শোভা আপু বিশ্বিত হয়ে বললেন, এ দেখি টের টের করে কথা বলে।

আমি বললাম, শোভা আপু, আমরা দু'জন ভাত খাব, ক্ষিধায় মারা
যাচ্ছি।

তুই যে কী যন্ত্রণা করিস! (শোভা আপুকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে
হচ্ছে। আমার যন্ত্রণায় তিনি কিছুমাত্র বিচলিত এমন মনে হলো না।)

গরম ভাত, ঘি, আলুভাজি। ডালও লাগবে। ঘন ডাল।

আগে বল এই মেয়ে কে?

এর নাম বকুল। এখন থেকে তোমার সঙ্গে থাকবে। কুলে ভর্তি করিয়ে
দেবে। দুলাভাই আপত্তি করলে তাকে সামলাবে।

আপত্তি করবে কেন?

দুলাভাই বাসায় আছে নাহি,

আছে। ঘুমাচ্ছে। ডাকি?

না না। ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। আমাকে দেখলে অগ্র্যৎপাত হবে। বামেলা
দরকার কী? শোভা আপু টাকাটা রাখ।

কী টাকা?

এখানে এক লাখ টাকা আছে। বকুলের এক আঞ্চীয়, দূরসম্পর্কের
ভাই, টাকা দিয়েছে। মেয়ের লেখাপড়ার খরচ।

বলিস কী?

দুলাভাইকে এই টাকার কথা বলার দরকার নেই। পুলিশের লোক তো,
নানান প্রশ্ন করবে। কী দরকার? আরেকটা কথা। আমি কিন্তু ভাত খেয়েই
ফুটব।

ফুটব মানে কী?

ফুটব মানে হাওয়া হয়ে যাব। Gone with the wind. বাতাসের সঙ্গে
বিদায়।

শোভা আপু ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বলল, এই মেয়েটার ভাগ্য ভালো।

কেন বলো তো?

আজ আমাদের ম্যারেজ ডে। তোর দুলাভাই এই জন্যে বাইরে থেকে নানান খাবারদাবার কিনে এনেছে। ফ্রিজভর্টি খাবার। গরম করব আর তোদের দেব।

গরম করা শুরু কর। সাবধানে গরম করো। শব্দ যেন না হয়। দুলাভাইয়ের ঘূম যেন না ভাঙে।

ও মরণ ঘূম ঘুমায়। একবার ঘুমিয়ে পড়লে কানের কাছে ঢেল বাজালেও ঘূম ভাঙবে না। একবার কী হয়েছে শোন— চোর ঘরে ঢোকার জন্যে জানালার প্রিল কাটছে। তোর দুলাভাই মরা ঘূম ঘুমাচ্ছে। আমি ঘূম ভাঙানোর জন্যে তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে মেঝেতে ফেলে দিয়েছি, তারপরেও ঘূম ভাঙে না। হি হি হি।

যে লোক মরণ ঘূম ঘুমায় শোভা আপুর হালকা হি হি হাসিতে তাঁর ঘূম ভাঙল। তিনি উঠে এলেন এবং হতভম্ব হয়ে তাকালেন। আমাকে বললেন, আপনি কে?

আমি বললাম, দুলাভাই আপুর সঙ্গে তো আমার পরিচয় হয়েছে। আমাকে রিমান্ডে নিয়ে গেলেন ভালো আছেন? হ্যাপী ম্যারেজ ডে।

এইমাত্র ঘূম থেকে উঠে আসার কারণেই হয়তো বেচারা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। চোখের সামনে আয়না মজিদকে দেখেও কী করবেন বা কী করা উচিত বুঝতে পারছেন না। তিনি আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বকুলের দিকে তাকালেন। চাপা গলায় বললেন, এই মেয়ে কে?

আমি বললাম, এর নাম বকুল। এ আয়না মজিদের বোনের মতো। আপনাদের ম্যারেজ ডে উপলক্ষে বকুল আপনাকে গান শোনাবে।

বকুল সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল,

পীরিতি করবায় সুমনে

ও সখী, পীরিতি করবায় সুমনে!

গানের মাঝখানেই দুলাভাই বললেন, এই মেয়ে থাকে কোথায়?

শোভা আপু বললেন, তুমি পুলিশী জেরা বক্ষ কর তো। এরা ক্ষিধায় মারা যাচ্ছে। তুমি ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে গরম করে দাও।

শোভা! তুমি পৃথিবীর সবচে' বড় গাধা মেয়ে বলে বুবতে পারছ না
এরা কারা। দু'জনই ভয়কর।

আমার ভাই হয়ে গেল ভয়কর?

তোমার ভাই? তোমার ভাই হয়েছে কবে? আমাকে ভাই শেখাও?

আজ আমাদের ম্যারেজ ডে, তুমি শুরু করেছ ঝগড়া?

শোভা! তুমি ভয়কর একটা ঘটনার শুরুত্বই বুবতে পারছ না। তুমি
জানো এ কে? এর নাম আয়না মজিদ।

আয়না মজিদ হোক বা চিরনি মজিদ হোক, এ আমার ভাই।

ভয়কর একটা খুনির সঙ্গে ভাই পাতায়ে ফেললে?

পাতাতে হয় নি— আগে থেকেই পাতানো ছিল।

Oh my God!

গড় তোমার একার না। আমাদের সবার। বলো Oh our God. বলে
ক্রিজ খুলে খাবার বের কর। যদি তা না কর আমি কিন্তু আগামী সাতদিন
কিছুই খাবো না। পানি পর্যন্ত না। আমার ভাই খেয়েদেয়ে চলে যাবে।
তারপর তোমার যা ইচ্ছা করবে।

দুলাভাই আরো হকচকিয়ে গেলেন। তারপর তাঁকে রান্নাঘরের দিকে
যেতে দেখা গেল। শোভা আপু গলা নামিয়ে বললেন, আগে একবার রাগ
করে চারদিন না খেয়ে ছিলাম। এতেই বাবুর শিক্ষা হয়ে গেছে। দেখিস
আর ঝামেলা করবে না। খেয়েদেয়ে পালিয়ে যাবি। তোর দুলাভাইয়ের
মতলব সুবিধার মনে হচ্ছে না। পুলিশ টুলিশ এনে হলস্তুল করতে পারে।

বকুলকে নিয়ে খেতে বসেছি। প্রচুর খাদ্য। দেখতেও ভালো লাগছে।
চার্লস ডিকেন্স বলেছিলেন, নগরীর এক প্রান্তে প্রচুর খাদ্য কিন্তু কোনো ক্ষুধা
নেই। অন্য প্রান্তে ক্ষুধা কিন্তু কোনো খাদ্য নেই। কথায় ভুল আছে।
যেখানেই খাদ্য সেখানেই ক্ষুধা।

শোভা আপু বকুলের পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। দুলাভাই শোভা
আপুর পাশে। তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে। সেই দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা এবং কিছুটা
ভয়। হাতের কাছে এত বড় ক্রিমিন্যাল অথচ তিনি কিছুই করতে পারছেন
না।

আনন্দে হাবীব ভাইয়ের মাথা মোটামুটি খারাপই হয়েছে বলা যেতে পারে। ডাক্তার আলট্রাসনোগ্রাফি করে বলেছে তাঁর স্ত্রীর যমজ বাচ্চা। ডাবল ফিটস পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। খবর শোনার পর থেকে তিনি উপহার বিলাতে শুরু করেছেন। যমজ উপহার— যাকে পাঞ্জাবি দিচ্ছেন একই রকম দুটা পাঞ্জাবি। যে শাড়ি পাচ্ছে সেও একই শাড়ি দুটা পাচ্ছে।

আমার জন্যেও তিনি উপহার নিয়ে এলেন—ডাবল মোবাইল। কাচুমাচু মুখ করে বললেন, আপনাকে ভালো কিছু দিতে চাই। এরচে' ভালো কিছু আমার মাথায় আসে নাই।

এই যত্ন দুটা দিয়ে আমি করব কী?

একটা তো আপনি দু'দিন পরেই হারিয়ে ফেলবেন, তখন অন্যটা দিয়ে কথা বলবেন। প্রতিমাসের এক তারিখে আমি দুটা মোবাইলে ফ্রেঞ্জিলোড করব।

ফ্রেঞ্জিলোড কী?

টাকা জমা দেবার ব্যবস্থা। আপনি তো দুনিয়ার কিছুই জানেন না। আপনার জানার দরকার নাই, আমরা আছি না? এই বিষয়ে আর কথা বলবেন না হিমু ভাই।

আচ্ছা মোবাইল বিষয়ে কথা শেষে যমজ বাচ্চার নাম কি আলাল দুলাল ঠিক আছে?

হাবীব ভাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনার ভাবির কথা বিবেচনা করে মেনে নিয়েছি। নয় মাস কষ্ট তো সে-ই করবে। তার একটা দাবি আছে না? তবে আমি আলাল দুলাল ডাকব না। আমার নিজের কথারও তো একটা সম্মান আছে।

আপনি কী ডাকবেন?

আমি বড়টাকে ডাকব আলা, ছোটটাকে দুলা। আলা-দুলা।

আলা-দুলা ও ভালো নাম। নামের মধ্যেই আদর টের পাওয়া যায়।

হাবীব ভাই বললেন, আমি আদর একেবারেই দিব না। আদরে সন্তান নষ্ট হয়। আদর যা দিবার আপনার ভাবি দিবে। আমি শাসনে রাখব।

আমি বললাম, শাসনে রাখতে পারবেন না। আপনার দুই বাচ্চা এক মুহূর্তের জন্যেও আপনাকে ছাড়বে না। দুইজন দুই হাত ধরে থাকবে।

আপনি যখন বলেছেন তখন ঘটনা যে এইটাই ঘটবে তা জানি। ব্যবসা-বাণিজ্য আমার লাটে উঠবে। দুই ভাই নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দোকানে গিয়ে বসে থাকবে।

তা তো থাকবেই।

হাবীব ভাইয়ের চোখে আনন্দে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি গোপন করার জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, আপনার ভাবি মনটা সামান্য খারাপ করবে। হাজার হলেও মা। কী বলেন, হিমু ভাই?

হাবীব ভাই চোখ মুছছেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, অপূর্ব এইসব মুহূর্ত যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি দেখেন? না-কি তিনি সব আনন্দ-বেদনার উর্ধ্বে? যদি আনন্দ-বেদনার উর্ধ্বে হন তাহলে আনন্দ-বেদনা কেন তৈরি করেন?

হিমু ভাই!

বলুন।

মোবাইলটা দিয়ে একটা টেলিফোন করুন। আমি নিজের চোখে দেখে যাই। ব্যাটারি ফুল চার্জ দেওয়া।

আমি শোভা আপুকে টেলিফোন করলাম।

শোভা আপু! বকুল কেমন আছে?

শোভা আপু আনন্দিত গলায় বললেন, ওর বকুল নাম আমি বদলে দিয়েছি। ওর নাম রেখেছি কটকটি। সার্বজনিক কট কট করে কথা বলে আর গান শোনায়। এই মেয়েটার গানের শোভা তো ভালো।

আপু, মেয়েটাকে গান শিখিও। একদিন এই মেয়ে গান গেয়ে খুব নাম করবে। দেশ-বিদেশে তার নাম ছড়াবে। বিদেশের বড় বড় রেকর্ড কোম্পানি তার রেকর্ড বের করবে। বিদেশে তাকে সবাই ডাকবে Song bird of Bengal নামে।

তুই এমনভাবে কথা বলছিস যেন সব জেনে বসে আছিস। তুই এত বোকা কেন?

আমি প্রসঙ্গ পাল্টালাম। গল্পীর গলায় বললাম, আপু চিঠিটা পড়ে শোনাও।

শোভা আপু বলল, কোন চিঠি পড়ে শোনাব?

দুলাভাইয়ের চিঠি। আজ বুধবার না? চিঠি দিবস। দুলাভাইয়ের চিঠি পাও নি?

না।

না কেন?

তোর দুলাভাই চিঠি কী লিখবে! ওর মনমেজাজ ভয়ঙ্কর খারাপ। তাকে নাইক্ষণ্ডিতে বদলি করে দিয়েছে।

সে-কী!

শাস্তিমূলক বদলি। সোমবার চলে যাবে। তার ডিমোশনও হয়েছে। আয়না মজিদ তার হাত থেকে পালিয়ে গেল, ডিমোশন তো হবেই। আচ্ছা সত্য করে বল তো, তুই কি আয়না মজিদ?

না।

আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবি না। আমি তোর বোন। সবার সঙ্গে মিথ্যা বলা যায়, বোনের সঙ্গে মিথ্যা বলা যায় না। কারণ জানতে চাস? চাই।

কারণ সব সম্পর্কে হিসাব আছে। দেনা-পাওনা আছে। মা-ছেলের সম্পর্কে আছে, আবার বাপ-ছেলের সম্পর্কেও আছে। শুধু ভাই-বোনের সম্পর্কে হিসাব নাই। দেনা-পাওনা নাই।

শোভা আপু! আমি আয়না মজিদ না।

তাহলে তুই কে?

আমি তোমার ভাই।

তুই এমনভাবে কথা বলিস, চোখে পাঞ্জি এসে যায়। আমি টেলিফোন রাখলাম।

হাতের কাছে পেশিল থাকলে আঁকিবুকি করতে ইচ্ছা করে। হাতে মোবাইল থাকলে কথা বলতে ইচ্ছা করে। আমি খালু সাহেবকে টেলিফোন করলাম। বাদলের খৌজ নিতে হবে।

কে হিমু! এতদিন কোথায় ছিলে? আমি পাগলের মতো তোমাকে খুঁজছি।

কেন?

আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে হিমু। হারামজাদা আয়না মজিদ আবার টাকা চেয়েছে।

কত চেয়েছে?

বলেছে প্রতিমাসের প্রথম বুধবারে তাকে একলাখ করে টাকা দিতে হবে। আমি কী করব বলো তো?

কী আর করবেন? টাকা দিয়ে যাবেন।

এত কষ্টের টাকা আমি দিয়ে যাব? এটা তুমি কোনো কথা বললে? হিমু, তুমি ঐ বদমাইশটার সঙ্গে আমার একটা নিগোসিয়েশন করে দাও।

দুই লাখ দিয়েছি, প্রয়োজনে আরো এক লাখ দেবো। আমাকে যেন মুক্তি দেয়।

আমি বললেই সে আপনাকে মুক্তি দিবে?

হ্যাঁ দিবে। তোমার বিষয়ে তার কিছু সমস্যা আছে। বারবার তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছে। তোমাকে না-কি তার খুব দরকার। হিমু, হাতের কাছে কাগজ কলম আছে? একটা টেলিফোন নাম্বার লেখ। আয়না মজিদের নাম্বার। আমাকে বলেছে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ামাত্র যেন এই নাম্বার তোমাকে দেয়া হয়। হিমু, ফর গডস সেক এক্সুণি টেলিফোন কর।

বাদল কেমন আছে?

বাদল কেমন আছে পরের ব্যাপার, তুমি এক্সুণি টেলিফোন কর। এক্সুণি। এই মুহূর্তে। ফর গডস সেক। নাম্বারটা লেখ—

টেলিফোন করতেই ওপাশ থেকে ভারী শ্লেষাজড়িত গলায় বলল, আপনে কেড়া? কারে চান?

আমি বললাম, আয়না মজিদকে চাই। তাকে বলুন হিমু কথা বলবে।

আয়না মজিদ কেড়া?

চিনেন না?

জে না। আমার নাম ফজলুর আমার রড সিমেন্টের দোকান। ভাইজান মনে হয় লম্বরে ঝটি করেছেন।

টেলিফোনের লাইন কেটে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আয়না মজিদ টেলিফোন করল। বুরুলাম এটাই সিস্টেম। মাঝখানের ফজলুর নাম্বার সিকিউরিটি সিস্টেমের অংশ।

হিমু!

হ্যাঁ।

আপনাকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। আমার নিজের জন্যে না। লম্বুটার জন্যে। আপনি তো জানেন সে গভীর রাতে এক বকুল গাছের চারপাশে ঘোরে। আমি ওর চক্র বন্ধ করব। আপনার সাহায্য দরকার। আপনি অবশ্যই আজ রাতে আসবেন। বকুল গাছের কাছে।

একা আসব, না-কি ঐ রাতের মতো কোনো অতিথি নিয়ে আসব?

আপনি একই আসবেন। আজ রাতের পর আপনাকে আমার আর প্রয়োজন হবে না।

আয়না মজিদ লাইন কেটে দিল ।

আকাশে নানান ধরনের চাঁদ ওঠে । কবি সুকান্তের বিখ্যাত ঝলসানো
রুটি মার্কা চাঁদ । রবীন্দ্রনাথের মায়াবী চাঁদ, যে চাঁদের আলোয় সবাই মিলে
বনে যেতে ইচ্ছা করে । আজ উঠেছে জীবনানন্দ দাশের চাঁদ । মরা চাঁদ,
কুয়াশামাখা জোছনা । যে চাঁদ লাশকাটা ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয় ।

ত্রান : রমনা পার্ক । বকুলতলা । আমি, আয়না মজিদ এবং টাইগার
দাঁড়িয়ে আছি পাশাপাশি । আমাদের সামনেই লম্বু খোকন । সে দাঁড়িয়ে
নেই । বকুল গাছকে ঘিরে চক্র দিচ্ছে । লম্বু খোকনকে আজ আরো লম্বা
লাগছে । সে শুধু যে চক্র দিচ্ছে তা-না, বিড়বিড় করে কী সব যেন বলছে ।
দৃশ্যটায় গা ছমছমে ব্যাপার আছে ।

আয়না মজিদ গলা ঝাঁকারি দিল । লম্বু খোকন চমকে তাকাল ।
ফিসফিসানি গলায় বলল, বস!

কী করছ?

ঘুরতেছি বস ।

কেন?

লম্বু খোকন এই প্রশ্নে থতমতো খেয়ে গেল । যেন জবাব তার জানা
নেই । আয়না মজিদ ধৰ্মথর্মে গলাক্ষেত্রে, চক্র কেন দিচ্ছ বলো?

এক্সারসাইজ করি । এক্সারসাইজ করলে শরীর ভালো থাকে ।

এক্সারসাইজ কতক্ষণ করো?

বেশি না, অল্প সময় করি ।

গতকাল কতক্ষণ এক্সারসাইজ করেছ?

ইয়াদ নাই ।

কে তোমাকে এক্সারসাইজ করতে বলেছে?

কেউ বলে নাই ।

আয়না মজিদ আমাকে দেখিয়ে বলল, চক্র দেয়ার ব্যাপারটা তোমাকে
হিমু করতে বলে নাই?

লম্বু খোকন বেশকিছু সময় আমার দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল,
ইনাকে চিনলাম না ।

হিমুকে চিনতে পারছ না?

জে না ।

সিগারেট খাবে? নাও একটা সিগারেট খাও।

জে না।

না কেন?

চৰুর দেওয়ার সময় বিড়ি সিগারেট খাওয়া নিষেধ।

নিষেধ কে করেছে?

কে নিষেধ করেছে বলতে পারব না। তবে বিড়ি-সিগারেট, মদ-গাঁজা
সব নিষেধ।

তোমার যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে এটা জানো?

জে না।

আমি এসেছি তোমার মাথা ঠিক করতে।

জি আচ্ছা।

লম্বু খোকন ‘জি আচ্ছা’ বলে হাঁটতে শুরু করেছে। টাইগার তাকে
অনুসরণ করছে। রহস্যময় দৃশ্য। লম্বু খোকন বিড়িবিড়ি করছে, কুকুরটাও
তার মতোই ঘড়ঘড় করছে।

আয়না মজিদ সিগারেট ধরাল। সিগারেট তার বাঁ হাতে। ডান হাত
প্যান্টের পকেটে চুকানো।

হিয়!

বলুন।

তুমি ঝামেলা তৈরি করেছ। খোকনকে পুরোপুরি কজা করেছ।
আমাকেও কজা করার চেষ্টা করছ। আমার বাঁ হাতে সিগারেট, ডান হাতে
কী বলো?

ডান হাতে পিণ্ডল।

গুড়।

আয়না মজিদ যেহেতু তুমিতে নেমে এসেছে আমিও তুমিতে নামলাম।
গল্প বলার ভঙ্গিতে বললাম, তোমার ধারণা হয়েছে আমাকে শুলি করে
মারলেই তোমরা দু'জন সব ঝামেলা মুক্ত হবে।

আমার ধারণা কি সত্যি?

সত্যি হবার সম্ভাবনা আছে।

আয়না মজিদ বলল, ভয় পাচ্ছ না?

আমি বললাম, ভয় পাচ্ছি। ভয় তুমিও পাচ্ছি। আমার ভয় পাওয়ার
ব্যাখ্যা আছে। তোমার ভয়ের ব্যাখ্যা নেই।

আয়না মজিদ বাঁ হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়াল। মনে হয় এইভাবে দাঁড়ালে গুলি করা সহজ। আমি বললাম, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই থাকব, না-কি আরেকটু কাছে আসব?

আয়না মজিদ জবাব দিল না। পকেট থেকে পিস্টল বের করল। আমি কয়েক পা কাছে এগিয়ে এলাম। আমার বাবা, মহাপুরুষ তৈরির কারিগর, ভয় বিষয়ে লিখেছেন—

সব জয় করা যায়। সুউচ্চ এভারেস্ট জয় সম্ভব, ভয় জয় করা সম্ভব না। একজন মহাপুরুষ এই অসম্ভবকে সম্ভব করবেন। যখন তিনি এই কাজটি পারবেন সেদিন ...

খুঁট করে শব্দ হলো। পিস্টলের সেফটি ক্যাচ খোলা হলো। লম্বু খোকন চক্রাকারে ঘোরা বক্ষ করে আয়না মজিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় তার ঘোর কেটে যেতে শুরু করেছে। কুকুরটা এখনো ঘুরছে। সে তার চক্র অনেক বড় করেছে। আমাদের সবাইকে চক্রের ভেতর নিয়ে নিয়েছে। তবে তার দৃষ্টি আয়না মজিদের দিকে। সে হঠাৎ মাথা উঁচু করে বিলাপের মতো ডাকল, সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় কেটে গেল। কেউ একজন পিস্টল নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যে কোনো মুহূর্তে গুলি হবে—এটা মনে থাকল না। বরং মনে হলো যে তাদের আলোয় আমরা তিনজন এবং একটা কুকুর পার্কে বেড়াতে এসেছি। আমি সহজ গলায় বললাম, আয়না মজিদ, তুমি কি লক্ষ করেছ কুকুরটা তার চক্র বড় করেছে? আমরা সবাই সেই চক্রের ভেতর। আমি চক্র থেকে বের হতে পারব, কিন্তু তুমি এবং তোমার সঙ্গী কখনো পারবে না। টাইগার তোমাকে চক্র থেকে বের হতে দেবে না।

আয়না মজিদ জবাব দিল না। পিস্টল সে এখনো আমার দিকে তাক করে নি। এর অর্থ কিছুক্ষণ সময় এখনো আমার হাতে আছে।

আমি আয়না মজিদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, ফায়ারিং ক্ষেয়াড়ে যাদের মারা হয় তাদের শেষবারের মতো একটা সিগারেট খেতে দেয়া হয়। বহুদিনের পুরনো নিয়ম। এই নিয়মে আমি একটা সিগারেট কি পেতে পারি? দুই থেকে আড়াই মিনিট সময় নেব। অসুবিধা আছে?

আয়না মজিদ চাপা গলায় বলল, না। সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমি আয়োজন করে সিগারেট ধরালাম। হাতে আড়াই মিনিট সময় আছে। আড়াই মিনিট অতি দীর্ঘ সময়। কারণ আইনস্টাইনের ‘থিওরি অব রিলেটিভিটি’ কাজ করতে শুরু করছে। টাইম ডাইলেশন হচ্ছে। আড়াই মিনিট এখন অনন্তকাল।

কথা শেষ হবার আগেই পর পর তিনবার গুলি হলো। আয়না মজিদ গুলিটা আমাকে করে নি, টাইগারকে করেছে। গুলি লাগে নি। টাইগার নির্বিকার। সে ঘুরেই যাচ্ছে, তবে তার গতি এখন অনেক বেশি। আমি সিগারেটে টান দিয়ে বললাম, আয়না মজিদ! আমার কী ধারণা জানো? আমার ধারণা বকুল নামের তোমার ছোটবোনকে তুমই ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলেছে। সেটাই ছিল তোমার জীবনের প্রথম খুন। প্রকৃতি এই কারণেই বকুলকে এবং টাইগারকে তোমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছে। তোমার পিস্তলে আরো তিনটা গুলি থাকার কথা। চেষ্টা করে দেখো। কুকুরকে লক্ষ্য করে গুলি করলে হবে না। একটু সামনে করতে হবে।

লম্বু খোকন বলল, বসের পিস্তলে তিনটার বেশি গুলি কোনোসময় থাকে না। তিন উনার জন্য লাকি। পিস্তল নিয়ে বস যখন বাইর হন— গুলি তিনটার বেশি থাকে না। বস, ঠিক বলেছি?

আয়না মজিদ জবাব দিল না সে ভীত চোখে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে কথা সত্যিঃ

পিথাগোরাস বিশ্বাস করতেন সংখ্যাই ঈশ্বর। ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন সংখ্যায়। তিন সংখ্যায় তিনি আছেন। তিন অতি রহস্যময় সংখ্যা। তিন হলো মাতা, পিতা ও সন্তান। তিন হলো আমি, তুমি এবং সে। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ।

বকুল গাছের নিচেও তিনজন। আয়না মজিদ, লম্বু খোকন এবং একটি কুকুর।

কুকুরটাকে কেন জানি খুবই ভয়ঙ্কর লাগছে। মরা চাঁদের আলোর অনেক ব্যাপার আছে। এই আলো দৃশ্য বদলে দেয়। স্বাভাবিক দৃশ্য অস্বাভাবিক করে দেয়।

আয়না মজিদ বিড়বিড় করে বলল, আমাদের ছেড়ে দিন।

আমি বললাম, কেউ তোমাদের ধরে রাখে নি। যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। দু'জন দু'দিকে ঝেড়ে দৌড় দাও। কুকুরটা confused হয়ে যাবে। কাকে ধরবে ঠিক করতে পারবে না। এই সুযোগে পগারপার।

দু'জনের কেউ নড়ছে না। নড়তে পারবে এরকমও মনে হচ্ছে না।
আমি পকেট থেকে মোবাইলটা বের করলাম। লম্বু খোকন বলল, ভাইজান
কাকে টেলিফোন করেন? তার গলায় রাজ্যের হতাশা।

কে? দুলাভাই? ঘূম ভাঙলাম। আপনি ভালো আছেন?

শাট আপ।

কষ্ট করে একটু কি আসবেন? রমনা পার্ক। আগে যেখানে কালীমন্দির
ছিল তার কাছেই। একটা বকুল গাছ আছে।

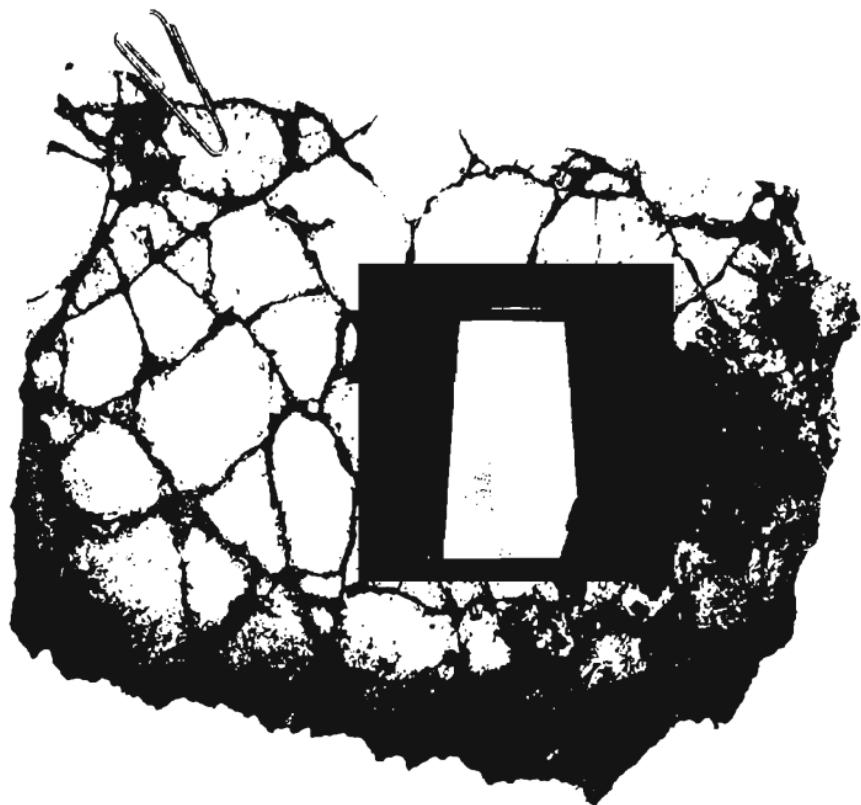
আই সে শাট আপ।

আয়না মজিদ এবং লম্বু খোকনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে
দিচ্ছি। এই সুযোগ দ্বিতীয়বার আসবে বলে মনে হয় না।

দুলাভাই কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন তার আগেই আমি টেলিফোন
রেখে দিলাম। আয়না মজিদের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি।
যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। দুই ধরনের রিমান্ড আছে। পুলিশের
রিমান্ড এবং প্রকৃতির রিমান্ড। পুলিশের রিমান্ড থেকে পালানো যায়,
প্রকৃতির রিমান্ড থেকে পালানোর উপায় নেই। তোমাদের দু'জনকেই প্রকৃতি
রিমান্ডে এনেছে।

ওদের পেছনে ফেলে আমি এগাছি। জোছনার আলো হঠাৎ খানিকটা
স্পষ্ট হয়েছে। প্রকৃতি রহস্যের ফুল ফোটাতে শুরু করেছে। গাছে গাছে
পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে। তাদের মধ্যে এক ধরনের অস্ত্রিতা।

হিমুর মধ্যদুপুর



‘হিমু, তুই আমাকে একটা কিডনি দিতে পারবি? আমার একটা কিডনি দরকার।’

মানুষজনের কথায় হকচকিয়ে যাওয়া কিংবা বিভ্রান্ত হওয়া আমার স্বভাবে নেই। তারপরেও মাজেদা খালার কথায় হকচকিয়ে গেলাম। ধানমন্ডি ২৭ নাম্বার রোডে গাড়ি থামিয়ে তিনি আমাকে ধরেছেন। এখন কিডনি চাচ্ছেন। তাঁর কথার ভঙিতে বিরাট তাড়াতড়। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তেই কিডনি দরকার।

‘কথা বলছিস না কেন? একটা কিডনি দিবি?’

‘কেন দেব না?’

‘থ্যাংকস, গাড়িতে উঠ। ড্রাইভারের পাশে বোস। চল বাসায় যাই।’

‘কিডনি কি বাসায় নিয়েই কেটে কুটে রেখে দেবে? ডাঙ্কার কাটবে না-কি তুমি নিজেই কাটবে? ধারালো স্টেরিলাইজড ছুরি-কাঁচি আছে তো?’

‘অকারণে কথা বলিস কেন? গাড়িতে উঠ।’

আমি গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে AC চলছে। আরামদায়ক শীতলতা। বাইরে বৈশাখ মাসের ঝাঁঝালো রোদ। শহর পুড়ে যাচ্ছে এমন অবস্থা। এই রোদের একটা নাম আছে—কাকমরা রোদ। কাকের মতো কষ্টসহিষ্ণু পাখিও এই রোদে হিট স্ট্রোকে মারা যায়। আমি আজ দুটা কাককে মরে থাকতে দেখেছি। মৃত্যুর পর কাকরা কোথায় যায় কে জানে। তাদেরও কি স্বর্গ-নরক আছে? কাকদের স্বর্গ কেমন হবে? আমার ধারণা তাদের স্বর্গে একটু পরপর থাকবে ডাস্টবিন। ডাস্টবিন ভর্তি ময়লা-আবর্জনা। ফেলে ছড়িয়ে আবর্জনা খাও। কেউ কিছু বলবে না।

খালা বললেন, ‘কিডনি দিতে হবে শুনে তুই দেখি ভ্যাবদা মেরে গেছিস। দুটা কিডনি মানুষের কোনো দরকার নেই। একটাতেই হেসেখেলে দিন চলে।’

আমি বললাম, ‘দুটা কিডনিতেও তো অনেকের চলে না। অন্যদেরটা নিতে হয়।’

খালা বললেন, ‘বাজে তর্ক আমার সঙ্গে করবি না। এই গরমে তর্ক শুনতে ভালো লাগে না।’

আমি বললাম, ‘আচ্ছা, আর তর্ক করব না। শীত আসুক। নগর শীতল হোক। তখন তর্ক।’

‘আবের রস খাবি? গরমের সময় আবের রস শরীরের জন্যে ভালো। অনেক এ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে। খাবি?’

‘খাব।’

‘দুটা আখ থেকে এক গ্লাস রস পাওয়া যায়। হালকা সবুজ কালার। এর মধ্যে লেবুর রস আর সামান্য বিট লবণ দেয়, বরফের কুঁচি দেয়। খেতে অসাধারণ। আমি রোজ এক গ্লাস করে আচ্ছি।’

‘জভিস এখনো হয় নাই?’

‘জভিস হবে কোন দুঃখে? আপ্তওয়ালা আমার পরিচিত লোক। নাম সুলেমান। নরসিংহি বাড়ি। সেই আমার সামনে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে আখ মাড়াইয়ের যত্ন ধূবে। আখও ধোয়া হবে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে। তার কাছ থেকে অনেক ফরেনারও আবের রস খায়।’

‘কোন দেশী ফরেনার সেটা হিসাবে, রাখতে হবে। ইউরোপিয়ান ফরেনার না সোমালিয়ান ফরেনার।’

‘হিমু! একবার বলেছি, আবারো বলেছি, তুই বাজে তর্ক আমার সঙ্গে করবি না। আমাকে ফরেনার শিখাবি না। আগামী আধা�ণ্টা একটা শক্ত উচ্চারণ করবি না। আমি যা বলব শুধু শুনে যাবি।’

‘ওকে।’

‘ওকে ফোকেও বলবি না।’

আমি নিঃশব্দে মাজেদা খালার সঙ্গে আবের রস খেলাম (জিনিসটা ভালো)। পাশেই ক্ষিরা কেটে বিক্রি করছে। খালা ক্ষিরা খেলেন। একজন কাসুন্দি দিয়ে কাঁচা আম মাখিয়ে বিক্রি করছিল। পাঁচ টাকা প্লেট। আমরা তাও খেলাম। সবশেষে তরমুজ।

খালা বললেন, ‘গরমের সব ওষুধ শরীরে নিয়ে নিলাম। শরীরের ডিহাইড্রেশন বক্ষ করার ব্যবস্থা হল। বুঝলি?’

আমার কথা বলা নিষেধ। কাজেই হ্যাস্চক মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম যে—‘বুঝেছি’। মাজেদা খালা, খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কিডনি প্রসঙ্গও খোলাসা করলেন। তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের দুটা কিডনিই নষ্ট। ডায়ালাইসিস করে দিন কাটছে। তাকে কিডনি দিতে হবে। তিনি সিঙ্গাপুরে যাবেন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে।

‘হিমু! তুইও উনার সঙ্গে সিঙ্গাপুরে যাবি। ফাঁকতালে তোর বিদেশ অমণ হয়ে যাবে। ভালো না?’

‘ভালো।’

‘পত্রিকায় প্রায়ই এ্যাড দেখি কিডনি বিক্রি করতে চায়। ওরা ফকির-মিসকিন। ওদের কিডনি কেনার মানে হয় না।’

‘ফকির মিসকিনের কিডনি আর প্রেসিডেন্ট বুশের কিডনিতো একই।’

‘আবার কথা বলা শুরু করেছিস? তোকে না বললাম আধাঘণ্টা কথা বলবি না।’

‘সরি।’

‘যাকে কিডনি দিবি তাঁর সঙ্গে যখন পরিচয় হবে তখন তোর মনে হবে একটা কেন? দুটা কিডনিই দিয়ে দেই। এমন অসাধারণ মানুষ। বুঝেছিস?’

আমি হ্যাস্চক মাথা নাড়লাম।

খালা বললেন, ‘আমরা ছেটবেলায় তাঁকে ডাকতাম, মুরগি। উনি বই পড়ার সময় নিজের অজান্তেই মুরগির মতো কক কক করেন এই জন্যে মুরগি নাম। তোকে গাড়ি দিয়ে তাঁর কাছে পাঠাব। ঠিকানা দিয়ে পাঠালে তুই যাবি না। আমাকে বলবি—ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিস। তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। যাকে কিডনি দিবি তাঁর নাম পল্টু। অসাধারণ মানুষ। পরিচয় হলেই বুঝবি। উনার দশটা কথা শুনলেই তুই তাঁর কেনা গোলাম হয়ে যাবি। তুই তাঁকে বলবি, আপনি আমার কিডনি, হার্ট, লিভার সব নিয়ে নিন।’

‘শুধু চামড়াটা নিয়ে আমি বাঁচব কীভাবে?’

‘কথার কথা বলছি রে গাধা।’

যার নাম পল্টু এবং যাকে ডাকা হতো মুরগি; তার বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার কারণ নেই। বিশেষ করে মাজেদা খালা যাকে অসাধারণ বলেন

তার বোকা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। বলা হয়ে থাকে, বুদ্ধিমানের কাছ থেকে দশ হাত দূরে থাকবে আর বোকাদের কাছ থেকে একশ হাত দূরে থাকবে। দূরে থাকা সম্ভব হল না। খালা গাড়ি করে সেইদিনই পল্টু সাহেবের কাছে পাঠালেন। খালা হচ্ছেন ‘ধর তজা মার পেরেক’ টাইপ মহিলা। দেরি সহ্য করার মেয়ে না।

আমি পল্টু সাহেবের সামনে বসে আছি। ভদ্রলোক বেতের ইঞ্জিচেয়ারে শুয়ে আছেন। মাথার নিচে বালিশ। হাতে একটা চাটি ইংরেজি বই, নাম Love of Lucy —লুসির প্রেম। বইয়ের কভারে একটা অর্ধনগু বিশাল বক্ষা মেয়ের ছবি। মনে হচ্ছে এই মেয়েটাই লুসি। লুসি যার প্রেমে পড়েছে তার ছবিও কভারে আছে। বড় বিভার টাইপ এক নিয়ো। সে কৃষ্ণগীরের ভঙ্গিতে লুসিকে জড়িয়ে ধরে আছে। কৃষ্ণগীর লুসির ঘাড়ে চুম্ব খাচ্ছে। কিন্তু ছবি দেখে মনে হচ্ছে সে লুসির ঘাড় কামড়ে ধরেছে এবং ড্রাকুলার মতো রক্ত চুষে খেয়ে নিচ্ছে। লুসি তাতে মোটেই দুঃখিত না, বরং আনন্দিত।

পল্টু সাহেব গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ থাকতে বলেছেন। মনে হচ্ছে লুসির প্রেমের শেষ পরিণতি না জেনে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। ভদ্রলোকের মুরগির মতো কক কক শব্দ করার কথা। তা করছেন না। কক কক শব্দ করার মতো ভালো বোধ হয় এই বই না।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের মতো, ভয়ঙ্কর রোগা। গায়ের রঙ অতিরিক্ত ফরসা। কিছু কিছু চেহারা আছে দেখেই মনে হয় আগে কোথায় যেন দেখেছি। এ রকম চেহারা। আইনস্টাইনের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের একটা মিল আছে। মাথায় বাবরি চুল। মুখে গৌফ। ভদ্রলোক শুয়ে আছেন খালি গায়ে। লুঙ্গি পরেছেন। সেই লুঙ্গি দূরবর্তী বিপদ সংকেতের মতো ইঁটুর উপর উঠে আছে। কখন দুর্ঘটনা ঘটবে কে জানে!

পল্টু সাহেব তার পা জলচৌকিতে রেখেছেন। পায়ের কাছে টেবিল ফ্যান। সেই ফ্যান শুধুমাত্র পায়ে বাতাস দিচ্ছে। ঘটনাটা কি বুঝা যাচ্ছে না। ঘটনা বুঝতে হলে লুসির প্রেম কাহিনীর সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ভদ্রলোক বাস করেন গুলশান এলাকার ফ্ল্যাট বাড়িতে। ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। লেকের পাশে। একটা আধুনিক ফ্ল্যাট যতটা নোংরা রাখা সম্ভব তা তিনি রেখেছেন। মনে হচ্ছে ঘর পরিষ্কার করার কেউ নেই। যেখানে

সেখানে বই পড়ে আছে। বেশ কিছু সিগারেটের টুকরা ভর্তি আধ খাওয়া চায়ের কাপ। একটা চায়ের কাপ মেঝেতে কাত হয়ে আছে; অনেকখানি জ্যায়গা জুড়ে চা শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। পিংপড়েরা খবর পেয়ে গেছে। তবে রান্নাঘর তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার। রান্নাঘরের ব্যবহার মনে হয় নেই।

বাথরুমে উঁকি দিলাম। বাথটাব ভর্তি ভেজা কাপড়। কমোডের কাছে সবুজ রঙের একটা তোয়ালে। বেসিনের উপর একটা পিরিচে আধ খাওয়া কেক এবং কলার খোসা। বোঝাই যাচ্ছে, পল্টু সাহেব বাথরুমে খাওয়া-দাওয়া করা দোষণীয় মনে করেন না।

ফ্ল্যাটের সাজসজ্জা বলতে দেয়ালে একটি বিশাল সাইজের বাঁধানো চার্লি চ্যাপলিনের ছবি। আরেকটা মাঝারি সাইজের আইনস্টাইনের ছবি। আইনস্টাইন জিভ বের করে ভেংচি কাটছেন।

পল্টু সাহেব লুসির প্রেম কাহিনী পড়ে শেষ করেছেন। বই পড়ে আনন্দিত হলেন কি-না বুঝতে পারছি না। ভুক্ত কুঁচকে আছে। তিনি বই মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বললেন, ‘নাম বল।’

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ‘নাম লাভ অব লুসি।’

‘বইয়ের নাম জানতে চাচ্ছ না।’
AMARBOI.COM
বইয়ের নাম জানি। তোমার নাম বল।’

‘স্যার, আমার নাম হিমালয়।’

হিমালয় নাম শুনলে সবার মধ্যেই কিছু কৌতুহল দেখা যায়। তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। যেন মানুষের নাম হিসেবে হিমালয়, এভারেস্ট, মাউন্ট ফুজি জাতীয় নাম শুনে তিনি অভ্যন্ত।

পল্টু সাহেব ইঞ্জি চেয়ারের হাতলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন, ‘চুরির অভ্যাস আছে?’

‘না।’

‘সত্যি বলছতো?’

‘জি স্যার।’

তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিতে দিতে বললেন, ‘তুমি সত্যি বলছ না। চুরির অভ্যাস নেই এমন মানুষ তুমি কোথাও পাবে না। বড় মানুষরা আইডিয়া চুরি করে। বিজ্ঞানীরা একজন আরেকজনের আবিষ্কার চুরি করেন। যানব জাতির সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে চুরির উপর বুঝেছ?’

‘জি স্যার।’

‘বেতন কত চাও বল? কত হলে পোষাবে সেটা বল। বেতন নিয়ে
মুলামুলি করার সময় আমার নেই।’

আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। মনে হচ্ছে বাসার চাকর হিসেবে তিনি
আমাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে ফেলবেন।

‘আগে যে ছিল সে মহাচোর। টিভি, ক্যাসেট প্লেয়ার, ডিভিডি সেট
নিয়ে পালিয়ে গেছে। ওর নাম হাশেম। টাকা-পয়সাও নিয়েছে। কত
নিয়েছে বের করতে পারি নি। তুমি কি চূরি করবে আগে ভাগে বল। আমি
সোজাসুজি আলাপ পছন্দ করি। বল কি চূরি করবে?’

‘যা ছিল সবতো আগেরজন নিয়েই গেছে। আমি আর কি নেব। হাশেম
ভাইজানতো আমার জন্যে কিছু রেখে যান নি।’

‘আগেরজনকে মাসে তিন হাজার টাকা দিতাম প্লাস থাকা-খাওয়া।
চলবে?’

‘জি স্যার, চলবে।’

‘রান্না করতে জান?’

‘না।’

‘না জানলেও সমস্যা নেই। রেস্টুরেন্টের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে তারা
খাবার দিয়ে যায়। এটা একদিক দিয়ে ভালো। রান্নাঘরে চুলা জুলবে না।
মসলার গুরু, ধোয়ার গুরু আমার কাছে অসহ্য লাগে। কাপড় ধূতে পার?
ওয়াশিং মেশিন আছে। ওয়াশিং মেশিনে ধূবে।’

‘শিখিয়ে দিলে পারব।’

‘আরেক যত্নণা। তোমাকে কে শিখাবে? আমি নিজেও তো জানি না।
ইনস্ট্রাকসান ম্যানুয়েল কোথায় গেছে কে জানে।’

আমি বললাম, ‘ধোপাখানায় কাপড় দিয়ে আসতে পারি।’

পল্টু সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, ‘ভালো বুদ্ধি। গুড। ভেরি গুড।
যাও কাজে লেগে পড়।’

আমি কদমবুসি করে কাজে লেগে পড়লাম। কিউনি বিষয়ক জটিলতায়
গেলাম না। তাড়াহড়ার কিছু নেই। পল্টু সাহেব অন্য একটা বই হাতে
নিয়েছেন। বইটার নাম—The trouble with physics. লেখকের নাম Lee
Smolin. কাজের ছেলে হিসেবে আমাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পর তিনি
মনে হয় আমাকে যাথা থেকে পুরোপুরি দূর করে দিয়েছেন। আমার নামও
ভুলে গেছেন। এ ধরনের মানুষরা কোনো কিছুই মনে রাখতে পারে না।

প্রথম চাকরি পেলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের খবর দিতে হয়। মিষ্টি খাওয়াতে হয়। মৃত বাবা- মা'র কবর জিয়ারত করতে হয়। যারা দূরে বাস করে, চিঠি লিখে তাদের কাছ থেকে দোয়া নিতে হয়। বিশাল কর্মকাণ্ড। আমি বিশাল কর্মকাণ্ডের শুরুতে মাজেদা খালাকে টেলিফোন করলাম। আবেগ জর্জরিত গলায় বললাম, ‘খালা আপনার দোয়া চাই। আজ চাকরিতে জয়েন করেছি।’

খালা বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘চাকরিতে জয়েন করেছি মানে কি? কি চাকরি?’

‘বাসাবাড়ির কাজ। সহজ বাংলায় চাকর। বেতন ভালো পেয়েছি—মাসে তিন হাজার। থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঈদে বোনাস এবং কাপড়।’

‘হড়বড় করে কি বলছিস? গরমে তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?’

‘খালা, তুমি দু’একটা সহজ রান্না শিখিয়ে দিওতো। স্যারকে রান্না করে খাওয়াতে হবে। হোটেলের রান্না থেয়ে স্যারের শরীর খারাপ হবে, এটা হতে দেয়া যায় না।’

‘হাঁকি পাঁকি কথা বন্ধ করবি? পল্টু ভাইজানের সঙ্গে দেখা করেছিস?’

‘করেছি। উনিই চাকরি দিলেন।’

খালা রাগি গলায় বললেন, তুই ভাইজানকে টেলিফোনটা দেতো। আমি উনার সঙ্গে কথা বলি।’

আমি বললাম, ‘স্যারকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। উনি পড়াশোনা করছেন। আমার উপর ইনস্ট্রোকসান আছে—পড়াশোনার সময় যদি প্রেসিডেন্ট বুশও টেলিফোন করেন তাকে বলতে হবে—off যান। ইরাকে মানুষ মারা নিয়ে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেন। স্যারকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। স্যার ব্যস্ত।’

‘ছাগলামী করবি না। এক্সুণি ভাইজানকে টেলিফোন দে। আর শোন, তোকে কিডনি দিতে হবে না। তুই মানুষ হিসেবে বিষাক্ত। আমি চাই না তোর শরীরের কোন অংশ ভাইজানের ভেতর থাকুক।’

‘উনাকে বাঁচায়ে রাখতে হবে না?’

‘আমি অন্যখান থেকে কিডনি জোগাড় করব। বাংলাদেশে কিডনি পাওয়া কোনো ব্যাপার? ঘোল কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি কিডনি বিক্রির জন্যে কাস্টমার খুঁজছে। ভাইজানকে টেলিফোন দে।’

আমি লাইন কেটে দিলাম।

চাকরি প্রাণ্তির আনন্দ সংবাদ আর কাকে দেয়া যায়। অবশ্যই
বাদলকে। সেও নতুন চাকরি পেয়েছে, কোনো এক ইউনিভার্সিটিতে
ফিজিক্স পড়াচ্ছে। তার ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে ডাকছে পগা স্যার। এটা নিয়ে
সে মানসিক সমস্যায় আছে। পগা ডাকের পেছনের কারণ বের করতে
পারছে না।

‘কে, বাদল?’

‘হিমুদা তুমি? আমি জানতাম আজ দিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে
যোগাযোগ হবে।’

‘চাকরি পেয়েছি এই খবরটা দেয়ার জন্যে টেলিফোন করলাম।’

‘তুমি করবে চাকরি—কি বলছ এসব? কোথায় চাকরি করছ?’

‘বাসার চাকর হিসেবে এক বাড়িতে দাখিল হয়ে গেছি। ঘর মোছা,
কাপড় ধোয়া, হালকা রান্না—ডাল ভাত ডিম ভাজি।’

‘সত্যি বলছ?’

‘অবশ্যই।’

বাদল মুক্ষ গলায় বলল, ‘আমার কাছে দারুণ এক্সাইটিং লাগছে। বাসা
বাড়িতে কাজ নেয়ার পেছনে নিচয়ই কোনো কারণ আছে। তোমাকে কেউ
চিনুক বা না চিনুক, আমি চিনি নাহিমুদা, কোথায় চাকরি করছ, কি করছ,
একটু দেখে যাই?’

‘আজ না, অন্য একদিন খবর দিয়ে নিয়ে আসব। নতুন চাকরিতো,
বসের মেজাজ মর্জি বুঝে নেই। শুরুতেই আত্মীয়-সজন বাড়িতে নিয়ে এলে
বস রাগ করতে পারেন।’

‘ঠিক আছে। তুমি যেদিন বলবে আমি সেদিনই চলে আসব। আচ্ছা
হিমুদা, আমাকে যে পগা স্যার ডাকে তার কারণ তোমাকে বের করতে
বলেছিলাম, বের করেছ?’

‘করেছি। ইংরেজি ইউনিভার্সিটিতো, ছাত্রী শুরুতে তোকে ডেকেছে
হলি কাউ। সেখান থেকে হলি ডাঁকি। পবিত্র গাধা থেকে পগা।’

‘বল কী!’

‘বাদল, রাখলাম, স্যারের কিছু লাগে কি-না খোঁজ নিতে হবে।’

‘তুমি কি সত্যি-সত্যি বাসার চাকরের কাজ নিয়েছ?’

‘ইয়েস।’

বাদল মুঞ্ছ গলায় বলল, ‘হাউ এক্সাইটিং। তোমাকে যতই দেখি ততই হিংসা হয়।’

আমি বললাম, ‘বাদল, টেলিফোন রাখি, আমার স্যার এখন মুরগির মতো কক কক শব্দ করছে। ঘটনা কি দেখে আসি।’

‘উনি মুরগির মতো কক কক করেন?’

‘সব সময় করেন না। ইন্টারেস্টিং কোনো বই পড়ার সময় করেন।’

টেলিফোন রেখে বিনীত ভঙ্গিতে স্যারের সামনে দাঁড়ালাম। স্যার অবাক হয়ে বললেন, ‘কি ছুটি চাও?’

আমি বললাম, ‘নাতো।’

‘চাকরিতে জয়েন করেই সবাই ছুটি চায়। বাবা-মা’র সঙ্গে দেখা করে আসবে। বিছানা-বালিশ নিয়ে আসবে ইত্যাদি।’

‘ছুটি চাই না। পায়ে বাতাস দিচ্ছেন কেন এটা জানতে চাই।’

স্যার উৎসাহিত হলেন। ছাত্রকে শেখাচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, ‘এরিস্টলের নাম শুনছে?’

‘জি না স্যার। আমি চাকর মানুষ। আমি আমার মতো চাকর-বাকরদের কিছু নাম জানি। উনার মতো বড় মানুষের নাম জানব কিভাবে?’

‘উনি যে বড় মানুষ এই তথ্য তোমাকে কে দিল?’

‘আন্দাজ করেছি। ইংরেজি সামতো, ইংরেজি নামের মানুষরা বড় মানুষ হয়।’

‘কচু হয়। যাই হোক এরিস্টল কোনো ইংরেজি নাম না। প্রিক নাম। উনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। উনার ধারণা ছিল মানুষের মাথার একমাত্র কাজ এয়ার কন্ডিশনিং-এর মতো বড় কন্ডিশনিং। শরীরের তাপ ঠিক রাখা। যেহেতু এরিস্টলের মতো বড় মানুষ এই কথা বলেছেন, সবাই ধরে নিল মাথার ইইটাই একমাত্র কাজ। মাথার কাজ নিয়ে কেউ আর কোনো চিন্তাভাবনাই করল না। পরের এক হাজার বছর এরিস্টলের কথাই বহাল রইল। এর থেকে কী প্রমাণিত হয় বল।’

‘প্রমাণিত হয় বড় বিজ্ঞানীদের সব কথা শুনতে হয় না।’

‘গুড়। তোমার বুদ্ধি ভালো। একশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিলাম। এখন থেকে তোমার বেতন তিন হাজার একশ।’

‘স্যার, আপনার অসীম দয়া। কিন্তু পায়ে ফ্যানের বাতাসের ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কার হয় নাই।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘আমার ধারণা শরীরের এয়ার কভিশনিং সিস্টেম হল পায়ে এবং কানে। খুব যখন ঠাণ্ডা পড়ে আমরা কী করি? কান ঢাকি এবং পায়ে মোজা পরি। ঠিক কি-না বল।’

‘জি স্যার, ঠিক।’

‘সেখান থেকে আমার ধারণা হয়েছে অতিরিক্ত গরমের সময় যদি পা এবং কান ঠাণ্ডা রাখা যায় তাহলে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। সেই পরীক্ষাই করছি।’

‘স্যার, ফলাফল কী?’

‘ফলাফল পজিটিভ। যদিও কান ঠাণ্ডা করার কোনো বুদ্ধি পাচ্ছি না। পা এবং কান দুটাই একসঙ্গে ঠাণ্ডা করতে পারলে নিশ্চিত হতে পারতাম।’

‘কানে কি বরফ ঘসব স্যার? প্রতি দুই তিন মিনিট পর পর আপনার দুই কানে বরফ ঘসে দিলাম।’

পল্টু স্যার আনন্দিত গলায় বললেন, ‘অত্যন্ত ভালো বুদ্ধি। তোমার বেতন আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়ালাম। এখন থেকে তোমার বেতন তিন হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা।’

‘স্যার, আপনার অসীম দয়া।’

‘অসীম কি জান?’

‘জানি না স্যার। এইটুকু জ্ঞান, অসীম হল অনেক বেশি।’

‘লেখাপড়া কিছু করেছ?’

‘অতি সামান্য।’

‘লেখাপড়া শেখার প্রতি আগ্রহ আছে? শিখতে চাও?’

‘শিখতে চাই না, স্যার।’

‘কেন চাও না?’

‘এত জেনে কি হবে? যত জ্ঞানই হোক মৃত্যুর পর সব শেষ। এই জন্যে ঠিক করে রেখেছি মানকের নকির এই দুই স্যারের কোচ্চেনের আনসার শুধু শিখে যাব?’

পল্টু স্যার অবাক হয়ে বললেন, ‘এই দুইজন কে?’

‘স্যার, ফেরেশতা।’

‘বল কী! নাম শুনি নাইতো। উনারা কোচ্চেন করেন না-কি?’

‘কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন। উন্তর না জানলে বিরাট সমস্যা।’

‘কী প্রশ্ন বলতো?’

যেমন একটা প্রশ্ন হচ্ছে—‘তোমার প্রভু কে?’

পল্টু স্যার হতভম্ব গলায় বললেন, ‘খুবই কঠিন প্রশ্ন তো। আসলেই তো আমার প্রভু কে? আমার প্রভু কি আমার সাব কনশাস মাইড, নাকি আমার কনশাস মাইড? কে আমাকে কন্ট্রোল করে?’

আমি বললাম, ‘স্যার, এরচেয়েও কঠিন প্রশ্ন আছে। যেমন— তোমার ধর্ম কী?’

পল্টু স্যার বললেন, ‘সর্বনাশ! লোহার ধর্ম হল লোহা কঠিন। চুম্বক তাকে আকর্ষণ করে। মানুষের ধর্ম তাহলে কী? জটিল চিন্তার বিষয় তো!’

পল্টু স্যার চোখ বুঝে চিন্তা শুরু করলেন। তাঁর মুখ থেকে কক কক শব্দ বের হতে লাগল।

সাতদিনে আমার বেতন তিন হাজার টাকা থেকে বেড়ে বেড়ে হল চার হাজার পঞ্চাশ। এবং এই সাত দিনে পল্টু স্যার সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তার সামারি এবং সাবসটেস হচ্ছে—

ক. পল্টু স্যার অতি সজ্জন ব্যক্তি।

খ. পল্টু স্যার বেকুব ব্যক্তি।

ধরা যাক, কোনো এক সাংগ্রাহিক পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ছাপা হবে, আমি প্রতিবেদক। তাহলে আমি যা করব তা হচ্ছে— তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে পায়ে ফ্ল্যানের বাতাস দিচ্ছেন এবং গভীর মনযোগে বই পড়ছেন। এ রকম একটা ছবি তুলব লেখার সঙ্গে যাবার জন্যে। ছবির নিচের ক্যাপশানে—পাঠেই আনন্দ! মূল লেখাটা হবে এ রকম—

একজন নীরব জ্ঞান সাধক

(কক কক ধর্মী)

তাঁর ভালো নাম আরু হেনা। পরিচিতজনদের কাছে পল্টু ভাই কিংবা পল্টুভাইজান। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। চিরকুমার মানুষ। গুলশান এলাকার ‘বগ্রিশশ’ ক্ষয়ার ফুটের একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন। ফ্ল্যাট বাড়ির আসবাব বলতে একটা শোয়ার খাট, একটা ইজিচেয়ার। বইকে যদি আসবাবের মধ্যে ফেলা যায় তাহলে ইজিচেয়ার এবং খাট ছাড়া তাঁর আছে ছোট-বড় প্রায় দশ হাজার আসবাব। পড়ার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই। হাতের

কাছে যা পান তাই পড়েন। বই হাতে না থাকলে তাঁর
বুক ধড়ফড় করে। হাঁপানির টান উঠে।

তিনি ঘুম থেকে উঠেন সকাল সাতটায়। এক কাপ
চা একটা টোস্ট বিসকিট খেয়ে পড়তে শুরু করেন।

দুপুর একটায় গোসল করেন। দুপুরের খাবার খেয়ে
ইজিচেয়ারে পনেরো থেকে বিশ মিনিট ঘুমিয়ে আবার
পড়তে শুরু করেন। সঞ্চ্যা ছটায় পড়া বন্ধ করে এক
কাপ চা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙ্গে সঞ্চ্যা সাতটা
সাড়ে সাতটার দিকে। আবার পড়তে বসেন—রাত
এগারোটা পর্যন্ত একটানা পড়ার কাজ চলে। এগারোটার
পর রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোতে যান। রাত তিনটার
দিকে ঘণ্টা খানেকের জন্যে তাঁর ঘুম ভাঙ্গে। এই
সময়টাও তিনি নষ্ট করেন না। পড়াশোনা করেন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

উচ্চতা	: পাঁচ ফুটেছয় ইঞ্চি।
ওজন	: ষাট কেজি (আনুমানিক)।
প্রিয় রঙ	: কিছু নেই।
প্রিয় খাবার	: সবই প্রিয়। যা দেয়া হয় তাই খান।
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	: এই মুহূর্তে তাঁর গৃহভূত্য হিমু।

মেডিকেল প্রোফাইল

ব্লাড গ্রুপ	: A Positive.
কিডনি	: দুটাই অকেজো।
প্রেসার	: নরমাল।
ডায়াবেটিস	: নাই।
কলেস্টেরেল	: বিপদসীমার নিচে।

অর্থনৈতিক প্রোফাইল

নিজের কেনা ফ্ল্যাটে থাকেন। এ ছাড়াও কয়েকটি ফ্ল্যাট
আছে। সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। ব্যাংকে প্রচুর টাকা।

তিনি চেক কেটে টাকা তুলতে পারেন না, কারণ সিগনেচার মিলে না। পল্টু স্যার যে সিগনেচারে এ্যাকাউন্ট খুলেছেন সেটা ভুলে গেছেন। বাড়ি ভাড়ার নগদ টাকা যা আসে তাতেই সংসার চলে। বাসায় বড় একটা লকার আছে। লকারের কম্বিনেশন নাম্বার স্যার ভুলে গেছেন বলে লকার খোলা যাচ্ছে না। স্যার প্রতি শুক্রবারে আধঘণ্টা সময় বিভিন্ন নাম্বারে চেষ্টা করেন। তাতে লাভ হচ্ছে না।

কক কক ধর্ম

বিষয়টা যথেষ্ট জটিল। কিছু কিছু বই পড়ার সময় তিনি কক কক জাতীয় শব্দ করেন। পছন্দের বই হলে এ ধরনের শব্দ করেন, না-কি অপছন্দের বই হলে করেন—তা এখনো বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কক কক শব্দটার সঙ্গে মুরগির ডাকের সাদৃশ্য আছে।

গৃহভৃত্য বিষয়ে আমার বাবার কিছু উপদেশবাণী ছিল। উপদেশবাণীর সার অংশ হচ্ছে—“মহাপুরুষদের কিছুকাল গৃহভৃত্য হিসেবে থাকতে হবে।” তিনি ডায়েরিতে কি লিখে গেছেন হ্বহ তুলে দিচ্ছি। এই অংশটি তিনি মৃত্যুর আগে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে লিখেছেন। হাতের লেখা জড়ানো এবং অস্পষ্ট। মানুষের মানসিক অবস্থার ছাপ পড়ে হাতের লেখায়। আমার ধারণা তখন তাঁর মানসিক অবস্থাও ছিল এলোমেলো। লেখার শিরোনাম—হিজ মাস্টার্স ভয়েস। তিনি সব লেখাই সাধু ভাষায় লেখেন। এই প্রথম সাধু ভাষা বাদ দিয়ে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

হিমু, তুমি নিশ্চয় রেকর্ড কোম্পানি—হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ড দেখেছ। তাদের মনোগ্রামে একটি কুকুরের ছবি আছে। কুকুরটা থাবা গেড়ে তার

মনিবের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে প্রভুর প্রতি আনুগত্য ঝরে ঝরে পড়ছে।

সব মহাপুরুষদের কিছু দিন কুকুর জীবন যাপন করা বাধ্যতামূলক। সে একজন প্রভুর অধীনে থাকবে। প্রভুর কথাই হবে তার কথা। প্রভুর আদেশ পালনেই তার জীবনের সার্থকতা। প্রভুর ভাবনাই হবে তার ভাবনা। প্রভু মিথ্যা বললে সেই মিথ্যাই সে সত্য বলে ধরে নিবে।

কুকুর ট্রেনিং-এ উপকার যা হবে তা নিম্নরূপ :

ক. জীবনে বিনয় আসবে। বিনয় নামক এই মহৎ গুণটি আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। আমি অতি বিনয়ী মানুষকেও দেখেছি অহংকারের গুদাম। সেই গুদাম তালাবদ্ধ থাকে বলে কেউ তার অহংকার প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

খ. ‘আনুগত্য’ কি তা শেখা যাবে। প্রতিটি মানুষ নিজের প্রতিই শুধু অনুগত। অন্যের প্রতি নয়। নিজের প্রতি আনুগত্য যে সর্বজনে ছড়িয়ে দিতে পারবে সেইতো মহামানুর।

গ. মানুষকে সেবা করার প্রথম পাঠ্টেন্ট উরু।

কুকুর ট্রেনিং কিংবা গৃহভূত্য ট্রেনিং তোমাকে সেবা নামক আরেকটি মহৎ গুণের সংস্পর্শে আনবে। ফ্রোরেস্ট মাইটিংগেল না, তোমাকে সত্য সেবা শিখতে হবে। ফ্রোরেস্ট মাইটিংগেল অসুস্থ মানুষদের সেবা করতেন। তারা এমনিতেই সেবার দাবিদার। তোমাকে সুস্থ মানুষকে সেবা করতে হবে।

আমি নিজে এখন অসুস্থ। সময় ঘনিয়ে আসছে একুপ মনে হয়। তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং দিয়ে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। যেসব শিক্ষা দিয়ে যেতে পারব না, আমার আদেশ, সেসব শিক্ষা নিজে নিজে গ্রহণ করবে।

এখন অন্য বিষয়ে কিছু কথা বলি—গত পরশু দুপুরে আমি তোমার মা'কে স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্ন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন মস্তিষ্ক তার স্মৃতিগুলো নাড়াচাড়া করে। যাচাই-বাছাই করে, কিছু পুনর্বিন্যাস করে, তারপর স্মৃতির ফাইলে যত্ন করে রেখে দেয়। এই কাজটা সে করে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন। মস্তিষ্কের এই কাজ-কর্মই আমাদের কাছে ধরা দেয় স্বপ্ন হিসেবে। ফ্রয়েড সাহেব বলেছে, সব স্বপ্নের

মূলে আছে ঘোনতা। এই ধারণা যে কট্টা ভুল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক, এখন স্বপ্নের কথা বলি। আমি তোমার কিশোরী মা'কে স্বপ্নে দেখলাম। এটা কীভাবে সম্ভব হল জানি না। কারণ তাকে আমি কিশোরী অবস্থায় কখনো দেখি নাই। যখন তাকে বিবাহ করি তখন তার বয়স বাইশ। সে একজন তরুণী।

আমি দেখলাম সে তার আমের বাড়িতে। কুয়ার পাড়ে বসে আছে। তার সামনে এক বালতি পানি। সে চোখেমুখে পানি দিচ্ছে। তোমার মা অতি রূপবতীদের একজন—এই তথ্য মনে হয় তুমি জান না। কারণ, তার মৃত্যুর পর আমি তার সমস্ত ফটোগ্রাফ নষ্ট করে দিয়েছি। তার স্মৃতি জড়িত সব কিছুই ফেলে দেয়া হয়েছে। কারণ স্মৃতি মানুষকে পিছনে টেনে ধরে। মহাপুরুষদের পিছুটান থেকে মুক্ত থাকতে হয়।

স্বপ্নের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। তোমার মা চোখেমুখে পানি দিয়ে উঠে দাঢ়ানো মাত্র আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। তোমার মা অত্যন্ত আনন্দিত গলায় বলল, ‘তুমি একা এসেছ, আমার ছেলে কই?’

আমি বললাম, ‘তাকে ঢাকা শহরে ঝোঁকে এসেছি।’

সে করণ গলায় বলল, ‘আহাৰে, কত দিন তাকে দেখি না! সে না-কি হলুদ পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে ঝাস্তায় রাস্তায় হাঁটে। এটা কি সত্যি?’

‘হ্যাঁ সত্যি।’

‘তুমি তাকে সুন্দর একটা শার্ট কিনে দিও। একটা প্যান্ট কিনে দিও। এক জোড়া জুতা কিনে দিও।’

‘আচ্ছা দিব।’

তোমার মা তখন কাঁদতে শুরু করে এবং কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘ওর কি কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে? কোনো মেয়ে কি ভালোবেসে তার হাত ধরেছে?’

আমি বললাম, ‘না। সে মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করছে। তার জন্যে নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ।’

তোমার মা চোখের পানি মুছে রাগী রাগী গলায় বলল, ‘সে মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করছে, না কচু করছে। তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আস। আমি থাবড়ায়ে তার মহাপুরুষগিরি ছুটায়ে দিব।’

স্বপ্নের এই জায়গায় আমার ঘূম ভেঙে গেল।

স্বপ্ন যে এক ধরনের ভাসি তা আমি জানি। তারপরেও স্বপ্নদর্শনের পর
পর আমার মধ্যে কিছু আচ্ছন্ন ভাব দেখা দিল। আমার চক্ষু সজল হল।
মনে মনে বললাম,

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি
অরণ্যং তেন গন্তব্যং
যথারণ্যং তথা গৃহম্ ।

বাবা হিমু, এখন তোমাকে একটি বিশেষ কথা বলি— তোমার মায়ের
একটি আট ইঞ্চি বাই বার ইঞ্চি ছবি এবং তার লেখা ডায়েরি আকারে
একটা খাতা আমি গোপনে রেখে দিয়েছি। একটা খামে সিলগালা করে
রাখা। যে তোশকে আমি ঘুমাই সেই তোশকের ভেতরে সিলাই করে রাখা
আছে। তুমি খামটি সংগ্রহ করবে। যে দিন কোনো কারণে তোমার হৃদয়
সত্যিকার অথেই আনন্দে পূর্ণ হবে সেদিন খামটা খুলবে। তবে একবার
খাম খুলে ফেলার পর ছবি, খাতা এবং খাম আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
যেহেতু একবার দেখার পর সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে সেই কারণেই তুমি
কোনোদিন খামটা খুলতে পারবে না তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। হা হা হা।
একে কি বলে জান? একে বলে থেকেও নাই।

বাবার উপদেশ মেনে এক মাস গৃহভ্যের কাজ করে আজ বেতন
পেয়েছি। পল্টু স্যার সারাদিনের ছুটি দিয়েছেন। আজ তার ডায়ালাইসিসের
দিন। সারাদিন কাটাবেন হাসপাতালে। রাতে ফিরবেন, আবার নাও ফিরতে
পারেন। শরীর বেশি খারাপ লাগলে হাসপাতালেই থেকে যাবেন। তাঁর
অবস্থা দ্রুত খারাপ হচ্ছে। ডাক্তাররা ‘কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া কোনো বিকল্প
নেই’ এই তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন।

পল্টু স্যার বলেছেন, অন্যের কিডনি শরীরে নিয়ে বাঁচার তিনি কোনোই
কারণ দেখছেন না। তাঁর মতে ঘুম যেমন ভয়াবহ কিছু না, মৃত্যুও না। বরং
ঘুমের চেয়ে ভালো। ঘুম এক সময় ভাঙে, বাস্তবের পৃথিবীতে ফিরে আসতে
হয়। গরম, ঘাম, পেটে ব্যথা, ক্ষুধা, বাথরুম নামক অসুবিধায় বাস করতে
হয়। মৃত্যুতে এই সমস্যা নেই। তাঁর একটাই সমস্যা—মৃত্যুর পর বইগুলো
সঙ্গে থাকবে না।

অনেকদিন পর রাস্তায় হাঁটছি। গরমটা ভালো লাগছে, গায়ের ঘামের গঙ্গও ভালো লাগছে। কঠিন রোদের আলাদা মজা আছে।

এফডিসির কাছের রেল ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন যাবে সেই দৃশ্য দেখব। ছুটুন্ত ট্রেনের সঙ্গে মনের একটা অংশও ছুটে যায়, সেই অনুভূতি অন্য রকম। ট্রেন কখন আসবে জানি না। অপেক্ষা করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। হাতে রাত আটটা পর্যন্ত সময়। আমি আগ্রহ নিয়ে চারপাশ দেখছি। একটা রিকশায় মায়াকাড়া চেহারার শ্যামলা মেয়ে বসে আছে। বৈশাখের দুর্দান্ত রোদেও মেয়েটা রিকশার হড় তোলেনি। রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে। মেয়েটাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে কাঁদতে কাঁদতে এবং চোখের পানি মুছতে মুছতে আসছে। প্রকৃতি মানুষের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছেন। দুঃখ পেলে মানুষ কাঁদবে, তার চোখে পানি আসবে এবং আনন্দ পেলে সে হাসবে, তার দাঁত দেখা যাবে—এই ব্যবস্থা। প্রকৃতি এই কাজটা কেন করল?

আমার ধারণা প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করেছে যেন মানুষ তার দুঃখ এবং আনন্দ লুকাতে না পারে। যেন অন্যরা টের পেয়ে যায়। দুঃখ এবং আনন্দ ভাগ করার জন্যে এগিয়ে আসে।

রেল ক্রসিং-এর গেট পড়ে গেছে। মেয়েটার রিকশা থেমে গেছে। আমি তাকিয়ে আছি রিকশার দিকে। আমার হঠাৎ মনে হল—রিকশার ভাড়া দেবার মতো টাকা মেয়েটার ক্ষেত্রে নেই। তারচেয়েও বড় কথা মেয়েটা ভয়াবহ ক্ষুধার্ত। রাতে সে কিছু খায় নি। এত বেলা হয়েছে এখনো কিছু খায় নি।

মেয়েটা রিকশা থেকে নেমে পড়েছে। রিকশাওয়ালা কঠিন মুখ করে কী যেন বলছে। মেয়েটার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়েছে। সে হতাশ ভঙ্গিতে আশেপাশে তাকাচ্ছে। আমি এগিয়ে গেলাম। রিকশাওয়ালাকে বললাম, ‘ভাড়া কত হয়েছে?’

রিকশাওয়ালা বলল, ‘একশ টাকা।’

আমি বললাম, ‘টাকা শহরে রিকশার ভাড়া একশ টাকা এই প্রথম শুনলাম।’

রিকশাওয়ালা বলল, ‘স্যার, আমি ইনারে নিয়া সকাল থাইকা ঘুরতাছি। এর বাড়িতে যায়, তার বাড়িতে যায়। কানতে কানতে ফিরা আসে, যাত্রাবাড়ি গেলাম। ঘগবাজার গেলাম। রামপুরা গেলাম—এখন আপনি বিবেচনা করেন। একশ টাকা কমই চাইছি।’

আমি বললাম, ‘আমারো তাই ধারণা। এই নাও রিকশা ভাড়া একশ টাকা। আর এই নাও বিশ টাকা। বরফ দেয়া লাছি থাও। গরমে আরাম হবে।’

রিকশাওয়ালা এই প্রথম ভালোভাবে আমার দিকে তাকালো এবং জিহ্বায় কাষড় দিয়ে বলল, ‘হিমু ভাই, মাফ দেন। আপনেরে চিনতে পারি নাই।’ সে নিচু হয়ে কদমবুসি করল।

মেয়েটা হতভম। আশেপাশের লোকজনও কৌতুহলী হয়ে তাকাচ্ছে। ট্রেন এসে গেছে। আমি তাকিয়ে আছি ট্রেনের দিকে—

বৃষ্টি দেখলেই যেমন ছেলেবেলার গান ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ মনে পড়ে, ট্রেন দেখলেই ট্রেনের ছড়া মনে পড়ে—

রেল গাড়ি ঝামাবাম
পা পিছলে আলুর দম
ইস্টিশনের মিষ্টি কুল
শখের বাগান গোলাপ ফুল

ট্রেন চলে গেছে। রেল গেটের জটুল শব্দ। শুধু আমি, মায়াবতী তরুণী এবং রিকশাওয়ালা আটকে আছি।

রিকশাওয়ালা গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাসিমুখে বলল, ‘হিমু ভাই’কি আমারে চিনেছেন? আমি ছামছু। আমার মেয়ের নাম সাগরিকা। আপনার কারণে মেয়েটার জীবন রক্ষা হয়েছিল। চিনেছেন হিমু ভাই?’

‘হঁ।’

‘একটা পরীক্ষা আছে না, পাস করলে মাসে মাসে টেকা পায়। সাগরিকা সেই পরীক্ষা পাস করছে। টেকা পাওয়া শুরু করছে। এইটা সেইটা কিনতে চায়। আমি বলেছি, খবরদার! আগে হিমু ভাইরে পছন্দের কিছু কিন্যা দিবি। তারপর অন্য কথা। ঠিক বলেছি না?’

‘হঁ।’

‘এখন বলেন আপনার পছন্দের জিনিস কী? আইজই কিনব।’

‘চিন্তা-ভাবনা করে বলি। হৃট করে বলতে পারব না। আগে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। ক্ষুধায় জীবন যাওয়ার উপক্রম। ঢাকা শহরের সবচে ভালো মোরগ-পোলাও কোথায় পাওয়া যাবে?’

‘পুরান ঢাকায় যাইতে হবে। সাইনি পালোয়ান।’

‘চল যাই।’

আমি রিকশায় উঠে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘চল, মোরগ-পোলাও খেয়ে আসি।’

মেয়েটা চোখ-মুখ খিচিয়ে কঠিন গলায় বলল, ‘আপনি আমাকে মোরগ-পোলাও খাওয়াবেন কেন?’

আমি বললাম, ‘তোমার ক্ষিধে লেগেছে এই জন্যে।’

মেয়েটি গলার স্বর আরো তীক্ষ্ণ করে বলল, ‘আমার ক্ষিধে লাগলে আপনি কেন আমাকে খাওয়াবেন?’

আমি বললাম, ‘ঝামেলা করবে না। সারাদিন রিকশা নিয়ে ঘুরেছ, ভাড়া দিতে পার নি, আবার ঝগড়া। আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে যদি রিকশায় না উঠ তিনটা থাপ্পর দিয়ে চলে যাব। এক...দুই...

তিনি বলার আগেই মেয়েটা চোখ মুছতে মুছতে রিকশায় উঠল। রিকশাওয়ালা বলল, ‘আপনেরে চিনে নাই, এই জন্য ডং করছে। চিনলে লাফ দিয়ে কোলে উইঠ্যা বসত।’

আমি বললাম, ‘তোমার ঐ দোকানে আইটেম আর কী পাওয়া যায়?’

‘রিকশাওয়ালা মহানদৈ রিকশার প্যাডেল চাপতে চাপতে বলল, ‘গ্লাসি পাইবেন। খাসির মাংস দিয়ে বানায়। এমন গ্লাসি আপনে বেহেশতেও পাইবেন না।’

‘মোরগ-পোলাওয়ের সঙ্গে গ্লাসি যায়?’

‘অবশ্যই যায়। কেন যাইব না? চ্যালচ্যালাইয়া যায়।’

‘ঠিক আছে, মোরগ পোলাও এবং গ্লাসি—সাথে আর কি?’

‘কোয়েল পাখির রোস্ট খাইবেন? পেটের ভিতরে থাকবে পাখির ডিম।’

‘অবশ্যই খাব।’

‘দাম আছে কিন্তু।’

‘দাম কোনো বিষয়ই না। একদিনইতো খাব। রোজ রোজ তো খাচ্ছি না।’

মেয়েটা শক্ত হয়ে বসে আছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কিছুটা দিশেহারা। তার হাতের আঙুল কাঁপছে। খুব সম্ভব টেনশন এবং ক্ষুধার কারণে।

‘তোমার নাম কী?’

‘আমার নাম জেনে কী করবেন?’

‘আমি একজনকে মোরগ-পোলাও, গ্লাসি এবং ডিমসহ কোয়েল পাখি
খাওয়াবো, তার নাম জানব না?’

‘আমার নাম রানু।’

‘থাক কোথায়?’

‘মহিলা হোস্টেলে। হাতিরপুলের কাছে।’

‘মহিলা হোস্টেলে কত টাকা বাকি পড়েছে? আমার ধারণা মহিলা
হোস্টেলের বাকি শোধ করার জন্যেই তুমি ঘুরছ। টাকা জমা দেবার আজই
কি শেষ দিন?’

রানু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘আপনি জেনে কি
করবেন? আমাকে টাকাটা দিবেন?’

‘ইঁ। দেব।’

‘বিনিয়য়ে আমাকে কি করতে হবে? আপনার সঙ্গে শুতে হবে?’

আমি কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট গলায় বললাম,
‘হ্যাঁ।’

রানু এখন মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ
রক্তবর্ণ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে আছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। আমি
বললাম, রানু শোন। তুমি ভুক্তবহু সমস্যায় পড়েছ। সমস্যা থেকে বের
হওয়ার জন্যে অন্য পুরুষের সঙ্গে শুয়ে টাকা রোজগারের চিন্তা করছ বলেই
আমাকে এমন কুৎসিত কথা বলতে পারলে।

রানু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ‘সরি।’

‘আমি তোমাকে একটা ঠিকানা লিখে দেব। এই ঠিকানায় চলে এসো,
দেখি কোনো চাকরি দেয়া যায় কি-না।’

‘আমার জন্যে আপনাকে কিছু করতে হবে না।’

‘আচ্ছা যাও—কিছু করব না।’

‘হোস্টেলের টাকাটা আপনার কাছ থেকে ধার হিসেবে নেব। যথা
সময়ে ফেরত দেব। আমার তিন হাজার টাকা লাগবে। তিন হাজার টাকা
কি আছে আপনার সঙ্গে?’

‘আছে।’

‘আরেকটা কথা আপনাকে বলি—আপনি নিজেকে যতটা ভালো মানুষ
প্রমাণ করতে চাইছেন ততটা ভালো মানুষ আপনি নন।’

‘কীভাবে বুঝলে?’

‘আমি মানুষের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি। সে ভালো না মন্দ।’

‘কখন থেকে পার? ছেটবেলা থেকে?’

রানু জবাব না দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। তার শরীরের কাঁপুনি থেকে বুঝতে পারছি সে কান্না আটকানোর চেষ্টা করছে। আমি বললাম, ‘টাকাটা যে আমাকে ফেরত দেবে, কীভাবে দেবে? তোমার ভাবভঙ্গ পরিষ্কার বলছে তুমি গভীর জলে পড়েছ। কারো কাছ থেকে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে?’

‘আপনার টাকা পেলেইতো হল। কোথেকে পাচ্ছি সেটা জেনে কী করবেন? যাই হোক আপনাকে বলছি—আমি কিউনি বিক্রি করছি। এক ভদ্রলোক কিনবেন বলে কথা পাকা হয়েছে। ক্রস ম্যাচিং আরো কি কি যেন আছে, সব করা হয়েছে।’

‘কত টাকায় বিক্রি করছ?’

‘এক লাখ টাকা। যে এজেন্ট বিক্রির ব্যবস্থা করেছে তাকে দশ হাজার দিতে হবে। আমি পাব নবাই হাজার।’

‘নবাই হাজারে কিউনি খায়াপস্মা। টাকাটা হাতে পাচ্ছ কবে?’

‘এই মাসের আঠারো ডিনার অর্ধেক টাকা পাব। বাকি অর্ধেক ট্রান্সপ্লান্টের পরে।’

‘যিনি তোমার কিউনি কিনছেন তার নাম জান?’

রানু বলল, ‘কার জন্যে কিউনি কেনা হচ্ছে তা আমি জানি না। মাজেদা বলে একজন মহিলা সব ব্যবস্থা করছেন। নিউ ইঞ্জিনে থাকেন।’

আমি বললাম, ‘ইলি কাউ। পবিত্র গাভী।’

রিকশাওয়ালা বলল, ‘গাভীর কথা কি বললেন স্যার?’

‘গাভীর কথা কিছু বলি নাই। তুমি রিকশা চালাও।’

রানু খাওয়া-দাওয়ায় প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে বলল, ‘আমি একটা মিষ্টিপান খাব।’ তার চোখে চকচকে ভাব আগে ছিল না, এখন চলে এসেছে। তাকে পান কিনে দেয়া হল। সে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বলল, ‘আমি এমিতে পান খাই না। শুধু বিয়েবাড়িতে গেলে পান খাই। একবার জর্দা দেয়া পান খেয়ে বিয়েবাড়িতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার বান্ধবীর বিয়ে। ওর নাম হাসি। আমরা ওকে ক্ষেপানোর জন্যে
বলতাম—

হাসি।

রজব আলির খাসি।'

'রজব আলিটা কে?'

'রজব আলি কেউ না। এমি একটা নাম। মজার ব্যাপার কী জানেন?
ওর বিয়ে যার সঙ্গে হয়েছে তার নাম রজব আলি। গার্মেন্টস ফ্যাট্টেরির
ম্যানেজার। অস্তুত না?'

'কিছুটা অস্তুত।'

রানু বলল, 'মাঝে মাঝে অস্তুত ঘটনা ঘটে। আজ যেমন ঘটেছে। যখন
খাচ্ছিলাম তখন হঠাত মনে হল আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।
আজকের তারিখটা জানেন?'

'সতেরোই মে।'

'আজ আমার বাবার মৃত্যু দিন। উনি মাঝে গিয়েছিলেন দুপুর দুটায়।
আমি যখন খাওয়া শুরু করি তখন থেকে দুপুর দুটা। আমি ঘড়ি
দেখেছিলামতো, আমি জানি। খারাপ সময় আমি যে কাঁদছিলাম আপনি
দেখেছেন? প্লেটে কয়েক ফোঁটা চোখের পানি পড়েছিল।'

'দেখেছি।'

'কাঁদছিলাম, কারণ আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছিল, আমার বাবা ঠিক আমার
পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলছেন—মা!
আরাম করে ভাত খা। খাওয়ার সময় প্লেটে চোখের পানি ফেলতে নেই। এ
রকম কেন মনে হল শুনতে চান?'

'চাই।'

'আরেক দিন বলব। একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আচ্ছা,
বলুনতো, আমি কি দেখতে খারাপ?'

'খারাপ না, তবে রসগোল্লাও না।'

'কিছু একটা আমার মধ্যে আছে। ভয়ঙ্কর রিপালসিভ কিছু। এখন পর্যন্ত
কোনো ছেলে আমার প্রেমে পড়ে নি। অথচ প্রতিরাতে ঘুমুতে যাবার সময়
আমি চিন্তা করি—একটা ছেলে আমার প্রেমে পড়েছে আমার যন ভুলাবার
জন্যে হাস্যকর সব কাঙ্কারখানা করছে।'

‘কী রকম হাস্যকর কাঙ্কারখানা?’

‘একেক রাতে একেক রকম ভাবি। কাল রাতে ভেবেছি—একটা ছেলে ব্লেড নিয়ে আমার ঘরের বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেছে—তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি না হও, তাহলে আমি ব্লেড দিয়ে আমার হাতের শিরা কেটে ফেলব।’

‘তুমি রাজি হয়েছ?’

‘অবশ্যই রাজি হব! যে কোনো ছেলে এই ধরনের কথা বললে আমি রাজি হব।’

‘না, তা হবে না। রিকশাওয়ালা ছামছু বললে রাজি হবে না।’

রানু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ‘রিকশাওয়ালাকে আপনি টেনে আনলেন কেন? আপনিতো অন্তৃত মানুষ।’

আমি বললাম, ‘তুমি যখন রাজি হলে তখন ছেলেটা কি করল?’

রানু বলল, ‘আপনাকে আর কিছুই বলব না। এতক্ষণ বক বক করেছি বলে নিজের উপর রাগ লাগছে। আমি আপনার সঙ্গে ফেরত যাব না। আলাদা রিকশা নিয়ে যাব।’

‘তাহলে বিদায়।’

রানু বলল, ‘বিদায়। আপনি আমাকে যত্ন করে খাইয়েছেন, কোন একদিন সেটা আমি শোধ করুব। যত তাড়াতাড়ি পারি করব। প্রমিজ।’

রানু চলে গেল। আমিও রওনা হলাম। হাতে অনেক সময়। মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করা দরকার। মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করার পর হাসপাতালে চলে যাব। দেখে আসব পল্টু স্যারকে। হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি, কারণ হাত খালি। টাকা যা ছিল রানুকে দিয়ে দিয়েছি। তিন হাজার টাকা দেবার কথা। তারচে বেশিই দিয়েছি। কত বেশি বুঝতে পারছি না।

ভরপেট খাওয়ার পর কড়া রোদে হাঁটার অন্য রকম মজা আছে। মনে হয় নেশা করে হাঁটছি। ছাতিম গাছের ফুলের গন্ধ শুকলে যে রকম নেশা হয় সে রকম নেশা।

মাজেদা খালা দরজা খুলে বললেন, তোর একি অবস্থা? মনে হচ্ছে ঘাম দিয়ে গোসল করেছিস। এক্ষুণি বাথরুমে ঢুকে পড়। সাবান ডলে গোসল দে। তার আগে লেবুর সরবত করে দিচ্ছি। সরবত খা। ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে থাক, শরীর ঠাণ্ডা হোক।

আমি ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে লাগলাম। মাজেদা খালা
ঘরের এসিও ছেড়ে দিয়েছেন। ঘর দ্রুত শীতল হচ্ছে। রোদে হাঁটার নেশা
ভাবটা কেটে যাচ্ছে।

মাজেদা খালা সরবত নিয়ে এলেন। চিনির সরবত না, লবণের
সরবত। প্রচুর ঘাম হলে এই সরবতই না-কি খাবার বিধান।

‘তুই কি আমার কাছে কোনো কাজে এসেছিস?’

‘হঁ।’

‘আমারো তাই ধারণা। ভৰ দুপুরে বিনা কাজে আসার মানুষ তুই না।
কাজটা কী?’

‘বিশেষ একটা ধর্ম নিয়ে আমি গবেষণা করছি। তুমি এই বিষয়ে কী
জান তাই জানতে এসেছি।’

‘ধর্ম বিষয়ে আমি কী জানব। তোর খালু সাহেব জানতে পারেন। সে
দেশে নেই। জাপান গিয়েছে।’

‘তুমি যা জান তাই শুনি।’

‘কী ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাস?’

‘কক কক ধর্ম।’

‘কক কক ধর্ম আবার কী? এই প্রথম এমন এক ধর্মের নাম শুনলাম।’

‘পল্টু স্যার যে কক কক শব্দ-করে এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।’

মাজেদা খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘সহজ কথা সহজে বলতে পারিস
না? আমি ভাবলাম কি-না কি ধর্ম।’

‘আমি যতদূর জানি কক কক করার কারণে স্যারের বিয়ে ভেঙে
গিয়েছিল। এটা কি সত্যি?’

মাজেদা খালা বললেন, ‘তোকে কে বলেছে? পল্টু ভাইজান বলেছেন?’

‘হঁ। স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্যার বিয়ে করেন নি কেন? তখন
বললেন।’

মাজেদা খালা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ‘কার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছিল,
সেটা কি বলেছে?’

‘না।’

‘যাক, এইটুকু সেঙ্গ তাহলে আছে।’

‘তোমার সঙ্গেই বিয়ে হতে যাচ্ছিল?’

‘হঁ। বিরাট বড়লোকের ছেলে, গাড়ি-বাড়ি এই সব দেখে বাবা রাজি
হয়ে গেলেন। আর আমি নিজেও তাকে পছন্দ করতাম। পছন্দ করার

মতোই মানুষ। বিয়ে করতে এসেছে। বরযাত্রীর সঙ্গে বসেছে। টেনশনের কারণে মনে হয় কিছু একটা হয়েছে—গুরু করল কক কক।

আমার বড় চাচা মিলিটারি কর্নেল। তিনি বললেন, ‘জামাই কক কক শব্দ করছে কেন? সমস্যা কী?’

‘পল্টু ভাইজান বড় চাচার হংকারে আরো বেশি ভয় পেয়ে গেলেন। জোরে জোরে কক কক করতে লাগলেন। এত জোরে যে, ভেতর বাড়ি থেকে শোনা যায়। বিয়ে ভেঙে গেল।’

আমি বললাম, ‘পল্টু স্যারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে খারাপ হতো না। মানুষটা শুধু যে ভালো তা-না। অন্য রকম ভালো।’

মাজেদা খালা চাপা গলায় বললেন, ‘জানি।’

আমি বললাম, ‘উনার শোবার ঘরে তোমার যে একটা বাঁধানো ছবি আছে এটা কি জান?’

‘নাতো।’

‘বয়সকালে তুমি যে কি রূপবতী ছিলে ছবিটা না দেখলে বিশ্বাস করাই মুশকিল। প্রথম কিছুদিন আমি চিনতেই পারিমি যে এটা তোমার ছবি।’

মাজেদা খালা বললেন, ‘তোর দায়িত্ব হচ্ছে আজই ছবিটা সরিয়ে ফেলা। অন্য লোকের স্তৰীর ছবি তিনি কেন নিজের ঘরে রাখবেন। ছিঃ। আজ দিনের মধ্যে তুই ছবি সরাবিঃ।

আমি বললাম, ‘এই কাজটা আমি করব না, খালা। বেচারার কিছুইতো নেই। থাকুক না একটা ছবি।’

মাজেদা খালা চট করে আমার সামনে থেকে সরে গেলেন। বুঝতে পারছি হঠাৎ তার চোখে পানি চলে এসেছে। প্রকৃতি মাঝে মাঝে মানুষকে এমন বিপদে ফেলে। চোখে পানি আসার সিস্টেম না থাকলে জীবন যাপন হয়তো সহজ হতো।

হাসপাতালের ৩১ নম্বর কেবিনে পল্টু স্যার হতাশ ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। তাঁর গায়ে হাসপাতালের হাস্যকর সবুজ জামা। এই জামায় রোগীর সুবিধার জন্যে বোতাম থাকে না। পেছন দিকে ফিতা থাকে। হাতড়ে হাতড়ে সেই ফিতা বাঁধতে হয় বলে বেশির ভাগ সময় আঙ্কাগিটু লেগে যায়। প্রয়োজনের সময় এই জামা খোলা যায় না। রোগীতো পারেই না, নার্সরাও পারে না।

পল্টু স্যারের হাতে টিভির রিমোট কন্ট্রোল। তিনি তাকিয়ে আছেন টিভির দিকে। টিভি কিন্তু বঙ্গ। ফিনাইল গন্ধমুক্ত হোটেলখর্মী হাসপাতাল। ইদানীং এই ধরনের হাসপাতাল বাংলাদেশে প্রচুর হচ্ছে। এই হাসপাতালগুলোর লক্ষ্য রোগীকে ফাইভ স্টার হোটেলের আনন্দে রাখা। চিকিৎসা অনেক পরের ব্যাপার। সমস্যা হচ্ছে রোগীরা চাচ্ছে চিকিৎসা। ফাইভ স্টার হোটেলে আরামে থাকতে চাইলে তারা ফাইভ স্টার হোটেলেই যেত। হাসপাতালে ভর্তি হতো না।

‘স্যার! টিভিতে কী দেখছেন?’

পল্টু স্যার চমকে আমার দিকে তাকিয়েই হাহাকার ধ্বনি করলেন, ‘হিমালয়, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি চোখে অঙ্ককার দেখছি। মহাসর্বনাশ।’

‘কী সর্বনাশ হয়েছে?’

‘হাসপাতালে পড়ার জন্যে একটা প্যাকেটে বই আলাদা করে রেখেছিলাম। প্যাকেটটা ফেলে এসেছি। বই ছাড়া রাত কাটাবো কীভাবে?’

‘আমার ঝুলির ভেতর একটা গল্পের বই আছে। এতে কাজ চলবে?’

পল্টু স্যার আনন্দিত গলায় বললেন অবশ্যই কাজ চলবে। আমার বই হলেই চলে। কী বই সেটা কোনো ব্যুপার না।’

স্যার, ‘আমি যে বইটা এমেছি তার নাম “বিড়াল আমার সিমকার্ড দুধে ভিজিয়ে খেয়ে ফেলেছিল।” অতি আধুনিক লেখা।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘সিমকার্ড বিড়াল দুধে ভিজিয়ে কিভাবে খাবে? কার্ডটা ধরবে কীভাবে? থাবা দিয়েতো কিছু ধরা যায় না।’

‘বিড়াল দাঁতে কামড় দিয়ে কার্ড ধরেছিল। সেই ভাবেই দুধের বাটিতে ডুবিয়েছে।’

পল্টু স্যার বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘বিড়াল সিমকার্ড খায় এটাই জানতাম না। ছাগল সব কিছু খায় এটা জানি—আচ্ছা শোন, এটা কি হাসির বই?’

‘হাসির বই না, স্যার। খুব সিরিয়াস বই। পরাবাস্তবতা।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমার সমস্যা নাই। শুধু হাসির ব্যাপারগুলো নিয়ে সমস্যা। একটা জোকস-এর বই অনেক দিন আগে পড়েছিলাম—কিছুই বুঝতে পারি নাই। তোমাকে একটা বলব? তুমি কিছু বুঝতে পার কি-না।’

‘বলুন।’

‘এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে। প্রেমিকা ব্যাক ভিউ মিরর দেখিয়ে বলল, আয়নাটা এমনভাবে ফিট করেছে যে, মুখ দেখা যায় না। চুল ঠিক করতে পারছি না।’ প্রেমিক বলল, ‘ঐ আয়নাটা পেছন দেখার জন্যে।’ তখন প্রেমিকা বলল, ‘ছিঃ ছিঃ কমল ভাই। আপনি এত অসভ্য কেন?’ এই হল গল্প, বুঝলে। এখন তুমি বল, ছেলেটা অসভ্যতা কি করেছে? সত্যি কথা বলার মধ্যে কোনো অসভ্যতা আছে?’

‘জি না।’

‘আমি গল্পটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। কিছুই বের করতে পারি নাই। আচ্ছা শোন, এমন কি হতে পারে যে প্রেমিক গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে এটাই হাসির ব্যাপার?’

‘হতে পারে।’

‘আমিও তাই ভেবেছি। মেয়েটা গাড়ি চালানো শিখবে ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হয়ে। কিংবা তাদের বাসার ড্রাইভারের কাছে। প্রেমিকের কাছে কেন?’
‘যুক্তিযুক্ত কথা বলেছেন, স্যার।’

‘তারপরেও মেয়েটার আচরণ ঠিক না সে ছিঃ ছিঃ করে উঠবে কেন? অবশ্যি মেয়েটার মেজাজ খারাপ। মেয়ের মুখ দেখতে পারছে না। মাথার চুল ঠিক করতে পারছে না। মেজাজ খারাপের কারণে সে ছিঃ ছিঃ বলেছে।’

‘স্যার, হতে পারে। অফিস বরং বই পড়ুন। কিংবা ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আজ আপনার শরীর খারাপ।’

‘ঠিকই বলেছ। চোখ জুলা করছে। তুমি বইটা পড়ে শুনাও।’

আমি বই হাতে নিলাম। পল্টু স্যার আধশোয়া হয়ে আছেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে পরাবাস্তব গল্প শুনছেন। তাঁর চোখে শিশুর মুক্তি।

বিড়ালটা নাদুস নুদুস কিন্তু অঙ্ক। তার জগৎ ধূসর।

তার চোখ পিটপিট করে, কিন্তু সে দেখে না। তার সামনে দুধের বাটি। বাটিতে দুধ নেই। কিংবা ছিল, দুষ্ট বিড়াল দেখতে পায় নি। কারণ সে অঙ্ক। প্রথম তার যখন চোখ ফুটল, তখন তার মা বলল, ‘ডালিং, দেখ কি সুন্দর পৃথিবী!’ সে পৃথিবী দেখে বিরক্ত হল, কি কুঁচিত! তখন সে নিজে নিজে অঙ্ক হয়ে গেল। যে চোখে দেখে না, সে কথা বেশি বলে। বিড়ালের মা তাকে একটা

গ্রামীণ মোবাইল সেট উপহার দিল। সেখানে কোনো সিমকার্ড ছিল না।

সে সিমকার্ড কিনতে গ্রামীণের সেলস সেন্টারে গেল।

সেলস সেন্টারের পরিচালক একজন তরুণী। তাঁর বয়স উনিশ। তিনি বৃক্ষিক রাশির জাতক। আজ তাড়াহড়া করে এসেছেন বলে শাড়ি পরে আসতে পারেন নি। তার সুগঠিত স্তন তোরের আলোয় ঝলমল করছে। তার স্তনযুগল দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, অনাধ্যাত্ম পূজার কুসুম দুটি।...সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথও তখন একটা সিমকার্ড কিনতে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা বিভিন্ন তরুণীদের তিনি টেলিফোন করে জানতে চাইবেন—“স্বামী, ভালোবাসা কারে কয়?”

পল্টু স্যার বিশ্বিত হয়ে বললেন ‘এখানে রবীন্দ্রনাথ কোথেকে এলেন?’ আমি বললাম, ‘পরাবাস্তু গল্পে সব কিছুই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ হাফপ্যান্ট পরে বিড়ি ফুকতে ফুকতে চলে আসতে পারেন। নিউমার্কেট কাঁচা বাজার থেকে রাতা মুকুঙ এবং হিন্দু শুটকি কিনে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে বলতে পারেন, ওগো মৃ মুরগির সালুন কর। হিন্দুলের ভর্তা কর। আর আমাকে কাদের সিদ্ধিকী সাহেবের গামছাটা দাও। পুরুরে একটা ঢুব দিয়ে আসি।’

‘কাদের সিদ্ধিকীর গামছা মানে?’

‘পলিটিক্যাল গামছা, স্যার। টেকসই, সহজে রঙ যায় না।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘এসব কী বলছ? তোমাকে বই পড়ে শোনাতে হবে না। তুমি বাসায় চলে যাও, ঘুমাও।’

‘আমি রাতে হাসপাতালেই থাকব।’

‘ঘুমাবে কোথায়?’

‘ঘুমাব না। জেগে থাকব। কাল সারা রাত জেগেছিলাম, তার আগের রাতেও জেগেছিলাম।’

‘কেন?’

‘বাবার উপদেশ। বাবা বলে গেছেন—মাসে তিন দিন তিন রাত ঘুমাবি
না। এক পলকের জন্যেও চোখের পাতা এক করবি না।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘কেন?’

আমি বললাম, ‘স্লিপ ডিপ্রাইভেশন হলে কিংবা মন্তিকে অঙ্গজেনের
অভাব হলে—অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আমার বাবা চাচ্ছিলেন যেন আমি
এই সব ঘটনা দেখি।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘তাহলে আমিও তোমার মতো জেগে থাকব।’

‘সেটা খারাপ না। জাগরণে যায় বিভাবৰী।’

পল্টু স্যার জেগে থাকার চেষ্টা প্রাণপণ করলেন বলেই মুহূর্তেই ঘুমিয়ে
গেলেন। আমি জেগে রইলাম। মাঝে মাঝে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে; আমি
বলি— এই চোখবাবারা জেগে থাকো। তোমরা দু'জনই ভালো। দু'জনই
লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কণ।

স্লিপ ডিপ্রাইভেশন এক ধরনের ঘোর তৈরি করে। বাস্তব জগৎ বিড়ালের
সিমকার্ড খাওয়ার জগৎ হয়ে যায়। রিয়েলিটির সংশয় তৈরি হয়। যেমন
শেষ রাতে আমার কাছে মনে হল কেবিন্সে একটা অঙ্ক বিড়াল চুকেছে। সে
ছোটাছুটি করতে গিয়ে খাটের পায়ের সঙ্গে বাঢ়ি খাচ্ছে এবং মিউমিউ
করছে। কয়েকবার ঘনঘন চোখের পলক ফেলার পর বিড়াল অদৃশ্য হয়ে
গেল। তবে সমস্যার সমাধান ছিল না। তখন দেখলাম খাটে মাজেদা খালা
শুয়ে আছেন। পল্টু স্যার না।

আমি বললাম, ‘খালা, তুমি এখানে কেন?’

খালা বললেন, ‘তাতে তোর কোনো সমস্যা? আমি কী করব না করব
তা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার।’

‘তুমই তাহলে তোমার প্রভু?’

‘হেঁয়ালি কথা বক্ষ করবি?’

‘অঙ্ক বিড়ালটা দেখেছ, খালা?’

‘নাতো।’

‘তোমার মোবাইলটা সাবধানে রাখ। বিড়াল অঙ্ক হলেও দুষ্ট আছে।
মোবাইল খুলে তোমার সিমকার্ড খেয়ে ফেলবে।’

‘কী সর্বনাশ! আগে বলবি না! দুনিয়ার নান্দার আমার এই সিমকার্ডে।
এটা খেয়ে ফেললে আমার গতি কি হবে?’

স্লিপ ডিপ্রাইভেশনে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। ভোরবেলা ঘুমিয়ে
পড়লাম। ঘুমের মধ্যে বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। বাটি ভর্তি গরম দুখ নিয়ে
বসেছেন। পাউরটি দুধে চুবিয়ে চুবিয়ে থাচ্ছেন।

আমি বললাম, ‘কী খাচ্ছ বাবা?’

বাবা বললেন, ‘পাউরটি খাচ্ছি। শরীরটা গেছে। সহজপাচ্য খাবার
ছাড়া কিছু খেতে পারি না। অদল হয়।’

‘চোখ এ রকম পিটপিট করছ কেন? চোখে কি কোনো সমস্যা?’

‘চোখে দেখি না।’

‘কবে থেকে দেখি না?’

‘দিন তারিখ ডায়েরিতে নোট করে রাখি নাই।’

‘খুব সমস্যা হচ্ছে?’

‘না, খুব আরাম হচ্ছে। গাধা ছেলে।’

‘পরকালে মানুষ অঙ্গ হয় এটা জানতাম না। আমার ধারণা ছিল
পরকালে সবার চির যৌবন এবং...’

‘চুপ কর। কট কট করে কথা বলবিনো। শান্তিমতো নাস্তা খেতে দে।
খাটের উপর শুয়ে আছে এই বুড়া কেঁজ।

‘তুমিতো চোখে দেখি না। স্বুঝলে কি করে খাটে এক বুড়ো শুয়ে
আছে?’

‘অনুমানে বুঝেছি। এই বুড়োর সমস্যা কী?’

‘উনার সমস্যা কিউনি। দুটা কিউনি। দুটাই অচল। আচ্ছা বাবা
ভালো কথা এইসব ক্ষেত্রে মহাপুরুষদের ভূমিকা কী হবে? মহাপুরুষ কি
তৎক্ষণাত্ত নিজেরটা দিয়ে দেবেন?’

‘না।’

‘না কেন?’

‘মহাপুরুষদের জীবনের মূল্য অনেক বেশি। তাদেরকে বেঁচে থাকতে
হবে। ভালো খাওয়া-দাওয়া, শান্তির নিদ্রা তাদের প্রয়োজন।’

‘বাবা, তুমিতো একেক সময় একেক কথা বল।’

বাবা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, ‘ঠিকই ধরেছিস। অঙ্গ হবার পর থেকে
কথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেছে। যাই হোক, তুই শান্তিতে ঘুমো।
তিনবার বল ‘ঘুম শান্তি’ ‘ঘুম শান্তি’ ‘ঘুম শান্তি’ আরামের ঘুম হবে।’

আমি তিনবার ‘ঘূম শান্তি’ বললাম। সারাজীবন শুনেছি ‘ওম শান্তি’ এখন শুনছি ‘ঘূম শান্তি’। সমস্যা নেই, আমার ঘূম দিয়ে কথা। লাশকাটা ঘরের শান্তিময় জীবনানন্দ স্টাইলের নিদ্রা।

আমার ঘূম ভাঙ্গল এক বুড়োর কথাবার্তায়। পল্টু স্যারের সঙ্গে এই বুড়ো হশ্চিত্বির ভঙিতে কথা বলছে। গলা মিষ্টি। বিশেষ ভঙিতে কর্কশ করার চেষ্টা চলছে। কর্কশ হচ্ছে না। যে কথা বলছে সে সংগীতশিল্পী হলে নাম করত।

‘মেঝেতে শুয়ে ঘুমাচ্ছে এ কে? তোমার সার্ভেন্ট?’

‘কেয়ার টেকার। নাম হিমু।’

‘যে সার্ভেন্ট তাকে সার্ভেন্ট বলবে। কেয়ার টেকার আবার কী?’

‘সার্ভেন্ট শুনতে খারাপ লাগে।’

‘খারাপ লাগার কিছু নাই। যে যা তাকে তাই বলতে হবে। নয়তো এরা মাথায় উঠবে। এর নাম কী?’

‘হিমালয়।’

‘বা বা নামের তো বিরাট বাহার। নয়টা বাজে, এখনো শুয়ে ঘুমাচ্ছে—এই শোন, এই।’

আমি চোখ মেললাম। ঘূম আগেই ভেঙেছিল। এখন চোখ পিটপিট করছি। বুড়োকে দেখছি। সৌম্য চেহারা। দাঢ়ি আছে। পরেছেন নীল রঙের আচকান। হাতে বাহারী ছড়ি থাকার কারণে—নাটকের সম্মাট শাহজাহানের মতো লাগছে।

অদ্রলোক বললেন, ‘তোকে রাখা হয়েছে রুগ্নীর সেবা করার জন্য। আর তুই হা করে ঘুমাচ্ছিস।’

আমি বললাম, সরি।

‘খবরদার, আর কোনোদিন সরি বলবি না। চাকর-বাকরের মুখে ‘সরি’ থ্যাংক্যু এইসব মানায় না। আর শোন, তোকে হিমালয়, কাঞ্চনজঙ্গা এসব ডাকতে পারব না। এখন থেকে তোর নাম আবদুল। বুঝেছিস?’

‘বুঝেছি স্যার।’

‘আমি পল্টুর আপন চাচা।’

‘চাচা স্নামালিকুম।’

‘আমাকে চাচা ডাকবি না। তোর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা নাই। আমাকে ডাকবি স্যার।’

‘ইয়েস স্যার।’

‘চিকিৎসা করে ইয়েস স্যার বলবি না, তুই মিলিটারিতে চুক্স নাই।
বদপুলা।’

চাকরদের স্টাইলে অর্থহীন হাসি দিলাম। বাড়ির দামি কোনো কাচের
জিনিস ভাঙলে চাকর এবং বুয়ারা যে রকম হাসি দেয়। সেই হাসিতে লজ্জা
থাকে, অপ্রস্তুত ভাব থাকে। কঠিন হাসি।

বৃন্দ বললেন, ‘আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। রোগীকে তার বাসায় নামিয়ে
দিব। তুই হাসপাতালের অফিসে যা। রিলিজের বিষয়ে কি করতে হবে
ফৌজ নে।’

আমি ঘর থেকে বের হতে হতে শুনলাম পল্টু স্যার বললেন, ‘চাচা, তুই
তুই করে বলছেন কেন?’

বুড়ো খেঁকিয়ে উঠে বলল, ‘তুই করব নাতো কি আপনি আপনি করে
কোলে বসাব? পল্টু শোন, ছোট জাতকে ছোট জাতের মতো রাখতে হয়।
আদর দিলে লাফ দিয়ে মাথায় উঠে। মাথায় উঠেই ক্ষ্যান্ত হয় না। মাথায়
“হেগে” দেয়।’

‘মাথায় হেগে দিবে কেন?’

‘তাদের স্বভাব ‘হাগা’ এই জন্মে হাগবে।’

জটিল এই বৃন্দ সম্পর্কে পরের কয়েক দিন যা জানলাম তা হচ্ছে—

এই বৃন্দের নাম আবদুস সাত্তার। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। টিকাটুলিতে
তার চেম্বার। চেম্বারের নাম শেফা ক্লিনিক। নিচে লেখা ধন্বন্তরি হোমিও
চিকিৎসক, এ সাত্তার MC. MR. PL (ভাবল স্বর্ণপদক প্রাণ্ত)।

ধন্বন্তরি বানান ভুল। MC. MR. PL এ কি হয় তা জানা যায় নি।
আমি উনার ক্লিনিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি চশমার ফাঁক দিয়ে
অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘তুই চাকর, তুই থাকবি চাকরের মতো
তুই MC. র বুঝবি কী? আর তুই এখানে এসেছিস কেন? আমার চেম্বারে
তোর দরকার কী?’

‘স্যারের জন্যে ওষুধ নিতে এসেছি। উনার ঘুম কম হচ্ছে।
হোমিওপ্যাথিতে ঘুমের ওষুধ আছে?’

‘গাধার মতো কথা বলবি না। এমন ওষুধ আছে, এক ফোটা খাওয়ায়
দিলে হাতি সাত দিন ঘুমাবে।’

আমি মুখ শুকনা করে বললাম, ‘হাতিরা কি আপনার কাছ থেকে ওষুধ
নেয়?’

আব্দুস সাত্তার বেশ কিছুক্ষণ হতভব ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে
থেকে তাঁর এ্যাসিস্টেন্টকে বললেন, ‘এই গাধাটাকে কানে ধরে চেম্বার
থেকে বের করে দাও। আর কোনো দিন যদি দেখি এই বদটা আমার
চেম্বারে ঘূরঘূর করছে, তাহলে সবার চাকরি যাবে।’

আব্দুস সাত্তার সাহেবের সম্পর্কে আর যা জানলাম তা হল— তাঁর
একটাই ছেলে। ছেলের নাম সোহাগ। বয়স আঠারো-উনিশ, এলাকার
ক্যারাম চ্যাম্পিয়ন। প্রতি বোর্ড বিশ টাকা বাজিতে সারাদিন ক্যারাম খেলে।
সন্ধ্যার পর বাজি জেতা টাকায় ফেনসিডিল খেয়ে খিম ধরে থাকে। তার
ফেনসি বন্ধুদের নিয়ে হঠাত হঠাত ছেটখাট ছিনতাই করে। অদ্র ছিনতাই।
যেমন— কোনো বৃক্ষ সন্ধ্যার পর রিকশা করে বাড়ি ফিরছে। তখন সোহাগ
চেঁচিয়ে বলবে, ‘এই যে মুরুক্কী! আপনার কি যেন পড়ে গেছে।’ তখন
রিকশা থামে। বৃক্ষ কি পড়ে গেছে দেখার জন্যে পেছনে তাকান। সোহাগ
তখন একটা মানিব্যাগ হাতে এগিয়ে আসে। এবং অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে,
‘মুরুক্কী! এই মানিব্যাগটা পড়েছে। এইটা কি আপনার? ব্যাগ ভর্তি টাকা।’

বেশির ভাগ বৃক্ষরাই বলে, ‘হ্যাঁ বাবা, আমার। আল্লাহ তোমার ভালো
করুক।’

‘মানিব্যাগে কত টাকা আছে বলতে পারেন?’

‘বাবা, গনা নাই।’

‘বুড়ামিয়া! দুই দিন পরে কবরে যাবেন—লোভ আছে ষেল আনা।
অন্যের ব্যাগ বলতেছেন নিজের।’

‘বাবা, ভুল হয়েছে। অন্ধকারে বুঝি নাই। আমার মানিব্যাগ পকেটেই
আছে।’

‘দেখি। পকেটের মানিব্যাগ দেখি।’

এর মধ্যে দলের বাকিরা এসে রিকশা ঘিরে দাঁড়ায়। একজনের হাতে
সুন্দর কাজ করা রাজস্থানী ছুরি। এই ছুরির বিশেষত্ব হচ্ছে এমিতে দেখলে
মনে হবে লতা ফুল আঁকা ছয় ইঞ্চি ধাতুর ক্ষেল। বোতাম টিপলেই খটাস
শব্দে ছুরি বের হয়ে আসে। ছুরির মাথা বকের ঠোঁটের মতো সামান্য বাঁকা।

বৃক্ষ খটাস শব্দে ছুরি বের হওয়া দেখে। ততক্ষণে তার আকেল উড়ুম
হয়ে গেছে।

‘মুরুক্কী মানিব্যাগটা দিয়ে কানে ধরে বসে থাকেন। মিথ্যা বলার শাস্তি। আমরা দূর থেকে লক্ষ রাখব। কান থেকে হাত সরালেই এই ছুরি পেটে হান্দায়া দেব।’

বিশেষ একটা জায়গা (জিয়ার মাজারের দক্ষিণ পাশে) অনেককেই কানে ধরে যেতে দেখা যায়। মিউনিসিপ্যালিটির লোকজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে—এই জায়গায় স্ট্রিট লাইট সব সময় নষ্ট থাকে।

এত কিছু জানলাম কীভাবে? একটু পরে বলি? আগে তরঞ্জী মেয়েদের কাছ থেকে গয়না এবং ব্যাগ কীভাবে নেয়া হয় এটা বলি। মনে করা যাক কোনো এক তরঞ্জী রিকশা করে যাচ্ছে। জায়গাটা অঙ্ককার দেখে তরঞ্জী খানিকটা ভীত। হঠাৎ সে দেখবে এক যুবক (সোহাগ) এগিয়ে আসছে এবং ব্যাকুল গলায় বলছে, ‘আপু, এক সেকেন্ড দাঁড়ান। প্রিজ আপু! প্রিজ!’ মেয়ে কিছু বলার আগেই রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে দেয়। সোহাগ এগিয়ে আসে। হাত কচলাতে কচলাতে বলে, ‘বন্ধুর সঙ্গে একটা বাজি ধরেছি। বাজি জিতলে এক হাজার টাকা পাই। আপু, আপনার পায়ে ধরি—help me.’

তরঞ্জী তখন বলে, ‘কী বাজি?’

‘আপনাকে চুমু খাব, আপনি কিছুই বলবেন না। এই বাজি। আপু, আমি দাঁত ক্লোজআপ টুথপেস্ট দিয়ে মেজে এসেছি— কোনো সমস্যা নেই।’

রিকশাওয়ালা ভাই, তুমি অন্য দিকে তাকাও। তুমি থাকায় আপু লজ্জা পাচ্ছে। আপু ঐ যে দেখুন আমার বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে বাজির ফলাফল দেখার জন্য। ওদেরকে বলে দিয়েছি যেন মোবাইল দিয়ে ছবি না তোলে। কেউ যদি ছবি তোলে তাহলে ভুড়ির মধ্যে ছুরি চুকায়ে দিব। এই দেখেন ছুরি।’ খটাশ শব্দ হয়। ফলার ভেতর থেকে রাজস্থানী ছুরি বের হয়ে আসে।

চুমুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে তরঞ্জী সঙ্গে যা আছে সবই দিয়ে দেয়। হাত ব্যাগ, ঘড়ি, গলায় চেইন, ইমিটেশন গয়না। কিছুই নিজের কাছে রাখে না। ছিনতাই দলের প্রধান তখন অতি ভদ্র ভঙ্গিতে বলে—‘সব কেন দিয়ে দেবেন আপু! রিকশা ভাড়া দিতে হবে না? বিশটা টাকা রাখুন, আপু। এই রিকশাওয়ালা! আপুকে সাবধানে নিয়ে যাও। অঙ্ককার জায়গা এ্যাভয়েড করবে। দিনকাল খারাপ।’

ঘটনা যা বললাম সবই পত্রিকায় প্রকাশিত। ছিনতাইকারী দলের প্রধান ক্যারাম চ্যাম্পিয়ন সোহাগ যে পল্টু স্যারের আপন চাচাতো ভাই সেটা কীভাবে জানলাম বলি—

হাসপাতাল থেকে ফেরার দ্বিতীয় দিনে সঙ্গ্যায় পল্টু স্যার অস্থির হয়ে পড়লেন, নতুন বই কিনবেন। ড্রাইভারকে ডেকে বললেন, ‘গাড়ি বের কর।’

ড্রাইভার বলল, ‘স্যার, গাড়িতো বসে গেছে।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘গাড়ি বসে গেছে মানে কী? গাড়িতো বসেই থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে না।’

‘ব্যাটারি বসে গেছে, স্যার। নতুন ব্যাটারি কিনতে হবে।’

‘দুই মাস আগে না ব্যাটারি কিনলে?’

‘ব্যাটারী হল লাকের ব্যাপার। কোনো ব্যাটারি দুই দিনেই শেষ হয় আবার কোনোটা দুই বছর চলে। ঠিক না হিমু ভাই?’

বলেই ড্রাইভার আমাকে চোখ টিপ দিল। বাধ্য হয়ে আমাকেও চোখ টিপ দিয়ে টিপ ফেরত দিতে হল।

সে আমার সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ যেতে চাচ্ছে। কাজের লোক, বুয়া, মালী, ড্রাইভার, দারোয়ান এদের মন্দুলের বৌঁটা হয়ে থাকাই নিয়ম। একজনের অপরাধ সবার অপরাধ

ড্রাইভার বলল, ‘পাঁচ হাজার টাকা দেন স্যার, নতুন ব্যাটারি নিয়ে আসি। তবে আজ গাড়ি বের করতে পারবেন না।’

পল্টু স্যার ড্রাইভারকে ব্যাটারির টাকা দিয়ে আমাকে নিয়ে বই কিনতে বের হলেন। আমরা রিকশা করে যাচ্ছি—যথাসময়ে এবং যথাজায়গায় একজন টাকা ভর্তি মানিব্যাগ নিয়ে ছুটে এল এবং চেঁচাতে লাগলো ‘মুরুক্কি, এই মানিব্যাগ কি আপনার?’ পল্টু স্যার বললেন, ‘কে? সোহাগ না? কেমন আছ?’

যুবক চোখ মুখ কুঁচকে ফেলে বলল, ‘ভালো আছি পল্টু ভাইজান।’

পল্টু স্যার বলল, ‘এই মানিব্যাগ আমার না। আমারটা পকেটেই আছে। মনে হয় অন্য কারোর।’

আমি বললাম, ‘ভাই, মানিব্যাগটা আমার। পকেট থেকে পড়ে গেছে খেয়াল করি নাই।’

সোহাগের বকুরা এগিয়ে আসছিল। সোহাগের ইশারায় তারা পিছনে সরে গেল।

সোহাগ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনার যে মানিব্যাগ তার
প্রমাণ কী? এখানে কত টাকা আছে বলতে পারবেন?’

আমি বললাম, ‘এখানে আছে উনিশশ’ দশ টাকা। ভাই, আপনি গুনে
দেখেন।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘দেখি, আমি গুনে দেই। টাকা গুনতে আমার
ভালো লাগে। বইয়ের পাতা উল্টাতে যেমন ভালো লাগে, টাকা গুনতেও
ভালো লাগে। টাকা গুনার সময় মনে হয় বই-এর পাতা উল্টাচ্ছি।

টাকা গুনে দেখা গেল উনিশশ দশ টাকাই আছে। কাকতালীয় ব্যাপার
ছাড়া কিছুই না। সবার জীবনেই কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে। আমার বেলায়
একটু বেশি বেশি ঘটে।

সোহাগকে হতভুব অবস্থায় রেখে আমরা চলে এলাম। পল্টু স্যার
বললেন, ‘আমার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি এই ছেলের পাওয়ার কথা। আমার
কোনো ওয়ারিশ নাই।’

আমি বললাম, ‘স্যার, আপনার কি অনেক টাকা-পয়সা?’

পল্টু স্যার বললেন, ‘ইঁ।’

আমি বললাম, ‘এত টাকা কীভাবে করেছেন?’

পল্টু স্যার বললেন, ‘আমি কৰব কীভাবে? আমার বাবা করেছেন।
ব্যবসা করতেন। কিসের ব্যবসা কিছুই জানি না। তাঁর কথা ছিল যেদিন
বিশ কোটি টাকার সম্পদ হবে সেদিন তিনি তওবা করে টাকা রোজগার বন্ধ
করবেন।’

‘তওবা করার সুযোগ কি পেয়েছিলেন স্যার?’

‘না। যেদিন তওবা করার কথা ছিল সেদিন সকাল বেলায় নাস্তা খাবার
সময় মাংসের টুকরা গলায় আটকে গেল। আমি তখন তাঁর সামনে বসে
নাস্তা খাচ্ছিলাম। আমি বুঝতেই পারি নাই বাবা মারা যাচ্ছেন। আমি ভাবছি
বাবা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? তারপরেই—
‘ধূম!’

‘ধূম কী?’

‘ধূম করে উনার মাথাটা টেবিলে পড়ে গেল। তুমি আবার ভেবো না
মাথা খুলে টেবিলে পড়ে গেছে। উনাকে সহ-ই পড়েছে। মাথা টেবিলে
লেগে ধূম শব্দ হয়েছে।’

‘ও আচ্ছা।’

পল্টু স্যার কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বললেন—‘ধূম বলা ঠিক হয় নাই। বলা উচিত ধূম ঝনঝন। ধূম করে মাথাটা টেবিলে লাগল। টেবিলে পানির যে গ্লাস ছিল সেটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে শব্দ হল ঝনঝন। কাজেই ধূম ঝনঝন।’

আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে আছি। বাবার মৃত্যু যে কারো কাছে ধূম ঝনঝন হতে পারে তা আমার ধারণাতে নেই। একজন সর্ববিষয়ে নির্বিকার মানুষ এ ধরনের কথা বলতে পারে! উনি কি মহাপুরুষদের মতো চরম নিরাসক্তদের একজন। মহাপুরুষ সম্পর্কে আমার বাবার ধ্যান-ধারণা এ রকমই। মহাপুরুষদের নানা লক্ষণ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

আসক্তি

চরম আসক্তির অন্য নাম নিরাসক্তি। মহাপুরুষরা সর্ববিষয়ে যে নিরাসক্তি দেখাইয়া থাকেন তাহা চরম আসক্তিরই অন্য পরিচয়। তোমাকে উদাহরণ দিয়া বুঝাই—মনে কর এক লোকের মদ্যপানের কিছু নেশা আছে। সেই ব্যক্তি মাঝে মধ্যে কিছু মদ্যপান করিবে। তাহার জন্যে নানান আয়োজন করিবে। মদ্যপানের সময় চাটের ব্যবস্থা, সংগীত শ্রবণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই লোকই যখন মদ্যপানে চরম আসক্তি দেখাইবে তখন সে শুভ্যখানায় উপস্থিত হইবে—তখন তাহার চাটের প্রয়োজন নাই, সংগীতেরও প্রয়োজন নাই। মদ্য হইলেই হইল। এই আসক্তি আরো বাড়িলে মদ্য পানেরও প্রয়োজন ফুরাইবে। নেশার বস্তু থাকিবে কিন্তু নেশা থাকিবে না।

একগাদা বই কিনে বাসায় ফিরে দেখি ড্রাইভারের ঘরের সামনের বেঞ্চিতে সোহাগ বসে আছে। হাতে সিগারেট।

পল্টু স্যারকে দেখে সে সিগারেট লুকানোর চেষ্টা করল। স্যার তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। হাত ভর্তি বই নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন। এক্ষুণি তাকে বই পড়া শুরু করতে হবে। খেজুরে আলাপের সময় নেই।

ড্রাইভার চাপা গলায় ডাকল, ‘হিমু ভাই, শুনে যান। আপনার সঙ্গে কথা আছে। সোহাগ ভাইজান কী জানি বলবে। আপনি উনারে চিনেনতো?’

আমি বললাম, ‘দেখা হয়েছে। ওস্তাদ মানুষ।’

সোহাগ সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে বলল, ‘যে দেখা হয়েছে, সেই দেখা কোনো দেখাই না। তোমার সঙ্গে আসল দেখা বাকি আছে।’

আমি বললাম, ‘আসল দেখা কখন হবে? রোজ হাশরের যয়দানে?’

‘রোজ হাশর আমি তোমারে দেখায়ে দিব। মানিব্যাগ আন।’

‘মানিব্যাগতো জমা দিয়ে দিয়েছি।’

‘কোথায় জমা দিয়েছ?’

‘গুলশান থানার ওসি সাহেবের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছি। উনি যেন আসল মালিককে ফেরত দেন।’

‘আমাকে গুলশান থানা চিনাও? চল আমার সঙ্গে থানায়। ব্যাগ রিলিজ করে নিয়ে আস।’

ড্রাইভার আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, ‘মানিব্যাগ দিয়ে দেন হিমু ভাই। এই লোক কিন্তু ডেনজার।’

আমি সোহাগের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘ভাইজান, আপনি না-কি ডেনজার?’

সোহাগ বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘প্রমাণ চাস? তুই প্রমাণ চাস (সে যে ডেনজার এটা প্রমাণ করার জন্যেই বোধ হয় তুই তুই করে বলছে। তবে একটা হাতু পকেটে ঢুকেছে। মনে হচ্ছে রাজস্থানী বস্তু বের হবে)।

‘কি, কথা বলস না কেন, প্রমাণ চাস?’

আমি বললাম, ‘প্রমাণ সবাই চায়। পাকিস্তানি মিলিটারি প্রমাণ চেয়েছে। হিন্দু না মুসলমান এই প্রমাণ। অনেককেই লুঙ্গি খুলে যন্ত্রপাতি দেখাতে হয়েছে।’

ড্রাইভার ভীত গলায় বলল, ‘ভাইজান, এইখানে কিছু করবেন না। যা করার বাইরে নিয়া করেন।’

সোহাগ রাজস্থানী ছুরির বোতাম টিপে যাচ্ছে—জিনিস বের হচ্ছে না। আমি বললাম, ‘নষ্ট হয়ে গেছে না-কি?’

সোহাগ আগুন চোখে তাকাল। আমি বললাম, ‘নষ্ট জিনিস পকেটে রাখা ঠিক না। তারপর আবার করেছেন টিপাটিপি। এই জিনিস পকেটে রাখবেন, হঠাৎ আপনা আপনি খুলে যাবে—পুট করে আপনার বিচি একটা খুলে পড়ে যাবে। তখন সবাই আপনাকে ডাকবে এক বিচির সোহাগ।’

ড্রাইভার মহাচিত্তিত গলায় বলল, ‘হিমু ভাই, এইসব কী বলেন? আপনি কারে কী বলতেছেন নিজেও জানেন না।’

সোহাগ বলল, ‘জানবে। চবিশ ঘণ্টার মধ্যে জানবে। যদি না জানে আমি পিতা-মাতার সন্তান না। আমি জারজ সন্তান।’

ড্রাইভার সোহাগের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে ঝামেলা চায় না। গাড়ির তেল, ব্যাটারি, টায়ার এসব মাঝে মাঝে চূরি করে সে জীবনটা পার করে দিতে চায়।

ঘরে চুকে দেখি পল্টু স্যার বই নিয়ে বসে গেছেন। তাঁর মুখ প্রশান্ত। যে লেখক এই বইটি লিখেছেন তিনি দৃশ্যটা দেখলে আরাম পেতেন। অবশ্যই তাঁর কাছে মনে হতো তাঁর লেখক জীবন সার্থক।

‘স্যার, চা বা কফি কিছু লাগবে?’

‘না।’

‘লেবুর সরবত করে দেব? ক্লান্তি দূর হবে।’

‘তাহলে করে দাও।’

রান্নাঘরে চুকে দেখি লেবু নেই। আমি স্যারকে বললাম, ‘স্যার ঘরে লেবু নেই। লেবু ছাড়া লেবুর সরবত করে দেব?’

‘দাও। লেবুর সরবত দিয়ে চেষ্টা করতে থাক লকারটা খুলতে পার কিনা। রিং ঘুরাতে থাক। এক সময় না এক সময় খুলবেই। সাতটা মাত্র সংখ্যা। আমার ধারণা অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু লকারে আছে। কী আছে মনে করতে পারছি না।’

আমি লকারের রিং ঘুরাচ্ছি। শুরু করেছি ০ দিয়ে—

০০০০০০০

০০০০০০১

০০০০০১১

০০০০১১১

এতো দেখি ভয়াবহ ব্যাপার। মোট কতবার ঘুরালে একবার না একবার বিশেষ সংখ্যাটা চলে আসবে তাই বা কে জানে।

বাদলকে জিজ্ঞেস করলে পাওয়া যাবে। অঙ্ক তার কাছে ছেলেখেলা।

আমি রিং ঘুরিয়েই যাচ্ছি।

ରାନୁ ଟାକା ନିଯେ ଏସେହେ । ସବଟା ଆନତେ ପାରେନି, ଏକ ହାଜାର ତିନଶ ଟାକା ଏନେହେ । ଟାକାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ଲାସ୍ଟିକେର ଦୁଟା ଆଇସକ୍ରିମେର ବାଟି । ଏକଟା ବାଟିତେ ମୋରଗ-ପୋଲାଓ, ଅନ୍ୟ ବାଟିତେ ଫିରନୀ । ଦୁଟାଇ ସେ ନିଜେ ରାନ୍ନା କରେଛେ । ଆମାର ଧାରଣା ଐ ଦିନେର ଖାବାରଟା ଫେରତ ଦିତେ ଚାଚେ । ମନେ ହଚ୍ଛ ଏହି ମେଯେ ଝଣ ରେଖେ ମରେ ଯାଓୟା ଟାଇପ ନା ।

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ଆପନି ଏହି ବାଡ଼ିର କେ ବଲୁନତୋ । ଆମି ଦାରୋଯାନକେ ବଲାମ, “ହିୟୁ ସାହେବେର ଫ୍ଲ୍ୟାଟେ ଯାବ ।” ଦାରୋଯାନ ଚେନେ ନା ।’

‘ଆମି ଏହି ବାଡ଼ିର ଚାକର । ଅନ୍ତର ଭାଷାଯ ଗୃହଭୂତ୍ୟ । “ବାବୁ କହିଲେନ, ବୁଝେଛ ଉପେନ” ଟାଇପ । ଆମାକେ ଚେନାର କଥା ନା । ଚାକରେର ପରିଚଯେ ଫ୍ଲ୍ୟାଟେର ପରିଚଯ ନା ।’

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ଆପନି କେନ ସବ ସମୟ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଏହି ଭାବେ କଥା ବଲେନ? ଏମେ ବୁଡ଼ୋ ମାନୁଷଟା ଇଜିଚେୟାରେ ବସେ ବଇ ପଡ଼ିଛେ, ତିନି ଆପନାର କେ ହନ?’

‘ମୁନିବ ହନ । ଉନି ମୁନିବ, ଆମି ଭୃତ୍ୟ ।’

‘ଅସମ୍ଭବ । ଉନି ଆପନାର ବାବା । ଆମି ଚେହରା ଦେଖେଇ ବୁଝେଛି ।’

କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ଘାୟୁଶ୍ଵରିଯେ ତାକାଲେନ । ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଭଙ୍ଗିତେ ବଲଲେନ, ‘ହିୟୁ, ବାବୁଇ ପାଖି ତାଙ୍କୁମାତ୍ର ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ ବାସା ବାଁଧେ ନା?’

‘ଜି ନା, ସ୍ୟାର ।’

‘ଯଦି ସବ ତାଲଗାଛ କେଟେ ଫେଲା ହ୍ୟ, ତଥନ ଓରା କୋଥାଯ ବାସା ବାଁଧବେ?’

‘ଓରା ଏକଟା ସମସ୍ୟା ତୋ ପଡ଼ିବେଇ । ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଗାଛେ ଟ୍ରାଇ କରବେ ।’

‘କୋନ ଗାଛ?’

‘ଆମାର ଧାରଣା, ସୁପାରି ଗାଛେ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା କରବେ ।’

ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ଚିନ୍ତିତ ଭଙ୍ଗିତେ ବଲଲେନ, ‘ଜିନିସଟା ଅଜ୍ଞତ ନା? ବାବୁଇ ପାଖିଦେର ତାଲଗାଛେଇ ବାସା ବାଁଧିତେ ହବେ? ଗଭୀର କୋନୋ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏର ମଧ୍ୟେ ଆଛେ ।’

‘ଚିନ୍ତାର ବିଷୟତୋ ଆଛେଇ ।’

‘ଐ ମେଯେ କେ?’

‘ସ୍ୟାର, ଆମାଦେର ବାବୁର୍ଚି ।’

ପଲ୍ଟୁ ସ୍ୟାର ଖୁବଇ ଅବାକ ହେଁ ବଲଲେନ, ‘ଆମାଦେର ବାବୁର୍ଚି ଆଛେ, ଜାନତାମ ନାତୋ! ନିଜେଦେର ବାବୁର୍ଚି ଆଛେ, ଅଥଚ ଆମରା ହୋଟେଲ ଥିକେ ଖାବାର ଏନେ ଖାଚିଛ କେନ?’

আমি বললাম, ‘আজই এপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। সে তার রান্নার স্যাম্পলও নিয়ে এসেছে। দুপুরে আপনাকে খেতে দেব। মোরগ-পোলাও আর ফিরনী। খেয়ে যদি আপনার পছন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পারমানেন্ট।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘এক বেলার রান্না খেয়ে তার রক্ষনশৈলী বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।’

আমি বললাম, ‘তাহলে এক সপ্তাহ রাঁধুক এক সপ্তাহ পরে বিবেচনা করা হবে।’

‘মেয়েটার নাম কী?’

‘স্যার, আপনিই জিজ্ঞেস করছন।’

আমি রানুর দিকে তাকালাম। সে আমাদের কথাবার্তায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। অতি বুদ্ধিমতীরাও বিভ্রান্ত হবে। পল্টু স্যার হাতের বই বক্ষ করে ঢেকের চশমা ঠিক করলেন। চশমা ঠিক করা মানে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা। পল্টু স্যার গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় এই রহজাটা করেন।

‘নাম কী বল।’

‘রানু।’

‘রান্না কোথায় শিখেছে?’

‘মা’র কাছে শিখেছি।’

‘মনে কর তুমি কৈ মাছের ঝোল রান্না করছ। সাধারণ লবণ দিয়ে রান্না করলে যে স্বাদ হবে, বিট লবণ দিয়ে রান্না করলেও কি একই স্বাদ হবে?’

‘বিট লবণ দিয়ে যে মাছের ঝোল রান্না করা যায় এটাই আমি জানি না।’

‘কোন রান্নাটা তুমি ভালো পার।’

‘ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল।’

পল্টু স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হিমু, চট করে একটা ইলিশ মাছ নিয়ে এসো। আমারো হঠাতে কেন জানি ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল খেতে ইচ্ছা করছে। বাবুটির চাকরি পার্মানেন্ট হবে কি-না তা ইলিশ মাছের ডিম রান্নার উপর নির্ভর করবে।’

রানুর হতভম্ব ভাব জ্ঞানেই বাঢ়ছে। এক সময় সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। কঠিন গলায় বলল, ‘একটা ভুল হচ্ছে। আমি বাবুটির কাজের জন্যে

এ বাড়িতে আসি নি। আমাকে এসব কেন বলছেন? আমাকে দেখে কি বাবুর্চির মতো লাগছে?’

পল্টু স্যার আমার দিকে সাহায্যের জন্যে তাকালেন। রানুর কথায় তিনিও খানিকটা হকচিয়ে গেলেন। আমি বললাম, ‘রানু শোন, আয়া বা বাবুর্চি এরা দেখতে আলাদা হয় না। এদের কোনো আলাদা পোশাকও নেই। এবং সত্যি কথা বলতে কি তোমার ভাবভঙ্গির মধ্যে কিছু বাবুর্চি ভাব অবশ্যই আছে।’

পল্টু স্যার ভরসা পেয়ে বললেন, ‘অবশ্যই অবশ্যই। খুবই সত্যি কথা। কথাবার্তা বুয়া টাইপ। ঝগড়া ঝগড়া ভাব।’

আমি বললাম, ‘তারপরেও তোমাকে বাবুর্চির চাকরি অফার করায় তোমার যদি সম্মান হানি হয়ে থাকে, তাহলে আমি এবং স্যার আমরা দু’জনই দৃঢ়বিত।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘হ্যাঁ দৃঢ়বিত। তবে বাবুর্চির কাজের মধ্যে কোনো অসম্মান নেই। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বাবুর্চি ছিলেন যেমন এরিস্টটল, লিওনার্দো দ্য বিঞ্চি।’

রানু বলল, ‘উনারা বাবুর্চি ছিলেন?’

পল্টু স্যার বললেন, ‘অবশ্যই। নিজেরা নিজেদের খাবার রান্না করে খেতেন। এখন তুমি বল, বেতন কত চাও?’

রানু বলল, ‘বেতন কত চাই মানে কী?’

‘তুমি নিশ্চয়ই বেতন ছাড়া কাজ করবে না। আর আমার পক্ষেও আকাশ-পাতাল বেতন দিয়ে বাবুর্চি রাখা সম্ভব না। লকার খোলা যাচ্ছে না।’

রানু বলল, ‘আমরা একই কথাবার্তায় ঘুরাফিরি করছি। হয় আপনি কনফিউজড নয়ত আমি কনফিউজড। আমি এখন চলে যাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না। স্নামালিকুম।’

পল্টু স্যার সালামের জবাব না দিয়ে বইয়ে মন দিলেন। পাতা উল্টে বইয়ের দিকে ঝুঁকে এলেন। তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল। রানু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমি কি আপনার সঙ্গে আলাদা এক মিনিট কথা বলতে পারি? আড়ালে?’

আমি বললাম, ‘আড়ালে যাবার দরকার নেই। এখানেই কথা বলতে পার। স্যার বই পড়া শুরু করেছেন, এখন কোনো কিছুই তাঁর মাথায় চুকবে

না। তাঁকে “এই ছাগলা, বই পাগলা” বলে গালিও দিতে পার। তিনি কিছুই
বুঝবেন না।’

রানু কঠিন গলায় বলল, ‘আপনি দয়া করে অন্য ঘরে আসুন! প্রিজ!’

আমি রানুকে নিয়ে রান্নাঘরে গেলাম। এই বাড়িতে শুধুমাত্র রান্নাঘরেই
দুটা প্লাস্টিকের টুল আছে। পিঁড়ির আধুনিক সংস্করণ। রানুকে বসতে
বললাম, সে বসল না। থমথমে গলায় বলল, ‘আপনি কি সত্যিই উনার
সার্ভেন্ট? চাকর বলতে লজ্জা লাগছে বলে সার্ভেন্ট বলছি।’

আমি বললাম, ‘সরাসরি চাকর বলতে পার। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।
ভৃত্যকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত লাইন আছে—
“আমি তব মালখের হব মালাকর।” মালাকর ব্যাটা চাকর ছাড়া কিছু না।’

‘হাই লেভেলের কথা বঙ্গ করে সরল করে বলুন ঘটনা কী? আপনি
চাকর হবেন কেন?’

‘আমি একটা জরুরি মিশন নিয়ে এখানে কাজ করছি।’

‘কী মিশন?’

‘পল্ট স্যার বহু টাকার মালিক। বিশ কোটি টাকার বেশিতো বটেই।
উনি মারা গেলেই সোহাগ নামের একজন পুরো সম্পত্তির মালিক হবে।
আমার মিশন হচ্ছে উনি যাতে দ্রুত মারা যান, সেই ব্যবস্থা করা।’

‘তার মানে?’

‘ভদ্রলোকের সময় ঘনিয়েছে। দুটা কিউনিই নষ্ট। আমাকে দেখতে
হবে তিনি যেন কিউনি ট্রান্সপ্লান্টে রাজি না হন। বুঝতে পারছ?’

‘না।’

আমি গলা নামিয়ে বললাম, ‘আমি এ বাড়িতে ঢুকেছি তাঁকে কিউনি
দেব এই অজুহাতে। এখন তার ধারে-কাছে যাচ্ছি না। স্যারের শরীর দ্রুত
খারাপ হচ্ছে। পরিকল্পনা মতো সব এগুচ্ছে।’

রানু বলল, ‘আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাকে এই গোপন
কথাগুলো কেন বলছেন?’

‘তোমাকে বলছি, কারণ তুমিও এই পরিকল্পনার অংশ।’

রানু প্রায় চিৎকার করে বলল, ‘আমি কী করে এই পরিকল্পনার অংশ
হব?’

‘মাজেন্দা খালা তোমাকে কিউনি দেবার জন্যে ফিট করেছে। ঠিক বলছি
না?’

রানু হতভম্ব গলায় বলল, ‘সেই কিডনি কি উনার জন্যে?’

‘অবশ্যই। তোমাকে কি করতে হবে শোন—বুড়োটাকে নানান কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কিডনি ট্রাঙ্গপ্লান্টটা দেরি করাবে। যেন দ্রুত কর্ম কাবার হয়ে যায়। সোহাগ ভাইজান বগল বাজাতে পারেন।’

রানু বলল, ‘আপনি অতি ভয়ঙ্কর মানুষ। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম। আমার উচিত সব কিছু পুলিশে জানানো।’

‘ভুলেও এই কাজ করবে না। পুলিশও আমাদের কেন। সবচে সহজ পণ্য হল মানুষ। মানুষ কেনা কোনো সমস্যাই না। মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সহজে কেনা যায় বুদ্ধিজীবীদের। তাঁরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন কখন বিক্রি হবেন।’

‘বকবকান্টা বক করবেন?’

‘করলাম।’

‘আমি এখন চলে যাব। তবে ভাববেন না আমি সহজ মেয়ে। একটা মানুষকে খুন করবেন আর আমি সব জেনেত্বেও চুপ করে থাকব?’

‘খুনতো করছি না। নেচারের উপর ভিত্তি করছি। নেচার তার কোর্সে চলবে। যথা সময়ে পল্টু স্যার বই পড়তে পড়তে পটল তুলবেন। উনার জন্যেও ভালো। বই পড়তে পড়তে খুব কম মানুষই মারা যায়। শুধু একজনকে পাওয়া গেছে যিনি বই পড়া শেষ করে লাইব্রেরি থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পা পিছলে মারা গেছেন। মোঘল বাদশা হুমায়ুন।’

রানু বলল, ‘আপনার প্রতিটি কথাই অসহ্য লাগছে। আমি কি আরেকবার উনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?’

আমি বললাম, কী কথা বলবে?

‘উনাকে জিজ্ঞেস করে জানব আপনি যা বললেন সেটা সত্য কি-না।’

‘কীভাবে জানবে? সরাসরি জিজ্ঞেস করবে? আমাকে ফাঁসাবে?’

‘আপনার ভয় নেই, সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করব না। আমি বোকা মেয়ে না।’

রানুকে আবার পল্টু স্যারের কাছে নিয়ে গেলাম। পল্টু স্যার বই থেকে মুখ তুলে আনন্দিত গলায় বললেন, ‘তোমার বেতন কত ঠিক হয়েছে?’

রানু বলল, ‘স্যার, আমিতো আগেই বলেছি, আমি বাবুটির কাজ করব না। আমি শুধু আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে এসেছি।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। দেখছ না বই
পড়ছি?’

‘স্যার ছেটি প্রশ্ন, হিমু নামের এই মানুষটা কি আপনাকে কিউনি
ট্রান্সপ্লান্ট করতে নিষেধ করছে?’

‘হ্যাঁ করেছে। এবং তার কথা আমার কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে
হচ্ছে। কেন আমি অন্য একজনের শরীরের অংশ নিয়ে বেঁচে থাকব? যার
কিউনি নিলাম তার থাকবে একটা মাত্র কিউনি। সেটা নষ্ট হয়ে গেলে
বেচারার গতি কী হবে?’

রানু বলল, ‘স্যার, আমি যাই। স্লামালিকুম। একটাই অনুরোধ,
আপনার কাজের লোকের কথায় আপনি বিভ্রান্ত হবেন না। আপনাকে বেঁচে
থাকতে হবে।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘কেন? আমিতো সোসাইটিতে কোনো কিছু
Contribute করতে পারছি না। শুধু বই পড়ছি। আমার বেঁচে থাকা মানে
দরিদ্র দেশের কিছু খাবার নষ্ট করা। বাতাস থেকে কিছু অঙ্গিজেন নিয়ে প্রিন
হাউস এফেক্টকে আগিয়ে নেয়া।’

‘এসব যুক্তি কি আপনার এ লোক জ্ঞাপনাকে বুঝিয়েছে?’

‘হ্যাঁ। তার যুক্তি খুবই ভালো। এখন তুমি যাও—বই পড়ছিতো! বই
পড়ার সময় ফালতু কথাবার্তা খুবই অসহ্য লাগে।’

রানু বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দ্রুত ঘর থেকে বের
হয়ে গেল। যে দৃষ্টি সে আমাকে দিল ইংরেজিতে তাকে বলে Ash Look,
বাংলায় ভস্ম দৃষ্টি। মুনী-ঝিঁঝিদের টাইমে তারা এই দৃষ্টি দিয়ে দুষ্ট লোক
ভস্ম বানিয়ে ফেলতেন। সেই ভস্ম গায়ে মেঝে সাধনায় বসতেন। ভস্ম নষ্ট
হতো না। কাজে লাগতো।

রানু যাবার ঘণ্টা খানিকের মধ্যে বাদল এসে উপস্থিত। দরজা খুলতেই
সে ঢুকল। কিছুক্ষণ পল্টু স্যারকে জুলজুল চোখে দেখল, তারপর নিচু গলায়
বলল, ‘হিমুদা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কারো একজনের চেহারার মিল
পাচ্ছি। কে বলতো!’

আমি বললাম, ‘ফিসফিস করে কথা বলতে হবে না। উনি যখন পড়ায়
ব্যস্ত থাকেন তখন বাড়ির ছাদে এটম বোমা ফাটলেও উনি ঠিকমতো শুনতে
পান না। ভাবেন, বেলুন ফেটেছে। এই সিন্ড্রমের নাম পাঠ বধির সিন্ড্রম।

‘কার চেহারার সঙ্গে মিল সেটা বল।’

‘দু’জনের চেহারার সঙ্গে খুব মিল একজন হচ্ছে আরব্য রাজনীর
বুড়েটা। যে ঘাড়ে চেপে থাকে, ঘাড় থেকে নামে না।’

‘ঠিক বলেছতো।’

‘আবার উনি যখন বই পড়া বন্ধ করে মাথা তুলে তাকান তখন তাঁকে
খানিকটা টেকো মাথা আইনস্টাইনের মতো লাগে।’

বাদল বলল, ‘হিমুদা, দু’দিন যদি তোমার সঙ্গে থাকি তাহলে কোনো
সমস্যা আছে? ইউনিভার্সিটি বন্ধ। বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। অনেকদিন
তোমার সঙ্গে দেখাও হয় না। থাকব দু’দিন?’

‘থাক।’

‘রাতে ঘুমাব কোথায়?’

‘মেঝেতে ঘুমাবি। চাকর-বাকরের আত্মীয়-স্বজন এলে কোথায় ঘুমায়?
মেঝেতে ঘুমায়। চাকরের আত্মীয় হিসেবে দু’দিন থাক—ভালো লাগতে
পারে।’

বাদল চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, ‘ভেরি ইন্টারেস্টিং আইডিয়া।
ভদ্রলোক কী পড়ছেন?’

‘এখন একটা উপন্যাস পড়ছেন। দেড়শ পৃষ্ঠার উপন্যাস। আমি সেই
উপন্যাসের পাতা ব্রেড দিয়ে কেটে সন্তুর পৃষ্ঠা করে দিয়েছি। একটা পাতার
পরেই তারপরের পাতা মিসিঃ দেখতে চাচ্ছি উনি ব্যাপারটা ধরতে পারেন
কিনা।’

‘ধরতে পারছেন?’

‘না। উনি খুব অগ্রহ নিয়ে উপন্যাসটা পড়ছেন। প্রায় শেষ করে
ফেলেছেন।’

বাদল মুঝ গলায় বলল, ‘দন্তয়েভক্ষির উপন্যাস থেকে উঠে আসা
ক্যারেষ্টের। হিমুদা, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।’

আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম। হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, ‘স্যার
এর নাম বাদল, আমার খালাতো ভাই। দু’দিন আমার সঙ্গে থাকবে, খাবে।
তবে বিনিময়ে কাজ করে দেবে। ফ্লোর মুছবে। কাপড় ধূয়ে দিবে। লকারটা
খোলার ব্যাপারেও কাজ করবে। এর অংকের মাথা ভালো।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘গুড! ভেরি গুড!’

বাদল বলল, ‘স্যার, যে বইটা পড়ছেন সেটা পড়তে কেমন লাগছে?’

পল্টু স্যার বললেন, ‘পড়তে খুবই ভালো লাগছে। তবে বইয়ের অনেকগুলো পাতা নেই। কেউ একজন ইভেন নাম্বার দিয়ে শুরু প্রতিটি পাতা কেটে রেখেছে। তাতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না, বরং সুবিধা হচ্ছে।’

বাদল আগ্রহ নিয়ে বলল, ‘কী সুবিধা, স্যার?’

‘মিসিং পাতাগুলোতে কী আছে কল্পনা করে খুবই আনন্দ পাচ্ছি। আমি ঠিক করেছি, এরপর যে বই-ই পড়ব তার odd কিংবা even নাম্বারের পাতাগুলো কেটে রাখব।’

বাদল বলল, ‘স্যার, আপনিতো মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। দয়া করে একটা বাণী দিন।’

‘কী বাণী দেব?’

বাদল বলল, ‘আপনার মতো মানুষ যা বলবেন সেটাই বাণী। একটা গালি যদি দেন, সেটাও হবে বাণী। দয়া করে আমাকে একটা গালি দিন।

‘সত্ত্ব গালি দেব?’

‘জি স্যার।’

‘এই মুহূর্তে তেমন কোনো গালি মনে পড়ছে না। একটু পরে দেই?’

‘জি আচ্ছা স্যার।’

বাদল আগ্রহ নিয়ে গালির জন্মে অপেক্ষা করছে। পল্টু স্যারকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। সম্ভবত লুগসই গালি পাচ্ছেন না। না পাওয়ারই কথা। বাংলা ভাষায় গালির সম্ভার তত উন্নত না। বেশির ভাগ গালিই পশুর সঙ্গে সম্পর্কিত—কুকুরের বাচ্চা, শূয়োরের বাচ্চা, গাধার বাচ্চা...নতুন ধরনের গালি কিছু হয়েছে, যেমন—তুই রাজাকার। আরো গালি থাকা দরকার। একটা জাতির সংস্কৃতির অনেক পরিচয়ের একটি হচ্ছে গালির সম্ভার। চীন দেশে গালির অভিধান পর্যন্ত আছে। আহারে কী সভ্যতা!

স্যারের ড্রাইভার এসে দরজা দিয়ে মুখ বের করে চোখ টিপল। চোখ টেপায় এর সীমাহীন পারদর্শিতা। চোখ টিপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল—বিরাট সমস্যা।

আমি কাছে গিয়ে বললাম, ‘কী সমস্যা?’

ড্রাইভার হাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, ‘কিসলু ভাই আসছে। একা আসে নাই, দলেবলে আসছে।’

‘কিসলু ভাইটা কে?’

‘সোহাগ ভাইজানের গ্রন্থের লিডার। ডেনজার আদমি। আপনারে খবর দিতে বলেছে, খবর দিলাম। এখন আপনে কি করবেন, সেটা আপনার বিবেচনা।’

‘আমাকে কি করতে বল?’

‘পালায় যান। জানে বাঁচেন।’

‘জানে মেরে ফেলার সম্ভাবনা কি আছে?’

‘অবশ্যই। বললাম না, ডেনজার আদমি।’

‘পালাবো কোন দিক দিয়ে? এরচে বরং ডেনজার আদমির সঙ্গে কথা বলতে থাকি। সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে ঘোড়ে দৌড়। এক দৌড়ে পগার পার।’

ড্রাইভার শুকনো মুখে বলল, ‘আমার যা বলার বলে দিয়েছি। আরেকবার বলতেছি—ডেনজার আদমি।’

ডেনজার আদমি কিসলু ভাই ড্রাইভারের ঘরের সামনের চেয়ারে বসে আছে। সে জিপ্সের প্যান্টের সঙ্গে কমলা রঞ্জের গেঞ্জি পরেছে। গেঞ্জিতে লেখা—Love Bangladesh. বঙ্গ প্রেমিকের চেহারায় ইন্দুর ভাব আছে। সব মানুষ যে বাঁদর থেকে এসেছে তা-মাঝ। কিছু মনে হয় ইন্দুর থেকেও এসেছে। আমি ডেনজার আদমির কাছে এগিয়ে গেলাম। ড্রাইভার অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট ধুমছে। ডেনজার আদমির লোকজন কাউকে দেখছি না। তবে তারা আশেপাশেই যে আছে তা ডেনজার আদমির প্রশান্ত মুখভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি। এই ধরনের বিপজ্জনক লোক একা যখন থাকে তখন অসহায় বোধ করে। আমি ডেনজার স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, ‘এই তুই চাস কীরে শূয়োরের বাচ্চা?’

ড্রাইভারের মুখ থেকে জুলন্ত সিগারেট পড়ে গেল। সে মাথা ঘূরিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো। মনে হচ্ছে তার পৃথিবী উলট-পালট হয়ে গেছে। আমি বললাম, ‘এখনো চেয়ারে বসে আছিস! উঠে দাঁড়া তেলাপোকার ছানা!’ (তেলাপোকার ছানা গালিটা বের করে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে আরো কিছু নতুন গালি আবিষ্কার করে ফেলব।)

‘এই তেলাপোকা! তোর নাম কী?’

হতভম্ব ডেনজার আদমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘কিসলু।’

‘আমার কাছে এসেছিস কী জন্যে? তোকে কি সোহাগ পাঠিয়েছে? এ মাকড়সাটা এখন কোথায়? হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে?’

‘হঁ।’

‘হঁ কিরে হারামজাদা! বল জি স্যার। তোকে আজ সহবত শিখায়ে দিব। সোহাগের রাজস্থানী চাকুটা প্যান্টের ভিতর আপনা-আপনি খুলে গেছে। ঠিক বলেছি না?’

‘জি স্যার।’

‘তোর প্যান্টের পকেটেওতো পিস্তল আছে। আছে কি-না বল?’

‘জি স্যার।’

‘গুলি নাই, পিস্তল নিয়ে ঘুরছিস কোন মতলবে? পিস্তলের গুলি কই?’

ডেনজার আদমি বিড়বিড় করে বলল, ‘যে গুলি আছে সেটা এই পিস্তলে ফিটিং হয় না।’

‘পিস্তল আর গুলি দেখেওনে কিনবি না? আমার কাছে কি জন্যে এসেছিস ঝটপট বল।’

‘ভুল হয়েছে। আপনাকে চিনতে পারি নাই।’

‘এখন চিনেছিস?’

ডেনজার আদমি কিসলু হতাশ চোখে এ্রিদিক-ওদিক তাকালো। সে এমনই হতভম্ব হয়েছে যে, মাথা এলোর্মেলোর পর্যায়ে চলে গেছে। ডেনজার আদমি জাতীয় ছেলেপুলেরা অসম্ভবভাবে হয়।

‘ওস্তাদ, বিদায় দেন, চলে আই।’

‘কানে ধর। কানে ধরে লেফট রাইট করতে করতে যা। তোর বক্সুরা সবাই যেন দেখে তুই কানে ধরে আছিস। আর শোন, পিস্তলের জন্যে ফিটিং গুলি যেদিন পাবি সেদিন এসে আমার সঙ্গে দেখা করবি। মনে থাকবে?’

‘জি ওস্তাদ।’

‘এখনো কানে ধরছিস না কেন? কানে ধর!’

ডেনজার আদমি কানে ধরল। ড্রাইভারের মুখের হা এতই বড় হয়েছে যে, মুখের ভেতর দিয়ে খাদ্য নালীর খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

‘হাঁটা শুরু কর। এক কদম যাবি, কিছুক্ষণ থামবি। আবার এক কদম যাবি, কিছুক্ষণ থামবি। মনে থাকবে?’

‘মনে থাকবে, ওস্তাদ।’

ডেনজার আদমি চলে যাচ্ছে। ড্রাইভার ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে টেক গিলচ্ছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘হামকি ধামকি করে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি—তাই না ফজলু?’

ফজলু বিড়বিড় করে বলল, ‘জি ওস্তাদ !’

মানুষের সবদিন সমান যায় না। কোনো কোনো দিনকে বলা যায় ভেজিটেবল ডে। তাও উল্লেখযোগ্য ভেজিটেবলও না। কদু টাইপ ভেজিটেবল। আবার কিছু দিন থাকে—সংবাদপত্রের ভাষায় ঘটনাবহুল।

যেমন আজকের দিন। ডেনজার আদমি কিসলু ভাইকে বিদায় করে উপরে এসেছি। পল্টু স্যার হাতের উপন্যাস ছুড়ে ফেলে বললেন, ‘অসাধারণ উপন্যাস পড়ে শেষ করলাম। টানটান উভেজনা। দুপুরের খাবার দাও। দেখি নতুন বাবুর্চি ইলিশ মাছের ডিম কেমন রান্না করেছে। আমার মন বলছে, ভালো হয়েছে।’

বাবুর্চি নেই, ডিমও নেই—এই দৃঃসংবাদ দেয়ার আগেই দরজার কলিংবেল বাজল। ঘরে ঢুকল রানু। হাতে টিফিন কেরিয়ারের একটা বাটি।

আমি বললাম, ‘কী এনেছ, ডিমের খোল?’

রানু কিছু বলল না। হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখে-মুখে আঘাতের ঘনঘটা। আমি বললাম, ‘স্যারকে খাবার দ্যাও। স্যারের ক্ষিধে লেগেছে।’

রানু বলল, ‘আপনার মাজেদু খালা আপনাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।’

আমি বললাম, ‘চিঠিটা অঞ্চলের হাতে দিয়ে তুমি কাজে লেগে পড়। বাদল তোমাকে সাহায্য করবে। তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দিতে হবে। বাসাবাড়ির কাজ প্রথম করছেতো! এমিতে সে ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়ায়।’

বাদল মেঝে ঝাট দিচ্ছিল। রানু তার দিকে তাকিয়ে রইল। রানুর ভাবভঙ্গি অধিক শোকে কংক্রিট টাইপ।

মাজেদা খালা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। শুরু করেছেন একটি নিরীহ প্রাণীকে দিয়ে—

এই গাধা,

তুই কী শুরু করেছিস। রানুকে কী বুঝিয়েছিস।
মেয়েটা আমার কাছে এসে কেঁদে-টেদে অস্থির। সব
সময় রহস্য করা যায় না। মানুষকে স্বাভাবিক আচরণ
করতে হয়। বয়সতো কম হয় নি। এখন স্বাভাবিক হবার
চেষ্টা করে দেখ।

আমি কয়েকদিন কথা বলে দেখেছি রানু মেয়েটা ভালো। ভালো মেয়েদের কপালে দুঃখ থাকে। এই মেয়ের কপালেও নানা দুঃখ। বেচারি এত কষ্ট করে ঢাকায় আছে। গ্রামে তার মা একা। সেই মায়ের কাছে চিঠি গেছে যে, রানু ঢাকায় বেশ্যাগিরি করে জীবন যাপন করে। সন্ধ্যার পর থেকে তাকে না-কি চন্দ্রিমা উদ্যানে পাওয়া যায়।

রানু যে হোস্টেলে থাকে সেখানকার কোনো মেয়েই কাজটা করেছে। হোস্টেল থেকেও রানুকে নোটিশ দিয়েছে যেন হোস্টেল ছেড়ে যায়। সে এখন যাবে কোথায়? তার থাকার জায়গা দরকার। টাকা-পয়সা দরকার। রানুর কাছে শুনলাম তুই বাগড়া দিচ্ছিস যেন পল্টু ভাইজান কিডনি না কেনেন। এটা কেমন কথা?

মেয়েটাকে আমি আবার পাঠালাম। তোর দায়িত্ব আজকালের মধ্যে কিডনির বিষয় ফাইনাল করে আমাকে জানানো। ভালো কোনো ছেলে পঞ্চওয়া গেলে আমি নিজ খরচায় মেয়েটার বিয়ে দিতে চাই। তোর সন্ধানে কেউ কি আছে?

আচ্ছা শোন! তোর পাতানো খালার ছেলে বাদল, এ ছেলেতো এখনো বিয়ে করে নি। ওর সঙ্গে ব্যবস্থা করা যায় না?

ইতি
তোর মাজেন্দা খালা

পুনর্চ ১ : পল্টু ভাইজান না-কি ইলিশ মাছের ডিমের ঘোল খেতে চেয়েছেন। রেঁধে পাঠালাম। উনার কেমন লাগল জানাবি। ঝাল মনে হয় একটু বেশি হয়ে গেছে। এখনকার বাজারে সবই মিষ্টি টাইপ কাঁচামরিচ। এটা যে এত ঝাল, আগে বুঝতে পারি নি।

পুনর্চ ২ : কি লিখতে চেয়েছিলাম ভুলে গেছি। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পল্টু ভাইজানের শোবার ঘরে আমার ছবিটা কি এখনো

ବୁଲଛେ? ଏହି ଛବି ଯେ ଆମାର କିଶୋରୀ ବୟାସେର, ତା ରାନୁକେ ବଲବି ନା । ସେ ଯଦି ନିଜେ ଥେକେ ବୁଝେ ଫେଲେ ତାହଲେ ଡିଲ୍ଲ କଥା ।

ପଞ୍ଚ୍ଚ ସ୍ୟାରେର ଖାଓୟା ଶେଷ ହେଁଥେ । ତିନି ରାନୁର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲେନ, ‘ତୋମାର ଜବ ପାର୍ମାନେଟ୍ । ମାବେ ମଧ୍ୟେ ମନେ ହୟ ଭାଲୋ-ମନ୍ଦ ଖାବାର ଜନ୍ୟ ବେଂଚେ ଥାକି । ନବରତ୍ନ ସଭାର ଆବୁଲ ଫଜଲେର ନାମ ଶୁଣେଛ?’

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ନା ।’

‘ତିନି ମୋଘଲ ସତ୍ରାଟ ଆକବର ଦ୍ୟା ପ୍ରେଟେର ନଯ ରତ୍ନେର ଏକ ରତ୍ନ । ତିନି ଆକବରେର ଏକଟା ଜୀବନୀ ଲିଖେଛେ, ନାମ “ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ” । ସେଥାନେ ସତ୍ରାଟ ଆକବର କି କି ଥେତେନ ସେଇ ସବ ଲେଖା ଆଛେ । ମରେ ଯାବାର ଆଗେ ତାଁର ପଛନ୍ଦେର ଏକଟା ଖାବାର ଥେତେ ଇଚ୍ଛା କରଛେ । ରେସିପିଓ ଉନି ଲିଖେ ଗେଛେ । ରେସିପି ବଲଲେ ରୀଧିତେ ପାରବେ?’

‘ରେସିପି କି?’

ପଞ୍ଚ୍ଚ ସ୍ୟାର ଆଗହେର ସଙ୍ଗେ ବଲଲେନ, ‘ଖାବାରଟାର ନାମ ଦୁନିଆଜା । ଦଶ ସେର ମାଂସେର ସଙ୍ଗେ ଦଶ ସେର ପିଯାଜେର ରସ ମିଶ୍ରିତ ହବେ । ଏକ ପୋଡ଼ୀ ଲବଣ ଦିତେ ହବେ । କିଛୁ ଗୋଲମରିଚେର ଗୁଡ଼ା । ତାବୁପୂର ଅଳ୍ପ ଆଁଚେ ଜ୍ଞାଲ ହତେ ଥାକବେ ।’

‘ଆର କିଛୁ ନା?’

‘ଆର କିଛୁତୋ ଲେଖା ଛିଲ୍ଲମ୍ବା ।’

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେଖିତେ ପାରି । ତବେ ଥେତେ ପାରବେନ ବଲେ ମନେ ହୟ ନା । ତେଲ ଘି ଛାଡ଼ା କେମନ ହବେ ଖାବାରଟା?’

ପଞ୍ଚ୍ଚ ସ୍ୟାର ବଲଲେନ, ‘ପିଯାଜେର ରସେ ରାନ୍ନାଇ ଏହି ଖାବାରେର ବିଶେଷତ୍ତ୍ଵ । ହିମୁ ବାବୁର୍ଚିର କାହୁ ଥେକେ ଜେନେ ନାଓ କୀ କୀ ଲାଗବେ । ଆଜ ରାତେ ଆମି ଆକବର ବାଦଶା । ଦୁନିଆଜା ଖାବ ।’

ରାନୁ ବଲଲ, ‘ଆମାକେ ବାବୁର୍ଚି ଡାକବେନ ନା । ଆମାର ନାମ ରାନୁ । ଆମାକେ ରାନୁ ଡାକବେନ । ଆମାକେ ଏକଟା ଘର ଦେଖିଯେ ଦିନ ଯେଥାନେ ଆମି ରାତେ ଥାକବ । ହୋସ୍ଟେଲ ଥେକେ ଆମାର କିଛୁ ଜିନିସପତ୍ର ଆନତେ ହବେ ।’

ବାଦଲ ବଲଲ, ‘ଆମି ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଯାବ । ସବ ନିଯେ ଆସବ ।’

ଘଟନା ଦ୍ରୁତ ଘଟିଛେ । କୋନ ଦିକେ ଯାଚେ କେ ଜାନେ ।

ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା । ରାନ୍ନାଘରେ ଦୁନିଆଜା ରାନ୍ନା ହଚ୍ଛେ । ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ହଚ୍ଛେ ବାଦଲ । ତାର ଉଂସାହ ତୁଳସ୍ପଶୀ । ମନେ ହଚ୍ଛେ ରାନୁ ବାବୁର୍ଚିର

এসিস্টেন্ট হয়ে সে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। একটু পরপর রানুর হাসির শব্দও আসছে। বাদলের হাসির আওয়াজ পাওয়া না। দু'জন মানুষের মধ্যে একজন যখন হাসে তখন অন্যজনকেও হাসতে হয়। বাদল হাসছে না কেন বুঝতে পারছি না। দু'জনের কথাবার্তাও ইতোমধ্যেই রহস্যজনক হয়ে আসছে।

রানু : রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ধোঁয়ায় আপনার কষ্ট হচ্ছে।

বাদল : তোমারও তো কষ্ট হচ্ছে। তুমিতো ধোঁয়া ফ্রফ না।

রানু : মেয়েদের আবার ধোঁয়ার কষ্ট!

বাদল : তোমরা মেয়েদের এত ছেট করে দেখ কেন?

রানু : আপনারাই আমাদের ছেট করে রাখেন।

বাদল : খুবই ভুল কথা বলছ রানী।

রানু : রানী বলছেন কেন? আমার নাম রানু।

বাদল : সরি, ভুলে রানী বলে ফেলেছি। স্লিপ অব টাং।

রানু : সবার সামনে এ রকম স্লিপ অব টাং যেন না হয়। অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে।

বাদল : অন্য কী ভাববে?

রানু : ইস্। আপনি বোক্সনা-কি? কেন বুঝতে পারছেন না?

বাদল : রানী, আসলেই বুঝতে পারছি না।

রানু : আবার রানী! শুনুন, প্রেমিকরাই শুধু তাদের প্রেমিকাদের রানী বলে ডাকে কিংবা জানপাখি ডাকে। খুবই হাস্যকর।

বাদল : হাস্যকর কেন হবে?

রানু : আমার কাছে হাস্যকর।

আমি মেঝেতে চাদর বিছিয়ে ঘুমুবার আয়োজন করছি—বাদল হস্তদণ্ড হয়ে ঢুকল। হাতে মোবাইল টেলিফোন।

‘হিমুদা! বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতো! বাবা কিছু না বুঝেই চিংকার চেঁচামেচি করছে। তুম পুরো বিষয়টা সুন্দর করে গুছিয়ে বল।’

আমি গল্পীর গলা বের করলাম, ‘হ্যালো।’

খালু সাহেব ধমকে উঠলেন, ‘হিমু না?’

‘জি।’

‘এ রকম করে কথা বলছ কেন? সমস্যা কী?’

‘কোনো সমস্যা নেই।’

‘বাদলের ব্যাপারটা কী আমাকে বল। কিছুই লুকাবে না। সে করছে কী?’

‘এই মুহূর্তে সে সন্দেহজনক চরিত্রের এক বাবুটি মহিলার এ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করছে, পিয়াজ কেটে দিচ্ছে এবং নিচু গলায় গল্পগুজব করছে।’

‘What?’

‘সত্যি কথা জানতে চাচ্ছেন, সত্যি কথা বললাম। তবে বাবুটার চেহারা ভালো। চরিত্র সন্দেহজনক হলেও চেহারা খারাপ না।’

‘সন্দেহজনক চরিত্র মানে কী?’

‘সন্ধ্যার পর চন্দ্রিমা উদ্যানে কাস্টমারের খোজে ঘুরে বলে জনশ্রুতি আছে।’

‘বাদল ওর সঙ্গে জুটল কীভাবে?’

‘বলতে চাচ্ছ না, খালু সাহেব।’

‘কেন বলতে চাচ্ছ না?’

‘হয়ত ব্যাপারটা আপনি সহজভাবে সিংড়ে পারবেন না।’

‘হিমু খেড়ে কাশ। খেড়ে কাশ বললাম। I order you to catch.’

‘বাদল যে বাসায় পার্ট টাইম চাকরের কাজ নিয়েছে সন্দেহজনক চরিত্রের ঐ মেয়েও সেই বাড়িতেই কাজ করে।’

‘কী বললে? বাদল পার্ট টাইম চাকরের কাজ নিয়েছে?’

‘জি। মহানন্দে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। মেঝে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছছে। আমার ধারণা ছাত্র পড়ানোর মনোটনি কাটানোর জন্যে সে এই কাজ করছে।’

‘খালু সাহেব টেলিফোনে সিংহনাদ করলেন, ‘বাদলকে টেলিফোনটা দাও! আমি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলব।’

আমি বিনীত গলায় বললাম, ‘বাদলকে টেলিফোন দিতে হলে আমাকে রান্নাঘরে যেতে হয়। কাজটা করতে চাচ্ছ না। তাদের কি অবস্থায় দেখব কে জানে। বললাম না মেয়েটার চরিত্র সন্দেহজনক।’

‘বাদল কোন বাসায় আছে সেই ঠিকানা দাও—আমি আসছি।’

আমি ঠিকানা দিয়ে বললাম, ‘আজ না এসে আপনি বরং আগামীকাল সন্ধ্যায় আসুন।’

‘আজ এলে সমস্যা কী?’

‘আজ বৃহস্পতিবার। আপনার বোতল দিবস। আজ এলে আপনার বোতল দিবসটা মাটি হবে। কাল সন্ধ্যায় আসুন, হাতেনাতে আসামি গ্রেঞ্জার করে নিয়ে যান।’

‘বাদল কি সত্য চাকরের কাজ নিয়েছে?’

‘জি। তবে পার্ট টাইম কাজ। এটা একটা আশার কথা। খালু সাহেব, বুঝতে পারছি আজ আপনার মন খুবই অশান্ত। এক কাজ করেন, আজ একটু সকাল সকাল ছাদে চলে যান। ওমর বৈয়াম বলেছেন...’

‘রাখ তোমার ওমর বৈয়াম। আমি কি চিজ, বাদল কাল সন্ধ্যায় জানবে।’

রানু-বাদল কথামালা আবার শুরু হয়েছে। আমি লকারের রিং ঘুরাচ্ছি এবং কথা শুনছি।

রানু : জানেন, আমার খুব শখ ঠিভি নাটকে অভিনয় করা। কিন্তু এত বাজে চেহারা কে আমাকে নেবে বলুন।

বাদল : তোমার চেহারা খারাপ কে বলল?

রানু : সবাই বলে।

বাদল : আমার সামনে বলে দেখুক।

রানু : আপনার সামনে বললে আপনি কী করবেন?

বাদল : আমি সুসি দিয়ে নাকসা ফাটিয়ে দেবো।

রানু : (হাসি)।

ঘটনা দ্রুত ঘটছে। কোন দিকে যাচ্ছে তাও বুঝা যাচ্ছে।

লেখকরা আনন্দিত মানুষের বর্ণনা নানানভাবে করেন। কেউ লেখেন—“লোকটা আনন্দে ঝলমল করছে।” কেউ লেখেন—“সে আনন্দে আটখানা।” রবীন্দ্রনাথ লেখেন—“বিমলানন্দের চাপা আভায় তাহার মুখমণ্ডলে...।”

এই মুহূর্তে আমি যাকে দেখছি তার আনন্দ কবি-সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আনন্দে আটখানার জায়গায় আনন্দে এগারোখানা বলতে পারি। তাতেও ইতর-বিশেষ হয় না।

আনন্দিত ভদ্রলোকের নাম আবদুস সান্তার। ডাবল স্বর্ণপদক প্রাণ হেমিওপ্যাথি চিকিৎসক MC. MR. PL. শেফা ক্লিনিকের কর্ণধার। তিনি বসে আছেন পল্টু স্যারের সামনের বেতের চেয়ারে। তাঁর হাতে হলদিরামের শনপাপড়ির প্যাকেট। সন্দেশ রসগোল্লার মরণঘন্টা সম্ভবত বেজে গেছে। হলদিরাম বাবুরা ঝোঁটিয়ে সব বিদায় করার সংকল্পে নেমেছেন।

সান্তার সাহেব শনপাপড়ির প্যাকেট পল্টু স্যারের দিকে এগিয়ে বললেন, ‘নে, তোর জন্যে এনেছি। ধিয়ে ভাজা শনপাপড়ি। অমৃতের কাছাকাছি।’

পল্টু স্যার হাত বাড়িয়ে প্যাকেট করা অমৃত নিলেন।

সান্তার সাহেব বললেন, ‘তোর চাকরটাকে বল, প্যাকেট খুলে সুন্দর করে সাজিয়ে মিষ্টি দিতে। ওটার নাম যেন কী কাঞ্চনজঙ্গা না?’

‘ওর নাম হিমু।’

সান্তার সাহেব আমাকে ডাকার আগেই আমি ছুটে গেলাম। চাকরদের মতো আনাড়ি হাতে প্যাকেট খুলতে গিয়ে প্রাস্টিকের প্যাকেট মেঝেতে ফেলে দিলাম। সান্তার সাহেবের ধরক দেয়ার কথা। ধরক দিলেন না। ধধুর গলায় বললেন, ‘ভালো আছিস?’

‘জি স্যার, ভালো আছি?’

‘একটা শনপাপড়ি তুই নিয়ে যা। আরাম করে থা।’

আমি বললাম, ‘স্যার, একটা নিলে হবে না। আমরা চারজন। অনুমতি দিলে চার পিস নিয়ে যাই।’

‘চারজন মানে কী?’

‘আমি, স্যারের ড্রাইভার, স্যারের বাবুটি, পার্ট টাইম ক্লিনার।’

সান্তার সাহেব চোখ কপালে তোলার চেষ্টা করতে করতে বললেন, ‘টাকা পয়সারতো দেখি হরির লুট হচ্ছে। সব বন্ধ। এখন থেকে পুরো কন্ট্রোল আমার হাতে। হিমু, তুই যা, কড়া করে এক কাপ চা বানিয়ে আন। চা খেতে খেতে আমি বুঝিয়ে বলব, কেন পুরো কন্ট্রোল আমার হাতে। পল্টু, তুমিও বই পড়া বন্ধ করে আমার কথা শোন। তোমারও শোনা প্রয়োজন।’

আমাদের সবার হাতে হলদিরামের একপিস করে শনপাপড়ি। সান্তার সাহেবের হাতে চায়ের কাপ। পল্টু স্যারের হাতে একটা বই, নাম—“বিষাক্ত

গাছ থেকে সাবধান।” লেখকের নাম প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য। বই পড়ায় বাধা পড়েছে বলে স্যার বিরক্ত। বিরক্তি প্রকাশ করতে পারছেন না বলে আরো বিরক্ত। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের মতো কম্পাউন্ড বিরক্তি।

সান্তার সাহেব খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, ‘এখন আমি একটা সংবাদ দেব। সংবাদটা তোমাদের জন্যে আনন্দেরও হতে পারে, আবার নিরানন্দেরও হতে পারে। সংবাদটা হচ্ছে—পল্টুর বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে কোট একটা অর্ডার জারি করেছে। আমাকে পাওয়ার অব এ্যাটর্নি দিয়েছে। পাওয়ার অব এ্যাটর্নির ফটোকপি আমার কাছেই আছে। চাইলে দেখতে পার। কেউ দেখতে চাও? দেখতে চাইলে আওয়াজ দাও।’

আমরা চারজনই একসঙ্গে না-সূচক মাথা নাড়লাম— দেখতে চাই না। পাওয়ার দেখাতে আনন্দ নেই, পাওয়ার না দেখাতেই আনন্দ।

সান্তার সাহেব পল্টু স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুই দেখতে চাস?’

পল্টু স্যার বললেন, কী দেখতে চাইব?

‘পাওয়ার অব এ্যাটর্নি?’

‘খামাখা এসব দেখতে চাইব কী জানো? জরুরি একটা বই পড়ছি।’

‘ঠিক আছে, তুই বই পড়তে থাক। আমি চা-টা শেষ করে এদের সঙ্গে আলাপ করতে থাকি।’

পল্টু স্যার গভীর মনযোগে পাঠ শুরু করলেন। আমি তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিলাম। তিনি পড়ছেন আতা গাছ। আতা গাছ যে বিষাক্ত আমার জানা ছিল না। জানা গেল, ফল ছাড়া এই গাছের সবই বিষাক্ত। একটি বিষাক্ত গাছ মিষ্টি ফল দিচ্ছে, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। মানুষের মধ্যেও কি এ রকম আছে? বিষাক্ত বাবা-মা’র অসাধারণ সন্তান।

সান্তার সাহেব গলা খাকারি দিয়ে আমার দিকে চোখ ইশারা করলেন। আমি ছুটে গেলাম, তাঁর হাত থেকে চায়ের খালি পেয়ালা নিয়ে গেলাম। তিনি আয়েসী ভঙিতে বললেন, ‘তোমাদের স্যার যে মানসিকভাবে পঙ্গ একজন মানুষ, আশা করি ইতোমধ্যে তোমরা বুঝেছ। হিমু, বল তুমি বুঝেছ?’

‘ইয়েস স্যার।’

‘ডাক্তাররা তাঁর বিষয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ। ডাক্তারদের সার্টিফিকেট বিষয়ে তোমাদের কোনো কথা আছে?’

আমি বললাম, ‘স্যার, কথা নাই। যে লোক দিনরাত বই পড়ে এবং পায়ে ফ্যানের বাতাস দেয় সে তো মানসিক ভারসাম্যহীন বটেই।’

সান্তার সাহেব বললেন, ‘গুড়! তুই ইন্টেলিজেন্ট। তোকে আমার পছন্দ হচ্ছে। শুরুতে বদমাইশ টাইপ মনে হচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে না।’

আমি ছুটে গিয়ে সান্তার সাহেবকে কদমবুসি করে ফেললাম। চাকরশ্রেণীদের নিজস্ব কিছু নীতিমালা আছে—প্রশংসাসূচক কিছু শুনলেই অতি দ্রুত কদমবুসি করা তার একটি। সামান্য ধরক দিলে আড়ালে অঞ্চ-বর্ষণও নীতিমালার অংশ। আড়ালেরও বিশেষত্ব আছে। আড়ালটা এমন হতে হবে যে যিনি ধরক দিয়েছেন তিনি দেখতে পান।

‘হিমু!’

‘জি স্যার।’

‘তোর স্যারের বিশাল বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে তোরা অবগত আছিস কি-না আমি জানি না। আমার কাছে শুনে রাখ। তার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্টই আছে। মানসিক ভারসাম্যহীন লোকের কাছে এতবড় সম্পত্তি থাকা ঠিক না। দেখা যাবে হঠাৎ উইল করে সে সম্পত্তি লিখে দিল— তার পোষা বিড়ালকে। বা কুকুরকে।’

আমি বললাম, ‘স্যারের কোন পোষা কুকুর-বিড়াল নাই।’

সান্তার সাহেব বললেন, ‘আমি কথার কথা বলছি। যাই হোক, এই সমস্ত নানান বিবেচনার প্রেক্ষিতে কোট আমাকে পাওয়ার অব এ্যাটর্নি দিয়েছে। তার যাবতীয় বিষয় আমি দেখব। সে ব্যাংকের সঙ্গে কোন রকম লেনদেন করতে পারবে না। যে বিপুল অপচয় সংসারের জন্যে করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ বক্ষ করতে হবে। পল্টু কখনো গাড়ি নিয়ে কোথাও যায় না। অকারণে একটা গাড়ি পড়ে আছে। মাসে মাসে ড্রাইভারের বেতন গোনা হচ্ছে। আজ থেকে ড্রাইভার অফ।’

ড্রাইভার বলল, ‘স্যার, এটা আপনি কী বলেন?’

সান্তার সাহেব বললেন, ‘কী বলি কানে শুন না? কানে ঠসা লোক গাড়ি কীভাবে চালাবে? পেছন থেকে গাড়ি ডাবল হৰ্ন দিলেও তো কিছু শুনবে না। তোমার চাকরি ডাবল অফ। যাও নিচে যাও। পাওনা বেতন থাকলে মিটিয়ে দেয়া হবে।’

ড্রাইভার নিচে নেমে গেল। সান্তার সাহেব বাদলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার ডিউটি কী?’

বাদল কিছু বলার আগেই আমি বললাম, ‘সে— সে আমার First এ্যাসিস্টেন্ট।’

‘তোর আবার এ্যাসিস্টেন্টও লাগে? এ্যাসিস্টেন্টের চাকরি অফ। নাম কী? নাম বলে নিচে চলে যা। কী নাম?’

‘বাদল।’

‘ঝড় তুফান বৃষ্টি বাদলা এই বাড়িতে চলবে না।’

কিছুক্ষণের মধ্যে রান্নার চাকরিও চলে গেল। তাকেও নিচে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে দাঁড়াতে হল।

এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু পল্টু স্যার নির্বিকার। তিনি বিষাক্ত গাছপালা নিয়েই আছেন। এই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে সুখি কেউ পৃথিবী নামক গ্রহে আছে তা মনে হচ্ছে না।

আমি সান্তার সাহেবের কাছে সামান্য এগিয়ে নিচু গলায় বললাম, ‘স্যার, আপনি হিসাবে ভুল করছেন।’

সান্তার সাহেব খ্যাকখ্যাক করে বললেন, ‘আমি হিসাবে ভুল করছি মানে? কিসের হিসাব? কিসের ভুল? তুই আমার ভুল ধরার কে?’

আমি মাঠে নামলাম। হোমিওপাথি সাহেবের যন্ত্রণা অনেকক্ষণ সহজ করা গেছে। আর না। এখন যুদ্ধ শেষ।

আমি বললাম, ‘তুই তোকুরি অনেকক্ষণ ধরে করছিস। আর একবার তুই বললে কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলব। তোকে নেংটো হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। আজ তুই আভারওয়ার পরে আসিস নাই কেন? তাহলে আভারওয়ার পরে নামতে পারতি, কিছুটা ইঞ্জত রক্ষা হতো।’

সান্তার সাহেব হঠাৎ গভীর জলে পড়ে গেলেন। তাঁর মস্তিষ্ক খানিকটা জট পাকিয়ে গেল। চাকরশ্রেণীর একজন এমন কথা কিভাবে বলছে— মস্তিষ্ক তার লজিক খুঁজছে। লজিক দ্রুত খুঁজে না পেলে কম্পিউটারের মতো সিস্টেম হ্যাঙ্গ করবে। সান্তার সাহেব ঘামতে শুরু করেছেন। তাঁর চোখ লাল। হ্যাঙ্গ হবার দিকেই তিনি যাচ্ছেন।

আমি এবার তাঁর সাহায্যে এগিয়ে গেলাম। তাঁর মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করার জন্যে বললাম, ‘তোকে দেখে মনে হয় তুই ইন্টেলিজেন্ট লোক। তোর সঙ্গে কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে। আমাকে চিনতে পারিস নাই? আমি CID-র লোক। আমাকে রাখা হয়েছে যেন পল্টু সাহেবের কোনো বিপদ হয় কি-না সেটা দেখার জন্যে। বিশ্বাস হয়?’

সান্তার সাহেব হা করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ব্রেইন এখনো ‘হ্যাঙ’ অবস্থায় আছে। আমি বললাম, ‘একটা কাজ করলেই তুই বিশ্বাস করবি। দ্বিতীয় প্রশ্ন আর মাথায় আসবে না।’

আমি কথা শেষ করেই বাঁ হাতে আচমকা এক চড় বসিয়ে দিলাম। সান্তার সাহেব চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলালেন। অঙ্কুট শব্দও করলেন—‘ও খোদা রে!’

পল্টু স্যার বই থেকে মুখ তুলে বিরক্ত স্বরে বললেন, ‘কী হচ্ছে?’

আমি বললাম, ‘কিছুই হচ্ছে না স্যার, সামান্য আর্গামেন্ট।’

‘আর্গামেন্ট বাইরে গিয়ে কর। তোমাদের যন্ত্রণায় পড়তেও পারছি না।’

আমি সান্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বিনীত গলায় বললাম, ‘স্যার, চলুন, আমরা বসার ঘরে যাই। নিজেদের মধ্যে যেসব সমস্যা আছে তার সমাধান করি। রুক্ষ দ্বার বৈঠক।’

সান্তার সাহেব নিঃশব্দে বসার ঘরে চলে গেলেন। তিনি এখনো বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমারেখায় আছেন। এখান থেকে বের হতে তাঁর সময় লাগবে।

বসার ঘরে আমরা দু’জন মুখোমুখি বসে আছি। সান্তার সাহেব কিছু বলার পরিকল্পনা নিয়ে কয়েকবার গলা খাকারি দিলেন। কিছু বলতে পারলেন না।

আমি বললাম, ‘ইচ্ছা করলে আমার বিষয়ে CID অফিসে খোজ নিতে পারিস। হায়ার লেভেলে খোজ নিতে যাবি। বলবি সিরাজুল ইসলাম নাম। হিমু আমার ছন্দনাম।’

সান্তার সাহেব বললেন, ‘আমি ঝামেলা পছন্দ করি না। আপনি পুলিশের লোক হোন আর যেই হোন, আমি কোটের অর্ডার নিয়ে এসেছি। দু’জন ডাক্তার সাটিফিকেট দিয়েছে যে পল্টু পাগল। একজন হলেন প্রফেসর কেরামত আলি, এসোসিয়েট প্রফেসর অব সাইকিয়াট্রি।’

আমি বললাম, ‘পয়সা দিলে ডাক্তারের সাটিফিকেট পাওয়া যায়। দু’জন ডাক্তার বলেছে পল্টু স্যার পাগল। দশজন বলবে পাগল না। হাইকোর্টে আপিল হবে। উল্টা মামলা হবে যে, সুস্থ মানুষকে পাগল সাজিয়ে সম্পত্তি দখলের ষড়যন্ত্র।’

‘মামলা মোকদ্দমা আমি ভয় পাই না।’

‘ভয় না পাওয়া ভালো। আমি একটা প্রস্তাব দেই?’

‘কী প্রস্তাব?’

আমি কিছুক্ষণ শীতল চোখে তাকিয়ে তুই থেকে আপনিতে উঠে এলাম। গলার স্বর নিচু করে বললাম, ‘আমাকে দলে নিন। পল্টু স্যারের সম্পত্তির পার্সেন্টেজের বিনিয়য়ে আমি আপনার হয়ে কাজ করব।’

‘কত পার্সেন্টেজ?’

‘আপনিই বলুন কত। গুরুত্ব বুঝে বলবেন।’

সান্তার সাহেব চুপ করে আছেন। বিরাট ধাঁধায় পড়ে গেছেন। ধাঁধায় পড়ারই কথা। আমি বললাম, ‘বাসায় যান। বাসায় গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিঞ্চা করুন। আমার নিজের প্রস্তাব হল ফিফটি-ফিফটি। যদি আমার প্রস্তাবে রাজি থাকেন কিসলুকে দিয়ে একটা সাদা গোলাপের তোড়া পাঠাবেন। সাদা হচ্ছে সন্ধির প্রতীক।’

‘কিসলুটা কে?’

আমি বললাম, ‘নাম শুনে মনে হল ভ্রাকাশ থেকে পড়ছেন। কিসলু আপনার ছেলের বক্স। একটা পিস্তল মিশ্রে ঘুরে বেড়ায়। পিস্তলের যে গুলি আছে সেটা পিস্তলে ফিট করে না। চিনেছেন?’

‘হঁ।’

‘চা খাবেন?’

‘না।’

‘পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করুন। একটা আপনি হাতে নিন, একটা আমার হাতে দিন। সিগারেটের রঙ সাদা। দু’জন দু’জনকে সাদা লাঠি দেখাচ্ছি। তার মানে কি বুঝতে পারছেন? শান্তির চেষ্টা।’

সান্তার সাহেব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। একটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। ভদ্রলোকের ব্রেইন এখনো পুরোপুরি কাজ করছে না।

আমি সিগারেট উঁচু করে বললাম, ‘শান্তি। শান্তি। শান্তি।’

সান্তার সাহেবও বিড়বিড় করে বললেন, ‘শান্তি শান্তি।’ আমি বললাম, ‘আপনি সিগারেট ধরিয়ে ধোয়া ছাড়ুন। আপনি যেখানে ধোয়া ছাড়বেন আমিও সেখানে ধোয়া ছাড়ব। মানুষ শান্তির পতাকা উড়ায়, আমরা উড়াব শান্তির ধোয়া। ঠিক আছে?’

ইঁ।'

শান্তির ধোয়া উড়ানো হল। শান্তির ধোয়া উড়িয়ে সান্তার সাহেব আরো
জবুথবু হয়ে গেলেন। আমি বললাম, 'বাসায় চলে যান। ঘুমের ট্যাবলেট
খেয়ে লম্বা ঘুম দিন। মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনার ঘুম দরকার।'

ইঁ।'

'একা একা সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারবেন, না-কি আমার সাহায্য
লাগবে?'

'একা নামতে পারব।'

'গুড়। তাহলে বিদায়। মনে রাখবেন, আমার অফার ফিফটি-ফিফটি।'

অল কোয়ায়েট অন দি ইস্টার্ন ফ্রন্ট। ভুল বললাম, সব ফ্রন্টেই শান্তি।
ঘরের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে আবার শুরু হয়েছে। রানু রান্না শুরু করেছে।
বাদল আছে সহকারী।

আজকের মেনু—

চিংড়ি মাছ দিয়ে করলা
মলা মাছের চচড়ি
কুমড়া ফুলের বড়া।
চিতল মাছের গাদা দিয়ে কোঙা।
স্ট্যান্ড বাই আইটেম খাসির কলিজা ভুনা।

কলিজা মশলা মাখিয়ে রেডি করা। সময় পাওয়া গেলে রান্না হবে।
সময় পাওয়া না গেলে রান্না হবে না। বলতে ভুলে গেছি, বিশেষ ধরনের
চাল আজ প্রথম রান্না হবে। চালের নাম বাঁশফুল। চালটা দেখতে মোটা।
রান্না হলে চিকন হয়ে যায়। বাঁশ গাছের ফুল ফুটলে যেমন গন্ধ ছড়ায় সে
রকম গন্ধ আসে।

পল্টু স্যারের বিষাক্ত গাছপালার পাঠ শেষ হয়েছে। এখন তিনি
পড়ছেন—মিনহাজ-ই-সিরাজের লেখা বই তবকত-ই-নাসিরি। মূল ফার্সি
থেকে অনুবাদ। এ ধরনের বইপত্র তিনি কোথেকে জোগাড় করেন তাও
এক রহস্য।

আমার হাতে কোনো কাজ নাই। আমি বারান্দায় বসে কিমাছি।
ঝিমুনি হল নিদ্রার আগের অবস্থা। এই অবস্থায় কনশাস এবং সাব-কনশাস

দুটই কিছু পরিমাণে জাহত থাকে বলে অস্তুত অস্তুত ব্যাপার ঘটে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক মেডিলিফ পিরিওডিক টেবিল চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক কেকুলে বেনজিনের গঠন দেখতে পেয়েছিলেন। আমি তেমন কিছু দেখতে পাই না, তবে রান্নাঘরে বাদল এবং রানু কী বলাবলি করছে তা শুনতে পারছি। প্রতিটি বাক্যের আলাদা অর্থও বুঝতে পারছি। যেমন বাদল বলল, ‘চামচের স্টার্ভার্ড ঠিক না। আরো লম্বা চামচ হওয়া উচিত। তাহলে আর তোমার হাতে গরম তেলের ছিটা পড়ত না।’ (গৃঢ় অর্থ—তোমার হাতে গরম তেলের ছিটা পড়ছে। আমার খারাপ লাগছে।)

রানু বলল, ‘রান্না করতে গেলে একটু-আধটু তেলের ছিটা খেতে হয়। আপনি এত কাছে থাকবেন না, আপনার গায়ে লাগবে।’ (গৃঢ় অর্থ—ওগো, গরম তেল আমার গায়ে লাগে লাগুক, তোমার গায়ে যেন না লাগে।)

বাদল বলল, ‘কড়াইয়ের সবটা তেল যদি আমার গায়ে পড়ে তাহলেও আমি দাঁড়িয়ে থাকব।’ (গৃঢ় অর্থ—তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।)

রানু বলল, ‘হাত ধরে থাকলে আমি নাড়ানাড়ি করব কীভাবে? আপনিতো ভালো পাগল।’ (গৃঢ় অর্থ—আপনি শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস। তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।)

মঞ্চ নাটকে কী হয়? অস্তুত আবেগঘন মুহূর্তে ভিলেনের প্রবেশ ঘটে। নাটকের ভাষায় ক্লাইমেট্র তৈরি হয়।

ক্লাইমেট্র তৈরি হয়ে গেল। ভিলেন হিসেবে মঞ্চে প্রবেশ করলেন বাদলের বাবা, আমার শ্রদ্ধেয় খালু সাহেব। আমি আদবের সঙ্গে তাঁকে বসার ঘরে নিয়ে বসালাম। ঠাঁটে আঙুল রেখে চাপা গলায় বললাম, ‘যা বলবেন, ফিসফিস করে বলবেন। এই বাড়িতে একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া পাগল বাস করেন। তিনি এখন বই পড়ছেন। তাঁর পাঠে বিয় হলে কি করে বসবেন ঠিক নেই। উঁকি দিলেই পাগল দেখতে পাবেন।’

খালু সাহেব উঁকি দিয়ে পাগল দেখে খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, পায়ে ফ্যানের বাতাস দিচ্ছে না-কি?

আমি বললাম, ‘হঁ। একটু পরেই মুরগির মতো কক কক করবে?’

‘কেন?’

‘উনি কক কক ধর্মী মানুষ।’

‘তার মানে কী?’

‘মানে এখনো পুরোপুরি বের হয় নি।’

‘বাদল এই পাগলের সাথে বাস করছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘এখন সে কোথায়?’

আমি বললাম, ‘রান্নাঘরে।’

‘রান্নাঘরে আর কে আছে? চন্দ্রিমা উদ্যানের মেয়েটা আছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘বাদলকে ডেকে আন। তাকে বলবে যে আমি আমার লাইসেন্স করা পিস্তল সঙ্গে করে এনেছি। খুনখুনি ঘটে যাবে।’

‘পিস্তল সত্যি এনেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘গুলি সাবধানে করবেন। আপনার হাতের টিপ-কেমন জানি না। গুলি করলেন বাদলকে, লাগল আমার গায়ে। বিনা দোষে বেহেশতে গিয়ে বসে রইলাম। সত্ত্বরটা পরী কানের কাছে ঘ্যানঘ্যাম শুরু করল। এ বলে আমার দিকে তাকাও, ও বলে আমার দিকে তাকিও।’

‘কথা বাঢ়াবে না। বাদলকে ডেকে আন।’

আমি বাদলের সঙ্গানে রান্নাঘরে চুকলাম। বাদলকে ঘটনা খুলে বললাম। রানু বলল, ‘কি সর্বনাশ! উনি সত্যি পিস্তল নিয়ে চলে এসেছেন?’

‘হ্যাঁ। এসেছেন এবং তাঁর হাতের টিপ খুবই খারাপ। বাদল একা যে বিপদে আছে তা না। আমরা সবাই বিপদে।’

বাদল বলল, ‘আমি কী করব সেটা বল। ফায়ার স্কেপ দিয়ে পালিয়ে যাব?’

‘না। তুই এক কাজ কর। খালু সাহেবের রাগটা আরো বাড়িয়ে দে। মানুষ অধিক শোকে পাথর হয়। অধিক রাগে হয় কংক্রিট। এমন ব্যবস্থা কর যেন তিনি রেগে কংক্রিট হয়ে যান।’

‘কীভাবে রাগাব?’

তুই খালু সাহেবকে গিয়ে বল, ‘বাবা, আমি ঐ মেয়েটাকে আজ ভোরবেলায় বিয়ে করে ফেলেছি। কোর্টে বিয়ে হয়েছে। এক লাখ এক টাকা কাবিন।’

‘মিথ্যা কথা বলব?’

‘হ্যাঁ, যুক্তে মিথ্যা বলার নিয়ম আছে।’

বাদল বলল, ‘এই মিথ্যাতেই হবে?’

‘হওয়ারতো কথা। রাগের একটা লিমিট আছে। লিমিট ক্রস করে যাবার পর শূন্যতা।’

বাদল রানুর দিকে তাকাল।

রানু বলল, ‘উনি যা বলতে বলছেন তাই বল।’

এরা যে দু’জনই তুমি লেভেলে নেমে এসেছে তা আগেই শুনেছি। তুমি যে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে তা জানলাম। রানুর চোখে-মুখে নববিবাহিতা শ্রীসুলভ লজ্জা এবং আনন্দ।

বাদল বলল, ‘তয় লাগছে, হিমুদা।’

রানু বলল, ‘ভয়ের কী আছে? আমি তোমার সঙ্গে যাব।’

বাদল বলল, ‘তুমি আমার সঙ্গে গেলে লাভটা কী হবে?’

রানু বলল ‘তুমি সাহস পাবে।’

‘আমি সাহস পাব কেন? তুমি কি সাহসের দোকান খুলেছ?’

রানু বলল, ‘ঝগড়া করছ কেন?’

বাদল বলল, ‘ঝগড়াতো তুমি করছ।’

আমি চৃপচাপ দাঁড়িয়ে আছি—প্রেমিক-প্রেমিকার ঝগড়ায় নাক গলানো যায়। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় নাকে প্রের বিয়ে না করেও স্বামী-স্ত্রীর মতো ঝগড়া করছে। কাজেই নাক গলানো ঠিক হবে না। ঝগড়া-টগড়া করে তারা একটা সিদ্ধান্তে আসুক, তারপর দেখা যাবে। আমি খালু সাহেবের কাছে চলে এলাম।

খালু সাহেব, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তির মতো চেয়ারের হাতলে দুই হাত রেখে বসে আছেন। তাঁকে দেখাচ্ছেও মূর্তির মতো। নাক, মুখ শক্ত। চোখের দৃষ্টি স্থিত। জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তির সঙ্গে তাঁর সামান্য অমিল আছে। কারণ তাঁর হাতে খোলা পিস্তল।

পল্টু স্যার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে ভীত মনে হচ্ছে। তাঁর হাতে এখন অন্য বই—একশ এক ইলিশ রান্না। তবকত-ই-নাসিরি সম্মুখত পড়ে শেষ করে ফেলেছেন। তিনি ঘণ্টায় একশ দশ কিলোমিটার টাইপ পাঠক। এই মূহূর্তে পল্টু স্যারের কক কক ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কক কক

করছেন। যতবারই করছেন ততবারই খালু সাহেব খানিকটা কেঁপে
উঠছেন।

পল্টু স্যার বললেন, ‘আপনি পিস্তল হাতে বসে আছেন কেন জানতে
পারি?’

খালু সাহেব বললেন, ‘আমার ছেলে এক্ষুণি রান্নাঘর থেকে বের হবে,
তাকে গুলি করব।’

‘কেন?’

‘সে একটা অতি সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়ে বিয়ে করে বসে আছে,
এই জন্যে।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘আমাদের সবার চরিত্রইতো সন্দেহজনক। শুধুমাত্র
পশু পাখি মাছ এদের চরিত্র সন্দেহজনক না। এরা কী করবে, কী করবে না
তা আমরা জানি। হোমোসেপিয়ানদের ব্যাপারে এই কথাটা বলা যাচ্ছে
না।’

খালু সাহেব বললেন, ‘আমাকে বিরক্ত করবেন না।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘আমি কাউকে বিরক্ত করছি না। আপনি বিরক্ত
করছেন। আমার পাঠে বিয়ু ঘটাচ্ছেন। শান্তিমতো বই পড়তে দিচ্ছেন না।
কক কক কক।’

‘কক কক করছেন কেন?’

‘আপনি বক বক করছেন, এই জন্যে আমি কক কক করছি। আমাকে
শান্তিমতো বই পড়তে দিন।’

খালু সাহেব বললেন, ‘কিছুক্ষণের মধ্যেই খুনাখুনি পর্ব শেষ হবে—
আপনি শান্তিমতো বই পড়তে পারবেন।’

পল্টু স্যার বললেন, ‘গুলির শব্দ আমি সহ্য করতে পারি না। খুব
ছোটবেলায় নানাজানের সঙ্গে পাখি শিকারে গিয়েছিলাম। গুলির শব্দে
অঙ্গান হয়ে পড়ে গেলাম। কক কক কক।’

খালু সাহেব বললেন, ‘আপনি কানে হাত দিয়ে রাখুন।

বাধ্য ছেলের মতো পল্টু স্যার কানে হাত চেপে রাখলেন। বাম কান বাঁ
হাতে চেপে ধরা। ডান কান ইলিশ মাছের বই দিয়ে চেপে ধরা। আমাদের
সবার দৃষ্টি রান্নাঘরের দরজার দিকে। রঙ্গমঝঃ প্রস্তুত। নাটকের প্রধান চরিত্র
প্রস্তুত। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ফিল্মের কোনো দৃশ্য হলে এখানে
ধ্বক ধ্বক টাইপ মিউজিক দেয়া হতো। ধ্বক ধ্বক হচ্ছে হার্টের শব্দ।

রান্নাঘর থেকে কেউ বের হল না। সবার ঘরের দরজা দিয়ে এক গাদা পুলিশ ঢুকে পড়ল। তারা আমাকে প্রেফতার করতে এসেছে। আমার বিরহকে অভিযোগ গুরুতর। আমি CID পরিচয় দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছি।

সাধারণ নিয়মে এক ঢিলে দুই পাখি পাওয়া যায়। এখানে পুলিশ এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি পেয়ে গেল। একজন অস্ত্রধারী পেল। খালু সাহেব। বাদলকে পেল, রানুকে পেল।

পল্টু স্যারকে তারা কিছু বলল না। পল্টু স্যার নির্বিকার ভঙ্গিতে ইলিশ মাছের বই পড়া শুরু করলেন। এত কিছু যে ঘটে যাচ্ছে তা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই, তিনি পড়ছেন—“ইলিশ আনারস।”

ফলের মধ্যে শুধু আনারস দিয়ে ইলিশ রান্না হয় কেন বুঝলাম না। অন্য ফলগুলো কী দোষ করল?

আম ইলিশ।

কালোজাম ইলিশ।

সাগর কলা ইলিশ।

বিদেশী ফল দিয়েও রান্নার চেষ্টা করা যেতে পারে যেমন আপেল ইলিশ, আঙুর ইলিশ। ইলিশ রান্নাকে আঞ্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

পুলিশের গাড়িতে উঠার সময় দেখলাম সান্তার সাহেবকে। প্রেফতার নাটক দেখার জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তাঁর হাতে পাইপ। চোখে সানগ্লাস। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে শুধুর গলায় ডাকলাম, ‘সান্তার ভাই।’

তিনি চমকালেন। আমার দিকে তাকালেন কি-না তা সানগ্লাস চোখে থাকার কারণে বুঝা গেল না। আমি বললাম, ‘কক কক কক।’

সান্তার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, ‘তুই এসব কী বলছিস?’

আমি বললাম, ‘কক কক বলছি।’

আমাকে অনুকরণ করা বাদলের দীর্ঘ দিনের স্বভাব। সেও বলল, ‘কক কক কক।’

এই মুহূর্তে বাদলের অতি ঘনিষ্ঠজন রানু। সে বাদলের অনুকরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। সে মিষ্টি গলায় বলল, ‘কক কক কক।’

আমরা কক কক করতে করতে পুলিশের গাড়িতে উঠলাম।

পারিবারিকভাবেই আমরা থানা-হাজত দখল করে আছি। রানুও আমাদের সঙ্গে আছে। মেয়ে হাজতীদের জন্যে আলাদা হাজত আছে। জানা গেছে সেখানে

এক হাজতী না-কি হেগে-মুতে সর্বনাশ করে রেখেছে। মেঘের আনতে লোক গেছে। মেঘের সব পরিষ্কার করবে তখন রানুকে সেখানে ট্রাইফার করা হবে।

আমাদের হাজতে বাইরের লোক বলতে চার ফুট হাইটের একজন আছে। প্রচণ্ড গরমেও তার গায়ে চাদর। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাঢ়ি। সে একটু পরপর থুথু ফেলছে এবং সেই থুথু তর্জনি দিয়ে মেঝেতে ঘসছে। খালু সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, ‘লোকটা এমন করছে কেন?’

আমি বললাম, ‘সে থু থু দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে।’

‘কেন?’

‘পানি পাবে কোথায় যে পানি দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করবে? খুঁথুই ভরসা।’

‘পাগল নাতো?’

‘সম্ভাবনা আছে। আবার হেরোইনচি ও হতে পারে।’

‘হেরোইনচি কী?’

‘এরা হেরোইন খায়। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব?’

‘আরে না। হিম্ম! আজ যে আমাকে এমন একটা ক্যারেষ্টারের সঙ্গে হাজতে বসে থাকতে হচ্ছে তার মূলে স্বীক্ষ্ণ তুমি।’

আমি বললাম, ‘কথাটা ঠিক না খালু সাহেব! আপনি অস্ত্র হাতে ধরা পড়েছেন।’

খালু সাহেব বললেন, ‘এটা আমার লাইসেন্স করা পিস্তল। অস্ত্র হাতে ধরা পড়েছি বলছ কেন?’

আমি বললাম, ‘খুনের উদ্দেশ্যে আপনি অস্ত্র হাতে বসেছিলেন। এ্যাটেম্পট টু মার্ডার। এখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই।’

রানু বলল, ‘অবশ্যই ভূমিকা আছে। আপনার কারণেই বাদলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আপনি না থাকলে এসব কিছুই হতো না। বাদল থাকতো তার জায়গায় আমি থাকতাম আমার জায়গায়। উনিও পিস্তল হাতে আসতেন না। পুলিশের হাতে ধরা পড়তেন না।’

খালু সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, ‘মেয়েটা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, তুমি কী বল?’

আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। খালু সাহেব বললেন, ‘চেহারাও সুন্দর। বুদ্ধি এবং রূপ একসঙ্গে পাওয়া যায় না। বাদলটার দিকে তাকিয়ে দেখ—রূপ আছে। বুদ্ধি এক ছটাকও নেই। তুমি কি আমার সঙ্গে একমত?’

‘একমত।’

‘তুমিতো অনেকবার হাজতে থেকেছে। হাজত থেকে বের হওার বৃদ্ধি কী?’

আমি বললাম, ‘গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকে টেলিফোন করতে হবে, এরা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আপনার গুরুত্বপূর্ণ আত্মীয়-স্বজনের একটা তালিকা মনে মনে তৈরি করুন।’

রানু বলল, ‘এই কাজ কখনো করা যাবে না। কাউকে জানানো যাবে না। পুলিশ আমাদের ধরে হাজতে রেখেছে এটা জানলে বিরাট সমস্যা হবে।’

খালু সাহেব আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ‘মেয়েটাকে যতটুকু বৃদ্ধিমতী ভেবেছিলাম, এ তারচেয়েও বৃদ্ধিমতী। আই এ্যাম ইমপ্রেসড। মেয়েটার উপর থেকে রাগ দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। কি করি বলতো!?’

‘রাগ ধরে রাখতে চান?’

‘হ্যাঁ।’

মেয়েটা কি কথা বলছে তা সন্মনেন না। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। আপনি থুথুওয়ালা বুদ্ধিকে তাকিয়ে থাকুন।’

খালু সাহেব থুথুওয়ালা বুদ্ধিকে তাকাতেই থুথুওয়ালা বলল, ‘স্যার, স্নামালিকুম।’

খালু সাহেব ভীত গলায় বললেন, ‘ওয়ালাইকুম সালাম।’

থুথুওয়ালা বলল, ‘পুড়িং খাইবেন?’

খালু সাহেব বললেন, ‘পুড়িং খাব মানে কী? কিসের পুড়িং?’

‘রক্তের পুড়িং।’

থুথুওয়ালা বসে বসে খালু সাহেবের দিকে এগুচ্ছে। খালু সাহেব আতঙ্কে অস্ত্রিত। থুথুওয়ালা বলল, ‘এক গামলা টাটকা গরম রক্ত নিবেন। তার মধ্যে লবণ দিবেন, বাটা লাল মরিচ দিয়া ঘুটবেন। অতঃপর ঠাণ্ডা জায়গায় রাখবেন। জমাট বাইকা পুড়িং হয়ে যাবে। চাইলের আটার রুটি দিয়া খাইবেন। বিরাট স্বাদ।’

রানু থুথুওয়ালার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, ‘যেখানে ছিলে সেখানে যাও। আজেবাজে কথা বলে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে না। আমরা

হিমসম্প্র-১১

ভয় খাওয়ার লোক না। আর একটা শব্দ করেছে কি থাবড়ায়ে তোমার দাঁত ফেলে দিব। জন্মের মতো রক্তের পুড়িঁ খাওয়া ঘুচায়ে দেব। বদমাস কোথাকার।'

খুঁওয়ালা ভয় খেয়েছে। সে তার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। খালু সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'বাদল গাধাটা যে এমন অসাধারণ একটা মেয়েকে পছন্দ করেছে, শুধুমাত্র এই কারণে এ জীবনে সে যত অপরাধ করেছে সব ক্ষমা করে দিলাম।'

আমি বললাম, 'পছন্দে লাভ হবে না। বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। এ রকম মেয়ে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।'

খালু সাহেব হতাশ গলায় বললেন, 'বাদলের উপর ভরসা করা যায় না। কোনো একটা গাধামি করবে। মেয়ে বলবে সব অফ।'

আমি বললাম, 'মেয়েটার 'অফ' বলার সম্ভাবনা আছে।'

খালু সাহেব গলা আরো নামিয়ে বললেন, 'মেয়েটা যদি একবার টের পেয়ে যায় বাদল কত বড় গাধা তাহলে সে কি আর তাকে বিয়ে করবে? না-কি করা উচিত?'

'করা উচিত না।'

'এখন আমাদের কী করা উচিত? সেটা বল।'

'এই দু'জনের বিয়ের ব্যুঝনা করা। বাই হুক অর বাই কুক।'

'এর মানে কী?'

'এর মানে যে কোনো মূল্যে বিবাহ। প্রয়োজনে হাজতেই কর্ম সমাধান করতে হবে। ওসি সাহেব হবেন সাক্ষী। আর আপনি এখন থেকেই বৌমা ডাকা শুরু করে দিন। কাজ এগিয়ে থাকুক।'

খুঁওয়ালা আবার খালু সাহেবের দিকে এগিছে। খালু সাহেব রানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বৌমা তুমি আমার পাশে এসে বসতো!' রানুর মুখে চাপা হাসি খেলে গেল। আর তখনি হাজতের দরজা খুলল। খালু সাহেব, রানু এবং বাদল ছাড়া পেয়ে গেল। আটকা পড়লাম আমি। খুঁওয়ালা খিকখিক করে হাসছে। সে এত মজা পাচ্ছে কেন কে জানে?

গুলশান থানার OC সাহেবের সামনে আমি বসে আছি। এই OC সাহেব নতুন এসেছেন। তাঁকে আমি আগে দেখি নি। অদ্বিতীয় মোটেই পুলিশ অফিসারের মতো লাগছে না। রোগা এবং অতিরিক্ত ফর্সা একজন মানুষ। গায়ে পুলিশের পোশাক নেই। গোলাপি রঙের হাফসার্ট পরেছেন।

প্যান্ট কি পরেছেন দেখতে পারছি না। গোলাপি রঙের সার্টের কারণে তাঁর চেহারায় বালক বালক ভাব এসেছে। গোলাপি না-কি মেয়েদের রঙ। কথা সত্যি হতে পারে।

ওসি সাহেবের সামনে একটা হাফ প্রেটে পান সাজানো। তিনি পান মুখে দিলেন। আয়েশ করে কিছুক্ষণ পান চিবানোর পর ঘন ঘন হেঁকি তুলতে লাগলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্বত ভঙ্গিতে বললেন, ‘সিগারেট ছাড়ার জন্যে পান ধরেছি কিন্তু জর্দাটা সহ্য হচ্ছে না। আগে দুই প্যাকেট সিগারেট খেতাম। চল্লিশ স্টিক।’

আমি খানিকটা বিশ্বিত হচ্ছি। ওসি সাহেবকে মনে হচ্ছে কৈফিয়ত দিচ্ছেন। অন্ত মামলায় গ্রেফতার হওয়া আসামীকে কোনো পুলিশ অফিসার কৈফিয়ত দেয় না।

‘আপনার নামতো হিমু?’

‘জি স্যার।’

‘হিমালয় থেকে হিমু?’

‘জি স্যার।’

‘রূপা নামের কাউকে চেনেন?’

‘জি স্যার।’

ওসি সাহেব আরেকটা পান মুখে দিলেন। যথারীতি নতুন করে হেঁকি শুরু হল। তিনি হেঁকি দিতে দিতে টেলিফোনের বোতাম টিপছেন। একেকবার হেঁকি দিচ্ছেন, একেকবার বোতাম টিপছেন। ব্যাপারটা যথেষ্টই ইন্টারেস্টিং। ওসি সাহেবের টেলিফোনের বোতাম টেপা শেষ হল। তিনি টেলিফোন আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘কথা বলুন।’

আমি বললাম, ‘কার সঙ্গে কথা বলব?’

ওসি সাহেব বললেন, ‘হ্যালো বললেই বুঝতে পারবেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। বলুন হ্যালো।’

‘হ্যালো।’

ওপাশ থেকে রূপার গলা শোনা গেল। রূপা বলল, ‘কেমন আছ?’

‘ভালো।’

‘কতদিন পর তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে জান?’

‘তিনি বছর?’

‘না। দুই বছর চার মাস। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমাকে ধরতে। ধরতে পারি নি। শেষে বাধ্য হয়ে ঢাকার সব কটা থানায় বলে রেখেছি—হিমু নামের একজন পুলিশের হাতে ধরা খেয়ে থানায় আসবে। তখন যেন আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়। এবার কি কারণে এ্যারেস্ট হয়েছ?’

‘পুলিশের CID পরিচয় দিয়ে ধরা খেয়েছি।’

‘এখন তোমাকে পুলিশ সাজাতে হচ্ছে?’

‘হঁ। একে কী বলে জান? একে বলে একই অঙ্গে কত রূপ।’

‘পিলজ হেঁয়ালি না। শাভাবিকভাবে কথা বল। সাধারণ একটা কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছা করছে।’

‘ঠিক আছ, সাধারণ কথা বলছি। রান্নার একটা রেসিপি বলি? রক্তের পুড়িং কী করে রান্না করতে হয় জান? প্রথমে এক গামলা গরম রক্ত নেবে। তারপর...’

‘হিমু! কেন এ রকম করছ?’

‘সরি।’

‘তোমার জন্যে বড় একটা সারপ্রাইজ আছে।’

‘বল শুনি।’

‘টেলিফোনে বলব না। তুমি আমার সামনে বসবে, তারপর বলব। সারপ্রাইজ পাবার পর তোমার মুখের কি অবস্থা হয় দেখব। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর সরাসরি আমার কাছে আসবে। ঠিক আছে?’

‘হঁ।’

‘হঁ না। বল—আমি আসব।’

‘আমি আসব।’

‘গুড বয়। এখন বল আমি আজ যে শাড়িটা পরে আছি তার রঙ কি?’

‘গোলাপি।’

‘আশ্চর্যতো। গোলাপি আমার পছন্দের রঙ না। আজই কি মনে করে যেন পরেছি। কীভাবে বললে?’

‘ওসি সাহেব গোলাপি রঙের সার্ট পরেছেন, সেই থেকে মনে হল তুমিও গোলাপি রঙ পরেছ।’

‘রূপা বিরক্ত গলায় বলল, ‘ওসি সাহেবের সার্টের সঙ্গে আমার শাড়ির রঙের কী সম্পর্ক?’

আমি জবাব না দিয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম। ওসি সাহেবের হেঁচকি খেমেছে। তিনি পানের প্লেটের দিকে লোভী লোভী চোখে তাকিয়ে আছেন। মনে হয় আরেকটা পান মুখে দেবেন।

‘হিমু সাহেব!’

‘জি স্যার।’

‘আপনিতো বিখ্যাত মানুষ!’

‘জানি না স্যার।’

‘আমাকে স্যার বলার প্রয়োজন নেই। আমি সামান্য পুলিশ অফিসার, আপনার মতো কেউ না। এই থানার আগের ওসি সাহেবকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময় তিনি বলেছেন, আপনার থানায় হিমু নামের কাউকে যদি ঘেফতার করে আনা হয় তাহলে তাকে যতটা সম্ভব যত্ন করবেন। ওসি সাহেবের নাম কামরূল। চিনেছেন?’

‘জি না।’

‘পুলিশের আইজি সাহেব একদিন থানা ইঙ্গেকশনে এসেছিলেন। তিনিও হঠাতে করে বললেন, হিমু নামের ক্ষেত্রে কখনো এ্যারেস্ট হলে তাঁকে যেন জানানো হয়।’

‘জানিয়েছেন?’

‘না। স্যার এখন কুয়ালালামপুরে। ইন্টারপোলের এক মিটিং-এ গেছেন। চা খাবেন?’

‘খাব।’

ওসি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘চা আমার খুব পছন্দের পানীয় ছিল। সারা দিনে বিশ কাপ চা খেতাম। প্রতি কাপ চায়ের সঙ্গে একটা করে সিগারেট। বিশটা সিগারেট দিনে আর বিশটা রাতে। ইন টোটাল ফটি স্টিকস। আলাউদ্দিন এন্ড ফটি রবারস। এখন হিমু সাহেব বলুন, আপনাকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? “জানি না” এই বাক্যটা বলবেন না। অবশ্যই জানেন। চা খেতে খেতে বলুন।’

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, ‘অনেকের ধারণা আমার কিছু আধিভৌতিক ক্ষমতা আছে।’

‘আধিভৌতিক মানে কি সুপার ন্যাচারাল?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনার কি সত্যি আছে তেমন কোনো ক্ষমতা?’

‘জানি না।’

‘সত্য জানেন না?’

‘না।’

ওসি সাহেব আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, ‘আপনি, আপনার অধিভৌতিক ক্ষমতা দিয়ে আমার বিষয়ে কি কিছু বলতে পারবেন?’

আমি বললাম, ‘আজ আপনার বিবাহ বার্ষিকী। এই উপলক্ষ্টেই আপনার স্ত্রী আপনাকে গোলাপি হাফসার্ট উপহার দিয়েছেন। বিবাহ বার্ষিকীর দিন থেকে সিগারেট ছেড়ে দিবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আজই আপনার সিগারেট ছাড়ার প্রথম দিন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আবার সিগারেট ধরবেন।’

ওসি সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, ‘আপনি যা বলেছেন তা ঠিক তবে যে কোনো বৃদ্ধিমান লোক অবজারভেশন থেকে কথাগুলো বলতে পারে। আপনিই বলুন পারে না?’

‘পারে।’

‘আচ্ছা আমার স্ত্রীর নাম কি বলুন পারবেন? আমার স্ত্রীর নাম যদি বলতে পারেন তাহলে বুঝব আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।’

‘আপনার স্ত্রীর নাম আমি বলতে পারব না তবে আপনার স্ত্রীর নামের মধ্যে ধাতব শব্দ আছে। সুরেলা ধাতব আওয়াজ। আপনার স্ত্রীর নাম কী?’

‘নূপুর।’

ওসি সাহেব অস্বাভাবিক গল্পীর হয়ে গেলেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সিগারেট ধরালেন। লম্বা টান দিয়ে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। এখন তিনি একবার সিগারেটের দিকে তাকাচ্ছেন, একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। বিস্মিত মানুষ দেখতে ভালো লাগে। ওসি সাহেবকে দেখতে ভালো লাগছে। ভদ্রলোক হাতের সিগারেট ফেলে দিতে চাচ্ছেন কিন্তু ফেলতে পারছেন না।

রাত নয়টায় সব ঝামেলা ঢুকিয়ে আমি থানা থেকে ছাড়া পেলাম। বাইরে ঝুম বৃষ্টি। রাস্তায় এক হাঁটু পানি। ওসি সাহেব বললেন, ‘পুলিশের গাড়ি দিছি আপনি যেখানে যেতে চান, নামিয়ে দেব। আমি সঙ্গে যাব। বলুন কোথায় যাবেন? আমার বাসায় যাবেন? রাতে আমাদের সঙ্গে থাবেন।

কিছু বক্স-বাক্সকে আসতে বলেছি। বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে নৃপুর নিজে
রাঁধবে। ওর রান্নার হাত ভালো। যাবেন?’

‘যাৰ। পথে দুটা জায়গায় যেতে হবে। এক মিনিট কৱে লাগবে।’

‘কোনো সমস্যা নেই। জিপে উঠুন।’

পুলিশের গাড়ি প্রথম থামল সান্তার সাহেবের হোমিও ফার্মেসিতে।
সান্তার সাহেব ফার্মেসি বক্স করছিলেন। পুলিশের গাড়ি দেখে চমকে
উঠলেন। গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে আরো চমকালেন।

আমি বললাম, ‘সান্তার সাহেব, আমি যে পুলিশের লোক এটা আশা
কৱি এখন বুঝতে পারছেন। পুলিশের গাড়ি নিয়ে ঘূরছি।’

সান্তার সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। আমি বললাম, ‘পুলিশকে কখনো
বিশ্বাস কৱবেন না। পুলিশ যখন বলেছে আমি CID-র কেউ না, তখনই
আপনার বুঝা উচিত ছিল। যাই হোক এখন আপনি প্রফেসর কেরামত
আলির বাসার ঠিকানা দিন। তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপার আছে।’

‘উনার বাসার ঠিকানা আমি জানব কীভাবে?’

আমি চাপা গলায় বললাম, ‘কেরামত আলি সাহেবের সঙ্গে আপনার
ডিল হয়েছে উনার বাসায়। অবশ্যই আপনি বাসা চেনেন। ঠিকানা দিন।
পুলিশি থাবড়া খাবার আগেই দিয়ে দিন।’

সান্তার সাহেব ঠিকানা দিলেন।

আমি বললাম, ‘আমার দিক থেকে ফিফটি ফিফটি ডিল কিন্তু এখনো
আছে।’ বলেই চোখ টিপলাম। সান্তার সাহেবের কোনো ভাবান্তর হল না।
তাঁর মধ্যে জবুথবু ভাব। ব্রেইন মনে হয় আবারো হ্যাঙ কৱার প্রস্তুতি
নিচ্ছে।

প্রফেসর কেরামত আলি থাকেন ধানমণ্ডিতে। রোড ৩/এ, আমার
ধারণা সান্তার সাহেব আগেই টেলিফোনে আমার কথা বলে রেখেছেন।
কারণ প্রফেসর সাহেব আতঙ্কে অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হলেন। বিড়বিড়
কৱে বললেন, ‘আমাকে কী জন্যে প্রয়োজন?’

আমি বললাম, ‘আপনার সঙ্গে একটা সিগারেট খাব এই জন্যে
এসেছি।’

‘সিগারেট খাবেন?’

‘হ্যাঁ। আপনি সিগারেট খানতো?’

ইঁ।'

'তাহলে ধরান।'

প্রফেসর সাহেবের হাতের সিগারেট কাঁপছে। তিনি যে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন তা বুঝা যাচ্ছে। তিনি সিগারেট টানছেন, তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি কিছুই না বলায় তার টেনশান আরো বাঢ়ছে। আমি সিগারেট শেষ করে বললাম, 'প্রফেসর সাহেব যাই?'

প্রফেসর কেরামত আলি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। আমি নিশ্চিত এই অদ্রলোক আজ সারারাত এক ফোটাও ঘুমাতে পারবে না। কিছুক্ষণ পর পর টেলিফোন করবেন সান্তার সাহেবকে। সান্তার সাহেবও ঘুমাতে পারবেন না।

ওসি সাহেবের বাড়িতে কোনো লোকজন নেই। ফাঁকা বাসা। অনেকক্ষণ কলিং বেল বাজাবার পর ওসি সাহেবের স্ত্রী নৃপুর এসে দরজা খুলল। পর্নীর মতো চেহারার বাচ্চা একটা মেয়ে। সে আমাকে দেখে কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'সজল ভাই, আপনি কোথেকে? আমিতো ভেবেছিলাম এই জীবনে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

ওসি সাহেব বললেন, 'তুমি উনাকে চেন?'

নৃপুর বলল, 'না, চিনি না।' এমি এমি সজল ভাই ডাকছি। তুমি উনাকে নিয়ে এসেছ, এই জন্যে তোমার আগামী এক হাজার অপরাধ ক্ষমা করলাম।'

নৃপুরের চোখ ছলছল করছে। সে যে কেঁদে ফেলার আয়োজন করছে তা পরিষ্কার। এই মেয়ের সঙ্গে আমার আগে দেখা হয়নি। সে সজল ভাই সজল ভাই কেন ডাকছে কে জানে।

ওসি সাহেব বললেন, 'লোকজন কেউ আসে নি?'

নৃপুর বলল, 'না। আমি সবাইকে টেলিফোন করে আসতে নিষেধ করেছি। আজকের দিনটা শুধু আমাদের দু'জনের, বাইরের লোক কেন থাকবে? তবে সজল ভাই অবশ্যই থাকবেন।'

ওসি সাহেব বললেন, 'উনি কি বাইরের কেউ না?'

নৃপুর বলল, 'না।'

খাবারের আয়োজন ভালো না। খিঁড়ি এবং ডিম ভুনা। আজকের বিশেষ দিনের জন্যে উপযুক্ত খাবার নিশ্চয়ই না। ডিমও রান্না করা হয়েছে

দুটা। স্বামী-স্ত্রী দুজনের জন্যে ব্যবস্থা। ওসি সাহেব বিশ্বিত হয়ে বললেন, ‘খাবার কি এই?’

নৃপুর বলল, ‘হঁ এই। শোন তুমি আগে খেয়ে নাও। আমি সজল ভাইকে নিয়ে পরে খাব। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা।’

ওসি সাহেব বললেন, ‘খাবারটা গরম কর। দুপুরের কিছু থাকলে ফ্রিজ থেকে বের কর। ডিম ভাজ। দুটা ডিম আমরা তিনজন কিভাবে খাব? অদ্রলোককে আমি প্রায় জোর করে এনেছি।’

নৃপুর অনাগ্রহের সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে গেল। ওসি সাহেব আমাকে বললেন, ‘ভাই, কিছু মনে করবেন না। আমার স্ত্রী পুরোপুরি সুস্থ কোনো যানুষ না। তার ভয়াবহ এপিলেন্সি আছে। একেকবার এপিলেন্সির এ্যাটাক হয় আর সে অস্ত্রুত কোনো গল্প তৈরি করে। সব গল্পেই একজনের সঙ্গে তার প্রণয় থাকে। যার সঙ্গে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে মফস্বল কোনো শহরের কাজি অফিসে বিয়ে করে। বিয়ের পর পর সেই ছেলে স্ত্রী রেখে পালিয়ে যায়। সজল সে রকমই কেউ হবে। এপিলেন্সি রোগ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?’

আমি বললাম, ‘জানি। এপিলেন্সিকে বলা হয় ধর্ম প্রচারকদের রোগ। অনেক ধর্ম প্রচারক এই রোগে ভুগতেন। আমার বাবারও এই রোগ ছিল।’

‘তিনি কি ধর্ম প্রচারক?’

‘হঁ, তাঁর ধর্মের নাম মহাপূরুষ ধর্ম। এ বিষয়ে আপনাকে আরেকদিন বলব।’

শেষ পর্যন্ত তিনজনই খেতে বসেছি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, টেবিলে অনেক খাবার। পোলাও আছে, মুরগির রোস্ট আছে, খাসির মাংসের রেজালা আছে। শুরুতে শুধু দুটা ডিম কেন দেয়া হয়েছিল কে জানে।

নৃপুর বলল, ‘সজল ভাই, আপনার সব কথা কিন্তু আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলে দেব। জানি আপনি রাগ করবেন। করলে করবেন।’

ওসি সাহেব বললেন, ‘কথাটা না বললেই হয়। একজন এম্বারাসড হবে এমন কথা বলার দরকার কী?’

নৃপুর বলল, ‘এম্বারাসড হলে হবে। আমাকে উনি কী অবস্থায় ফেলেছিলেন সেটা জান? বিয়ে করবেন এই কথা বলে তিনি আমাকে বাড়ি থেকে বের করলেন। আমি তখন বাচ্চা একটা মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়ি।

আমাকে নিয়ে গেলেন কুমিল্লায়, সেখানে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে আমাকে তুলবেন। কুমিল্লায় গিয়ে পৌছলাম। সজল ভাই বন্ধুর বাড়ি আর খুঁজে পান না।'

ওসি সাহেব বললেন, 'তোমাদের তাহলে বিয়ে হয় নি?'

'বিয়ে কেন হবে না? কুমিল্লায় নেমে প্রথম আমরা ঠাকুরপাড়ায় এক কাজী অফিসে বিয়ে করলাম, তারপর বন্ধুর বাড়ি খুঁজতে বের হলাম।'

ওসি সাহেব বললেন, 'বাড়ি কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল?'

নৃপুর বলল, 'এত কথা তোমাকে বলব না। পরে এসব নিয়ে আমাকে ঝোঁটা দেবে। সজল ভাই, যেমন চুপচাপ থাচ্ছেন, তুমিও তাই কর। নিঃশব্দে খাও। সজল ভাই আমার রান্না কেমন?'

'অসাধারণ। রান্নার কমপিটিশন হলে সিদ্ধিকা কবীর ফেল করবে।'

'সজল ভাই কি যে ঠাণ্ডা করেন! আমিতো উনার বই দেখেই রাঁধি।'

'যে রান্নার বই লেখে সে রাঁধতে পারে না।'

নৃপুর বলল, 'সজল ভাই! কুমিল্লার এক হোটেলে আমরা কী জঘন্য খাবার খেয়েছিলাম আপনার মনে আছে? আপনি যে ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, এটা কিসের মাংস? কুকুরের না বানরের। হিঃ হিঃ হিঃ।'

হাসতে হাসতে ঘেয়েটা পড়্যে পড়ছে। ওসি সাহেব দুঃখিত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা বাজল। ওসি সাহেব গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

বাসার দরজা তালাবন্ধ। দারোয়ান বলল, 'স্যার সন্ধ্যাবেলা রিকশা করে কোথায় যেন গেছেন। সঙ্গে চার-পাঁচটা বই ছিল। দারোয়ান নিজেই রিকশা ডেকে দিয়েছে।'

পল্টু স্যার দারোয়ানের কাছে চাবি এবং চিঠি রেখে গেছেন। আমি বাসায় ফিরলে আমাকে যেন চিঠি এবং চাবি দেয়া হয়।

চিঠিতে লেখা—

হিমু,

অঙ্কের একটা বই পড়তে পড়তে লকারের
কম্বিনেশন নাম্বারটা মনে পড়ল। আমি ফিবোনাক্ষি

সিরিয়েল ব্যবহার করেছি। ফিবোন্নাকি সিরিয়েল হচ্ছে
এর যে কোন সংখ্যার আগের দুটি সংখ্যার যোগফল।
লকারের নাম্বারটা এই ভাবেই পেয়ে যাবে।

নানান কারণে গৃহত্যাগ করলাম। ডাক্তাররা
বোঁচাখুঁচি করে আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে, এটা আমার
ভালো লাগছে না। অন্যের কিউনি নিয়ে বাঁচার প্রশ্নই
উঠে না।

আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে না। যে
হারিয়ে যেতে চায় তাকে হারিয়ে যেতে দিতে হয়।

ইতি
তোমার স্যার।

ফিবোন্নাকি সিরিয়েলের প্রথম সাতটি সংখ্যা

১ ১ ২ ৩ ৫ ৮ ১৩ ২১

আমি চাচ্ছিলাম সবার সামনে লকার খুলতে। তা সম্ভব হল না। সান্তার
সাহেব হাজতে। পুলিশের ধারণা তিনিই পল্টু স্যারকে কোথাও লুকিয়ে
রেখেছেন, কিংবা গুম খুন করেছেন।

বাদল রানুকে পাওয়া গেল না। তারা হানিমুনে কাঠমুণ্ডু গিয়েছে। তারা
যেদিন গেছে তার একদিন পর খালু সাহেবও চলে গেছেন। বৌমাকে না
দেখে তাঁর না-কি অস্ত্রির লাগছিল।

লকার খোলার সময় মাজেদা খালা ছিলেন। ওসি সাহেবে ছিলেন।

লকারের সিল গালা করা দলিল পাওয়া গেল। দলিল পড়ে জানা গেল
তিনি তাঁর সব কিছু দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে
গেছেন।

দলিল পড়ে ওসি সাহেবের চোখ ছলছল করতে লাগল। তিনি বললেন,
'পুলিশদের সমস্যা কী জানেন? তারা সব সময় খারাপ লোকদের দেখে,
চোর, ডাকাত, খুনি, ধর্ষক,...। ভালো মানুষদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়
না। হঠাৎ হঠাৎ যখন দেখা হয় তারা আবেগ তাড়িত হয়ে পড়ে।'

মাজেদা খালা বললেন, ইস এতগুলো টাকা খামাখা নষ্ট। ওসি সাহেবে
কঠিন চোখে মাজেদা খালার দিকে তাকানোয় তিনি ঝিম মেরে গেলেন।

আমি আগের জীবনে ফিরে গেছি। পথে হাঁটা। আগে বেশির ভাগ সময়
রাতে হাঁটাম, এখন হাঁটি দিনে। যদি হঠাতে পল্টু স্যারের দেখা পাওয়া
যায়।

সেই সন্তাননা অবশ্য ক্ষীণ। উনি মহাপুরূষ পর্যায়ের মানুষ। এ ধরনের
মানুষরা ডুব দিয়ে আড়ালে চলে যেতে চাইলে তাদের খুঁজে বের করা প্রায়
অসম্ভব। অনেকের সঙ্গেই দেখা হয় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না।

একদিন দেখা হয়ে গেল কিসলুর সঙ্গে। সে জিপের প্যান্টের সঙ্গে তিনি
সাইজ বড় একটা মেরুন রঙের শার্ট পরে হাঁটছে। আমাকে হঠাতে দেখে
থমকে গেল। দৌড়ে পালিয়ে যাবার আগের পজিশন। যে কোনো মুহূর্তে
অলিম্পিক দৌড় দেবে। আমি বললাম, কি অবস্থা?

‘জি। ভালো অবস্থা?’

‘পিস্তলের গুলি পাওয়া গেছে?’

‘জি না।’

‘গুলি ছাড়া পিস্তলতো ছুরি কাঁচির চেয়ে নিম্নস্তরের অস্ত্র। কোনো একটা
মজা পুরুর দেখে ফেলে দাও।’

‘জি আচ্ছা।’

‘চল একজনের কাছে নিয়ে যাই। সে নতুন ধারার রান্নার রেসিপি
জানে।’

‘রান্নার রেসিপি দিয়ে আমি কি করব?’

‘একটা বিদ্যা শিখা থাকল। কোন বিদ্যা কখন কাজে লাগে কিছুইতো
বলা যায় না।’

‘একটা জরুরি কাজ ছিল।’

‘তোমার যে কাজ, দুপুর তার জন্যে উপযুক্ত সময় না। চল যাই ঘুরে
আসি।’

কিসলু বিরস মুখে বলল, ‘চলুন।’

তাকে নিয়ে গেলাম হাজতে দেখা হওয়া থুথুওয়ালার কাছে। সে থাকে
কলাবাগানের সামনের নার্সারিতে। মালির কাজ করে। কিসলুকে দেখে সে

বলল, রক্তের পুড়িং কীভাবে রানতে হয় জানেন ভাইজান? এক গামলা টাটকা রক্ত নিবেন। পরিমাণ মতো লবণ এবং গোলমরিচ দিবেন...

কিসলু বিড় বিড় করে বলল, ‘একি পাগল?’

আমি বললাম, ‘নাহু।’

‘রক্তের পুড়ি বানাতে চায় সে পাগল না?’

‘তুমি গুলি করে রক্ত বের কর তোমাকে কেউ পাগল বলে না। আর এই বেচারা রক্তটাকে দিয়ে একটা খাদ্য বানানোর কথা বলছে তাকে পাগল বলছ। কথাটা কি ঠিক?’

কিসলু চুপ করে রইল। থুথুওয়ালা বলল, ‘হিমু ভাই, আপনার জন্যে একটা গাছের চারা আলাদা করে রেখেছি। একদিন এসে নিয়ে যাবেন।’

‘গাছের নাম কী?’

‘দুপুরমণি। ঠিক দুপুরে ফোটে। টকটকা লাল রঙের ফুল। বিরাট সৌন্দর্য।’

কিসলু আমার হাত থেকে ছাড়া পেতে চাচ্ছে। সাহস করে বলতে পারছে না। আমি বললাম, তোমার বক্সটি খবর কী? সোহাগ! সে আছে কেমন?

‘জানি না।’

‘জান না কেন? বক্সটি বক্সুর খোঁজ রাখবে না! তোমার মতো লোকজনদের একা চলাফেরা করাও তো বিপজ্জনক।’

‘বিদায় দেন যাই। জরুরি কাজ ছিল।’

‘তোমাকে যখন পেয়েছি, এত সহজে ছাঢ়ছি না। চল দুই ভাই মিলে একটা ছিনতাই করি।’

‘কী বললেন!’

‘গুলি হোক বা না হোক, তোমার সঙ্গেতো একটা পিস্তল আছেই? ব্রিফকেস হাতে এমন কাউকে আটকাও। ব্রিফকেস রিলিজ করে আমার কাছে দাও। আমি ঝোড়ে দৌড় দিব।’

কিসলু এই পর্যায়ে নিজেই ঝোড়ে দৌড় দিল। হৃষি খেয়ে পড়ল এক পত্রিকা হকারের উপর। হকার গলা উচিয়ে বলল, ধর ধর।

ঢাকা শহরে কেউ একজন ধর ধর বলা মানে মহা বিপদ। ঢারদিক থেকে ধর ধর শুরু হয়ে গেল। কিসলু প্রাণপণে ছুটছে। তার পেছনে পেছনে

অনেকেই ছুটছে। এদের সঙ্গে জুটেছে একজন পুলিশ সার্জেন্ট। মনে হয় বেচারার আজকের আমদানি ভালো হয় নি। পুলিশ সার্জেন্টের আমদানি ভালো না হলে তারা আহত বাঘের মতো হয়ে যায়। তখন তারা অসীম সাহসে ছিনতাইকারী ধরে।

কিসলুর পরিণতি দেখার জন্যেই আমাকে ছুটে যেতে হল। সে সার্জেন্টের হাতেই ধরা খেয়েছে। গণধোলাই শুরুর আগের অবস্থায় আমি উপস্থিত হয়ে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিলাম। পল্টু স্যারের ড্রাইভারের কারণে চোখ টিপটা আমি বেশ ভালো রঞ্জ করেছি। পুলিশ সার্জেন্ট আমার চোখ টিপে উৎসাহিত। ধরেই নিয়েছেন আমদানি ভালো হবে। ব্যাংকে এলসি খোলা হয়ে গেছে। তিনি কঠিন গলায় বললেন, ভিড় করবেন না। যে যার কাজে চলে যান। একে আমি থানায় নিয়ে যাচ্ছি। জিজ্ঞাসাবাদ হবে।

জাগ্রত জনতা নিভে গেল। তবে তাদের এত সহজে অকুস্তল ছেড়ে যাবার মানসিকতা নেই। আমি উঁচু গলায় বললাম, এ আমার আপন ভাইগু। হেরোইন খায়। আমার পকেট থেকে মানিব্যাগ নিয়ে দৌড় দিয়েছে। এক সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছি—হঠাৎ মানিব্যাগ তুলে নিয়ে দৌড়। একে থানায় দিয়ে কোনো লাভ আছে? পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবে। আমি বরং একে কানে ধরে তার মা'র কাছে নিয়ে যাই। আপনারা চলে যাবেন না। আপনারা আমার পেছনে পেছনে আসুন।

পুলিশ সার্জেন্ট বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমি বললাম, ‘পুলিশের সঙ্গে আমার কথা নাই। ইচ্ছা করলে আপনিও মোটর সাইকেল নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসুন।’

ঢাকা শহরে অনেক দিন পর একটা মজার দৃশ্যের অবতারণা হল। আমি কিসলুর কানে ধরে এগুচ্ছি। আমার পেছনে জাগ্রত জনতা। সবার শেষে মোটর সাইকেলে পুলিশ সার্জেন্ট। জনতার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আমি কিসলুর কানে কানে বললাম, তুমি তোমার বাড়িতে নিয়ে চল। এ ছাড়া গতি নাই। বাসা কোথায়?

‘কাওরান বাজার।’

‘মা বাসায় আছেন তো?’

‘হ।’

ତାକା ଶହରେ ଯାରା ଘୋରାଘୁରି କରେ ତାଦେର ବେଶିର ଭାଗେରଇ କୋନୋ କାଜ ନେଇ । ସବାଇ ଜୁଟେ ଯାଛେ । ମିଛିଲେ ମାନୁଷେର ସଂଖ୍ୟା ବାଡ଼ିତେଇ ଥାକଲ । ଆମାର ଧାରଣା ଆଜକେର ଏହି ଘଟନାର ପର କିସଲୁର ରୂପାନ୍ତର ହବେ । ଭାଲୋର ଦିକେ ନା-କି ଆରୋ ମନ୍ଦେର ଦିକେ ତା ବଲା ଅବଶ୍ୟ ବେଶ କଠିନ । ଅସ୍ତ୍ରବ ଭାଲୋ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବ ମନ୍ଦେର ବିଭାଜନ ରେଖା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ।

ମାଝେ ମାଝେ ଆମି ଖାଲୁ ସାହେବେର ଅଫିସେ ତାଁର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ ଯାଇ । ବେଶିର ଭାଗ ସମୟଇ ତାଁକେ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥା ପାଓଯା ଯାଯ । ବାଦଳ ବିଷୟେ ଉତ୍ତେଜନା ।

‘ବାଦଳେର କାଣ ଶୁନେଛ?’

‘ନୁହୁ କିଛୁ କରେଛ?’

‘ନୁହୁ କିଛୁ ନା । ସେଇ ପୁରାନୋ ଗୀତ । ବୌମାର ସଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା । ବୌମା ଖାଓଯା-ଦାଓଯା ବନ୍ଧ କରେ ବସେ ଆଛେ ।’

‘ଆପନି ବଲଲେଇ ତୋ ଖାଓଯା ଶୁରୁ କରବେ ।’

‘ଆମି କେନ ବଲବ? ପ୍ରତିବାର ଆମାକେ କେମି ଝାମେଲା ମିଟାତେ ହବେ?’

‘ଆପନାର କଥା ରାନୁ ଫେଲିତେ ପାରୁରେ ନା ବଲେଇ ଯା କରାର ଆପନାକେ କରତେ ହବେ ।’

‘ଆମି ଯଥନ ବେଁଚେ ଥାକବ ନୁହୁ ତଥନ କି ହବେ?’

‘ତଥନ ଏକଟା ବିରାଟ ସମୟା ହବେ ।’

‘ବୌମାର ଜନ୍ୟ ଆମି ଟେନଶାନେ ଅଛିର ହୟେ ଥାକି । ଏତ ଡିପେନଡେନ୍ଟ ଆମାର ଉପର । ସେଦିନ ଶାଢ଼ି କିନବେ ରଙ୍ଗ ପଛନ୍ଦ କରତେ ପାରଛେ ନା । ଦୋକାନ ଥେକେ ଟେଲିଫୋନ କରେଛେ । ବାଧ୍ୟ ହୟେ ଅଫିସ ବାଦ ଦିଯେ ଗେଲାମ ।’

‘କୀ ରଙ୍ଗ ପଛନ୍ଦ କରଲେନ?’

‘ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ି ଛିଲ, ଏକଟା ହାଲକା ସବୁଜ ଆର ଏକଟା କଫି କାଲାର । ଆମି କଫି କାଲାରଟା ପଛନ୍ଦ କରଲାମ ।’

‘ଆପନାର ଦିନତୋ ଖାଲୁ ସାହେବ ଭାଲୋଇ ଯାଛେ ।’

ଖାଲୁ ସାହେବ ଦୀର୍ଘ ନିଃଶାସ ଫେଲାର ମତୋ ଭାନ କରେ ବଲଲେନ, ‘ଏଟାକେ ତୁମି ଭାଲୋ ବଲଛ? ବିଶାଲ ଯନ୍ତ୍ରଣାୟ ଆଛି । ଐ ଦିନ ତୋମାର ଖାଲାର ସଙ୍ଗେ ରାଗ କରେ ବଲଲାମ, ଭାତ ଖାବ ନା । ବୌ ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଲଲ, ବାବା ଖାବେ ନା । କାଜେଇ ଆମିଓ ଖାବ ନା । ତୋମାର ଖାଲା ଗେଲ ଆରୋ ରେଗେ । ବିରାଟ କ୍ୟାଚାଲ ଶୁରୁ ହୟେ ଗେଲ ।’

খালু সাহেবের সঙ্গে যতবারই কথা হয় আনন্দ পাই। একটা মানুষ
জগতের আনন্দ যজ্ঞের নিম্নণে উপস্থিত হয়েছে, এটা অনেক বড় ব্যাপার।
আনন্দ যজ্ঞে আমাদের সবার নিম্নণ। কিন্তু আমরা নিম্নণের কার্ড হারিয়ে
ফেলি বলে যেতে পারি না। দূর থেকে অন্যের আনন্দ যজ্ঞ দেখি।

একদিন হাজতে সান্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অল্প
কিছুদিন হাজতবাসের কারণেই ভদ্রলোক বুড়িয়ে গেছেন। মুখের চামড়া
যুলে পড়েছে। আমাকে দেখে হাহাকার করে উঠলেন।

‘বাবা, আমাকে এই নরক থেকে বের করতে পারবে?’

‘পলুঁ স্যারকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এরা আপনাকে ছাড়বে না।’

‘ওদেরকে বল, আমি খুঁজে বের করব। হারানো মানুষ খুঁজে বের করার
অনেক সিস্টেম আছে। ঝাড়-ফুঁক আছে। জীন দিয়ে তদবিরের ব্যবস্থা
আছে। যারা এসব করে তাদেরকে আমি চিনি।’

‘দেখি কিছু করতে পারি কি-না।’

‘তুমি অবশ্যই করতে পারবে। তোমার কথা এরা শুনবে। এখানে এক
হারামজাদার সঙ্গে আমাকে রেখেছে, প্রেরোজ রাতে আমার গায়ে পেশাব
করে। তাকিয়ে দেখ কালো গেঞ্জি গায়ের বদমাইশটা।’

আমি কালো গেঞ্জিওয়ালা সিকে তাকালাম। সে দাঁত বের করে বলল,
‘গত রাতে পেশাব করি নাই, স্যার। উনারে জিজেস করে দেখেন। যদি
মিথ্যা বলি, আমি মানুষের জাত না।’

সান্তার সাহেব ধরা গলায় বললেন, ‘কার সাথে আমাকে রেখেছে
দেখেছ? এরচে মরণ ভালো না?’

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, ‘কথা সত্য স্যার।’

সান্তার সাহেব বললেন, ‘এমিতেই সারা রাত ঘুম হয় না। হঠাৎ যদি
কোনো কারণে চোখ লাগে এই বদমাইশটা পা দিয়ে খোঁচা দেয়।’

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, ‘গপ সপ করার জন্যে আপনেরে জাগাই।’

‘তোর সঙ্গে কী গল্প করব?’

‘আমি দুইটা মার্ডার করছি এই গপ শুনবেন?’

‘না—চুপ থাক।’

‘শুনেন না। যজা পাইবেন। রাইতে হাতে ইট নিয়া ঘূরতাছি শোয়ার
জায়গা পাই না। ভালো জায়গা পাইলে মাথার নিচে ইট দিয়া ঘুম দিব। হঠাৎ

দেখি সাত আট বছরের এক পুলা ঘুমাইতাছে। সুন্দর চেহারা। ইট নিয়া
আগাইলাম। মাথাত বাড়ি দিয়া মাথা খেতলায়া দিব এই আমার চিন্তা।...’

সান্তার সাহেব বললেন, ‘আর বলবি না। চুপ চুপ।’

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, ‘চুপ চুপ কইরা লাভ নাই তোরে পুরা গল্ল
শুনতে হবে।’

সান্তার সাহেব হতাশ গলায় বললেন, ‘হিমু এর হাত থেকে তুমি
আমাকে উদ্ধার কর। তোমাকে আমি কথা দিলাম আমি মঙ্কা শরীফে যাব।
সেখানে তওবা করে শুন্দ হব।’

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, ‘স্যার আমারে সাথে নিবেন? আমি তওবা
করব না। আমি দেখব। আমি তওবা বিশ্বাস করি না। পাপ করলে শান্তি।
তওবা আবার কী? আমি শান্তির জন্যে তৈয়ার। একবার একজনের বিচি
ফালায়া খাসি বানায়া দিছিলাম। আমি একা না। আমরা ছিলাম তিন জন।
দুই জন চাইপ্যা ধরছে। আমি অপারেশন করছি।’

সান্তার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কী বলছে শুনছ? এই
রকম একজনের সঙ্গে বাস করছি।’

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, ‘সুযোগে পাইলে আপনের উপরে একটা
অপারেশনের ইচ্ছা আছে। একলা পারব না। আরো দুই তিন জন হাজতে
চুকলে তারারে দলে টাইন্যা একটা চেষ্টা নিব। স্যার ছেপ খাবেন?’

সান্তার সাহেব হতভয় গলায় বললেন, ‘ছেপ খাব মানে!'

কালো গেঞ্জিওয়ালা বলল, ‘হা করেন। মুখে ছেপ দেই। খায়া দেখেন
মজা পাবেন। দুষ্ট লোকের ছেপ খাইতে মজা। সাধু লোকের ছেপে মজা
নাই। স্যার হা করেন।’

আমি সান্তার সাহেবকে এই অবস্থায় রেখে চলে এলাম। তিনি নরক
যত্রণা ভোগ করছেন। এর জন্যে তাকে নরকে যেতে হয় নি। পৃথিবীতেই
তাঁর জন্যে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাপারগুলো কী কাকতালীয়ভাবে
ঘটে? না কেউ একজন ব্যবস্থা করে দেন? এই বিষয়ে বিখ্যাত একটা
কবিতাও আছে—

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক
মানুষেতে সুরাসুর।

আমি কালো গেঞ্জিওয়ালাকে দেখেছি— সে উত্তর মেরু হলে দক্ষিণ
মেরুর একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ।
রোগা, গাত্র বর্ণ ধৰণবে সাদা। হলুদ রঙের একটা শার্ট পরেছেন। শার্ট
ছাপিয়ে তাঁর গায়ের রঙ ছিটকে বের হচ্ছে। তিনি বড় একটা
এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি হাতে ডাস্টবিনের সামনে দাঁড়িয়ে আয় আয় বলে
কাকে যেন ডাকছেন। আমি এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোকের কাছে জানতে
চাইলাম, ‘কাকে ডাকছেন?’

তিনি লজ্জিত গলায় বললেন, ‘কাকদের ডাকছি। ওদের জন্যে খিচুড়ি
রান্না করে এনেছি।’

‘একটু বুঝিয়ে বলবেন?’

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ‘কাকরা সারাজীবন আবর্জনা খায়।
ভালো কিছু খেতে পারে না। এই জন্যেই মাঝে মাঝে আমি ওদের খিচুড়ি
রান্না করে খাওয়াই।’

‘কতদিন পর পর খাওয়ান।’

‘মাসে দু’বারের বেশি পারি না। আমি আরো মানুষ।’

ভদ্রলোক পাতিলের ঢাকনা খুলে দিয়েছেন। কাকরা এসে খিচুড়ি
খাচ্ছে। তিনি আগ্রহ নিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দ ঠিকরে বের
হচ্ছে। আমি দ্রুত দূরে সরে ফেলাম কারণ আমার বাবা বলে গেছেন—

“তোমার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তুমি
কিছু মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষের
সাক্ষাৎ পাইবে। অতি অবশ্যই তুমি
তাহাদের নিকট হইতে সহস্র হাত
দূরে থাকিবে। কারণ মহাপুরুষদের
আকর্ষণী ক্ষমতা প্রিয়। একবার
তাহাদের আকর্ষণী ক্ষমতার ভিতর
পড়িলে আর বাহির হইতে
পারিবে না। তাহাদের বলয়ের
ভিতর থাকিয়া তোমাকে চক্রাকার
ঘূরিতে হইবে। ইহা আমার
কাম্য নয়।”

এক দুপুরে মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা। তিনি গ্লাস ভর্তি করে আর্থের
রস খাচ্ছেন। তৃণিতে তাঁর চোখে খুশি খুশি ভাব এসে গেছে।

‘এই হিমু! এদিকে আয়, আর্থের রস খাবি?’

‘খাব।’

‘একে গ্লাস ভর্তি করে দাও। বরফ কুচি বেশি দেবে।’

আমি গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি। বরফের কুচি মুখে টুকে চিড়বিড় ভাব হচ্ছে।
ভালো লাগছে।

‘পল্টু ভাইজানের শোবার ঘর থেকে ছবিটা আমি নিয়ে এসেছি। ছবিটা
আমি আমার শোবার ঘরে টানিয়েছি।’

‘ছবিটার কোনো নাম দিয়েছ?’

‘নাম দেব কেন?’

‘এত সুন্দর একটা ছবি নাম ছাড়া মানায় না। মোনালিসার সঙ্গে মিল
দিয়ে ছবির নাম দাও ‘মাজেলিসা।’ মাজেদা থেকে মাজেলিসা।’

‘চুপ করে আর্থের সরবত খা। উন্টট উন্টট কথা।’

‘তুমি রোজ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ছবিটাকে দিকে তাকিয়ে থাক।’

‘তা থাকি। এতে মনটা খারাপ হয়। কী ছিলাম আর কী হয়েছি। আগে
মনটাও ছিল সরল। এখন কুটিল হয়ে গেছে।’

‘উন্টেটা হওয়া উচিত ছিল খালা। মধ্য দুপুরেই শুধু মানুষের ছায়া
পড়ে না। মানুষ হয় ছায়াশূন্য।’

‘এর মানে কী?’

‘কোনো মানে নেই এমি বললাম।’

‘উন্টাপাল্টা কথা আমাকে বলিস নাতো! বুঝতে পারি না। মাথা
এলোমেলো লাগে। আরেক গ্লাস সরবত খাবি?’

‘খাব।’

খালা আরো দু’গ্লাসের অর্ডার দিলেন।

‘পল্টু ভাইজানের কোনো খোজ পেয়েছিস?’

‘না। মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ তো! নিজেরা ধরা না দিলে ধরা যায়
না।’

‘পত্রিকায় ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দে।’

‘কী দরকার?’

‘একটা মানুষ এমি এমি হারিয়ে যাবে?’

‘মানুষের জন্মই হয়েছে হারিয়ে যাওয়ার জন্যে।’

‘ফিলসফির কথা আমাকে বলবি না। থাপ্পড় খাবি।’

আমি চুপ করে গেলাম। আখেরে রসে মন দিলাম। আজকের রস অন্যদিনের চেয়ে ভালো হয়েছে। অমৃতের কাছাকাছি। রস থেকে পুদিনা পাতার গন্ধ আসছে। যদিও কোনো পাতা দেখা যাচ্ছে না। দার্শনিকভাবে বলা যায়—“সে নেই তার গন্ধ রেখে গেছে।”

এক রাতে ওসি সাহেব তাঁর বাসায় দাওয়াত করলেন। তাঁর দেশের বাড়ি থেকে কৈ মাছ এসেছে। নানান পদের কৈ মাছ হবে। কৈ উৎসব।

বাসায় পৌছে দেখি জাটিল অবস্থা। ওসি সাহেবের কাজের মেঝে চুরি করে পালিয়েছে। গয়না টাকা-পয়সা নিয়েছে। কত টাকা, কী কী গয়না এখনো বের হয় নি। কারণ ওসি সাহেবের স্ত্রী নূপুরের এপিলেপ্টিক এ্যাটাক হয়েছে। সে আধমরার মতো শয়ে আছে।

ওসি সাহেব বললেন, ‘কাজের মেয়েটা টাকা গয়না নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে নি, যে হাঁড়িতে করে কৈ মাছ পাঠিয়েছে সেটাও নিয়ে গেছে।’ নূপুর বলল, ‘মেয়েটা যখন চুরি করছিল তখন আমার এ্যাটাক শুরু হয়েছে। আমি চোখের সামনে ছায়া ছায়া ভাবে দেখছি সে চাবি দিয়ে আলমিরা খুলছে। টাকা বের করছে। অথচ আমার কিছুই করার নেই।’

আমি বললাম, ‘তুমি কি একটু উঠে বসতে পারবে? আমার একটা ঘূম ঘুম খেলা আছে। এই খেলাটা খেলতাম। খেলাটা ঠিকমতো খেলতে পারলে এপিলেপ্টিক অসুখটা ভালো হয়ে যাবার কথা।’

ওসি সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, ‘প্রিজ! প্রিজ।’

আমি বললাম, ‘নূপুর আমি তোমাকে যা চিন্তা করতে বলব, তাই চিন্তা করবে। চোখ বন্ধ কর।’

নূপুর চোখ বন্ধ করল।

‘এখন তুমি আছ একটা গভীর বনে। চারদিকে বিশাল সব বৃক্ষ। আলো ছায়ার খেলা। তুমি আপন মনে ঘূরছ। তোমার চারপাশে কেউ নেই। ঘূরতে ঘূরতে হঠাতে একটা কাঠের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে। বাড়িটা অনেক উঁচুতে। সেখানে উঠার কাঠের সিঁড়ি আছে।

সিঁড়ি বেয়ে তুমি উঠছ । কারণ তুমি জান কাঠের বাড়িতে তোমার জন্যে
এক আনন্দময় বিশ্ময় অপেক্ষা করছে । তুমি একের পর এক সিঁড়ি ভাঙছ ।
যতই উপরে উঠছ ততই তোমার শীত শীত লাগছে এবং ঘুম পাচ্ছে ।
অনেক কষ্টে তুমি ঘুম আটকে রেখেছ । কারণ ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আর
আনন্দময় বিশ্ময়কর দৃশ্যটা দেখতে পাবে না ।

এখন তুমি কাঠের ঘরের দরজার সামনে । দরজায় হাত রাখা মাত্র
দরজা খুলে যাবে । দরজায় তুমি হাত রেখেছ । দরজা খুলে যাচ্ছে । নৃপুর,
তুমি কী দেখছ?

‘দেবশিশুর মতো একটা ফ্রক পরা বাচ্চা মেয়ে বসে আছে । সে মনে
হয় রাগ করেছে । ঠোঁট ফুলিয়ে রেখেছে ।’

‘মেয়েটা কার নৃপুর?’

‘মনে হয় আমার ।’

‘হাত বাড়াও । হাত বাড়ালেই মেয়েটা ঝাপ দিয়ে তোমার কোলে এসে
পড়বে । হাত বাড়াও । এখন মেয়েটা কোথায়?’

‘আমার কোলে ।’

‘দেখ ঘরে একটা খাট আছে খাটে বিছানা করা । তুমি তোমার
মেয়েকে নিয়ে খাটে উঠে পড় । এখন দু’জনই ঘুমাও । তোমার খুব শান্তির
ঘুম হবে । এই ঘুম যখন ভাঙ্গবে তখন তোমার মাথার অসুখটা সেরে যাবে ।
আর কখনো মাথায় ঝড় উঠবে না ।’

নৃপুর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল । ওসি সাহেব দৌড়ে গেলেন । ঝীকে
বিছানায় শুইয়ে দিলেন । ওসি সাহেবের চোখ ভর্তি বিশ্ময় । তিনি আমার
হাত ধরে কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, ‘নৃপুর কি সত্যি ভালো হয়ে যাবে?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ ।’ এতো বিশ্বাস কোথেকে পেলাম কে জানে । আমি
বললাম, ‘আপনাদের পরীর মতো রূপবতী একটা মেয়ে হবে । অবিকল
রূপার মতো । তাকে নিয়ে আপনাদের হবে সোনার সংসার ।’

‘রূপা কে?’

‘আছে একজন । সে আমার জন্যে অদ্ভুত সারপ্রাইজ নিয়ে অপেক্ষা
করে । আমি কখনো তা দেখি না ।’

‘কেন দেখেন না?’

‘দেখলেই তো সারপ্রাইজ নষ্ট । ভাই, আমি বিদায় নিচ্ছি ।’

এখন মধ্যদুপুর ।

আমি হিঁর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমার হাতে দুপুরমণি গাছের চারা।
অপেক্ষা করছি সেই মাহেন্দ্রক্ষগের যখন আমার ছায়া পড়বে না এবং
দুপুরমণি গাছে ফুল ফুটবে। অস্পষ্টভাবে মনে হল বাবা আমার সামনে
দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল। তিনি ধরা গলায় বললেন, ‘হিমু!
বাবা শোন, আমার দীর্ঘদিনের সাধনা নষ্ট হয় নি। তোকে দেখে বড়ই
আনন্দ হচ্ছে।’

‘বাবা আমি কি মহাপুরুষ হয়ে গেছি?’

‘বলা কঠিন।’

‘কঠিন কেন?’

‘সব মানুষের মধ্যেই একজন মহাপুরুষ বাস করেন। তাঁরা কখনো
প্রকাশিত হন। কখনো হন না। সমস্যা এইখানেই। তুই তোর মা’র ছবিটা
দেখেছিস?’

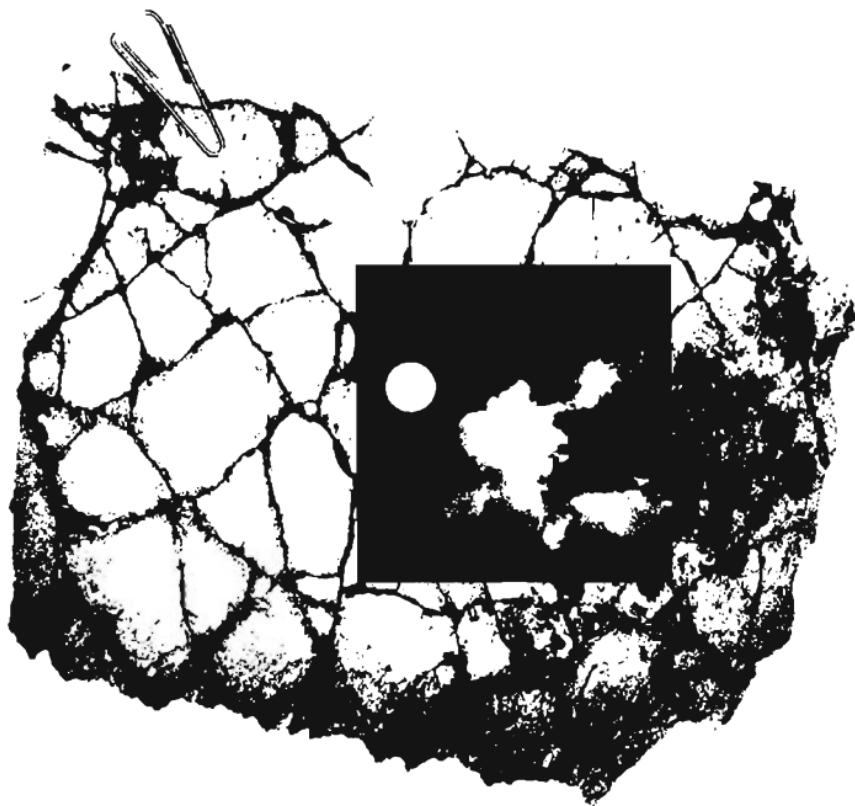
‘না।’

‘দেখবি না?’

আমি জবাব দিলাম না। আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্য মাথার উপর
উঠে গেছে, এখন কথা বলার সময় না।

নৈঃশব্দের সময়।

হিমুর নীল জোছনা



ঝুম বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল। এই বৃষ্টির আরেক নাম আউলা ঝাউলা বৃষ্টি। কিছুক্ষণ দক্ষিণ দিক থেকে ফোটা পড়ছে, কিছুক্ষণ উত্তর দিক থেকে। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপ্টা। সামান্য বিরতি, আবার শুরু। মেসবাড়ির একটা অংশে টিনের ছাদ। সেখানে শিলাবৃষ্টির ঝনঝন শব্দও হলো। ব্যাপারটা কী?

নভেম্বর মাস বৃষ্টি-বাদলার মাস না। আকাশে অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের জন্যে নিচয়ই কোনো গুড়বড় হয়েছে। আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি নেই। নভেম্বর-ডিসেম্বরে বৃষ্টি। হিমালয়ের বরফ গলে যাচ্ছে। হিমবাহ দক্ষিণ মেরু ছেড়ে সাগরে জ্বাসতে শুরু করেছে। পেঙ্গুইন পাখিরা ডিম দিচ্ছে না। সিল মাছরা পানি ছেড়ে গঠীর ভঙ্গিতে ডাঙায় বসে আছে। পৃথিবীর চৌম্বকশক্তিতেও নাকি কী সব হচ্ছে। উত্তর মেরু হয়ে যাবে দক্ষিণ মেরু। আমাদের কাছের মালদ্বীপ সমুদ্রে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে মালদ্বীপ ফুটবল টিমের সঙ্গে বাংলাদেশ হয়তো আর সেমিফাইন্যাল খেলবে না—এমন দুর্চিন্তা নিয়ে বিছানায় উঠে বসতেই শুনলাম, ভাইজান, ঘুম ভাঙছে? গুড মর্নিং ডিয়ার স্যার।

মাথা ঘোরালেই প্রশ্নকর্তাকে দেখতে পাব। মাথা না ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখা যাক। এই বৃষ্টি বেশিদিন দেখা যাবে না। পত্রিকায় পড়েছি—জলবায়ু যেভাবে বদলাচ্ছে তাতে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি হবে আরবে। উটের বদলে তারা কোষা নৌকায় চলাচল করবে। বাংলাদেশ হবে মরুভূমি। আমরা উটের পিঠে চড়ব। ভাত-মাছের বদলে ডিনার করব খেজুর দিয়ে।

ভাইজান কি একটু আমার দিকে তাকাবেন? সিম্পল রিকোয়েস্ট।

আমি তাকালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আসলে আমার ঘূম ভাঙে নি। এখনো ঘুমুচ্ছ এবং স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন ছাড়া এই দৃশ্য দেখা সম্ভব না।

দেখলাম, বিছানার পাশে হাতলভাঙা চেয়ারে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে আছেন। গায়ে আলখান্না। তিনি কলা দিয়ে পাউরটি খাচ্ছেন। বেশ আগ্রহ করে থাচ্ছেন। টেবিলের উপর বিড়ির প্যাকেট এবং দেয়াশলাইও দেখা যাচ্ছে। তিনি সম্ভবত ব্রেকফাস্ট শেষ করে বিড়ি ধরাবেন।

মহাপুরুষদের স্বপ্নে দেখাও বিড়ম্বনা। আমি একবার স্বপ্নে আইনস্টাইনকে দেখেছিলাম। তিনি বেত হাতে ক্লাস নিচ্ছেন। আমি ক্লাসের একজন ছাত্র। ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছি। সেখানে লেখা $E=mc^2$, আইনস্টাইন আমাকে বললেন, You boy, 'm' মানে কী? আমি বললাম, জানি না স্যার।

আইনস্টাইন বললেন, কাছে আয়। মেরে আজ তোর হাত্তি গুঁড়া করব।

আমি কাছে গেলাম না। তিনি নিজেই এগিয়ে এলেন। আমার ঘূম ভাঙ্গল বেতের বাড়ি থেয়ে।

এখানে ঘটনা কী বুঝতে পারছি না। গত রাতে বাঁদলের সঙ্গে বিয়েবাড়ির দাওয়াত খেতে পরিয়েছিলাম। খাসির রেজালার বিশাল বাটি দু'জনে শেষ করেছি। খামেলা কি সেখান থেকে ওরু? যাবতীয় দুঃস্বপ্ন নাকি বদহজমের কারণে হয়। পাউরটি হাতে কবিগুরুর উৎস সম্ভবত গত রাতের মনু বাবুচির খাসির রেজালা।

ভাইজান কি আমারে দেখে চমক খাইছেন?

আমি জবাব দিলাম না। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফেরা যায় কি না সেই চেষ্টা করছি।

আমার নাম ছামাদ। বহুরূপী ছামাদ। রবি ঠাকুরের ভেক ধরছি। হয়েছে না?

হয়েছে।

আমি কাজী নজরুল পারি। গান্ধিজি পারি। গান্ধিজি সাজলে ছাগল নিয়া ঘুরতে হয়, এইটা সমস্যা।

সমস্যা কী জন্যে?

ছাগল ভ্যা ভ্যা ডাক পাড়ে। একটা ছাগল দৌড় দিয়া পালাইছিল,
ধরতে পারি নাই। দুই হাজার তিনশ টাকার ছাগল। তারপর থাইকা ঠিক
করেছি গান্ধিজি অফ। আর না। ঠিক করেছি না?

অবশ্যই ঠিক করেছেন।

ভাইজান, চায়ের ব্যবস্থা কি করা যায়? সকালে পরপর দুই কাপ চা না
খেলে আমার পাইখানা ক্লিয়ার হয় না।

আমার গা দিয়ে হালকা শীতল স্রোত বয়ে গেল। গল্ল-উপন্যাসে
পড়েছি, অতি ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনার মুখোমুখি হলে মেরণ্দণ্ড দিয়ে শীতল
স্রোত বয়ে যায়। আমার ক্ষেত্রে সারা শরীর দিয়েই বইছে। আর কেনইবা
বইবে না! অবিকল রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে একজন লোক বলছে
সকালে দুই কাপ চা না খেলে তার পাইখানা ক্লিয়ার হয় না। কী ভয়ঙ্কর!
আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, ছামাদ, আপনি কি আমাকে চেনেন?

জি-না। আপনার দরজা খোলা ছিল, ঢুকে পড়েছি। গুস্তাকি মাফ হয়।
আর আমারে আপনি বলবেন না। তুমি। স্বেফ তুমি। আপনার দিল যদি
চায় তুইও বলতে পারেন।

তুমি কি মেসের অন্য কাউকে চেনোৱা

জি-না।

আমার এখানে উদয় হলে কীভাবে বলবে?

ছামাদ বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, সকালে নাশতা করার জন্যে একটা
পাউরঞ্চি আর দুটা কলা কিনেছি। পার্কে যাব। বেঞ্চে বসে নাশতা করব।
মাথায় এই চিত্ত। শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। সঙ্গে নাই ছাতা। কী করি কী করি?
দেখি মেসের দরজা খোলা। ঢুকে পড়লাম। দারোয়ান আমাকে দেখল কিন্তু
কিছু বলল না। মনে হয় পোশাক দেখে টাসকি খেয়েছে। এই হচ্ছে ঘটনা।
আর কিছু জানতে চান?

রবি ঠাকুর, নজরুল, গান্ধিজি—এদের ভেক ধরার প্রয়োজন কী?

ভিক্ষার সুবিধা হয়। ধরেন রবি ঠাকুর সাজলাম, যারা রবি ঠাকুরের
চিনে তারা খুশি হয়ে পাঁচ-দশ টাকা দেয়। একবার পাঁচশ টাকা
পেয়েছিলাম। এক আপা দিয়েছিলেন। উনার মোবাইল নাম্বার আছে আমার
কাছে। অনেকে ঘাড়ে হাত দিয়ে ছবি তুলে। সবার হাতে মোবাইল, ছবি
তুলতে অসুবিধা নাই। খটাখট পিকচার।

চুল দাঢ়ি সব নকল?

জি। তবে টাইট ফিটিং, টানাটানি করলেও ছুটবে না। দাঢ়ি ধরে টান দিয়া দেখেন।

ছামাদ মুখ এগিয়ে দিল।

ভাইজান, শক্ত করে টান দেন। কোনো অসুবিধা নাই। ছুটে গেলে গাম দিয়ে লাগায়ে ফেলব। গাম সাথে আছে।

আমি দাঢ়ি ধরে টানলাম। দাঢ়ি মুখ থেকে খুলে এল না। ছামাদ আনন্দিত গলায় বলল, রবি ঠাকুর সাজা আমার জন্যে সহজ। আমার চেহারাটা উনার মতো। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। আগে পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি ছিল। অভাবে অনটনে উচ্চতা এক ইঞ্চি কমেছে।

আলখান্না পেয়েছ কোথায়?

আমার এক চাচাতো ভাই আছে, নাম সামছু। এফডিসিতে কাজ করে। ডাইরেক্টর এমদাদ সাহেবের থার্ড এসিস্টেন্ট। সে বানায়ে দিয়েছে। এফডিসির দরজি বিরাট এক্সপার্ট। যা বলবেন বানায়ে দেবে। রবি ঠাকুরের ড্রেস ঠিক আছে না?

আমি বললাম, সবই ঠিক আছে। পায়ের স্পঞ্জের স্যান্ডেল ঠিক নাই। চটিজুতা দরকার। উনি চটিজুতা পরতেন।

জানি। টাকার অভাবে কিনতে পারি না। দুইবেলা খাওয়া জুটে না, আর চটিজুতা! উনেছি রবি ঠাকুর ছিলেন জমিদারের ছেলে, আর আমার বাবা ছিলেন মোটর মেকানিক। কার্বুরেটরের কাজ উনার মতো কেউ জানত না। যারা গেলেন ক্যানসারে। মৃত্যুর আগে আমারে বললেন, বাবা ছামাদ, যা করতে মন চায় করবি। একটাই উপদেশ, কার্বুরেটর ঠিক রাখবি। গাড়ির যেমন কার্বুরেটর ঠিক থাকলে সব ঠিক, মানুষেরও একই ঘটনা।

তোমার কার্বুরেটর কীভাবে ঠিক রাখছ?

দুষ্ট কাজ কখনো করি না। খাওয়া জুটলে খাই, না জুটলে নাই। রবি ঠাকুর সাইজা মানুষের আনন্দ দেই। মানুষের আনন্দ দেওয়া বিরাট সোয়াবের কাজ।

টেবিলে পাউরটির কিছু গুঁড়া পড়ে ছিল। ছামাদ আঙুলে করে পাউরটির গুঁড়া মুখে দিয়ে দিল। আমি বললাম, চলো তোমাকে চটিজুতা কিনে দেই। রবি ঠাকুর স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে ঘুরছেন এই দৃশ্য সহ্য হচ্ছে না।

আগে চা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সকালে চা না খেলে অস্তির লাগে। একটা বিষয় বুঝলাম না, রবি ঠাকুর সাজলে অল্পতেই অস্তির লাগে। ভাইজান, উনি কি অস্তির ছিলেন?

মনে হয় না। তিনি অস্তির প্রকৃতির হলে বাংলা সাহিত্যে অস্তিরতা চলে আসত। তুমি উনার লেখা কিছু পড়েছ?

ইঙ্গুলে তালগাছের লেখাটা পড়েছিলাম। ‘তালগাছ একপায় দাঁড়িয়ে’— এটা। লেখাটায় ভুল আছে।

কী ভুল?

উনি লিখেছেন ‘উকি মারে আকাশে’। গাছের কি চৌখ আছে? আসমানের দিকে ক্যামনে উকি মারবে। বিরাট ভুল না?

আমি চুপ করে রইলাম। ছামাদ উৎসাহের সঙ্গে বলল, বড় মানুষ ভুল করেছে এইজন্যে পাবলিক কিছু বলে না। আপনে আমি ভুল করলে খবর ছিল। বিড়ি একটা খাবেন? খালিপেটে বিড়ির আলাদা মজা। ধোঁয়া ব্রেইনের মধ্যে গিয়া লাগবে।

আমি খালিপেটে বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ব্রেইনে লাগানোর ব্যবস্থা করলাম। ব্রেইনের চেয়ে ফুসফুসে বেশি লাগছে। কাশতে কাশতে জীবন বের হওয়ার উপক্রম।

ছামাদ বলল, কেমন বুঝতেছেন?

আমি কাশতে কাশতে বললাম, ভালো বুঝতেছি।

ঠ্যাং উপরে মাথা নিচে—এই অবস্থায় বিড়ি কখনো খেয়েছেন?

না।

বিরাট মজা। প্রথমে মাথার মধ্যে একটা চক্র দেয়। তারপরে...

তারপরে কী?

এখন বলব না। প্র্যাকটিক্যালে দেখবেন। যদি অনুমতি দেন আজ সারা দিন আছি আপনার সাথে।

সারা দিন তোমাকে নিয়ে আমি করব কী?

ছামাদ হাই তুলতে তুলতে বলল, আত্মীয়-বান্ধবের বাড়িতে নিয়া যাবেন। বলবেন, রবি ঠাকুর নিয়া আসছি। অটোগ্রাফ নিতে চাইলে নাও। ছবি তুলতে চাইলে তোলো। দশজনের মধ্যে আটজন বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু দুইজন বিশ্বাস করবেন। তখনই মজা। ভাইজান, চায়ের ব্যবস্থা কিন্তু এখনো করেন নাই।

আমি বিছানা থেকে নামতে বললাম, চলো মাজেদা খালার
ফ্ল্যাটে যাই। চা-নাশতা সেখানেই হবে।

মাজেদা খালা চোখ কপালে তুলে বললেন, বসার ঘরে কে বসে আছে?

আমি বললাম, অনুমান করো কে?

রবি ঠাকুর নাকি?

হ্যাঁ।

বলিস কী? উনি মারা গেছেন না?

তাঁর ক্লোন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

বলিস কী? উনার ক্লোন হয়েছে? জানতাম না তো। একটা ভেড়ার
ক্লোন হয়েছে জানি, নাম ডলি।

নিজের চোখেই তো দেখলে। পত্রিকা পড়ো না, জানবে কীভাবে?
আজকের পত্রিকা পড়েছ? শুরুদের সম্পর্কে নিউজ থাকার কথা।

খালা বললেন, আমার তো মনে হয় ড্রেস আজ ইউ লাইক। কেউ রবি
ঠাকুর সেজেছে।

আমি বললাম, তুমি জীবনে কৃষ্ণনো ড্রেস আজ ইউ লাইকে কাউকে
রবি ঠাকুর সাজতে দেখেছ? মন্তি সাজে, মুক্তিযোদ্ধা সাজে। চুড়িওয়ালা,
বাদামওয়ালা সাজে। রবীন্দ্রনাথ সাজে না।

খালা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। আমি বললাম, চা-নাশতার ব্যবস্থা করো
খালা। বিখ্যাত মানুষ। চিরতার পানি আছে?

চিরতার পানি দিয়ে কী হবে?

রবি ঠাকুর সকালে নাশতার আগে এক গ্লাস চিরতার পানি খেতেন।
ইনিও খান। তবে এক গ্লাস খান না। এক চামচ।

চিরতার পানি এখন কোথায় পাব?

তিতা করলা চিপে রস বের করে এক চামচ দাও। এতেই হবে।

নাশতা কী দেব?

গোশত-পরোটা, ডিমের ওমলেট।

উনি কি গরুর মাংস খান?

অবশ্যই। গরুই এখন উনার প্রধান খাদ্য।

তুই কি কাউকে রবি ঠাকুর সাজিয়ে নিয়ে এসেছিস?

এই কাজটা আমি কেন করব? আমার স্বার্থ কী?

সেটা ও একটা কথা।

খালু চিন্তিত মুখে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খালু সাহেবের ঘরে আমার ডাক পড়ল। খালু সাহেব খাটে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর চোখমুখ কঠিন। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। এটা নতুন কিছু না। সবসময় এরকমই থাকে। শুধু যখন কঠিন ডায়েরিয়া হয় তখনই তাঁর চোখমুখ স্বাভাবিক দেখায়। মনে হচ্ছে আজ তিনি ডায়েরিয়ামুক্ত। খালু সাহেবের সামনে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ। যেসব বঙ্গভাষী ইংরেজি খবরের কাগজ পড়েন তাদের জাত আলাদা। আমি খালু সাহেবের বাঁ-পাশে রাখা সাইড টেবিলে বসতে বসতে বললাম, কেমন আছেন খালু সাহেব? ওরস্যালাইন চলছে নাকি চলছে না?

তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, চেয়ারে বসো। সাইড টেবিল বসার জন্যে না। আর শোনো, ডোন্ট ট্রাই টু বি ফানি। তুমি চার্লি চ্যাপলিন না।

আমি জায়গা বদল করলাম। খালু সাহেব শান্ত গলায় বললেন, তুমি নানাবিধ যন্ত্রণা তৈরি করেছ। বর্তমান যন্ত্রণাটির নাম কী?

আমি বললাম, কোন যন্ত্রণার কথা বলছেন?

সোফাতে শুয়ে সকালবেলা যে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে সে কে?

তার ভালো নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডাকনাম ছামাদ। ছামাদ মিয়া।

আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না। Speak out.

ছামাদ মিয়া রবীন্দ্রনাথ সেজেছে। সে আগে একটা চায়ের দোকানের ক্যাশিয়ার ছিল। টাকা চুরির অপরাধে চাকরি গেছে। তবে সে রবীন্দ্রনাথের কসম খেয়ে বলেছে যে, টাকা চুরি করে নি। ছামাদ বাবার উপদেশ মতো তার কার্বুরেটর ঠিক রেখেছে। যাদের কার্বুরেটর ঠিক তারা চুরি চামারি করে না। ছামাদের বাবা মোটর মেকানিক। তাঁর মটো হলো—‘কার্বুরেটর ঠিক থাকলেই সব ঠিক। হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা কার্বুরেটর ঠিক রাখো।’

অকারণ কথা বলবে না। বদটা রবীন্দ্রনাথ সেজেছে কেন?

অল্পকথায় বলব, না ব্যাখ্যা করে বলব?

অল্পকথায় বলো।

সারা পৃথিবীতেই বিখ্যাত ব্যক্তির মতো সাজার প্রবণতা আছে। চার্লি চ্যাপলিনের জীবদ্ধাতেই চার্লি চ্যাপলিন সেজে পাঁচজন ঘুরে বেড়াত।

এদের আলাদা করা মুশকিল হতো। আইনস্টাইনের সময়ে তিনজন আইনস্টাইনের ভেক ধরেছিল। এক নকল আইনস্টাইন বিজ্ঞানী নীলস বোরের সঙ্গে দেখা করে বলেছিল—‘থিওরি অব রিলেটিভিটি বোগাস!’ আইনস্টাইনের কথা শুনে নীলস বোরের মাইল্ড স্ট্রাকের মতো হয়েছিল। তিনি বুঝতেই পারেন নি যে নকল আইনস্টাইনের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আমাদের ছামাদও একই পথের পথিক।

খালু সাহেব ইংরেজি খবরের কাগজ চোখের সামনে ধরতে ধরতে বললেন, তোমাকে তিন মিনিট সময় দিলাম। এই তিন মিনিটের মধ্যে তুমি ঐ বন্ধন নিয়ে বিদায় হবে। আর কোনোদিন যেন তোমাকে এবং ঐ বন্ধনকে আমার ফ্ল্যাটে না দেবি।

আমি বললাম, তিন মিনিটের মধ্যে তো খালু সাহেব বিদায় হতে পারব না। শুরুদেব নাশতা করবেন। দু'কাপ চা খাবেন। চা খাবার পর তার পাইখানা ক্লিয়ার হবে। তারপর তিনি যাবেন। উনি আপনার ফ্ল্যাটে এসেছেন পাইখানা ক্লিয়ার করার জন্যে।

খালু সাহেবের হাত থেকে পত্রিকা পড়ে গেল। তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তাঁর চোখে আগুন দাঁড়িদাউ করছে। খালু সাহেব সাধু-সন্ন্যাসী পর্যায়ের কেউ হলে তাঁর চোখের আগুনে আমি ভস্ম হয়ে যেতাম। ভাগিয়স তিনি সাধু-সন্ন্যাসী নন। ইংরেজি খবর পড়া বাঙালি সন্তান, যার মাসে দু'বার সিরিয়াস ডায়েরিয়া হয়।

You get lost!

আমি মধুর ভঙ্গিতে হেসে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

টেবিলে নাশতা দেওয়া হয়েছে। মাজেদা খালা এবং তাঁর নতুন কাজের মেয়ে হামিদা পাশেই দাঁড়িয়ে। মাজেদা খালার চোখে কৌতুহল। হামিদার চোখে ভয়। কাজের মেয়েরা কী কারণে জানি ভয় পেতে পছন্দ করে।

শুরুদেব টেবিলে বসে খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মাজেদা খালা বললেন, চায়ের কাপে করলার রস। আগে করলার রস খান। শুরুদেব বললেন, করলার রসের আমি কেঁথা পুড়ি।

মাজেদা খালা এবং হামিদা মুখ চাওয়া-চাওয়ি পর্বের ভেতর দিয়ে গেল। ‘কেঁথা পুড়ি’ রাবিন্দ্রিক ভাষার মধ্যে পড়ে না।

ছামাদ কাজের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বুয়া?

বুয়া এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, জে স্যার।

চুরি করবা না খবরদার। কার্বুরেটর ঠিক রাখবা।
বুয়া চিঞ্চিত গলায় বলল, জে আচ্ছা রাখুম নে।
ঘরে পান আছে না?

জে আছে।
জর্দা দিয়ে পান রেডি রাখো।
জে আচ্ছা।

মাজেদা খালা ফিসফিস করে বললেন, উনি কি দুপুরে খাবেন? দুপুরে
খেলে উনার পছন্দের খাবার তৈরি করতাম।

আমি বললাম, অন্য কোনো দুপুরে এসে খেয়ে যাব। আজ উনি অনেক
জায়গায় যাবেন। খালু সাহেবের গাড়িটা পাওয়া গেলে ভালো হতো। উনার
মতো মানুষকে নিয়ে তো রিকশায় করে যাওয়া যায় না। দেখি কী করা
যায়।

খালু সাহেব নতুন গাড়ি কিনেছেন—টয়োটা আলাফার্ডে না কী যেন
নাম। নিশ্চয়ই দামি গাড়ি। কারণ এই গাড়ি বের করা হয় না। গ্যারেজে
জামা গায়ে দিয়ে রাখা হয়। ড্রাইভার মজিদ সঙ্গে দুইদিন গাড়ির গায়ে কী
সব ক্রিয় ঘৰাঘৰি করে।

গুরুদেবকে নিয়ে আমি নিচে সাথেতেই খালু সাহেবের ড্রাইভার মজিদের
সঙ্গে দেখা। আমি বললাম, মজিদ! উনাকে চিনেছ? মজিদ বলল, উনারে
চিনব না! কী বলেন হিমু ভাই। উনার গানের সিডিতে আমার গাড়ি ভর্তি।

মজিদ এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে কদম্বুসি করল। আমি বললাম, নতুন
গাড়িটা বের করো। আজ উনাকে নিয়ে ঘুরব। পত্রিকার অফিসে যেতে হবে।
ইন্টারভিউ-এর কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখা দরকার। টিভি
চ্যানেলগুলোর সঙ্গে কথা বলতে হবে। একটা টকশো'র ব্যবস্থা যদি হয়ে যায়।
চ্যানেলগুলোতে রান্নারও নানান অনুষ্ঠান হয়। সেখানে উনাকে সেলিব্রেটি
হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। রান্নার একটা অনুষ্ঠান 'বাংলার
ভর্তা'। সেখানে উনি একটা রেসিপি দিতে পারেন—'কাঁচকলার খোসার
ভর্তা'। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাংলা সাহিত্য নিয়ে কথা বললেন।

খালু সাহেবের দামি গাড়ি চলছে। আমি বসেছি ড্রাইভারের পাশে।
ছামাদ পেছনের সিটে আয়েসি ভঙ্গিতে বসা। গাড়িতে গান বাজছে।
গুরুদেবের গান—

'আহা আজি এ বসন্তে'

ছামাদ বলল, ভাইজান, ঘিমানি গান না। হিন্দি ছাড়েন। শমসাদ বেগমের সিডি আছে? উনার একটা গান ‘সাঁইয়া দিলমে আনা রে’ নোবেল প্রাইজের যোগ্য। আজেবাজে জিনিস নোবেল পায়। ভালোটা পায় না। আফসোস।

হিন্দি গানের ক্যাসেট খুঁজে পাওয়া গেল না। ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ুয়া বঙ্গসন্তানরা হিন্দি গান শোনেন না। তাঁরা রবীন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, দিজেন্দ্র গীতিতে নিজেদের আটকে রাখেন।

ভাইজান, আমরা কই রওনা দিলাম?

বুঝতে পারছি না। প্রথম যাচ্ছি কোনো একটা টিভি চ্যানেলের অফিসে। দেখি কিছু করা যায় কি না।

আপনার মতলব তো বুঝতেছি না। মতলব খোলাসা করেন।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, মতলব আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। দেখি কী হয়। প্রথম চেষ্টা টকশো।

ছামাদ বলল, জিনিসটা কী?

কথা বলার অনুষ্ঠান। কথা বলতে পারো তো?

এক বছর বয়স থাইকা কথা বলা ধরেছি। প্রথম কথা কী বলি শুনতে চান?

চাই।

বাপজানের কাছে শুনেছি আমার প্রথম কথা—‘ঘাউ’।

ঘাউ কী?

ছামাদ দৃঢ়ঘিত গলায় বলল, জানি না কী। শিশুবয়সে কী ভাইব্যা বলেছি কে জানে। এখনো মাঝে মধ্যে চিন্তা করি—ঘাউ কেন বলতাম। ষেউ বললেও বুবতাম কুকুরের ভাষা। ঘাউটা কী?

ছামাদ চোখ বন্ধ করল। মনে হয় ‘ঘাউ’ কেন বলত তা-ই ভাবছে। আমি নিজেও চোখ বন্ধ করলাম। আমারও শৈশবে ফেরার চেষ্টা।

শৈশবে আমার প্রিয় বই ছিল মোহন সিরিজ। দস্যু মোহনের রোমাঞ্চকর কাণ্ডকারখানা। তার মানবসেবা। একটা বইতে পড়লাম দস্যু মোহনকে পদ্মার বুকে লঞ্চের ডেকে ধরা হলো। তাকে বস্তায় ভরে, বস্তার মুখ সেলাই করে পদ্মায় ফেলে লঞ্চ চলে গেল।

এর পরপরই লেখক লিখলেন, “তাহার পরে কীভাবে কী ঘটিল কে জানে, দস্যু মোহনকে দেখা গেল পদ্মার পাড়ে বসিয়া হাসিমুখে চুরুট টানিতেছে।”

লেখক সন্তুষ্টির দস্য মোহনকে বস্তার ভেতর থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ‘কীভাবে কী ঘটিল কে জানে’র আশ্রয় নিয়েছেন।

ছামাদের বিষয়েও আমি লিখতে পারি—“কীভাবে কী ঘটিল কে জানে, ছামাদকে দেখা গেল পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর সঙ্গে একটি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতেছে।”

এখনকার পাঠকরা অনেক সচেতন। কাজেই ‘কীভাবে কী ঘটিল কে জানে’-তে যাওয়া যাচ্ছে না। কীভাবে ঘটেছে তার ব্যাখ্যায় যেতেই হবে।

ছামাদকে নিয়ে আমি একটি টিভি চ্যানেলের অফিসে টুকলাম। চ্যানেলের নাম দিচ্ছি না। তারা মামলা-মোকদ্দমা করে দিতে পারে। ধরা যাক টিভি চ্যানেলের নাম ‘চ্যানেল আঁধি’।

রিসিপশনে এক ট্যারা সুন্দরী বসে আছে। চ্যানেলের মালিকরা তাদের সব আত্মীয়স্বজনকে চ্যানেলে ঢাকরি দেন। এই রূপসী ট্যারার অন্য কোথাও কিছু হচ্ছিল না বলেই মনে হয় এখানে কাজ পেয়েছে।

ট্যারারা কার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে বোৰা কঠিন। তাদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় জটিল অস্বত্তিতে থাকতে হয়। তরুণী আমাকে কিংবা ছামাদকে বিরক্ত মুখে বলল, ‘আলাপচারিতা’ অনুষ্ঠানে এসেছেন?

আমি বললাম, জি ম্যাডাম, উনি এসেছেন, আমি স্যারের পিএ।

এত লেট করেছেন! লাইভ অনুষ্ঠান। মন্ত্রী মহোদয় বসে আছেন। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। দর্শকরা সরাসরি টেলিফোন করছেন। এক্ষুনি চলে যান চার নম্বর স্টুডিওতে।

আমি বললাম, চার নম্বর স্টুডিও তো চিনি না।

রিসিপশনিস্ট বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

মহিলা ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে, আমরাও তার পেছনে ছুটছি। এর মধ্যে মহিলা মোবাইল টেলিফোনে কাকে যেন বলল, সমৃদ্ধ স্যার। উনি চলে এসেছেন। আমি নিয়ে যাচ্ছি। সিচুয়েশন আভার কনট্রোল।

স্টুডিওতে আমি টুকতে পারলাম না। বাইরে বসে রইলাম। যেখানে বসে আছি সেখানে এক বিশাল ফ্ল্যাটক্রিন টিভি। টিভিতে দেখছি রূপবতী হাস্যমুখী এক উপস্থাপিকা। শুধু তার ঠোঁট কুচকুচে কালো। আজকাল কালো লিপস্টিকের চল হয়েছে। দেখেই মনে হয় বিড়ি খাওয়া মহিলা। উপস্থাপিকার পাশে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। উনি বেঁটে এবং স্তুলকায়।

পায়জামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে মুজিবকোট পরেছেন। মুজিবকোট বঙ্গবন্ধুকেই মানায়। এই কোট বেঁটে এবং মেটারা পরলে তাদের লাগে পেঙ্গুইন পাথির মতো। মন্ত্রী মহোদয়ের পাশে হাস্যমুখী ছামাদ। বাকি ঘটনা নিম্নরূপ।

উপস্থাপিকা : যানজটের কারণে আমাদের একজন অতিথির অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে সামান্য বিলম্ব হয়েছে। তার জন্যে দর্শকমণ্ডলির কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতিথির পরিচয় দিচ্ছি, তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশ বিজ্ঞানী ডা. সালাত হোসেন খান। কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত পরিবেশ বিষয়ক...

ছামাদ: ম্যাডাম, সামান্য মিসটেক হয়েছে। আমার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে রবিদা বলতে পারেন।

[মন্ত্রী মহোদয় এবং উপস্থাপিকার মুখ চাওয়াচাওয়ি। উপস্থাপিকার মুখের হাসি নিভে গিয়েছিল, তিনি অতিদ্রুত সেই হাসি নিয়ে এলেন।]

উপস্থাপিকা : আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে! কোন রবীন্দ্রনাথ?

ছামাদ : তালগাছ রবীন্দ্রনাথ।

‘তালগাছ উঁকি মারে আকাশে’। যদিও ইহা সম্ভব নহে। তালগাছের চক্ষু নাই। আপু, এ গানটা কি শুনেছেন—‘ও আমার চক্ষু নাই রে’?

মন্ত্রী মহোদয় : What is happening? Who is this person?

ছামাদ : (মুখভর্তি হাসি) পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করতে করতে) আপু, এখানে কি বিড়ি খাওয়া যাবে? (মন্ত্রী মহোদয়ের দিকে বিড়ির প্যাকেট বাঢ়িয়ে) স্যার, একটা টান দিয়া দেখেন মাথায় কেমুন চকুর দেয়।

(রিং বাজছে)

উপস্থাপিকা : (এখনো মুখভর্তি হাসি) দর্শকদের একজন টেলিফোন করেছেন। ভাই, আপনি আপনার বাসার টিভি সেটের সাউন্ড কমিয়ে দিন। এখন বলুন আপনার নাম কী?

দর্শক : নূরে আলম।

উপস্থাপিকা : আপনি কোথেকে টেলিফোন করেছেন?

দর্শক : মগবাজার।

উপস্থাপিকা : মগবাজার থেকে জনাব নূরে আলম টেলিফোন করেছেন। আপনি কার সঙ্গে কথা বলতে চান?

দর্শক : গুরুণ্দেবের সঙ্গে ।

রবিদা, ভালো আছেন?

ছামাদ : ভালো আছি ।

দর্শক : আপনি রিয়েল না ফলস?

ছামাদ : (বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করছেন বলে জবাব দিতে পারছেন না ।)

মন্ত্রী মহোদয় : প্রচার বক্ষ হচ্ছে না কেন?

দর্শক : রবিদা, আপনার পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল কেন?

ছামাদ : ভাই, চটিজুতা খরিদ করতে পারি নাই । এখান থেকে বের হয়ে খরিদ করব ইনশাল্লাহ ।

মন্ত্রী মহোদয় : অনুষ্ঠান এক্সুণি বক্ষ করা প্রয়োজন । সম্মত কোথায়?

সম্মত ।

ছামাদ: স্যার সম্মত কর্তব্যাজারে । এখানে সম্মত কই পাবেন!

উপস্থাপিকা : (মুখের হাসি আরো বিস্তৃত) কারিগরি ত্রুটির কারণে আলাপচারিতা অনুষ্ঠানটি এখন প্রচার করা যাচ্ছে না বলে আমরা দৃঢ়বিত ।
দর্শকদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ।

অনুষ্ঠান প্রচার বক্ষ হয়ে গেল । ক্ষুক হলো ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠানের ফিলার । কাকতালীয়ভাবে সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচ হচ্ছে । বর্ধার গান—“আজি স্বরবর মুখের বাদল দিনে ।” নাচছেন অভিনেত্রী তানিয়া । ছবির নাম ‘নয় নম্বর বিপদ সংকেত’ ।

আমি মুক্ষ হয়ে নাচ দেখছি । ঘরে পাঞ্জাবি পরা এক লোক টুকেছেন । তিনি ক্ষুক গলায় বলছেন, রবীন্দ্রনাথকে কে নিয়ে এসেছে খুঁজে বের করো । স্যাবোটাজ হয়েছে । বিরাট স্যাবোটাজ । পুলিশে কি খবর দেওয়া হয়েছে?

চারদিকে ছোটাছুটি হচ্ছে । এখন আর চ্যানেলের অফিসে থাকা সমীচীন নয় বলে কেটে পড়ার প্রস্তুতি নিলাম । ‘য পলায়তি স জিবতী ।’

কেটে পড়া সম্ভব হলো না । রিসিপশনের মেয়েটি বলল, আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিএ না?

জি ।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ম্যাডাম চলে যাচ্ছি । গুরুণ্দেবকে রেখে গেলাম । টকশোতে সামান্য ঝামেলা হয়েছে । তাতে সমস্যা নেই, অন্য যে-কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে

চুকিয়ে দিতে পারেন। আপনাদের একটা অনুষ্ঠান আছে না—‘জাপানি রান্না’? গুরুদেব জাপানি রান্নায় আগ্রহী। তাঁর একটা বই আছে ‘জাপান যাত্রীর পত্র’, সেখানে....

কথা বলবেন না। এবং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আসছে। আপনারা দু'জনই থানায় যাবেন।

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ম্যাডাম কাজটা কি ভালো হবে? ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেশার’—শুনতেও খারাপ। আপনাদের চ্যানেলে প্রেশার হয়েছেন এটা আপনাদের জন্যে ব্যাড পাবলিসিটি।

কথা শেষ হওয়ার আগেই পুলিশ চলে এল। আমাদের তিনজনের স্থান হলো ধানমন্ডি থানার হাজতে। আমি, ছামাদ এবং খালু সাহেবের ড্রাইভার মজিদ। মজিদ হতভয়। এটাই নাকি তার প্রথম হাজত খাটা।

মজিদ বারবার বলছে, আমারে কেন পুলিশ ধরল! আমি করেছি কী? আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমার বাবা ভুরুঙ্গামারীতে যুদ্ধ করেছেন।

ছামাদ বলল, ভুরুঙ্গামারী জায়গাটা কেথায়?

মজিদ বিরক্ত গলায় বলল, আমি জানব কীভাবে? যুদ্ধ তো আমি করি নাই। আমার বাবা করেছেন।

আপনার বাবা যেখানে যুদ্ধ করেছেন সেখানে আপনি যাবেন না? দেখে আসবেন না? আপনার তো কার্বুরেটর ঠিক নাই।

আমার আবার কার্বুরেটর কী? আমি গাড়ি নাকি? আপনি রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন বলে যা মন চায় বলবেন?

আমি যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি। এই শুণটি আমি ছামাদের মধ্যেও দেখলাম। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি টানছে। মজিদ অস্ত্রি। সে হাঁটাহাঁটি করছে। একটু পরপর বলছে, কী করি কন তো?

পুলিশ কনস্টেবলদের একজন পুরোপুরি বিভ্রান্ত। লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। চলে যায় আবার আসে। এক পর্যায়ে সে নিজের কৌতুহল সামলাতে না পেরে আমাকে বলল, দাঢ়িওয়ালা উনার পরিচয় কী?

আমি বললাম, উন্নার নাম রবীন্দ্রনাথ।

বিশ্বকবি?

ইঁ।

উন্নার মতো মানুষ হাজতে। কী অবস্থা! তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে
একবার দেখলাম সব বিশিষ্টজন গ্রেপ্তার। হাসিনা আপা, খালেদা ম্যাডাম।
এখন বিশ্বকবি হাজতে। উনি করেছেন কী?

অভিযোগ এখনো তৈরি হয় নাই। ‘টিভি চ্যানেলে হামলা’ জাতীয় কিছু
হবে।

উনি বিড়ি টানতেছেন দেখে মনটা দেওয়ানা হয়েছে। সাধারণ কেউ
তো না। বিশ্বকবি। জিজ্ঞেস করেন তো উনি চা খাবেন কি না।

আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন।

পুলিশ কনস্টেবল বিনীত গলায় বলল, কবি সাব, চা খাবেন? চা এনে
দেই?

ছামাদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঘাউ’।

পুলিশ কনস্টেবল লাফ দিয়ে সরে গেল।

শুরু হলো আমাদের হাজতবাস।

আমরা তিনজন ওসি সাহেবের খাস কামরায়, তার মুখোমুখি বসেছি। ওসি
সাহেবের চেয়ারটা মনে হয় নতুন কেনা হয়েছে। গদির সঙ্গে লাগানো
পলিথিনের ঢাকনা এখনো খোলা হয় নি। চেয়ারটা রিভলভিং। ওসি সাহেব
অঙ্গীর প্রকৃতির। সারাক্ষণই চেয়ার ঘোরাচ্ছেন। একবার এদিকে
তাকাচ্ছেন, পরমুহূর্তে সাঁই শব্দে চেয়ার ঘুরে যাচ্ছে।

ওসি সাহেবের বাঁপাশে সিভিল ড্রেস একজন বসে আছেন। তার হাতে
ওয়াকিটকি। এতে বোৰা যাচ্ছে তিনিও পুলিশের একজন। তার মুখভর্তি
বসন্তের দাগ। এই ধরনের খাবলা খাবলা মুখ আজকাল আর দেখা যায় না।
চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় থেকে আমরা
বঞ্চিত হচ্ছি।

ওসি সাহেবের হাতেও ওয়াকিটকি। তিনি বিরক্তমুখে কার সঙ্গে যেন
কথা বলছেন। এর মধ্যে মজিদ বলল, স্যার আমি একজন জেনুইন

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমার পিতা ভূরঙ্গামারিতে ফাইট করেছেন। উনার সাথীরা সবাই মারা পড়েছেন। আমার পিতাও মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন।

ওসি সাহেব হস্কার দিয়ে উঠলেন, আমি একজনের সঙ্গে কথা বলছি দেখস না বদামইশ? থাপ্পড় খেতে চাস? পুলিশের থাপ্পড় কখনো খেয়েছিস?

জি-না স্যার।

বিড়বিড় করছিস কী জন্যে?

দোয়া পড়তেছি স্যার। দোয়ায়ে ইউনুস। ইউনুস নবী মাছের পেটে এই দোয়া পড়ে খালাস পেয়েছিলেন।

মনে মনে পড়, ঠোঁট নাড়বি না। ঠোঁট নড়লে সুই দিয়ে ঠোঁট সিলাই করে দেব।

ঠোঁট আর নড়বে না স্যার। Promise.

ওসি সাহেব ওয়াকিটকি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার গলা দিয়ে বুলবুল আওয়াজ বের হচ্ছে। তিনি মাঝে মাঝে চেয়ারটা পুরোপুরি ঘোরাচ্ছেন। ৩৬০ ডিগ্রি এঙ্গেল পূর্ণ করছেন। তিনি যে মজা পাচ্ছেন তা বোঝা যাচ্ছে। উনার নাম নাজমুল হুস্তান প্লাস্টিকের লেখা নাম। পকেটের উপর লাগানো। ‘হুস্ত’ কারও নাম হতে পারে না। আরবের এক পাখির নাম হুদ। মনে হয় ‘হুদা’ নাম। আক্ষেত্রে পড়ে গেছে।

নাজমুল হুদ ওয়াকিটকি মুখের কাছে নিয়ে বললেন, স্যার এখন আপনি ডিসিশান দিন—এই তিনটাকে নিয়ে আমি কী করি। মন্ত্রী মহোদয়ের টেলিফোন পেয়ে ছুটে গেছি। তিনটাকে ধরে নিয়ে এসেছি। এখন কী? চ্যানেল আঁধির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা কোনো মামলা করবে না বলে জানিয়েছে।

মন্ত্রী মহোদয়ের পিএস-এর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন, স্যার কিছুই বলবেন না। উনি কোনো দায়িত্বও নিবেন না। প্রথমবার মন্ত্রী হয়েছেন তো, কোনো ঝামেলা চান না। তিনি মিডিয়ার ভয়ে অস্ত্রি। তাঁর সংবর্ধনার জন্যে অঞ্চলে ১৮৩টা তোরণ করা হয়েছিল। মিডিয়ায় সেই খবর চলে আসার পর থেকে তিনি মিডিয়া ভয় পান। এখন স্যার আপনি একটা ডিসিশান দিন। জি স্যার, আপনার কথা বুঝতে পারছি। Over.

বসন্তের দাগওয়ালা বিরক্ত মুখে বললেন, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বুঝলাম না। হাজতে থাকুক, সকালে কোটে চালান করে দিব। এখন পর্যন্ত

তো ডলাও খায় নাই। পুলিশের হাতে ধরা খেয়েও ডলা ছাড়া পার হবে এটা ঠিক না। পুলিশের উপর থেকে পাবলিকের ভয় চলে যাবে। রাতে আমার হাতে ছেড়ে দেন, পাকিস্তানি ডলা দিয়ে সকালবেলা কোর্টে চালান করে দেব।

কোর্টে যে চালান করবেন চার্জ কী?

একটা কিছু দিলেই হয়। উলফা কানেকশন, দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা। উলফায় যেতে না চান, উদীচী বোমা হামলা আছে। আমাদের হাতে জিনিসের তো অভাব নাই।

নাজমুল হৃদ বললেন, এদের সামনে এই আলোচনাটা না করলে ভালো হয়।

বসন্তওয়ালা বিরস মুখে বললেন, ডলা ঠিকমতো পড়লে আলোচনা কিছুই মনে থাকবে না।

পাকিস্তানি ডলা, পাকিস্তানি ডলা বলছেন। জিনিসটা কী?

সেভেনটিওয়ানে অনেকে এই ডলা খেয়েছে। উপরের চামড়া টাইট থাকে, ভিতরের হাতিড ছাতু হয়ে যায়।

না না, আমার থানায় এইসব চলবে না।

বসন্ত দাগওয়ালা হতাশ হয়ে ঠোট কামড়াচ্ছেন। কিছু মানুষ অল্পতেই হতাশগ্রস্ত হয়।

নাজমুল হৃদ ছামাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই তুই রবি ঠাকুর সেজেছিস কী জন্যে?

ছামাদ বলল, ঘাউ!

ওসি সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে স্তুক হয়ে গেলেন। সম্ভবত রবিঠাকুরের কাছ থেকে তিনি ‘ঘাউ’ আশা করেন নি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুই কী বললি?

ছামাদ বলল, ঘাউ। এবারের ঘাউ আগের চেয়েও জোরালো। বসন্তের দাগওয়ালা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন। তার চোখে মুখের ভঙ্গি বলছে—খাইছি তোরে। পাকিস্তানি ডলা কামিৎ।

ওসি সাহেব বললেন, তুই যদি আরেকবার ঘাউ বলিস, তাহলে আমার হাতের ব্যাটনটা তোর মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে দেব। মুখ ছাড়া অন্য কোনো

জায়গা দিয়ে চুকাতে বলতাম। ইংরেজি সাহিত্যে এমএ করেছি বলে বলতে পারছি না। মুখে বাঁধছে।

আমি গলাভর্তি আনন্দ নিয়ে বললাম, স্যার আপনি ইংরেজি সাহিত্যে এমএ?

নাজমুল হৃদ বললেন, তাতে তোর কোনো সমস্যা?

জি-না স্যার।

এমএ-তে শেষ না। কবি রবার্ট ফ্রন্সেটের উপর এমফিল করেছি। বিশ্বাস হয়?

আমি বললাম, বিশ্বাস হয় না স্যার।

নাজমুল হৃদ হতাশ গলায় বললেন, আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না।

মজিদ বলল, আমার বিশ্বাস হয় স্যার। আপনারে দেখলেই বুঝা যায় আপনি বিরাট জ্ঞানী। আপনার চোখেমুখে জ্ঞান।

তোরে না বললাম ঠোঁট নাড়াবি না। ঠোঁট নাড়ালি কোন সাহসে?

স্যার ভুল করেছি। মাফ করে দেন। আর একটা কথা যদি বলি তাহলে মাটি খাই।

নাজমুল হৃদ তাকালেন ছামাদের পিকে। কঠিন গলায় বললেন, যা জিজ্ঞেস করব জবাব দিবি। ঘাউ করবি না।

ছামাদ বলল, ঘাউ করব না স্যার। ঘাউ করলে আমিও মাটি খাই।

তুই থাকিস কোথায়?

আগে গোরানে থাকতাম। তিনি কাঠা জমির উপরে বাপ একটা দোতলা বাড়ি করেছিলেন। সেই বাড়ি ছাত্রলীগের কংকন ভাই দখল করেছেন। সেখানে বঙবন্ধু জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্র খুলেছেন।

জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্র কী হয়?

উনারা ক্যারাম খেলেন, তাশ খেলেন। গল্লগুজব করেন। সন্ধ্যার পর লাল পানি খান বলে শুনেছি। নিজের চোখে দেখি নাই। শোনা কথায় বিশ্বাস করা ঠিক না।

ছামাদের কথায় ওসি সাহেবের মনে হলো মন সামান্য নরম হয়েছে। তাঁর গলা উঁচুপর্দা থেকে মধ্যমপর্দায় নেমে এল। তিনি বললেন, বাড়ির দখল নেওয়ার চেষ্টা করিস নাই?

একটা মামলা করেছিলাম। পরের দিন মামলা তুলে নিয়ে কংকন ভাইয়ের পায়ে ধরে মাফ চেয়েছি। উনার হাতে চুমু খেয়েছি।

হাতে চুমু খেয়েছিস কেন?

পুরুষ মানুষ, এইজন্যে হাতে চুমু খেয়েছি স্যার।

চা খাবি?

খাব স্যার। আপনার অসীম দয়া।

ওসি সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, রবীন্দ্রনাথ সেজে আর খবরদার ঝামেলা করবি না। চা খেয়ে বিদায় হয়ে যা।

জি আচ্ছা।

বসন্ত দাগওয়ালা বললেন, কাজটা আপনি ঠিক করছেন না স্যার। পরে বিপদে পড়তে পারেন। র্যাবের হাতে দিয়ে দিন—ক্রসফায়ারে ঝামেলা শেষ করে দিবে। ওদের কাজকর্ম আমার পছন্দ। ধর তঙ্কা মার গ্যাজাল।

ওসি সাহেব অন্যমনক্ষ গলায় বললেন, তাও করা যায়।

ছামাদ বলল, চা লাগবে না স্যার। যদি অনুমতি দেন আমরা আপনাকে কদম্বুসি করে এখনই চলে যাই।

নাজমুল ছদ বললেন, কদম্বুসি করতে হুবে না। চলে যা। আর শোন, তুই তুই করে বলেছি বলে কিছু মনে নিবিসো। পুলিশে চাকরি করার কারণে ভদ্রতা গেছে। অথচ এই আমি একসময় এমফিল করেছি রবার্ট ফ্রেস্টের উপর।

"Woods are lovely dark and deep
And I have promised to keep
And miles to go before I sleep."

আমরা তিনজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। থানার গেট থেকে বের হয়ে তিনজন তিনদিকে হাঁটা। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুক্ষণ গন্তীর ভঙ্গিতে হাঁটছিলেন। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘেড়ে দৌড় দিলেন। বাঙালির স্বভাব হলো কাউকে দৌড়াতে দেখলে তার পেছনে পেছনে দৌড়াবে। দুইজন টোকাই এবং একজন মধ্যবয়স্ক লুঙ্গিপরা মানুষকে তার পেছনে পেছনে দৌড়াতে দেখলাম।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মজিদও দৌড়াচ্ছে। তার পেছনে কেউ নেই। সে দৌড়াতে দৌড়াতে এক চলন্ত বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল। বেচারা ভালো ভয় পেয়েছে।

কোথায় যাওয়া যায় বুঝতে পারছি না। হাজতবাসের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। হাজতবাস হচ্ছে না বলে সিস্টেমে গঙ্গোল হয়ে গেছে। হাজতের কাছাকাছি কোথাও রাত কাটাতে ইচ্ছা করছে। এই সমস্যা সবারই হয়। ফাঁসির এক আসামিকে ফাঁসির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গলায় দড়ি পরাবার আগে আগে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা ঘোষণার খবর চলে এল। জেলার তার পাছায় লাথি দিয়ে বললেন, যা বাড়ি চলে যা। সে বাড়ি গিয়ে ফ্যানের সঙ্গে লাইলনের দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়ল। খেল খতম ফাঁসি হজম।

কটা বাজে জানা দরকার। ঘড়ি দেখে ঠিক করতে হবে রাতটা কোথায় কাটাব। মেসে যেতে ইচ্ছা করছে না। রাত যদি এগারোটার কম হয় তাহলে বাদলের কাছে চলে যাব। এগারোটার বেশি হলে ধানমন্ডি থানায় ফিরে গিয়ে ওসি সাহেবকে বলব, স্যার রাতটা হাজতে থাকতে দিন। আপনার পায়ে ধরি। I touch your foot.

আজকাল হাতঘড়ির চল উঠে গেছে। সময় জিজ্ঞেস করলে লোকজন বিরক্ত হয়। কারণ সময় জানতে তাকে মোবাইল ফোন বের করে টেপাটিপি করতে হয়। সময় ঘড়ির কাছ থেকে চলে গেছে মোবাইল ফোন সেটের কাছে।

লাইটপোস্টের কাছে মোটামুটি উদাস দৃষ্টির এক ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম। বিনীত গলায় বললাম, ভাই, কয়টা বাজে?

ভদ্রলোক বললেন, সঙ্গে ঘড়ি নাই।

মোবাইল সেটটা দেখে বলুন কয়টা বাজে।

মোবাইল ফোন সেট নাই। চুরি গেছে।

ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ার আগে তার ফোন বেজে উঠল। তিনি বিনুমাত্র লজ্জিত বোধ করলেন না। উঁচুগলায় কথাবার্তা চালাতে লাগলেন।

আফতাব? ভালো আছ? আমি ঢাকায় না তো। ঢাকায় থাকলে অবশ্যই তোমার সঙ্গে দেখা করতাম। আমি এখন রাজশাহীতে। সপ্তাহখানিক থাকব। হ্যাঁ, তোমার বিপদের কথা শুনেছি। সো স্যাড।

আমি ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মোবাইল ফোনের কারণে তিনি ঢাকায় থেকেও রাজশাহীতে অবস্থান করতে পারছেন। এটাকে বিজ্ঞানের ‘পশ্চাত্যাত্মা’ বলা যেতে পারে।

টেলিফোনে ভদ্রলোকের কথাবার্তা থেকে আন্দাজ করছি, তিনি আফতাব সাহেবের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন। টাকা আজই

ফেরত দেওয়ার কথা। তিনি টাকার ব্যবস্থাও করেছেন, রাজশাহীতে থাকার কারণে দিতে পারছেন না।

ভদ্রলোক টেলিফোন শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কী চান?

সময় জানতে চাই।

অন্য কারও কাছ থেকে জানেন। ফালতু ঝামেলা।

আফতাব ভাই আপনার কাছে কত পায়?

হোয়াট?

উনি বিপদে আছেন, টাকাটা ফেরত দেওয়া উচিত না? আপনি যখন বিপদে পড়েছিলেন তখন আফতাব ভাই ঠিকই আপনাকে সাহায্য করেছে।

আপনি তাকে চিনেন?

অবশ্যই চিনি। আমি আপনাকেও চিনি।

ভদ্রলোক হকচিংকিয়ে গেলেন। তার মধ্যে আমতা আমতা ভাব চলে এল। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। আমি রিকশা থামিয়ে ভদ্রলোককে বললাম, আসুন যাই।

কোথায় যাব?

আফতাব ভাইয়ের কাছে যাই। উনাকে টাকাটা দিয়ে আসি।

পুরা টাকা তো আমার সুষ্ঠু নাই। অল্প আছে।

যা আছে তাই দিন। বাকিটা দুই দিন পরে দিবেন। দেরি করবেন না। রিকশায় ওঠেন। রিকশা কোথায় যাবে বলে দিন।

ভদ্রলোক বিরসমুখে রিকশায় উঠে এলেন।

রিকশায় করে আমরা চলে এলাম কলাবাগানে। সারা পথই ভদ্রলোক উস্খুস করতে লাগলেন। একবার মনে হলো উনি চলত রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়বেন। আমি শক্ত করে তার পাঞ্জাবি চেপে ধরলাম। নেমে গেলে পাঞ্জাবির অর্ধেকটা আমার হাতে রেখে নামতে হবে। ভদ্রলোক এই রিক্ষ নিবেন বলে মনে হয় না। পাঞ্জাবিটা দায়ি।

পাঞ্জাবি ধরে আছেন কেন?

রিকশায় চড়লে আমার কিছু একটা ধরে থাকতে হয়। কিছু ধরে না থাকলে ভয় লাগে। মনে হয় পড়ে যাব।

হৃত ধরে রাখুন।

হৃত ধরে একবার ক্যাচ খেয়েছি, এইজন্যে হৃত ধরি না। আফতাব
ভাইয়ের কাছ থেকে কত টাকা ধার করেছিলেন?

আপনার তা দিয়ে দরকার কী? পাঞ্জাবিটা ছাড়েন তো।

পাঞ্জাবি ছাড়ব না।

কলাবাগানে ঢোকার কয়েকটা গলি। একটার সামনে এসে ভদ্রলোক
রিকশা থামালেন। আমি বললাম, গলিতে ঢুকব না? ভদ্রলোক ইশারায়
দেখালেন এবং গলা নামিয়ে বললেন, আফতাব বসে আছে। চায়ের
দোকানের সামনে।

মেয়ে দুটা কে?

তারই মেয়ে। বাবার সঙ্গে থাকে। একজনের নাম কেয়া আরেকজনের
নাম খেয়া।

আরেকটা মেয়ে হলে তো বিপদে পড়ত, নাম রাখতে হতো গেয়া।

ভদ্রলোক রিকশা ভাড়া মিটালেন এবং কিছু বোবার আগেই গলির
ভেতর ঢুকে গেলেন। এতক্ষণ পাঞ্জাবি ধরে থাকা বৃথা গেল। পূরনো দিনের
গদ্যের ভাষায়—‘চক্ষের নিমিষে পক্ষি উড়িয়া গেল।’

আফতাব দুই মেয়েকে নিয়ে বসে আছেন চায়ের দোকানের সামনের
ফুটপাথে। ফুটপাথ রাস্তা থেকে উঁচু। তিনজনই পা ঝুলিয়ে বসেছে।
হিসাবমতো মেয়ে দুটির বসার কথা বাবাকে মাঝখানে রেখে বাবার
দু'পাশে। তারা সে রকম করে নি। দুইবোন হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে
বসা। বড় মেয়েটির বয়স ৬/৭ হবে। ছোটটি ৪/৫। দুটা মেয়েই ফুটফুটে।
আমি এগিয়ে গেলাম। অতি পরিচিত কেউ এমন ভঙ্গিতে বললাম, কেয়া-
খেয়া, এত রাতে রাস্তায় বসে আছ কেন? সমস্যা কী?

তিনজনই চমকে তাকাল। আমি মেয়ে দুটির পাশে বসতে বসতে
বললাম, বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে নাকি?

কেয়া বলল, হ্যাঁ বের করে দিয়েছে।

আমি বললাম, ঘটনা কী বলো? অল্প কথায় বলবে, ডিজিটাল যুগে অল্প
কথা বলতে হয়।

কেয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে তার বাবা বলল, আপনাকে
চিনলাম না। আপনার পরিচয়?

আমার নাম হিমু। আমি এই মেয়ে দুটার মামা হই। আপনার নাম
আফতাব না?

হ্যাঁ। কিন্তু এখনো আমি আপনাকে চিনলাম না।

আমি বললাম, চেনাচিনি পরে। আগে আপনাদের ঘটনা শুনি। এত
রাতে আমার দুই ভাগী রাস্তায় বসা—এর মানে কী? এরা কি রাতে
খাওয়াদাওয়া করেছে?

মেয়ে দু'জন একসঙ্গে বলল, না। ছোট মেয়েটা বলল, মামা! বাবার
কাছে টাকা নাই।

আমি বললাম, টাকা না থাকলেও খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কেয়া মা
এবং খেয়া মা, বলো কী খেতে চাও? পোলাও, মুরগির রোস্ট, সঙ্গে ডিম
ভুনা—চলবে?

দু'জন আবারও একসঙ্গে বলল, চলবে।

খাবারের সঙ্গে কোক বা পেপসি এইসব কিছু লাগবে?

কেয়া বলল, আমি খাব সেভেন আপ।

খেয়া বলল, আমি ফান্টা।

আমি বললাম, খাওয়ার প্রবলেম সেটেল হয়ে গেল। এখন আফতাব
ভাই, আপনার প্রবলেম শুনি। ~~বাজড়ি~~ ভাড়া দিতে পারেন নাই বলে বহিকার?

আফতাব বলল মেয়ে দুটার সামনে বলতে চাচ্ছি না।

আমি বললাম, এদের সামনেই বলতে হবে। বাচ্চাদের সমস্যা থেকে
দূরে রাখা যাবে না। এরা বড় হবে সমস্যার মধ্যেই।

আফতাব আমাকে হাত ধরে চায়ের দোকানের কাছে নিয়ে গলা নিচ
করে সমস্যা বললেন।

সমস্যা জটিল না, সাধারণ সমস্যা। আফতাব একজনের সঙ্গে সাবলেট
থাকতেন। ছ’মাসের ভাড়া বাকি পড়ায় এই অবস্থা। ছ’মাস ধরে
আফতাবের চাকরিও নাই। এক কনস্ট্রাকশান কোম্পানিতে কাজ করত।
রড চুরির দায়ে চাকরি ছলে গেছে।

রড চুরি করেছেন?

হ্যাঁ।

এই প্রথম চুরি করেছেন না আগেও করেছেন?

আগেও করেছি। ফার্মেসিতে যখন চাকরি করতাম তখন করেছি। বড় চুরি না, ছোটখাটো চুরি।

রড চুরিটাই বড়? নাকি এরচেয়ে বড় কিছু আছে? ঘোড়ে কাশেন, ঘোড়ে না কাশলে হবে না।

আফতাব বিড়বিড় করে বললেন, একবার একটা NGO-তে চাকরি করতাম। তখন নতুন মোটরসাইকেল চুরি করে বেচে দিয়েছি।

আপনি তো কামেল আদমি।

রড দু'জনে মিলে চুরি করেছিলাম। হাফ টন রড। অন্যজনের চাকরি আছে। তার প্রমোশনও হয়েছে। বাদ দেন তার কথা, বাচ্চা দুটাকে আপনি এক রাতের জন্যে রাখতে পারবেন? আমার উপকার হয়। নারায়ণগঞ্জে একজনের কাছে কিছু টাকা পাই, টাকাটা উদ্ধার করতে পারি।

এত রাতে নারায়ণগঞ্জ যাবেন?

গভীর রাত ছাড়া তাকে পাওয়া যাবে না। সে বাড়িতে ঢোকে রাত একটার পর।

তাহলে যান। এরা থাকুক আমার সঙ্গে

ধার হিসেবে একশ টাকা দিতে প্রস্তুতবেন?

পারব। একশ টাকার একটা স্লোটই আমার কাছে আছে। নিয়ে যান।

আফতাব চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, অচেনা অজানা একজনের কাছে মেয়ে দুটা রেখে যাচ্ছেন। আপনি কী রকম বাবা?

আফতাব আবার বসে পড়ল। ছেট মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মামা, আমরা কখন পোলাও খাব?

আমি বললাম, তোমার বাবা নারায়ণগঞ্জে যখন রওনা হবে আমরাও তখন পোলাও খেতে রওনা হব।

ছেট মেয়ে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা তুমি যাও না কেন?

আমি বললাম, আফতাব, আমি পাকেচকে এখানে উপস্থিত হয়েছি বাচ্চা দুটাকে সাহায্য করার জন্যে। প্রায়ই দেখা গেছে মহাবিপদে যারা পড়ে তাদের মাঝে মাঝে উদ্ধারের ব্যবস্থা প্রকৃতি করে। বাচ্চা দুটাকে নিয়ে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নাই। তাদের কোথায় নিয়ে যাব তা এখনো জানি না, কাজেই আপনাকে ঠিকানা দিতে পারছি না। ধানমণি থানায় আমি বাচ্চা দুটা কোথায় আছে জানিয়ে রাখব। সেখানে গেলেই খৌজ পাবেন।

ছোট মেয়েটা বলল, মামা! আমরা খেতে যাব না?

যাব। এখনই যাব।

কোথায় যাব?

এখনো জানি না কোথায় যাব। আশেপাশেই কোথাও যেতে হবে, দূরে
যাওয়া যাবে না। তোমরা হাঁটতে পারবে না। আর আমার সঙ্গে টাকাও নেই
যে রিকশা করে নিয়ে যাব।

বাবা যাবে না?

না।

আমরা একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়ির নাম
'কমলকুটির'। গেটে ধাক্কাধাক্কির শব্দ শুনে লুঙ্গি পরা গেঁজি গায়ে এক বৃক্ষ
বের হলেন, বৃক্ষ অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, স্যার বাই এনি চাপ্স, আজ কি আপনার বাসায় পোলাও
এবং মুরগির রোস্ট রান্না হয়েছে? সঙ্গে ভুনা ডিম। বাচ্চা দুটা এই খাবার
ছাড়া অন্য কিছু খাবে না।

হ্যাঁ আর ইউ?

আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম হিমু। বড় মেয়েটার নাম
কেয়া, ছোটটার নাম খেয়া।

রাত বারোটার সময় পোলাও রোস্ট? ফাজলামির একটা সীমা থাকা
দরকার। আমি কি আপনার পরিচিত?

জি-না।

রাত বারোটার সময় কারও বাড়ির দরজা ভেঙে ফেলে খাবার চাওয়া
যায়?

অবশ্যই যায় না।

আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

এত জোরে চি�ৎকার করবেন না স্যার। ছোট বাচ্চাটা ভয় পাচ্ছে।

হৈচে শুনে এক বৃক্ষ বের হয়ে এসেছেন। বৃক্ষ পাশে দাঁড়িয়েছেন।
বৃক্ষার মনে হয় কাঁচা ঘুম ভেঙেছে। তিনি ভয়ে অস্তির হয়ে বললেন, কী
হয়েছে?

বৃক্ষ বললেন, উটকা নুইসেন্স। কিছু হয় নাই ঘুমাতে যাও।

বৃক্ষ বিকট শব্দে দরজা বক্ষ করলেন। খেয়া বলল মামা! আমার ভয়
লাগছে।

আমি বললাম, ভয়ের কিছু নাই। যিম ধরে দাঁড়িয়ে থাক। এক্ষুণি
দরজা খুলবে। এক থেকে একশ পর্যন্ত গুনতে থাক, এরমধ্যে দরজা
খুলবে।

খেয়া একত্রিশ পর্যন্ত গোনার সময় দরজা খুলল। বৃন্দ গন্তীর গলায়
বললেন, খেতে আসো।

আমি বললাম, পোলাও-রোস্ট, ডিম ভূনা আছে তো?

আছে।

ফান্টা এবং সেভেন আপ লাগবে। না থাকলে আনিয়ে দিতে হবে।

আমরা খেতে বসেছি। বৃন্দ এবং বৃন্দা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃন্দ রাগী
চোখে তাকিয়ে আছেন কিন্তু বৃন্দার মুখ হাসিহাসি। তিনি মনে হয় অত্যন্ত
মজা পাচ্ছেন। বৃন্দা আমাকে বললেন, বাবা, তুমি কি কারও কাছ থেকে
খবর নিয়েছ যে আজ আপনাদের বাড়িতে এইসব রান্না হয়েছে?

না।

তাহলে জানলে কীভাবে?

অনুমান করেছি। আমার অনুমানশক্তি ভালো।

বৃন্দ বললেন, আজ একটা বিশেষ উপলক্ষে এইসব রান্না হয়েছে।
উপলক্ষটা বলো, দেখি তোমার অনুমানশক্তি।

আজ আপনাদের ম্যারেজ ডে। আপনারা ভেবেছিলেন আপনাদের
ছেলেমেয়েরা আসবে। খাবার তাদের জন্যে রান্না করা। তারা কেউ আসে
নাই।

বৃন্দা লজ্জিত গলায় বললন, প্রত্যেকেই সংসার নিয়ে থাকে। নানান
ঝামেলায় ভুলে গেছে। ভুলে যেতেই পারে, তাই না?

অবশ্যই।

বৃন্দা হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে গিয়ে বললেন, বাচ্চা দুটা আরাম করে
থাচ্ছে দেখে এত শান্তি লাগছে। অনেকদিন পর এমন একটা শান্তি
পেলাম।

বৃন্দ বললেন, ঘরে সেভেন আপ নাই স্প্রাইট আছে, এতে কি চলবে?
কেয়া বলল, চলবে না।

বৃন্দা বললেন, ড্রাইভারকে বলো গাড়ি নিয়ে বের হতে। যেখান থেকে
পারো সেভেন আপ আনবে।

কেয়া বৃন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, নানু! আমরা দু'জন রাতে কোথায়
ঘুমাব?

বৃন্দ-বৃন্দা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। আমি বললাম, এরা
দু'জন আজকের রাতটা আপনাদের সঙ্গে থাকবে।

বৃন্দ-বৃন্দার আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি। খেয়া বলল, রাতে আমি নানুর
সঙ্গে ঘুমাব। কেয়া বলল, আমিও নানুর সঙ্গে ঘুমাব।

বৃন্দ বললেন, এরা কারা? কোথেকে এসেছে?

আমি বললাম, আপনি অতি কঠিন প্রশ্ন করে বসেছেন যার উত্তর কেউ
জানে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বহুর এগিয়ে গেলেও আমরা জানি না—আমরা
কোথেকে এসেছি, কেন এসেছি। যাই হোক, সকালে এসে আমি ওদের
কিছুক্ষণের জন্যে থানায় নিয়ে যাব।

বৃন্দা বললেন, থানায় কেন?

আমি বললাম, এরা লস্ট প্রপার্টি। লস্ট প্রপার্টির খোজ থানায় দিতে
হয়।

বৃন্দা বললেন, এরা তোমার কেউ না?

জি-না।

পথে কুড়িয়ে পেয়েছ?

প্রায় সে রকমই।

বৃন্দা বিড়বিড় করে বললেন, কমল এইরকম কাজ করত। অসময়ে
ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাসায় নিয়ে এসে বলত, মা এ আজ সারা দিন না
খেয়ে আছে। ওকে ভাত খাওয়াও। কত রাগ করতাম কমলের উপর।

বৃন্দ বললেন, কমলের প্রসঙ্গ থাক।

বৃন্দা হ্যাস্চক মাথা নাড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি
পড়ছে। তিনি নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

আমি বললাম, কমল কতদিন হলো মারা গেছে?

বৃন্দ বলল, অনেকদিন। প্রায় কুড়ি বছর।

আমার ধারণা এই বৃন্দ কমলকে ভুলে গিয়েছিলেন। প্রকৃতি একটা
বিশেষ ঘটনা ঘটিয়ে আবার মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি এমন খেলা
সবসময় খেলে।

আমাকে রাতটা কমলকুটিরে কাটাতে হলো । বৃন্দ শুরু থেকে কঠিন মুখ করে ছিলেন, হঠাৎ তিনি কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় চলে গেলেন । তিনি বললেন, আমার স্ত্রী তোমাকে তার ছেলের মতো দেখছে । সেই ছেলে দুপুররাতে চলে যাবে? তুমি ফাজলামি করছ? গেস্টরুমে তোমার জন্যে ব্যবস্থা করেছি । আরাম করে ঘুমাও । তোমার কী সমস্যা, বাচ্চা দুটির কী সমস্যা আমি জানতে চাচ্ছি না । যাকে আমার স্ত্রী সন্তানের মতো দেখছে সে আমার কাছেও সন্তান । তোমাদের সমস্যা পরে শুনব । এখন ঘুমাও । আমি হাট্টের রোগী । রাতজাগা আমার জন্যে নিষেধ । আমার স্ত্রীর জন্যেও নিষেধ । তুমি বলেছিলে বাচ্চা দুটিকে থানায় নিতে হবে । নিয়ে যাও, কিন্তু আবার ফিরে আসবে । এটা আমার অর্ডার । আমি আর্থিতে ছিলাম । ব্রিগেডিয়ার হিসেবে রিটায়ার করেছি । এই বাড়িতে সামরিক ব্যবস্থা চালু আছে । আমার অর্ডারের বাইরে কিছু হয় না । বুঝেছ?

আমি বিকট চিংকার দিয়ে বললাম, ইয়েস স্যার । আই আভারস্ট্যাভ স্যার ।

বৃন্দ হেসে ফেললেন । তার হাসি দেখে বোচা দুটা হাসতে শুরু করল । ভেতর থেকে বৃন্দা ছুটে এলেন । কিছু না জিনে তিনিও হাসতে শুরু করলেন ।

ভোরে ঘুম ভেঙেছে । আমি কেয়া-খেয়াকে নিয়ে বসেছি । তাদের বাবার খৌজ বের করা দরকার । বৃন্দ-বৃন্দা দু'জনই ঘুমে । তারা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন । বেলা পর্যন্ত ঘুমাবেন এটাই স্বাভাবিক ।

কেয়া বাবার মোবাইল নাম্বার জানে । সেই নাম্বারে টেলিফোন করলাম । একটি মেয়ে রোবটদের গলা নকল করে বলল, সংযোগ দেওয়া সম্ভব না, আপনি যদি ভয়েস মেইলে কিছু বলতে চান...ইত্যাদি । আমি বললাম, কেয়া, নাম্বারটা ভুল না তো?

কেয়া বলল, নাম্বারটা ভুল মামা ।

খেয়া বলল, নাম্বারটা ভুল মামা । অবশ্যই ভুল । একশবার ভুল ।

ছোটমেয়েটার মধ্যে বড় বোনের কথা ব্যাখ্যা করার প্রবণতা আছে । বড় মেয়েটাও দেখি ছোটটার কথা ব্যাখ্যা করে । যতই সময় যাচ্ছে এদের অন্তর্ভুক্ত গুণাবলি প্রকাশিত হচ্ছে । তারা বাবাকে নিয়ে মোটেই ব্যস্ত না । তাদের মা কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম । বড়টা বলল, বলা যাবে না । ছোটটা বলল, বলা ঠিক হবে না । বললে বড় আপার পাপ হবে ।

আমি বললাম, পাপ হলে বলার দরকার নাই। চলো ধানমন্ডি থানায় যাই। তোমরা কোথায় আছ জানিয়ে আসি। তোমাদের বাবা দুশ্চিন্তা করবেন।

খেয়া বলল, দুশ্চিন্তা করবে না।

কেয়া বলল, ও ঠিকই বলেছে। দুশ্চিন্তা করবে না। একটুও করবে না।

আমি বললাম, দুশ্চিন্তা না করলেও জানানো দরকার। তোমার বাবা ধানমন্ডি থানাতে খোঁজ করবেন। চলো যাই। থানার ঝামেলা শেষ হোক, তোমাদের এখানে দিয়ে যাব।

ওসি সাহেব ছিলেন না। বসন্ত দাগওয়ালা আছেন। আজ তাঁর গায়ে থাকি পোশাক। শার্টের পকেটের উপর নাম লেখা। মনে হয় তার নাম আব্দুল গফুর। প্লাস্টিকের 'র' উঠে গেছে বলে নাম এখন আব্দুল গফু। এই থানার সবার নাম থেকে একটা করে অক্ষর উঠে যাচ্ছে কেন কে জানে! ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত না তো?

আমাকে দেখে গফু সাহেব আনন্দিত হলেন বলে মনে হলো। তিনি পাশের কনস্টেবলকে বললেন, এদের হাজতে তুকিয়ে দাও। কুইক।

আমি বললাম, কী কারণে হাজিতে ঢোকাচ্ছেন জানতে পারি?

আজকের খবরের কাগজ পড়েছে?

জি-না স্যার।

খবরের কাগজ পড়া থাকলে বুঝতে কেন হাজতে। তোমার কপালে আছে পাকিস্তানি ডলা।

বলেই তিনি ওয়াকিটকিতে কাকে যেন বললেন, আসামির সঙ্কানে যেতে হবে না স্যার। আসামি নিজেই ধরা দিয়েছে। এই তো আমার সামনে, সঙ্গে দুটা ট্যাবলেট। জি স্যার হাজতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। না ট্যাবলেট দুটার বিষয়ে কিছু জানি না। এক্ষুণি জানছি। ওভার।

গফু সাহেব ওয়াকিটকি নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এরা কারা?

আমি বললাম, বড় জনের নামে কেয়া, তারপরেরটার নাম খেয়া। এদের নাম ক খ গ ঘ হিসেবে রাখা হচ্ছে। তারপরেরটার নাম হবে গেয়া। পঞ্চমটার নাম নিয়ে সমস্যা—ঙেয়া।

তুমি দেখি রসে টইটুম্বুর। রসমালাই হয়ে গেছ। চিপ দিয়ে রস বের
করে শুকনা খড় বানিয়ে ফেলব। তুমি বাচ্চা দুটার কে?

কেউ না। তবে ওরা আমাকে মামা ডাকছে। কথায় আছে না
‘বাঁশতলায় বিয়াইছে গাই সেই সূত্রে মামা ডাকাই।’

গফু হক্কার দিয়ে উঠলেন, ফাজলামি একদম বক্ষ। বাচ্চা দুটার বাবা
কোথায়?

আমি বললাম, জানি না স্যার।

কেয়া বলল, স্যার আমিও জানি না।

খেয়া বলল, বড় আপা সত্য জানে না। আল্লার কসম জানে না।

বাবা করে কী?

আমি বললাম, উনি একজন বিশিষ্ট চোর স্যার। চুরির দায়ে তিনবার
উনার চাকরি গেছে। সর্বশেষ চাকরি গেছে রড চুরির কারণে। এরা দুই
বোন হলো চোর কন্যা। এই তোমরা স্যারকে সালাম দাও।

দু'জনই একসঙ্গে বলল, স্নামালিকুম। স্নামালিকুম, স্নামালিকুম।

গফু বললেন, এই ট্যাবলেট দুটাকে হাজাতে ঢেকাও। এরা গুরুত্বপূর্ণ
তথ্য দিতে পারে।

আমি বললাম, স্যার একটা খবরের কাগজ কি দেওয়া যাবে? কী
অপরাধে হাজতবাস সেটা কাহজি পড়ে জানতাম।

আর একটা কথা না।

কেয়া বলল, এত জোরে ধমক দিবেন না স্যার। আমি ভয় পাই।

খেয়া বলল, বড় আপা খুব ভয় পায়। আল্লার কসম, বড় আপা ভয়
পায়।

আমার হাতে যে খবরের কাগজ তাতে সেকেন্ড লিড নিউজ হচ্ছে—

টকশোতে রবীন্দ্রনাথ
মন্ত্রী বিভাগ
(স্টোফ রিপোর্টার)

একটি টিভি চ্যানেলের লাইভ টকশোতে অবিকল
কবিশুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখা গেছে। তিনি বন ও
পরিবেশ মন্ত্রীর সঙ্গে একটি টকশোতে অংশ নেন। মন্ত্রী

মহোদয় পুরোপুরি বিভাস্ত হয়ে পড়েন। তিনি বারবার অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করতে বলেন, তারপরেও শো বন্ধ হয় না। শেষ পর্যন্ত উনি ক্ষিণ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ানোর পর একটি রবীন্দ্রনাথের গানের অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

যেসব দর্শক কিছুক্ষণের জন্যে হলেও প্রোগ্রামটি দেখেছেন তারাও মন্ত্রী মহোদয়ের মতোই বিভাস্ত।

মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন এটি বিরোধীদলের স্তুল ষড়যন্ত্র। জনতার কাছে তাঁর প্রহণযোগ্যতা কমাতেই এই সাজানো নাটকের আয়োজন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, কথিত রবীন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে রিমাংডে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। অনেক রাঘববোয়াল ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে জানোনা হয়েছে।

এই প্রতিবেদক কথিত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানেন পুলিশের কাস্টডিতে এমন কেউ নেই। ওসিকে সাময়িকভাবে ক্লোজ করা হয়েছে। পুলিশের আইজি জানিয়েছেন, পুলিশের দিক থেকে কোনো অবহেলা হয়ে থাকলে দায়ী ব্যক্তি কঠোর শাস্তি পাবে।

চ্যানেল আঁধি কর্তৃপক্ষের কেউ টেলিফোন ধরছেন না। চ্যানেল আঁধি'র মুখ্যপাত্র হিসেবে ভাসান খান বলেছেন, ব্যাপারটা ক্ষুদ্র ভুল বুঝাবুঝি। জনেক অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে ভুলক্রমে টকশো'র প্রোগ্রামে চলে যান। ভুল ধরা পড়া মাত্র অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। ভাসান খানের কাছে নাটকের নাম এবং পরিচালকের নাম জানতে চাইলে ভাসান খান আমতা আমতা করতে থাকেন।

প্রতিবেদক ব্যাপক অনুসন্ধান করেও এমন কোনো নাটকের সন্ধান পান নি।

বাংলাদেশ রবীন্দ্র গবেষণা পরিষদের প্রধান ড. হাকিমুল কবির বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্বকবি। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত তাঁর রচনা, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। ভুল সুর এবং ভুল উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া বর্তমানে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চ্যানেল আঁখি এই ফ্যাশনের আগনে বাতাস অতীতে দিয়েছে। এখনও দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে কেন টকশোতে আনা হলো এর পেছনের উদ্দেশ্য জাতি জানতে চায়। রবীন্দ্র গবেষণা পরিষদ পুরো ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছে।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে দেশের বুদ্ধিজীবীরা আগামীকাল মানব বক্ষনের কর্মসূচি দিয়েছেন। কাগজে মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে কথিত রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিটা প্রচারিত অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া। ছবিতে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্ত্রী মহোদয়কে এক পুরিয়া গাঁজা নিতে সাধাসাধি করছেন। এরকম প্রশ্নের ছাপা হওয়ার পর হৈচে পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি হাত থেকে কাগজ নামাতে নামাতে বললাম, লাগ ভেলকি লাগ।

কেয়া বলল, মামা! আমাদের কি জেল হয়ে গেছে?

আমি বললাম, সেরকমই মনে হচ্ছে।

খেয়া বলল, আমরা পাপ করেছি এইজন্যে আমাদের জেল হয়েছে।
পাপ করলে জেল হয়।

কেয়া বলল, পাপ করলে ফাঁসি হয়। মামা, আমাদের ফাঁসি হবে না তো?

সন্তুষ্টবন্না কম।

খেয়া বলল, ফাঁসি হলে জিভ এরকম বের হয়ে থাকে। তাই না মামা?

খেয়া মুখ থেকে জিভ বের করে দেখাল। কেয়া বলল, হয় নাই।
এরকম।

খেয়া বলল, না এরকম। আমি দেখেছি তো।

কেয়া বলল, আমিও তো দেখেছি।

আমি বললাম, কোথায় দেখেছ?

খেয়া বলল, বলব না। বললে আল্লা পাপ দিবে।

আমি বললাম, থাক তাহলে বলার দরকার নাই।

কেয়া-খেয়া চুপ করে আছে। চুপ না থেকে অবশ্যি উপায়ও নেই। কারণ দু'জনের জিভ মুখ থেকে বের করা। ফাঁসির পর জিভের অবস্থার প্রদর্শনী। আমি বড় ধরনের রহস্যের সন্ধান পাচ্ছি। রহস্যের জট খোলার হলে খুলবে। তাড়াভংড়া করলে আঙ্কা গিটু লেগে যাবে। আল্লাপাক এইজন্যেই বলেন, হে মানব সত্তান তোমাদের বড়ই তাড়াভংড়া।

আমি কাগজ পাঠে মন দিলাম। বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রলীগ তাদের বিজয় কেতন উড়িয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক লীগ এখনো পথে নামে নি, তবে নেমে যাবে। একটা খবরে যথেষ্ট পুলকিত বোধ করলাম। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ মিলিয়ে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে পাঁচটা রাস্তা পাকা করে ফেলেছে। জনগণের দুঃখে কাতর হয়েই তারা কাজটা করেছে। কাজের টেক্সার বাজারে ছাড়ার আগেই কাজ শেষ। টেক্সারে যেহেতু কাজ তারাই পাবে, আগে করে ফেলতে কোনো সমস্যা নাই। বরং সুবিধা আছে। কাজ খারাপ হচ্ছে এই নিয়ে তদারকি করার কেউ নেই। তাদের পয়সাও খাওয়াতে হবে না।

নাজমুল হৃদ এসেছেন। হাজতের দরজা খুলে আমাকে তার কাছে নেওয়া হলো। আমার সঙ্গে কেয়া-খেয়া।

ওসি সাহেব বললেন, এই বাচ্চা দু'টা জিভ বের করে রেখেছে কেন?

আমি বললাম, জানি না স্যার।

ওরা কি সবসময় জিভ বের করে রাখে?

মিনিট দশক আগে জিভ বের করেছে, তারপর থেকে আর ঢোকাচ্ছে না।

স্ট্রেঞ্জ! এই তোমরা জিভ মুখে ঢোকাও।

দু'জন সঙ্গে সঙ্গে জিভ ঢুকিয়ে আবার বের করে ফেলল। ওসি সাহেব চমৎকৃত হয়ে বললেন, চাইল্ড সাইকোলজি বোৰা কঠিন। আমার সাইকোলজি পড়ার শখ ছিল, কী মনে করে ইংরেজি পড়লাম। এই বাচ্চারা জিভ মুখে ঢোকাও। দু'জনের জিভ ঢুকল এবং সঙ্গেই বের হয়ে এল।

ওসি সাহেব আবারও বললেন, স্ট্রেঞ্জ। এখন তার চোখে রীতিমতো মুক্তা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পুরো ব্যাপারটার একটা ভিডিও করে রাখলে কেমন হয়?

আমি বললাম, ভালো হয় স্যার।

ওসি সাহেব খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, মোবাইল ফোনের ফালতু ভিডিও না। প্রফেশনাল ভিডিও। আমার শালাকে খবর দেই। সে প্যাকেজ নাটক বানায়। নাম হিরন্য কারিগর। ছদ্মনাম। ভালো নাম ছানাউল্লাহ। তার কোনো নাটক দেখেছেন?

আমি বললাম, জি-না স্যার।

আমিও দেখি নাই। নাটক দেখার সময় কোথায়! চোর-ডাকাত আর সন্ধাসী দেখে সময় পাই না। আমার শালা বলেছে তার একটা নাটক ভালোবাসা দিবসে প্রচার হবে। নাটকের নাম ‘ভালোবাসার তিন কাহন’। তিনটা মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবাসে। শেষে ঠিক হয় লটারি হবে। লটারিতে যে মেয়ের নাম উঠবে সে-ই ছেলেটিকে বিয়ে করতে পারবে। বাকিরা দূরে সরে যাবে। লটারিতে তিনজনের নামই একসঙ্গে উঠে। নাটক এখানেই শেষ।

আমি বললাম, তিনজনের নাম একই সঙ্গে কীভাবে উঠবে?

ওসি সাহেব বললেন, আমিও একই প্রশ্ন আমার শালাকে করেছিলাম। সে বলল, নাটকের এইটাই ‘ক্লিক’ প্রদায় দেখতে হবে। আচ্ছা, এই কন্যারা, জিভ ভেতরে।

জিভ ভেতরে চলে গেল তখনে এবার আর বের হলো না। ওসি সাহেব বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। হতাশ গলায় বললেন, এদের সমস্যাটা কী? জিভ বের করছে না কেন? এই জিভ বের করো। বের না করলে কঠিন শাস্তি।

শাস্তির কথায় দুই কন্যার ভাবান্তর হলো না। তারা কঠিন মুখ করে বসে রইল। নাজমুল হৃদ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাগজ পড়েছেন?

আমি বললাম, জি স্যার।

কোনো বক্তব্য আছে?

আপনার জন্যে খারাপ লাগছে স্যার।

আমার জন্যে খারাপ লাগছে কেন?

আপনি সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন এইজন্যে খারাপ লাগছে।

নাজমুল হৃদের মুখে আনন্দের হাসি দেখা গেল। তিনি হঠাৎ এত আনন্দিত কেন বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোকের হাবভাব যথেষ্টই বিস্ময়কর।

তিনি আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আমরা পুলিশরা হচ্ছি কাকের মতো। কাকের মাংস কাক খায় না। পুলিশের মাংস পুলিশ খায়

না। সাংবাদিকদের ঠাণ্ডা রাখার জন্যে বলা হয়—সাময়িক বরখাস্ত। এক থানার ওসি ক্লোজ হলে অন্য থানায় তাকে ওপেন করা হয়। এখন কি পরিষ্কার?

জি স্যার।

দেশে নিউজের আকাল বলে নিউজ তৈরি করা হচ্ছে। এক ছাত্রলীগের নিউজ কত ছাপবে। কয়েকদিন রবীন্দ্রনাথের নিউজ ছাপা হবে। তারপর শেষ। আপনি খামাখা থানায় এসে ধরা খেয়েছেন কেন—এটাই তো বুঝলাম না।

বাচ্চা দুটার জন্য এসেছি স্যার। ওরা মিসিং চাইল্ড। ওরা জানে না ওদের বাবা কোথায়। ওরা যে আমার কাস্টডিতে আছে এটা রিপোর্ট করতে থানায় এসে ধরা খেলাম।

ওসি সাহেব বললেন, ধরা খাওয়াখাওয়ির কিছু নাই। থানায় রিপোর্ট করে বাচ্চা নিয়ে চলে যান।

রবি ঠাকুরকে খুঁজে বের করবেন না?

না। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনেক মাত্তিমাতি হয়েছে। আর না। বাচ্চা দুটা কোন ঠিকানায় আছে ভালোমতো লিখে রেখে চলে যান। আমি আমার শালাকে ক্যামেরা দিয়ে পাঠাব। সে জিভের ব্যাপারটা রেকর্ড করে ফেলবে। নাম মনে আছে তো? হিরন্যায়কারিগর।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে আপনি বিপদে পড়বেন না তো?

বিপদের মধ্যেই আছি। নতুন আর কী পড়ব।

আপনি বললে আমি ছামাদ মিয়াকে খুঁজে বের করতে পারব।

কোনো প্রয়োজন নাই। ইউ গেট লস্ট। ম্যাচের কাঠির আঙ্গনকে দাবানল বানানোর কিছু নাই। সকাল আটটার সময় ডি঱েকটিভ বাংলাদেশের সব থানায় থানায় চলে গেছে।

Catch poet Tagore

Don't misbehave

Handle with honour.

আমি চিন্তাই করতে পারছি না কার মাথায় এরকম একটা ডি঱েকটিভ দেওয়ার চিন্তা এসেছে। যান যান আপনি ভাগেন। আরে কী আশ্র্য, বাচ্চা

দু'টা আবার জিভ বের করে ফেলেছে। ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই তোমরা দু'টা মিনিট বসো। কেক খেয়ে যাও।

ওসি সাহেবের ওয়াকিটকি বেজে উঠেছে। তিনি রিভলভিং চেয়ারে ঘুরতে ঘুরতে কথা বলছেন।

না না স্যার। কোনো সাংবাদিকের সঙ্গে আমি কথা বলব না। আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন, আমাকে ক্লোজ করে অন্য কোনো থানায় ওপেন করে দেন। তবে স্যার আমার ধারণা রবীন্দ্র হাঙ্গামা থেমে যাবে। সাংবাদিকরা নতুন একটা নিউজ আইটেম পেয়েছে। এটা নিয়েই এখন তাদের মাতামাতি করার কথা। পড়েন নাই? এক পরিবারের সাতজনের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু। আমরা সেফ সাইডে আছি। কয়েকদিন এইটা নিয়েই চলবে ইনশাল্লাহ। কীভাবে আগুন ধরল, মৃত্যুর আগে কে কী বলল, এইসব ছাপা হতে থাকবে। খবরের কাগজের দোষ দিয়েও তো লাভ নাই স্যার। পাবলিক খবর চায়। এত খবর সাপ্লাই দিবে কীভাবে? ডিমান্ড বেশি সাপ্লাই কর। আমি স্যার সাবসিডিয়ারিতে ইকনমিস্কুল নিয়েছিলাম, সেখানে পড়েছিল অব ডিমিনিশিং রিটার্ন। আমি বেশি কষ্ট বলছি? সরি স্যার। আর কথা বলব না। মুখ বন্ধ।

কেয়া-খেয়ার জন্যে পেস্ট্রি এসেছে। খেয়া চামচ দিয়ে ঠিকমতো খেতে পারছে না। ওসি সাহেব বললেন, চামচ আমার কাছে দাও আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

কেয়া বলল, পুলিশ মামা! আমাকেও খাইয়ে দিতে হবে।

ওসি সাহেব বললেন, নো প্রবলেম।

দু'জনেই হা করে আছে। ওসি সাহেব পালা করে ওদের মুখে পেস্ট্রি দিচ্ছেন।

বসন্ত দাগওয়ালা এক ফাঁকে ঘরে তুকলেন, বিরক্তমুখে বললেন, কী হচ্ছে?

ওসি সাহেব বললেন, পেস্ট্রি খাওয়া হচ্ছে।

ধামড়ি দুই মেয়ে। এদের মুখে তুলে খাওয়াতে হবে কেন? স্যার আপনি মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করেন।

ওসি সাহেব যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করলেন। পেস্ট্রি পর্ব শেষ হওয়ার পর কোক আনালেন। সেটাও গ্লাসে করে মুখে তুলে খাওয়ানো হলো।

খেয়া বলল, পুলিশ মামা গল্ল বলো।

ওসি সাহেব গল্ল শুরু করলেন। ঠাকুরমা'র ঝুলির ডালিম কুমারের গল্ল। কনস্টেবলরা উঁকিখুঁকি দিচ্ছে। একজন দু'জন করে ঘরে ঢুকছে। বাংলাদেশের থানাগুলোতে অনেক কিছুই হয়, রূপকথার আসর কখনো বসে না।

ওসি সাহেব হাত-পা নেড়ে গল্ল বলছেন। শ্রোতার সংখ্যা বাড়ছে।

'ডালিম কুমার যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। তার হাতে তলোয়ার। সে চেপেছে ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার ক্ষুরে টগবগ শব্দ হচ্ছে...'

হিমুর গল্ল সবসময় উত্তমপুরুষে লেখা হয়। এই চ্যাপ্টার থেকে হিমু উত্তমপুরুষে লেখা হচ্ছে না। হিমু-পাঠে অভ্যন্ত পাঠকদের সাময়িক সমস্যা হতে পারে। আমি দৃঢ়বিত, কিছু করার নেই। চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই পাত্র-পাত্রী কে কোথায় কী করছে জানিয়ে দেই।

কেয়া-খেয়া

এরা দু'জন কমলকুটিরে মহাসুখে আছে। বৃন্দ ধমকা-ধমকি করেও কিছু করতে পারছেন না। তাদের জন্যে জামা, জুতা কেনা হয়েছে। দু'জনই বার্বিডল উপহার পেয়েছে। কেয়া তার বার্বিডলের নাম দিয়েছে ফুনফুন, খেয়া তারটার নাম দিয়েছে কুনকুন। তাদের আলাদা রূম দেওয়া হয়েছে। এই রূমে তারা থাকছে না। বৃন্দ-বৃন্দার শোবার ঘরে থাকছে। রাতে শোওয়ার সময় একপাশে বৃন্দ, অন্যপাশে বৃন্দা, মাঝখানে দুই কন্যা। বৃন্দ ঘনঘন বলছেন, একি বিপদে পড়লাম! কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত আনন্দে আছেন তা বোঝা যাচ্ছে। বার্বিডল তিনিই কিনে এনেছেন। মাঝে মাঝে এই দু'বৌন জিভ বের করে কেন বসে থাকে এটা নিয়ে বৃন্দ-বৃন্দা চিন্তিত। এদেরকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর পরিকল্পনা তাঁদের আছে।

বাচ্চা দু'টি বৃন্দ-বৃন্দার স্তুবির জগতে কী আলোড়ন এনেছে তা বোঝানোর জন্যে টেলিফোন কথাবার্তার কিছু অংশ দেওয়া হলো। বৃন্দা তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। এই মেয়ে অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী।

বৃদ্ধা : বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না রে মা । কেয়ার স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে । স্যান্ডেল কিনতে যেতে হবে ।

মেয়ে : কেয়া কে ?

বৃদ্ধা : আমাদের সঙ্গে থাকে । দুই বোন কেয়া-খেয়া । কী যে দুষ্ট !

মেয়ে : আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না । এরা কারা ?

বৃদ্ধা : ওদের যত্নগায় অস্থির হয়ে কাল বলেছি—আমি তোদের সঙ্গে থাকব না । জঙ্গলে চলে যাব । তারপর দুই বোন শুরু করল কান্না ।

মেয়ে : মা, তুমি বাবাকে দাও তো । বাবার সঙ্গে কথা বলি ।

বৃদ্ধা : তোর বাবা খেয়াকে নিয়ে গেছে আইসক্রিম কিনতে । তোর বাবা আদর দিয়ে দুই বিচ্ছুকে মাথায় তুলেছে । কাল কী দেখলাম শোন । তোর বাবা ঘোড়া সেজেছে । দুই বোন ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে আছে । আমাকে দেখে কেয়া বলল, নানু, তুমি আসো । ঘোড়ায় ওঠো । তিনজনের জায়গা হবে । কী যে যত্নগায় আছি ।

ওসি, ধানমন্তি

নাজমুল ইহুদ

তাকে ধানমন্তি থানা থেকে ক্লোজ করে তেজগাঁ থানায় ওপেন করা হয়েছে । আবার তাকে ধানমন্তি থানায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলে আপাতত কোনো ডিউটি দেওয়া হয় নি । তিনি থানায় হাজিরা দিয়ে তার শালা হিরন্যয় কারিগরের কাছে গেছেন । হিরন্যয় কারিগর একটা ডকুমেন্টারি বানাচ্ছেন । ডকুমেন্টারির নাম ‘একজন গার্মেন্টকর্মীর একদিন’ । গার্মেন্টকর্মীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন চিত্রনায়িকা মিস রিনকি । যার সাম্প্রতিক ছবি ‘প্রেম দে, না দিলে থাপড় খাবি’ সুপারহিট হয়েছে । মিস রিনকি নানান নথড়া করছেন । হিরন্যয় কারিগর নথড়া সামলাতে পারছে না ।

ছামাদ মিয়া

ছামাদ মিয়া রবীন্দ্রনাথ সেজে হিমুর মেসের ঘরে বসে আছে । হিমু মেসে নেই তাতে কোনো সমস্যা হয় নি । হিমুর ঘরের দরজা সবসময় খোলাই থাকে । তাকে নিয়ে যে খবরের কাগজে বিরাট হৈচে হচ্ছে এটা সে জানে বলেই আবারও রবীন্দ্রনাথ সাজা । এবারের সাজ আগেরবারের চেয়েও

ভালো হয়েছে। মেসের অনেকেই উঁকি মেরে তাকে দেখে যাচ্ছে। একজন এসে তার মেয়ের জন্যে অটোগ্রাফ নিয়েছে। ছামাদ ইংরেজিতে অটোগ্রাফ দিয়েছে। সেখানে লেখা—Be Happy. দুটা ‘p’ এর জায়গায় একটি ‘p’ ইংরেজি বানানে ছামাদ সামান্য দুর্বল।

মেসের ম্যানেজার ‘ভোর বাংলা’ নামের পত্রিকার সম্পাদককে জানিয়েছে—যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত হৈচৈ তাদের কাগজে হয়েছে তিনি বাংলা মেসে উপস্থিত আছেন। ‘ভোর বাংলা’র সিনিয়র সাংবাদিক ফজলু মোর্টসাইকেল নিয়ে রওনা হয়েছেন। তার সঙ্গে সিনিয়র ফটো সাংবাদিক ময়না ভাই আছেন। তারা মালিবাগের কাছে জ্যামে আটকা পড়েছেন। ভয়ঙ্কর জ্যাম। আজ সারা দিনে ছুটবে এরকম মনে হয় না।

জনাব গফু

ইনি এখন ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাণ ওসি। তিনি যে কাজেকর্মে আগের ওসির চেয়েও দক্ষ তা প্রমাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হিমুর মেসের ঠিকানায় অভিযান চালাবার জন্যে ফোন নিয়ে জিপে উঠে বসে আছেন। জিপ ছাড়ছে না, কারণ জনাব গফু র্যাবকে খবর দিয়েছেন। তিনি চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন পত্রিকার হেডলাইন—

কথিত রবীন্দ্রনাথের ডানহাত হিমু গ্রেফতার (স্টোফ রিপোর্টার)

পুলিশ-র্যাবের যৌথ অভিযানে অবশেষে কথিত রবীন্দ্রনাথ নাটকের হোতা হিমু গ্রেফতার। অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন চৌকশি পুলিশ অফিসার জনাব গফুর। হিমু মুখ খুলতে শুরু করেছে। সে ইতোমধ্যেই অনেক রাঘববোয়ালের নাম বলেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তারা হিমুকে চার দিনের রিমান্ডে নিতে চায়। রিমান্ডে না নেওয়া হলে অনেক অজানা তথ্য অজানাই থেকে যাবে। চৌকশি অফিসার হিমুকে গ্রেফতারের নাটকের যে রোমহর্ষক বর্ণনা দেন তা উনার জবানিতেই পত্রস্থ করা হলো। ইত্যাদি...

হিমু

হিমু নির্খোজ। সে কোথায় আছে, কী করছে জানা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই হিমু ডুব দেয়, মনে হয় এবারও ডুব দিয়েছে। আমরা হিমুর ভেসে ওঠার প্রতীক্ষায় আছি।

‘ভোর বাংলা’র সিনিয়র সাংবাদিক জনাব ফজলু কিছুক্ষণ হলো ছামাদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করেছেন। এখন তিনি পুরোপুরি হতাশ। ছামাদ মিয়া শখের বশে রবীন্দ্রনাথ সাজে। এই নিউজের কোনো ভেল্যু আছে? পাবলিক চায় একসাইটমেন্ট। একজন শখে রবীন্দ্রনাথ সাজে, এর মধ্যে একসাইটমেন্ট কোথায়?

ফজলু বিরসমুখে বললেন, আপনি মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে টকশো করলেন কেন?

ছামাদ বলল, আমি কিছু জানি না স্যার। ভুলে চুকেছি। আর যাব না। যদি যাই মাটি খাই। ঘাউ।

ঘাউ বললেন কেন?

মাঝে মধ্যে নিজের অজান্তেই বলি। আর বলব না।

আপনার চুল-দাঢ়ি সবই নকল?

জি। তবে টাইট ফিটিং ট্রিন দিয়া দেখেন।

ফজলু দাঢ়ি টানাটানির কোনো আগ্রহ বোধ করলেন না। সংবাদের হেডলাইন কী দেবেন এই নিয়েই তার চিন্তা। ‘পর্বতের মুষিক প্রসব’ এই হেডলাইন হতে পারে। তাতে এক সংখ্যাতেই শেষ। দুই-তিন সংখ্যা চালানোর মতো কিছু থাকবে না। প্রথম দিন একটু আভাস দিয়ে পরের দুই দিনে যবনিকা অপসারণ করা দরকার। পাবলিক একটু একটু করে জানবে, পুরোটা জানবে না।

রবীন্দ্রনাথের লাইন দিয়ে নিউজ হতে পারে—শিরোনাম হবে ‘আজি হতে শতবর্ষ পরে।’ শতবর্ষ পরে ছামাদ মিয়া নামের একজনের ইচ্ছা হলো রবীন্দ্রনাথ সাজবে। এই নিয়ে গল্প। প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথ হিসেবে তার ছবি। দ্বিতীয় দিনে আসল ছামাদের ছবি। শিরোনাম—কে এই ছামাদ?

ফারহক বললেন, দাঢ়ি গোঁফ খোলেন। আলখাল্লা খোলেন। নরমাল ছবি তোলা হবে। লুঙ্গি গেঞ্জি।

ছামাদ দ্রুত আদেশ পালন করল। ময়না ভাই ছবি তুলতে তুলতে বললেন, স্যার আপনি পোশাকটা পরেন। আপনার একটা ছবি তুলে দেই। রবীন্দ্রনাথ সাজলে আপনাকে কেমন লাগে দেখি।

ফারুক বললেন, এইসব ফাজলামির কি আর বয়স আছে?

ছামাদ বিনীত গলায় বলল, পরেন না স্যার। গরিবের একটা রিকোয়েস্ট।

ময়না ভাই বললেন, সুন্দর করে তুলে দেই, বাঁধিয়ে বাড়িতে রাখবেন। ভবি মজা পাবেন।

ফারুক বললেন, তোমার ভাবি মজা পাবে কথাটা ঠিক বলেছ। যে-কোনো ফালতু জিনিসেই সে মজা পায়। দেখি দাঢ়িগোঁফ পরাও। কুটকুট করবে না তো?

ফারুক রবীন্দ্রনাথ সেজে তিনটা ছবি তুললেন। ঘরের ভেতরে আলো কম থাকায় বারান্দায় এলেন ছবি তুলতে। থিমেটেক ছবি। বারান্দার রেলিং-এ ঝুঁকে উদাস চোখে আকাশের মেঘমালা দেখতে দেখতে ছবি। ময়না ভাই একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং আকাশ ধরার চেষ্টা করছেন। এইসময় অফিসার গফুর র্যাব নিয়ে বারান্দায় চুকলেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্তায় কবিগুরুর হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেওয়া হলো। তিনি ওয়াকিটকিতে তৎক্ষণাত ডিআইজি সাহেবকে জানালেন, কবিগুরু আভার অ্যারেস্ট স্যার। ওভার।

সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার এবং সিনিয়র ফটোগ্রাফার দু'জনই থানা হাজতে। ভয়ঙ্কর অপরাধী ছাড়া কাউকে থানা হাজতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখার নিয়ম নেই। কিন্তু সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার জনাব ফারুককে অতিরিক্ত নিরাপত্তার কারণে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখা হয়েছে। হাত বন্ধ থাকায় তিনি মুখ থেকে নকল চুল দাঢ়ি খুলতে পারেন নি। আলখাল্লাও খুলতে পারেন নি। তাঁকে ভয়ঙ্কর চিন্তিত এবং বিমর্শ দেখা যাচ্ছে। সেই তুলনায় সিনিয়র ফটোগ্রাফার ময়না ভাইকে বেশ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তিনি বেশ আয়েশ করেই সিগারেট টানছেন। ফারুক বললেন, হ্যান্ডকাফ খোলার ব্যবস্থা করছন। গলা চুলকাচ্ছে, চুলকাতে পারছি না। ময়না ভাই বললেন, আমি কীভাবে হ্যান্ডকাফ খুলব? চাবি তো আমার কাছে না।

কোথায় চুলকাতে হবে ঠিকমতো বলুন আমি চুলকিয়ে দিচ্ছি। গলা? সামনের দিকে না পেছনের দিকে? আরেকটা কথা স্যার বিপদে অস্থির হতে নাই। আপনি বেশি অস্থির।

থানার সামনে ক্যামেরা হাতে বিভিন্ন চ্যানেলের লোকজন। এদের মধ্যে দু'জন সাহেবও আছেন। তারা CNN থেকে কাভার করতে এসেছেন। তাদের কাউকেই হাজতিদের সঙ্গে দেখা করতে হচ্ছে না। তবে শোনা যাচ্ছে পুরো ঘটনা জানিয়ে একটা প্রেস বিফিং করা হবে। বিফিং করবেন ভারপ্রাণ ওসি জনাব গফু। তিনি এখন বাথরুমে বসে আছেন। বাথরুমে নাপিত এসেছে, সে তাকে শেভ করে দিচ্ছে। সকালে তাড়াহড়োর কারণে শেভ করা হয় নি। এতগোলো ক্যামেরার সামনে মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাঢ়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। দ্রুত শেভ করতে গিয়ে ঝামেলা হয়েছে। নাপিতের ক্ষুরের টানে গালের কোনো ভেইন কেটেছে। রক্ত পড়ছে, তুলা চেপেও রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। নাপিত একটা পাকিস্তানি থাপ্পড় খেয়ে তবদা মেরে গেছে।

প্রেস বিফিং শুরু হয়েছে। গফু শালে তুলা চেপে ধরেই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন।

‘দেশি-বিদেশি সাংবাদিক’ ভাই ও বোনেরা আমার। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি কথিত রবীন্দ্রনাথ একটা মেসবাড়ির কক্ষে মিটিং করছে তার পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করার জন্যে।

কালবিলম্ব না করে আমি থানার ফোর্স, চারজন র্যাব ভাই এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাণ দু'টি কুকুর নিয়ে অকুস্তলে হানা দেই। গোপন সূত্রের খবর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুল প্রমাণিত হয়। আল্লাপাক রাববুল আলামনের অনুগ্রহে এইবার ভুল প্রমাণিত হয় নাই। আমি সশঙ্কে বুটের এক ধাক্কায় দরজা ভেঙে ঘরে চুকে শিকারি হায়েনার মতো লাফ দিয়ে আসামির উপর পড়েই তাকে ঝাপটে ধরি। ধন্তাধন্তিতে আমার যে গাল কেটে গেছে তা বুঝতেও পারি নাই।’

ভারপ্রাণ ওসি সাহেব গাল থেকে তুলা সরালেন। দর্শকসারি থেকে ‘উফ’ শব্দ উঠল। দর্শকদের মধ্যে নাপিতও ছিল। সে পুরোপুরি বিভান্ত হয়ে গেল।

এখন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। একজন
একটির বেশি প্রশ্ন করতে পারবেন না। বলুন আপনার কী প্রশ্ন?

গ্রেফতারের পর কথিত রবীন্দ্রনাথ কী বলছেন?

দুঃখের বিষয় তিনি কিছুই বলছেন না। কিছু জিজ্ঞেস করলে বিড়বিড়
করছেন।

তিনি কি একাই ধরা পড়েছেন, না সদলবলে ধরা পড়েছেন?

আমরা তার একজন সহযোগীকে ধরতে সমর্থ হয়েছি। তার অন্য
সহযোগী একফাঁকে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়।

এরা কি কোনো জঙ্গী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত?

আসামির লম্বা দাঢ়ি দেখে সে রকমই মনে হচ্ছে। দেশজুড়ে ব্যাপক
অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। আমরা শীঘ্রই এই বিষয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
দিতে পারব। তবে আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি—আরো তিনজন
কথিত রবীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজন শাস্তাহার রেলস্টেনের
চা-বিক্রেতা। সে নিজেকে নির্দোষ দাবি করছে। তার চেহারাই এরকম।
অন্যজনকে সীমান্ত অতিক্রমের সময় ধৰ্ম হয়। সে চাদরের নিচে লুকিয়ে
ভারত থেকে ফেনসিডিল আনে লম্বা চুল-দাঢ়ির কারণে তাকে সুফি
মানুষের মতো লাগে বলে ক্ষিভিআর ধরে না। তৃতীয়জন বলছেন তিনি
কাহালুর ছাত্রলীগের সংস্কৃতি সম্পাদক। তাঁর বয়স একষতি তবে তিনি তাঁর
ছাত্রত্ব সম্পর্কে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে সবসময় কোনো
না কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন। বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথি
কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। এখন আমি আর একটি প্রশ্ন নেব। হ্যাঁ আপনি
প্রশ্ন করুন। এখন আপনার টার্ম।

এমন কি হতে পারে যে ছাত্রলীগকে জনগণের সামনে ছোট করার
জন্যে কেউ রবীন্দ্রনাথ সেজে ছাত্রলীগে ঢুকে পড়েছে?

অবাস্তুর প্রশ্ন। জবাব দিব না।

অবাস্তুর হবে কী জন্যে? পত্রপত্রিকায় দেখেছি অনেক শিবিরের ক্যাডার
দাঢ়ি কামিয়ে ছাত্রলীগে ঢুকেছে। নিয়মিত শেভ করছে।

পলিটিক্যাল প্রশ্নের জবাব দিব না। আমরা সরকারি কর্মচারী।
আমাদের কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। তবে ঘটনা সত্য হতে পারে।

‘ভোর বাংলা’র সম্পাদক থানায় এসেছেন। তিনি দুটি বৈঠক করেছেন। প্রথম বৈঠক সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ফার্মক থানের সঙ্গে। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হয়।

সম্পাদক : (হতভয়। বিস্মিত। রাগান্বিত এবং হতাশাগ্রস্ত। সবই একই সঙ্গে)

আপনি সাংবাদিকতার নামে এই কাজ করছেন? নিজেই রবীন্দ্রনাথ সেজে টক শোতে অংশ নিচ্ছেন। আবার নিজেই এই বিষয়ে রিপোর্ট করছেন। সাপ হয়ে দংশন করছেন। ওরা হয়ে ঝাড়ছেন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

ফার্মক : ঘটনা এরকম না।

সম্পাদক : ঘটনা কী রকম? আপনি কি অস্থীকার করবেন যে, আপনি রবীন্দ্রনাথ সাজেন নি? এখনো তো দাঢ়ি গোফ লাগিয়ে বসে আছেন।

ফার্মক : আমি শুছিয়ে কথা বলতে পারছি না। সব আউলা লেগে যাচ্ছে। ময়না ভাই প্রিজ ঘটনা কী হয়েছে বলুন।

ময়না : স্যার উনার কোনো দোষ নাই। আমি ক্যামেরা হাতে বলছি। মাতাল যেমন মদের বোতলে হাত দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে না, ক্যামেরামুক্তও ক্যামেরায় হাত দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে না।

সম্পাদক : কথা পেঁচাবেন না, টু দ্য পয়েন্ট কথা বলুন।

ময়না : সব দোষ আসলে ভাবির।

সম্পাদক : এখানে ভাবি এল কোথেকে? ভাবি কে?

ময়না : ফার্মক স্যারের স্ত্রী। উনার অত্যুত স্বভাব। সব ফালতু জিনিসে উনার আনন্দ। মেয়েছেলে এ রকমই। কবি বলেছেন, স্ত্রী চরিত্রম দেবা না জানতি, কুত্রাপি মনুষ্য। এর অর্থ...

সম্পাদক : ভ্যারভ্যার করছেন কেন?

ময়না : ভ্যারভ্যার কখন করলাম?

সম্পাদক : এই তো এখন করছেন। ইডিয়টের মতো ননস্টপ যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছেন।

ময়না : আমাকে ইডিয়ট বলেছেন?

সম্পাদক : হ্যাঁ বলেছি। রাগ সামলাতে না পেরে বলেছি। সরি ফর দ্যাট।

- ময়না : তোর চাকরি আর করব না। আমি ট্যাকনিকাল পারসন।
 আমার চাকরির অভাব? তোর পত্রিকায় চাকরি না করলে কী
 হয়? আমার ‘....ল’ হয়?
- সম্পাদক : তুই তুই করছেন কেন এবং অশালীন কথা বলছেন কেন?
- ময়না ভাই : রাগ সামলাতে না পেরে তুই তুই করছি। সরি ফর দ্যাট।
 এই নে তোর পত্রিকার ক্যামেরা।
- সম্পাদক : ক্যামেরা তো ভাঙ।
- ময়না : ক্যামেরা পুলিশ আছাড় দিয়ে ভেঙেছে। আমি ভাঙ্গি নাই।
 সাহস থাকলে পুলিশের সাথে গিয়া দরবার কর।
 সম্পাদক লেন্স ভাঙা ক্যামেরা হাতে উঠে দাঁড়ালেন।

দ্বিতীয় বৈঠক।

স্থান : ওসি সাহেবের কক্ষ।

- সম্পাদক : আপনার সম্পর্কে আমাদের কাছে কিছু তথ্য আছে।
 সেনসেটিভ কিছু তথ্য।
- গফুর : (হাসিমুখে) আপনি সাংবাদিক, আপনার কাছে তো তথ্য
 থাকবেই। আপনি কোথাই হলে আপনার কাছে থাকত পথ্য।
- সম্পাদক : রসিকতা করলে চেষ্টা করবেন না। আমি উন্নাদ পত্রিকার
 সম্পাদক না। আমার পত্রিকার নাম ‘ভোর বাংলা’। যা বলছি
 মন দিয়ে শুনুন। একটা পত্রিকার অনেক ক্ষমতা। পত্রিকা এমন
 এক রিপোর্ট করতে পারে যে এক রিপোর্টে আপনার চাকরি
 শেষ। রিপোর্টের কারণে আপনাকে জেলের ভাত খেতে হচ্ছে।
- গফুর : কী রিপোর্ট?
- সম্পাদক : যেমন ধরন ভাসমান পতিতাদের কাছ থেকে আপনি
 নিয়মিত তাদের আয়ের একটা অংশ নিয়ে থাকেন। তাদের
 একজনের নাম শমিতা। তাকে প্রায়ই আপনার বিশেষ
 শারীরিক প্রয়োজনে সাড়া দিতে হয়।
- গফুর : (অবাক) শমিতা কে?
- সম্পাদক : বললাম না, ভাসমান পতিতা। শমিতা পত্রিকায় বিশাল
 ইন্টারভু দিবে। সেই ইন্টারভু ছবিসহ ছাপা হবে।
 আপনারা পুলিশেরা যেমন ইচ্ছেমতো সাক্ষী হাজির করতে

পারেন। আমরাও পারি ইচ্ছেমতো ইন্টারভুয়র ব্যবস্থা
করতে। নেপোলিয়ানের মতো জেনারেল পত্রিকার ভয়ে
অস্ত্রির থাকতেন। আপনি কেউ না, ডোবার পুঁটিমাছ।
পুঁটিমাছ আমি ধরব না। ডোবা সেঁচে ফেলব। আপনি শুকনা
ডোবায় খাবি থাবেন।

- গফুর : আমাকে কী করতে হবে?
- সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ হিসেবে যাকে ধরেছেন, তাকে ছেড়ে দিতে হবে।
সে আমার পত্রিকার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার। অত্যন্ত ভালো
মানুষ। পাকে চক্রে রবীন্দ্রনাথ সেজেছে।
- গফুর : এখন তাকে ছাড়া কীভাবে সম্ভব? আমি কনফারেন্স করে
বলেছি যে কথিত রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছে। সাংবাদিকরা ছবি
তুলেছে।
- সম্পাদক : দাঢ়ি গৌফ আলখাল্লাসহ ছবি উঠেছে। চেহারা কিছুই বোঝা
যাবে না। ফারুকের সঙ্গে ময়না বলে যে বদটাকে ধরেছেন
ওকে দাঢ়ি গৌফ পরিয়ে দিলেই হবে। বুঝতে পারছেন কী
বলছি?
- গফুর : (একই সঙ্গে হতাশ, চিন্তিত, বিস্মিত এবং রাগত)
- সম্পাদক : কথা বলছেন ~~কো~~কেন? আপনি কি চান একজন রিপোর্টার
আপনার পেছনে লাগিয়ে দেই যাতে সে আপনার নাড়িনক্ষত্
বের করে নিয়ে আসতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই কাউকে না
কাউকে হাজতে পিটিয়ে মেরে ফেলে বলেছেন, হার্টঅ্যাটাকে
মারা গেছে। এখন বলুন, ফারুক কি ছাড়া পাচ্ছে?
- ওসি : অবশ্যই পাচ্ছে। আপনার মতো একটা মানুষের অনুরোধ
আমি রাখব না তা কি হয়?
- সম্পাদক : ময়না বলে যেটা আছে ঐটাকে একটু সাইজ করে দিবেন।
ঐটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ। আগের অনুরোধ ছিল
পত্রিকার পক্ষ থেকে। আপনার কি গল্প-কবিতা লেখার
বদঅভ্যাস আছে?

জি-না।

গল্প-কবিতা কিছু লেখা থাকলে পাঠিয়ে দিবেন। সাহিত্য পাতায়
ছাপিয়ে দিব।

ধানমন্ডি থানার ক্লোজ হওয়া ওসি নাজমুল হৃদ অনেক দিন পর বিমলানন্দ উপভোগ করছেন। চোর-ডাকাতের পেছনে দৌড়াতে হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ মানুষজন টেলিফোনে গুরুত্বহীন বিষয়ে কথা বলছেন না। মন্ত্রী মহোদয়দের পলিটিক্যাল এপিএসরা হমকি-ধামকি করছে না। তিনি তার শ্যালক হিরন্য কারিগরের কাজ দেখছেন। তার বসার জায়গা হয়েছে সুপারহিট নায়িকা মিস রিনকির কাছাকাছি। মাঝখানে দুটা ফাঁকা চেয়ার আছে। তিনি ইচ্ছা করলে একটা চেয়ার ডিঙিয়ে নায়িকার পাশে বসতে পারেন। যে-কোনো কারণেই হোক তার সাহস হচ্ছে না। শোনা গেছে এই নায়িকা নানান নথরা করে, তাকে তেমন কোনো নথরা করতে দেখা যাচ্ছে না। নায়িকা একটু পরপর হ্যান্ডব্যাগ থেকে আয়না বের করে একদৃষ্টিতে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকছে। এটা নিষ্ঠয়ই নথরার মধ্যে পড়ে না।

নাজমুল হৃদকে নাশতা দেওয়া হয়েছে। ট্যাবলেট সাইজের সিঙ্গাড়া। নাজমুল হৃদ অতি সুস্থাদু ছয়টা সিঙ্গাড়া খেয়ে ফেলেছেন। আরও খেতেন, চক্ষুলজ্জায় খেতে পারছেন না। নায়িকা মিস রিনকির সামনেও কাঁচামরিচ পেঁয়াজসহ একগাদা সিঙ্গাড়া দেওয়া হয়েছে। নায়িকা একটা সিঙ্গাড়া ভেঙে খানিকটা মুখে দিয়ে মুখ বিকৃত করেছেন। এরপর ওসি সাহেবের পক্ষে দুই হালি সিঙ্গাড়া খেয়ে ফেলা যায় না।

কিছুক্ষণ আগে মিস রিনকির একটা শট হয়েছে। গার্মেন্টস ফ্যাট্টরি থেকে বের হয়ে সে চুড়িওয়ালির কাছ থেকে কী সুন্দর করেই না চুড়ি কেনার অভিনয় করল, অসাধারণ।

মিস রিনকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, পানি খাব। আশেপাশে কেউ নেই। ওসি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কত বদমাইশকে নিজের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়েছেন, আর ইনি সম্মানী মহিলা। অপূর্ব অভিনয়।

মিস রিনকি পানির গ্লাস হাতে নিলেন। ছেট চুমুক দিলেন। জিভ ভেজানোর মতো কয়েক ফোঁটা পানি মুখে নিলেন। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, ধন্যবাদ। নায়িকারা নায়ক ছাড়া অন্য কারও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। ওসি সাহেব বললেন, আপনার চুড়ি কেনার দৃশ্য দেখে মুক্ষ হয়েছি।

ও আছ্ছা।

কেন মুক্ষ হয়েছি বলব? যদি বিরক্ত না হন, অল্পকথায় বলি।

মিস রিনকি হঁয়া না কিছু বলল না। পানির ঘাসে আরেকবার ছেটে চুমুক দিল। ওসি সাহেব বললেন, আপনি চূড়িওয়ালির সামনে বসলেন। হাতভর্তি করে চূড়ি পরলেন। অনেক দরাদরি করলেন। দরে বনল না। মন খারাপ করে সব চূড়ি ফেরত দিলেন। হাত থেকে চূড়ি বের করার সময় দু'টা চূড়ি ভেঙে গেল। আপনি ভাঙা চূড়ির দাম দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আবার ফিরে এসে ভাঙা চূড়ি দু'টা নিয়ে চলে গেলেন। অসাধারণ, অসাধারণ! আমার হাতে অঙ্কার পুরস্কার থাকলে আজই একটা পেয়ে যেতেন।

বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

ওসি সাহেব বসলেন। রিনকি বলল, এখানে যা করেছি সব নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে করেছি। ডিরেষ্টের শুধু বলেছে আপনি হাতে চূড়ি পরবেন। দাম না বনায় হাত থেকে চূড়ি খুলে দিয়ে চলে যাবেন। বাড়তি কাজ অর্ধাং চূড়ি ভেঙে যাওয়া, ভাঙা চূড়ির টাকা দেওয়া এবং ভাঙা চূড়ি নিতে আবার আসা—সব আমি আমার চিন্তা থেকে করেছি।

আবারও বলছি, অসাধারণ।

আপনাকে ধন্যবাদ। আমার কপাল খারাপ, সব অগা মগা বগা ডাইরেষ্টের হাতে পড়ি।

এই ডাইরেষ্টের কেমন? হিরন্যায় কার্যাগর। অগা মগা বগার মধ্যে কোন ক্লাসে পড়ে?

সে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। বগা শ্রেণীর। বগার চেয়েও খারাপ, ছগা বলতে পারেন।

ঠিকই বলেছেন, আসলেই ছগা। দু'বারে এসএসসি পাস করেছে। ইন্টারমিডিয়েটে আটকে গেছে। সেদিন এক পত্রিকায় ছগার ইন্টারভু ছাপা হয়েছে। ছগা বলেছে সে অস্ট্রেলিয়া থেকে সিনেমাটোগ্রাফির উপর ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। ডিগ্রি তো দূরের কথা, অস্ট্রেলিয়া কোথায় তা-ই ছগাটা জানে না।

তাকে চিনেন?

আমার ছেট শ্যালক।

সরি, না জেনে অনেক কিছু বলেছি।

না জেনে কেন বলবেন! জেনেগুনেই বলেছেন। হাতি চেনে মাহুতকে, সাপ চেনে ওবাকে, নায়িকা চেনে ডিরেষ্টেরকে।

আপনি খুব গুছিয়ে কথা বলেন। আপনি কি অভিনয় করেন?

না, তবে আপনাকে দেখে অভিনয় করার ইচ্ছা হয়েছে। জানি পারব না। চা খাবেন? চা দিতে বলব?

বলুন ।

এখন কোন শট হবে?

বলতে পারছি না । ডিরেষ্টর বলতে পারবেন ।

নাজমুল হৃদ ছোট নিঃশ্঵াস ফেলে বললেন, দৃশ্য নেওয়াকে যে শট বলে
তা-ই জানতাম না । পুলিশের লোক তো । আমার কাছে শট মানে গুলি করা ।

আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে?

জি । ধানমন্ডি থানার ওসি ছিলাম, এখন আমাকে ক্লোজ করা হয়েছে ।

আপনার ছেলেমেয়ে কী?

বিয়ের দ্বিতীয় দিনে আমার স্ত্রী মারা যান, তারপর আর বিয়ে করি
নাই । একদিকে ভালোই হয়েছে । পুলিশের চাকরিতে ঘরে ফিরতে ফিরতে
কোনোদিন রাত দুটা বাজে, কোনোদিন তিনটা বাজে । রেহনুমা দ্বিতীয় দিনে
মরে গিয়ে বেঁচে গেছে ।

আপনার স্ত্রী বিয়ের দ্বিতীয় দিনে মারা গেছেন শুনে খুব খারাপ লাগল ।
আমার আসলেই মনটা খারাপ হয়ে গেছে ।

ওসি সাহেব বললেন, দ্বিতীয় দিনে মারা গেছে এটা মন খারাপ করার
মতো কোনো ঘটনা না । সে ফাঁস নিয়ে মারা গেছে । অন্য জায়গায় প্রণয়
ছিল । জোর করে বিয়ে দিয়েছে, কাজেই বিয়ের শাড়ি ফ্যানের সঙ্গে
লাগিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছে ।

Oh God! আপনার এই স্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তারপরেও
আপনার যোগাযোগ আছে?

কেন থাকবে না? রেহনুমা মারা গেছে । তার বাবা-মা, ভাইবোন এরা তো
বেঁচে আছে । রেহনুমার ছোটভাই ছেটবোন দুজনই দুলাভাই বলতে পাগল ।

মিস রিনকি ইতস্তত করে বললেন, কিছু মনে করবেন না । আপনি কি
যুৰ থান?

খাওয়ার খুবই ইচ্ছা হয় কিন্তু খাই না । সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম, যুৰ না
খাওয়ার পেছনে এটা একটা কারণ । সাহিত্যের সঙ্গে অভাব যায়, যুৰ যায় না ।

এই মাসের ১৩ তারিখ রাতে কি আপনার কাজ আছে?

চাকরি থাকলে কাজ থাকবে । না থাকলে ফ্রি । কেন বলুন তো?

১৩ তারিখ আমার জন্মদিন । আমি সবসময় চেষ্টা করি জন্মদিনের রাতে
১৩ জন ভালো মানুষ আমার সঙ্গে ডিনার করবেন । আপনাকে আমি সিলেষ্ট
করলাম । আমার জন্মদিনে আপনার নিম্নত্বণ ।

আমি ভালো মানুষ?

প্রাথমিকভাবে সে রকমই মনে হচ্ছে।

জীবনে প্রথম কেউ আমাকে ভালো মানুষ বলল। যাই হোক, এখন
বলুন আপনাকে নিয়ে ১৩, নাকি বাদ দিয়ে ১৩?

আমাকে নিয়ে ১৩।

যিশুখ্রিষ্টের লাস্ট সাপারের মতো?

হ্যাঁ।

১৩ জনের মধ্যে কতজন জোগাড় হয়েছে?

আমি তো আছিই। আমাকে ছাড়া আর মাত্র দু'জন জোগাড় হয়েছে।
একজন আপনি। অন্যজনকে আপনি চিনবেন না। তার প্রধান কাজ রাতে
ঢাকা শহরের পথে পথে হাঁটা। তার ভালো নাম হিমালয়। ডাকনাম হিমু।
অনেক দিন হয়ে গেল তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। আপনি পুলিশের
লোক, আপনি কি তাকে ১৩ তারিখের আগে খুঁজে বের করতে পারবেন?

কী নাম বললেন?

হিমু।

নাজমুল হৃদের কাছে নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে। হিমু যে চোর-ডাকাত
কেউ না এটা বোঝা যাচ্ছে। চোর-ডাকাতের নাম তার মনে থাকে। ভালো
মানুষের নাম মনে থাকে নাঃ। তিনি নিশ্চিত মিস রিনকির নাম তার মনে
থাকবে না। তবে মিস রিনকিকে নিয়ে দু'লাইনের ছড়া বানালে নামটা মনে
থাকবে। ভালো মানুষের নাম তিনি এইভাবে মনে রাখেন।

আনন্দ ফিনকি

নায়িকা রিনকি।

এই তো হয়েছে। রিনকি নাম তিনি আর ভুলবেন না। তিনি বিড়বিড়
করে কয়েকবার ছড়াটা বললেন, যাতে কখনো ভুলে না যান।

রিনকি বলল, বিড়বিড় করে কী বলছেন?

নাজমুল হৃদ বললেন, কিছু না কিছু না। তাকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে
হলো। আরেকটা ছড়া তার মাথায় এসেছে।

রিনকির চোখ কালো

এই মেয়েটা ভালো।

সকাল দশটা পাঁচ।

বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান কংকন ভাই তালা খুলে গবেষণা কেন্দ্রে ঢুকলেন। মেঝেতে অনেকগুলো পত্রিকা পড়ে আছে। তিনি পত্রিকার সংখ্যা গুলেন। তার ভুরু খানিকটা কুঁচকাল। মাত্র চারটা পত্রিকা। গবেষণা কেন্দ্র থেকে সব পত্রিকা অফিসে চিঠি গেছে নিয়মিত সৌজন্যসংখ্যা পাঠানোর জন্যে। গবেষণার জন্যে পত্রিকা প্রয়োজন। সবাই পাঠাচ্ছে না। চিঠিতে কাজ হবে না। কিসলুকে পাঠাতে হবে। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে কিসলুর আঙুলে ঘি আনতে হবে।

কংকন ভাইয়ের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস নেই (তার কোনোকিছু পড়ারই অভ্যাস নেই) তারপরেও একটা পত্রিকা হাতে নিলেন। নাম ‘ভোর বাংলা’। পত্রিকার প্রধান খবর—

রবীন্দ্ররহস্য ঘনীভূত

কংকন ভাই আগের কোনো খবর পড়েন নি। কাজেই রবীন্দ্ররহস্য বিষয়ে কিছুই জানেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধরা পড়েছেন শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদ থেকে গত মাসেই কবিগুরুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কাঙালিভোজ হয়েছে। ওয়ান আইটেম। গরুর মাংসের তেহারি। এখন দেখা যাচ্ছে, তিনি ক্রেঁচে আছেন এবং পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। এমন একজন সম্মানিত মানুষকে পুলিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া গ্রেফতার করবে না। তাহলে কি বর্তমান সরকার রবীন্দ্রনাথবিরোধী অবস্থান নিয়েছে? যদি নিয়ে থাকে তাহলে বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রকেও একশানে যেতে হবে। কবিগুরুর কুশপুত্রিকা দাহের ব্যবস্থা করতে হবে। কুশপুত্রিকার অভাব নেই। তিনটা বানানোই আছে। কংকন ভাই মনোযোগ দিয়ে দ্বিতীয়বার খবরটা পড়ে মোটামুটি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন।

একটা মেস থেকে রবীন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি জনাব গফুর। যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট, গাত্রবর্ণ গৌর। সাংবাদিকরা তার ছবি তুলেছেন।

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ বদল হয়েছেন। দেখা গেছে হাজতের রবীন্দ্রনাথের উচ্চতা তিন ফুট। গাত্রবর্ণ ঘন কৃষ্ণ। ভারপ্রাপ্ত ওসিকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে।

রহস্য সমাধানের জন্যে ব্যাপক তদন্ত শুরু হয়েছে। দেশপ্রেমিক মাগরিকদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাটকের মূল নায়ককে পুলিশে ধরিয়ে দিতে। মূল নায়কের নাম ছামাদ মিয়া। ছামাদ মিয়া সম্পর্কে যে-কোনো তথ্য র্যাব বা থানাকে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কংকন ভাই খবর পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে তবদী মেরে রাইলেন। দেশে এত কিছু ঘটে গেছে তিনি জানতেন না। ছামাদ মিয়া সম্পর্কে তথ্য তার কাছে আছে। এই বদমাইশ কাজী নজরুল ইসলাম সেজে বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রে এসেছিল। থাপ্পড় খেয়ে বিদায় হয়েছে।

কংকন ভাই সিগারেট ধরালেন। চা ছাড়া সিগারেট টেনে সুখ পাওয়া যায় না। হাশেম এখনো আসে নি বলে চা খাওয়া যাচ্ছে না। গবেষণা কেন্দ্রে চা-কফির ব্যবস্থা আছে। সিগারেট টানতে টানতে কংকন ভাইয়ের মাথায় নতুন আইডিয়া চলে এল। তিনি খানিকটা উত্তেজিত বোধ করলেন। রবীন্দ্র-ঝামেলা মিটে গেলেই এই আইডিয়া নিয়ে এগুতে হবে। দেরি করা যাবে না।

আইডিয়ার খুঁটিনাটি কিসলুকে জানতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু জানানো যাচ্ছে না। তার মোবাইল ফোন গত রাতে ছুরি গেছে। মানুষ মোবাইল ফোন সেট পকেটে রাখে। কংকনও রাখত, আই ফোন কেনার পর পকেটে রাখা বন্ধ করেছে। আই ফোন হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘোরার আনন্দই আলাদা। সবাই সারাক্ষণ দেখছে হাতের মুঠোয় কী জিনিস। মানুষকে দেখাতে গিয়েই দুর্ঘটনা। হাতের মুঠোর জিনিস ফসকে গেছে। এখন কংকন ভাই খানিকটা স্বত্ত্ব বোধ করছেন। মাথায় যে আইডিয়া এসেছে তার সফল বাস্তবায়ন হলে একটা নতুন আই ফোন কেনার পরেও হাতে কিছু ক্যাশ টাকা থাকবে।

বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের নাম পাল্টে ‘নজরুল পাঠচক্র’ দেওয়া। এখানে লোকজন আসবে, জাতীয় কবির রচনা পাঠ করবে। তাঁর সম্পর্কে জানবে।

বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র নাম রাখার কিছু বিপদ আছে। সরকার বদল হলেই নাম বদল হবে। নতুন নাম ‘জিয়া গবেষণা কেন্দ্র’। বাড়ি ছাত্রদলের দখলে চলে যাবে। ‘নজরুল পাঠচক্র’-এ এই চক্রের থাকবে না। নতুন নামকরণ উপলক্ষে কাঙালিভোজের আয়োজন করা হবে। আলোচনা সভা

এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পত্রপত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলগুলোকে দাওয়াত দেওয়া হবে।

এটা কংকন ভাইয়ের অপ্রধান আইডিয়া। প্রধান আইডিয়া হচ্ছে, যখন রান্নাবান্না শুরু হবে তখন একদল উচ্চজ্ঞল মানুষ হামলা করবে। অনুষ্ঠান পও হয়ে যাবে। কয়েকজন গুরুতর আহত হবে।

এতে লাভ দুটা। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না। ডেকোরেটেরের কাছ থেকে রান্না করার হাঁড়িপাতিল ভাড়া করলেই হবে। জখমও হবে ডেকোরেটেরের লোকজন। এদের জখম হওয়ার সময়ও হয়ে গেছে। ফ্রি সার্ভিস দিতে চায় না। ঘাড়ে ধরে আদায় করতে হয়। দেশের প্রতি মায়া নাই। আছে টাকার ধান্দায়। বদমাইশের দল।

দ্বিতীয় লাভ হলো প্রচার।

কংকন ভাই কাঙালিভোজ উপলক্ষে চাঁদা সংগ্রহ কীভাবে করা যায় তা ভাবতে লাগলেন। আশেপাশের বাড়িতে যেতে হবে। সঙ্গে থাকবে কিসলু। কিসলুর চেহারা দেখলেই বাড়িওয়ালার কলিজ পানি হয়ে যাবে। মুখ ফুটে চাঁদা চাওয়ার আগেই চাঁদা চলে আসবে। চা-নাশতা চলে আসবে। অনেকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হবে। অতি ভদ্র অতি বিনয়ী নারীকষ্টে টেলিফোন যাবে।

নারীকষ্ট বলবে, বঙবন্ধু গবেষণা পরিষদ থেকে বলছি। আমি রিনা। কেমন আছেন? শুভ দুপুর। (চাঁদা চাইতে হবে বঙবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের নামে। নজরুল পাঠচক্রের নামে চাঁদা চাইলে দুই টাকার ছেঁড়া নোটও পাওয়া যাবে না।)

টেলিফোনে যে নারীকষ্ট চাঁদা চাইবে সে কংকন ভাইয়ের স্ত্রী, নাম সুমনা। মহিলা লীগের প্রচার সম্পাদিকা। সুমনা আদর্শ পত্নী। স্বামীর সব কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত। সে বঙবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের একজন গবেষক। মন্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের তার ভালো দক্ষতা আছে। গত মাসেই ত্রাণমন্ত্রীর কাছ থেকে পাঁচশ কস্বল, তিনশ সুয়েটার এবং আঠারো টিন অলিভ ওয়েল নিয়ে এসেছে। সব গবেষণা কেন্দ্রে জমা আছে।

কংকন ভাইয়ের কক্ষে গভীর চিন্তামণি অবস্থায় যিনি ঢুকলেন তার গায়ে হলুদ পাঞ্চাবি। পা খালি। তার নাম হিমু। ভালো নাম হিমালয়। তিনি

কংকন ভাইকে দেখে বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, কংকন ভাই, কেমন
আছেন? শুভ দুপুর।

কংকন ভাই বললেন, আপনি কে?

আমাকে একজন পাঠিয়েছে।

কে পাঠিয়েছে?

তাঁর নাম তো বলতে পারছি না। নিষেধ আছে। তিনি আপনার কাছে
সামান্য চাঁদা চান। খুবই অল্প।

হতভয় কংকন ভাই অনেক কষ্টে নিজের হতভয় ভাব সামলালেন,
তখন রাগ তাকে অভিভূত করল। তিনি রাগে তোতলাতে তোতলাতে
বললেন, আমার কাছে চাঁদা চায়। বান্দির পুতটা কে?

কংকন ভাই, আপনি উনার বিষয়ে যে নোংরা কথা বলেছেন সেটা আমি
শুনি নাই। মাঝে মাঝে আমি কানে কম শুনি। যাই হোক, আপনি তের
তারিখ রাত আটটার মধ্যে টাকার ব্যবস্থা করবেন। বেশি না, তের লাখ।
তের তারিখের সঙ্গে মিল রেখে তের লাখ। দশ তারিখ হলে বলতাম দশ
লাখ। আপনার তিন লাখ টাকা বাঁচত। কিন্তু উনি ডেট দিয়েছেন তের।

তের লাখ টাকা চাঁদা চায়! আমার কাছে? আপনি কে? কী নাম?

আমার নাম হিমু। অনেকে ডাকে হিমালয়। হিমালয় ঠাণ্ডা তো কাজেই
হিমালয়। আমি নিজেও ঠাণ্ডা আবার কেউ কেউ ডাকে হিমবাহ। হিমবাহ
বুঝেন তো? পানির উপরে সামান্য বের হয়ে থাকে। সবটাই থাকে নিচে।
আপনি আমার পানির উপরের অংশ দেখছেন। নিচেরটা দেখছেন না।

তোমার পেটের ভুঁড়ি বের করতে আমার এক মিনিট লাগবে। আমারে
চিনো না।

আপনাকে কেন চিনব না! আপনি কংকন ভাইয়া। অন্যের বাড়ি দখল
করে আসের জমিয়ে বসেছেন। আজ আপনি একা কেন? আপনার লোকজন
কোথায়? মোবাইলে টেলিফোন করে লোকজন যে ডাকবেন তাও সম্ভব না।
মোবাইল হারিয়ে ফেলেছেন, তাই না? আহারে, এমন দায়ি সেট!

তুই জানস ক্যামনে? এই মোবাইলের খবর তুই ক্যামনে জানস?

হিমু বলল, শুরু করেছিলেন আপনি, তারপর তুমি, এখন তুই। আমি
আপনি দিয়ে শুরু করেছি, শেষ পর্যন্ত আপনি বলব। ভদ্রতার খেলাফ হবে
না। কষ্ট করে জানালা দিয়ে একটু বাইরে তাকাবেন। কাউকে কি দেখা

যায়? উনাকে চিনেন? উনার নাম জগলু। আঙ্গুলকাটা জগলু। উনি নিজের আঙ্গুল কাটেন না। অন্যের আঙ্গুল কাটেন। এইজন্যেই নাম আঙ্গুলকাটা জগলু। কংকন ভাই, আপনার এখানে চায়ের ব্যবস্থা আছে না? এক কাপ চা খাওয়া যাবে?

কংকন কিছু বলল না। আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল। কিসলুর আসার কথা। এখনো কেন আসছে না। জানালা দিয়ে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভাওতাবাজি হতে পারে। আঙ্গুলকাটা জগলুকে কংকন চিনে। আঙ্গুলকাটা জগলু দিনেদুপুরে বের হবে না। তাছাড়া সে যতদূর জানে আঙ্গুলকাটা জগলু জেলে। তার কাছে মনে হচ্ছে পুরোটাই ভাওতাবাজি। দেশ চলছে ভাওতার উপরে।

কংকন ভাই, চায়ের কথা বলেছিলাম।

চা বানানোর লোক নাই।

অপেক্ষা করি, আপনার লোকজন আসুক। চা খাই। আমি আপনার এখান থেকে চা না খেয়ে চলে যাব এটা কেমন কথা? আপনার ইঞ্জত আছে না?

সাহস থাকলে বসে থাক।

হিমু শান্ত গলায় বলল, সাহসের আমার অভাব নাই। সাহসের অভাব আপনার। আমি চায়ের জন্মে অপেক্ষা করব। আসুক আপনার লোকজন। শুনেছি আপনার এখানে ক্যারাম খেলা হয়, একদান ক্যারামও খেলব।

কংকনের ঠোঁটের কোনায় এই প্রথম সামান্য হাসির আভাস দেখা গেল। কারণ কিসলু আসছে। দরজা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। কিসলুর সঙ্গে হাশেমও আছে।

কংকন বলল, তুই বোস তোরে আমি চা খিলাব। একজন মুখ হা করায়ে ধরে রাখবে অন্যজন মুখে গরম চা ঢালবে। যত পারিস খাবি।

হিমু বলল, ধন্যবাদ। চা মুখে ঢেলে দিবে, আমাকে কিছু করতে হবে না—এইজন্যে শুকরিয়া। কংকন ভাই, আপনি মহান।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে কিসলু চুকল। তার পেছনে পেছনে হাশেম। কিসলু ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, হিমু ভাই! আপনি এখানে। কী আশ্চর্য! আমাকে চিনেছেন?

না।

আমি কিসলু। আপনার জন্যে জানে বাঁচলাম। এই রাতে আপনি না থাকলে জানে মরতাম। ওরে বাপরে, কী বিপদ যে গেছে! আপনারে এইখানে দেখব চিন্তাই করি নাই। যে রাতে আপনারে প্রথম দেখি আমি কিন্তু আপনারে মানুষ ভাবি নাই। ভাবছি ফেরেশতা। কিছু মনে নিয়েন না হিমু ভাই, আপনারে কদমবুসি করব।

হিমু বলল, দ্রুত এক কাপ চা খাওয়াও তো কিসলু।

চা এক কাপ কী জন্যে খাবেন? চা খাবেন হাজার কাপ।

কংকন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। সে তার এক জীবনে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছে, এরকম দেখে নি। তার শরীর বিমর্শিম করছে। সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করছে। বিচিত্র কারণে সিগারেট ধরাতে ভয় লাগছে।

কিসলু লোকটাকে কদমবুসি করেছে এটা না হয় মানা গেল। তার দেখাদেখি হাশেমও কদমবুসি করে হাত কচলাচ্ছে—এর অর্থ কী?

হিমু বলল, কিসলু। চা দু'কাপ বানাবে। বাইরে আঙুলকাটা জগলু আছে। উনাকে এক কাপ চা দিবে।

কিসলু বিড়বিড় করে বলল, খাইছে আমারে! আমি তো মরতে বসছিলাম আঙুলকাটা জগলুর কাছে। এসা জেলে আছে?

হিমু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জেলে নকল জগলু। আসলটা বাইরে। তুমি চা নিয়ে যাও। দেখলেই চিন্তাবস্থা আমি দোতলায় যাচ্ছি। কংকন ভাইকে দোতলায় পাঠাও। তার সঙ্গে আমার প্রাইভেট কিছু কথা আছে।

হিমু এবং কংকন ভাই মুখোমুখি বসা। হিমুর হাতে চায়ের কাপ। কংকন ভাইয়ের হাতে পানির গ্লাস। গ্লাসে কয়েক টুকরা বরফ। পানিতে ‘ভদকা’ নামক ওষুধ খানিকটা দেয়া হয়েছে। এই ওষুধ ভয় কমাতে সাহায্য করে। ওষুধের দুটা বোতল কংকন ভাইয়ের প্রাইভেট আলমারিতে সবসময় থাকে।

হিমু বলল, ভয় পেয়েছেন?

কংকন জবাব দিল না। হিমু বলল, আমাকে শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন। আমি নির্বিষ। তের লাখ টাকা চাঁদার কথা যা বলেছি সেটাও ভূয়া। আপনাকে চাঁদা জোগাড় করতে হবে না।

কংকন ভাইয়ের ফ্যাকাশে মুখে কিছু রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে। ফ্যাকাশেভাব কিছুটা দূর হয়েছে। তিনি ঘনঘন গ্লাসে কয়েকটা চুমুক

দিলেন। হিমু বলল, চাঁদা না দিলেও তের তারিখে এই বাড়িটা ছেড়ে দেবেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা অন্য কোথাও করবেন। ভালো কথা, আপনি ছাত্রলীগ করেন। বঙ্গবন্ধু যখন সপরিবারে নিহত হলেন তখন কিন্তু আপনার ছাত্রলীগ টুঁ শব্দ করে নাই। মিটিং মিছিল দূরের কথা।

সেই সময়ের ছাত্রলীগ কী করছে তার দায়িত্ব তো আমাদের না।

হিমু বলল, আচ্ছা এই সময়ের ছাত্রলীগের কথাই হোক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে অ্যারেস্ট করে জেলে ঢোকানো হলো। তখনো কিন্তু আপনারা টুঁ শব্দ করেন নি। মিটিং না, মিছিল না। আজ অন্যের বাড়ি দখল করে গবেষণা কেন্দ্র খুলে বসেছেন।

ওষুধে কাজ দিয়েছে। হারানো সাহস ফিরে আসছে। কংকন ঝাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, আপনি কি ভেবেছেন এত সহজে পার পেয়ে যাবেন? না। আমি এর শোধ যদি না নেই আমার নাম কংকন না। আমার স্তৰীর নাম সুমনা না।

হিমু নামের মানুষটা হাসছে। এই লোকটা হাসছে কেন? তার হাসির কী আছে? হাসির শব্দ শুনে কংকনের আবার ভয় লাগতে শুরু করেছে। কংকন বড় করে গ্লাসে চুমুক দিল। সে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ফোস ফোস শব্দ হচ্ছে।

হিমু বলল, যে অন্যকে ভয় দেখায় সে নিজে সবসময় ভয়ের মধ্যে থাকে। ভয়ে আপনার কলিজা শুকিয়ে গেছে। ভয়ের প্রধান কারণ হলো, আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন না। মানুষ ভূতপ্রেত বুঝে না বলে ভূতপ্রেত ভয় পায়। মৃত্যুকে বুঝতে পারে না বলে মৃত্যু ভয় পায়। আপনি আমাকে এই কারণেই ভয় পাচ্ছেন। আমি এখন চলে যাব। ভাই, ভয়টা দূর করেন। কাউকে ভয় দেখাতে আমার ভালো লাগে না। এরপরেও কেন যে মাঝে মাঝে ভয় দেখাই!

এই বাড়ি বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের জন্যে ছামাদ দান করেছে। আমার কাছে দলিল আছে। আমার নামে দলিল।

আপনি আবার ছামাদের নামে দলিল করে দিবেন। ছামাদ বেচারার নিজের বাড়ি থাকতে ফুটপাতে ঘুমায়।

সেটা আমার দেখার বিষয় না। বাড়ি লিখে দেওয়ার সময় মনে ছিল না?

হিমু উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, ভাই আমি যাচ্ছি। সুমনা ভাবিকে আমার সালাম দিবেন।

হিমুকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল কিসলু। কিসলু গলা নামিয়ে বলল, আপনি বললেন আঙুলকাটা জগলুর কথা। আমি চা নিয়ে দেখি কেউ নাই। তখনই বুঝলাম ঘটনা আছে। হিমু ভাই, ঘটনা কী? আঙুলকাটা জগলু কি ছিল?

না।

তার কথা কী জন্যে বলেছেন?

কংকনকে ভয় দেখানোর জন্যে বলেছি।

কংকন ভাই ভয় খাওয়ার জিনিস না, তয় আপনারে বিরাট ভয় পাইছে। অবশ্য আপনারে তো ভয় পাইতেই হবে।

হিমু বলল, কিসলু যাই?

কিসলু বলল, চলেন একটা চায়ের দোকানে বসি। আপনার সঙ্গে এক কাপ চা খাই। আপনার মুখ থেকে দুটা ভালো কথা শুনি। চারদিকে মন্দ কথা শুনি, দুষ্ট কথা শুনি। দুটা ভালো কথা শুনতে মন চায়।

রাস্তার পাশে চায়ের দোকান দোকানের সামনে বেঞ্চি পাতা। হিমু এবং কিসলু বসেছে। হিমু হাসতে হাসতে বলল, ভালো কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত?

কিসলু বলল, জি হিমু ভাই।

হিমু বলল, একজন সাধুর গল্প শোনো। সাধুর নাম ঋষি কাশ্যপ। তার কাছে ভয়ঙ্কর এক খুনি এসেছে। সে সাধুর কাছে দীক্ষা নিতে চায়।

সাধু বললেন, তুমি অতি ভয়ঙ্কর মানুষ। তারপরেও তোমাকে আমি দীক্ষা দিব। একটা শর্ত আছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে তোমাকে যে-কোনো একটা ভালো কাজ করতে হবে।

কী রকম ভালো কাজ সাধুজি?

যে-কোনো ভালো কাজ। যত তুচ্ছই হোক ভালো কাজ হলেই হবে। একটা ভালো কাজ করে আমার কাছে আসবে, আমি তোমাকে দীক্ষা দিব।

ভয়ঙ্কর মানুষ ভালো কাজের সন্ধানে বের হলো। একটা কুকুরের সঙ্গে তার দেখা। কুকুরটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে যাচ্ছে, কারণ তার একটা ঠ্যাং

নেই। পিঠে ঘা। ভয়ঙ্কর মানুষটার মনে হলো কুকুরটা কষ্ট পাচ্ছে। তার কষ্ট লাঘব হওয়া দরকার। সে থান ইট দিয়ে কুকুরের মাথায় বাড়ি দিয়ে তাকে মেরে ফেলে সাধুর কাছে উপস্থিত হয়ে ভালো কাজটা কী করেছে তা বলল। বিস্তারিত বলল। সে ভালো কাজ করতে পারায় আনন্দিত।

সাধুজি বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। স্বান করে আসো, তোমাকে দীক্ষা দেব।

কিসলু বলল, এটা কী করে সম্ভব? ঐ লোক তো ভয়ঙ্কর মন্দ কাজ করেছে। ভালো কাজ তো করে নাই।

হিমু বলল, যে ভালো কাজ করতে পারে তার দীক্ষার প্রয়োজন নাই। যে ভালো কাজ করতে পারে না তারই দীক্ষার প্রয়োজন।

হিমু ভাই, জটিল গল্প শুনলাম।

হিমু বলল, এই গল্প আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি। বাবা প্রায়ই আমাকে শিক্ষামূলক জটিল গল্প বলতেন। ভালো কাজ বা সৎকর্ম নিয়ে বাবার একটা থিওরি আছে। থিওরিটা সত্য। শুনবে?

কিসলু আগ্রহ নিয়ে বলল, শুনব।

বাবা বলতেন, যে-কোনো মানুষ যদি প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ সাত দিন করে সে মহাপুরুষের পৃষ্ঠায়ে উঠে যাবে। এর পর সে যা-ই বলবে তা-ই সত্য হবে।

বলেন কী!

চেষ্টা করে দেখবে? প্রতিদিন একটা ভালো কাজ করাও কিন্তু বেশ কঠিন।

অবশ্যই চেষ্টা করে দেখব। এখনই একটা ভালো কাজ করব। ঐ দেখেন হিমু ভাই, একটা বুড়া মানুষ রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছে, গাড়ির কারণে পার হতে পারছে না। তাকে যদি রাস্তা পার করায়ে দেই কাজটা কি ভালো কাজ হবে?

অবশ্যই হবে।

কিসলু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল রাস্তায়। দু'হাত তুলে গাড়ি থামাল। বৃক্ষকে হাত ধরে রাস্তা পার করল। বৃক্ষ বলল, আবৰাজি, আপনার নাম?

কিসলু বলল, আমার ডাকনাম কিসলু।

বৃন্দ বলল, আধাঘণ্টার উপর চেষ্টা করতেছিলাম। রাস্তা পার হইতে পারি নাই। আপনে পার করেছেন। আজ মাগরেবের ওয়াকে আপনার জন্যে দোয়া করব বলে আপনার নাম জানতে চেয়েছি।

কিসলুর চোখে পানি এসে গেল। সে বের হলো দ্বিতীয় ভালো কাজের সন্ধানে। একটা ভালো কাজ করে সে তৃষ্ণি পাচ্ছে না।

হিমুর বাবা ভালো কাজ বিষয়ে হিমুকে লিখিত উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন—

বাবা হিমালয়,

ভালো কর্ম বা সৎকর্ম করার তোমার প্রয়োজন নাই।
সৎকর্ম মেশার মতো। একটি সৎকর্ম করলে আরেকটি করতে ইচ্ছা করবে। সৎকর্মের নেশা তৈরি হবে। যে-কোনো নেশাই মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। নেশা হলো নেশা। ভালো নেশা মন নেশা বলে কিছু নাই। তুমি সেই সৎকর্ম করবে যা অন্যদের করতে পারছে না।
অন্যদের করার ক্ষমতা নাই।

সৎকর্ম যেমন নেশা তৈরি করে অসৎকর্মও করে।
নেশাগ্রস্ত হয়ে দুষ্টনেক একের পর এক অসৎকর্ম করতে থাকে।

এখন কি বুঝতে পারছ সৎকর্ম অসৎকর্ম একই
মুদ্রার দুই পিঠ?

কিসলু সন্ধ্যা মেলাবার আগেই চারটি সৎকর্ম করে ফেলল। সৎকর্ম এবং তার ফলাফল নিম্নরূপ—

১. বৃন্দকে রাস্তা পার করানো।

(বৃন্দ তার নাম জানতে চেয়েছে এবং বলেছে মাগরেবের নামাজে তার জন্যে দোয়া করবে।)

২. একজন টোকাইকে পাউরণ্টি এবং কলা কিনে দেওয়া।

(টোকাই পাউরণ্টি-কলা হাতে নিয়েই দৌড় দিয়েছে। তার আচরণ রহস্যময়।)

৩. এক মহিলা মালিবাগ যাবে, রিকশা পাচ্ছিল না। কোনো রিকশাই মালিবাগ যাবে না। তার জন্যে রিকশার ব্যবস্থা করে দেওয়া।
(এই মহিলার আচরণও টোকাইয়ের মতো। সে গল্পীরমুখে রিকশায় উঠেছে। কিসলুর দিকে ফিরেও তাকায় নি। যেন রিকশা এনে দেওয়া কিসলুর দায়িত্ব।)
৪. একজন ট্রাফিক পুলিশকে এক বোতল পানি কিনে দেওয়া।
(পানির বোতল পেয়ে ট্রাফিক পুলিশ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল। তার চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম। ট্রাফিক পুলিশ বলল, ভাই, আপনি আমাকে পানির বোতল দিলেন কী জন্যে? কিসলু বলল, অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করেছি আপনি রোদে দৌড়াদৌড়ি করছেন। আপনাকে দেখে মনে হলো, আপনার পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। ডিউটি ছেড়ে যেতে পারছেন না।
ট্রাফিক পুলিশ বলল, ভাই আপনি হাতটা বাড়ান। আপনার হাতটা একটু ধরব।)

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, এখন ভালো কাজ না করলেও চলে; ভালো কাজ সঙ্ক্ষয় পর্যন্ত করার কথা। তারপরেও কিসলুর মাথায় ঘূরতে লাগল—আর কী করা যায়? সে রীতিমত্ত্বে অস্থির।

অফিসার গফুরকে ধানমন্ডি থানা থেকে ক্লোজ করে খাগড়াছড়ি থানায় ওপেন করা হয়েছে। তিনি সেখানে ভালো আছেন। থানা কম্পাউন্ডের পেছনে অনেকখানি জায়গা। তিনি সেখানে সবজি চাষ শুরু করেছেন। পাহাড়ি বেগুন লাগিয়েছেন। থানায় কাজকর্ম নাই। পাহাড়িরা ঘুষ দেওয়া শিখতে পারে নি বলে থানায় আসে না। মামলা-মোকদ্দমা নাই। ঝামেলা নিজেরা মিটিয়ে ফেলে। কাজেই অফিসার গফুর সবজি চাষে মন দিয়েছেন। রাতে জঙ্গল দেখেন। হাতির ভয়ে সারা রাত তাকে জেগে থাকতে হয়। প্রায়ই বন্য হাতির পাল বের হয়। এদের ঝৌকটা কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে থানার দিকে। একটা পুরো রাত তাকে থানা কম্পাউন্ডের বিশাল শিরিষগাছে উঠে কাটাতে হয়েছে। সেই রাতে হাতির পাল আরেকটু হলে

থানায় ঢুকে যেত। শিরিষগাছে দ্রুত ওঠার জন্যে তিনি অর্ডার দিয়ে একটা মই বানিয়েছেন। মই গাছের সঙ্গে সেট করা হয়েছে।

নাজমুল হৃদকে পুরনো জায়গায় এনে ওপেন করা হয়েছে। রবীন্দ্র-সমস্যার পূর্ণ সমাধানের জন্যে তাকে সাত দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সাত দিনে সমাধান না হলে তাকেও খাগড়াছড়ি যেতে হবে। ১৩ তারিখ সাত দিন শেষ হবে। তবে খাগড়াছড়ি নিয়ে তিনি চিন্তিত না। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চাকরি ছেড়ে দেবেন। তার মধ্যে অভিনয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাচ্ছে। তিনি আজিজ সুপার মার্কেট থেকে একটা বই কিনেছেন। বইয়ের নাম ‘অভিনয় কলা’। বইয়ে অভিনয়-বিষয়ে অনেক টিপস দেওয়া আছে। চোখের এবং মুখের এক্সারসাইজ দেওয়া আছে। আয়নার সামনে এইসব এক্সারসাইজ তিনি নিয়মিত করছেন। গলার স্বর উন্নত করার জন্যে হারমোনিয়াম কিনে ‘সারেগামাপাধানিসা’ করছেন। আবৃত্তি ঝাসে ভর্তি হয়ে বৃন্দ আবৃত্তি করছেন।

রাতে তার ভালো ঘূম হচ্ছে না। অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছেন। সব স্বপ্নই অভিনয়বিষয়ক এবং প্রতিটি স্বপ্নে মিস রিনকি থাকছেন। শুধু থাকছেন তানা, তার স্ত্রী হিসেবে অভিনয় করছেন। শুগত রাতের স্বপ্নে তিনি এবং মিস রিনকি একটা স্কুলের সামনে দাঁড়ানো। দু'জনেই ভক্তদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ হচ্ছে তাদের শিশুকন্যা স্কুলে। তারা শিশুকন্যাকে নিতে এসেছেন। স্বপ্নে শিশুকন্যার নাম জানা যায়নি।

ওসি সাহেব তার খাসকামরায়। আজ তার মেজাজ ভয়ঙ্কর খারাপ। মেজাজ খারাপের প্রধান এবং একমাত্র কারণও মিস রিনকি। পত্রিকায় তাকে নিয়ে একটা খবর বের হয়েছে। তিনি নাকি চিত্রজগতের সুপার হিরো গালিব খানের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। প্রতিবেদক দাবি করছেন, তার কাছে কাবিননামার ফটোকপি আছে। প্রয়োজনে তিনি তা প্রকাশ করবেন। মিস রিনকি এবং গালিব খানের ছবিও ছাপা হয়েছে। ছবিতে দু'জন দু'জনের দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন।

ওসি সাহেবের ইচ্ছা করছে ভয়ঙ্কর কিছু করতে, যাতে এক কথায় তার নিজের চাকরি চলে যায়। খাকি পোশাক পরে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। ভয়ঙ্কর কী করবেন তাও মাথায় আসছে না। আপাতত

বলপয়েন্টের খোঁচায় গালিব খানের দুটা চোখ ফুটা করে দিয়েছেন। অঙ্ক গালিব খানকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

নাজমুল হৃদের এমন মানসিক অবস্থায় থানায় ঢুকল কংকন ভাই। সে এসেছে সচেতন নাগরিক হিসাবে ছামাদ মিয়া বিষয়ে তথ্য দিতে এবং হিমুকে নিয়ে একটা ডায়েরি করিয়ে রাখতে। ডায়েরিতে লেখা হবে হিমু তাকে জীবননাশের হ্রকি দিয়েছে।

ওসি সাহেব, আমার নাম কংকন। আমি বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক। ভালো আছেন?

এই বলে কংকন হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়াল। ওসি সাহেব ‘ও’ বলে ঝিম মেরে রাইলেন। হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়ালেন না। কংকনের মাথা ঝিমঝিম করছে। সে হাত বাড়িয়ে আছে, ওসি সাহেব হাত বাড়াচ্ছেন না। এ-কী ভয়ঙ্কর অপমান! এত বড় অপমানের ভেতর দিয়ে তাকে একবার শুধু যেতে হয়েছিল। সে গিয়েছিল ধর্মমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাকে এক ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর মন্ত্রীর পিএস বলল, দেখা হবে না। কংকন বলল, আপনি কি উনাকে আমার কোর্ট দিয়েছেন? পিএস বলল, দিয়েছিলাম। মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, দেখা হবে না। কংকন সেই অপমানের শোধ ভালোভাবে মিয়েছিল। এক পয়সা দামের ওসির অপমানের শোধ সে কীভাবে মিবে তা-ই এখন ভাবছে। কংকন হাসিমুখে বলল, আপনি বোধহয় লক্ষ করেন নি আমি হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়িয়েছি।

ওসি সাহেব আবারও বললেন, ও। এবারও তাকে হাত বাড়াতে দেখা গেল না। তিনি রিভলভিং চেয়ারে একটা চক্র দিলেন। হাতের বলপয়েন্ট দিয়ে গালিব খানের নাম কেটে লিখলেন গাধা খান।

কংকন গম্ভীর মুখে বসল। হাত শুটিয়ে নেওয়া ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। ঘরে ওসি ছাড়া আর কেউ নেই বলে তার অপমান কারও চোখে পড়ল না। ‘মানী ব্যক্তির মান আল্লা রক্ষা করেন’—কথাটা ভুল না।

আপনাকে আগে একবার বলেছি, মনে হয় মিস করেছেন, আমি বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক।

ওসি সাহেব খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, তাহলে বলেন দেখি বঙ্গবন্ধু পাঞ্জাবির নিচে গেঞ্জি পরতেন নাকি পরতেন না? বাটপট জবাব চাই।

হতভুর কংকন বলল, এটা আমাদের গবেষণার বিষয় না। ওসি সাহেব, আমার নাম কংকন। নামটা আপনার পরিচিত থাকার কথা। আমি ছাত্রলীগের...

কংকন কথা শেষ করার আগেই নাজমুল হৃদ আনন্দিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, পাইছি তোরে।

কী বললেন?

বললাম, পাইছি তোরে। তুই ছামাদের বাড়ি দখল করে গবেষণা কেন্দ্র খুলেছিস। ঠিক ধরেছি না? আজ তোকে পাকিস্তানি ডলা দেওয়া হবে। পাকিস্তানি ডলা কী জানস? উপরের চামড়া থাকবে টাইট, ভিতরে হাঙ্গড় গুঁড়। একেবারে ট্যালকম পাউডার।

কংকন বলল, আপনি বোধহয় জানেন না। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে খাগড়াছড়িতে ট্রাঙ্গফার করতে পারি।

ট্রাঙ্গফার কর। তারচেয়ে ভালো হয় চাকরি খেয়ে ফেল। বান্দরের বাচ্চা খান্দর। তুই একটা খান্দর। খান্দর কী জানস? বান্দরের থাকে একটা লেজ আর খান্দরের থাকে দুইটা লেজ। তোর প্যাস্টের ভিতর আছে দুইটা লেজ। পাছায় হাত দিয়ে দেখ।

কংকন শান্ত গলায় বলল, অঙ্গনার টেলিফোনটা কি ব্যবহার করতে পারি? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটা কল করব।

কোনো সমস্যা নাই, কল কর। আইজি স্যারকে কর। প্রধানমন্ত্রীর পিএসকে কর। যত ইচ্ছা টেলিফোন করতে থাক। টেলিফোন করার আগে মাথাটা একটু সামনে এগিয়ে আন। তোর কান মলে দিব।

কী বললেন?

বললাম মাথাটা একটু সামনে আন, তোর কান মলে দিব। বান্দরের বাচ্চা খান্দর।

ইউ আর এ ম্যাড পারসন।

নাজমুল হৃদ আনন্দিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। বেল টিপে কনস্টেবলকে ডেকে বললেন, এই খান্দরটাকে কানে ধরে হাজতে নিয়ে চুকাও।

কংকন কল্পনাও করে নি সত্যি সত্যি এই কাজ করা হবে। এক পয়সা দামের কনস্টেবল তাকে কানে ধরে হাজতে ঢোকাবে। হাজতের দেয়ালে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে মোবাইল ফোন নেই যে সে

কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তার গা ঝিমঝিম করছে। বারবার মনে হচ্ছে এইসব কিছুই ঘটে নাই। সে দুঃখপূর্ণ দেখছে। ঘুম ভাঙলেই দেখবে সে সুমনার পাশে শয়ে আছে। তার পায়ের উপর সুমনার গাবদা পা।

ওসি সাহেব মিস রিনকির খবর আরেকবার পড়লেন। তার মেজাজ আরও খানিকটা খারাপ হলো। তিনি গাধা খান নাম কেটে লিখলেন খন্দর খান। এতে তার মন খানিকটা শান্ত হলো। ‘খ’ এর অনুপ্রাসটা ভালো লাগছে। এইসময় থানায় ঢুকল কেয়া-খেয়ার বাবা, আফতাব। সে ভয়ে ভয়ে বলল, স্যার আমার মেয়ে দু'টার সংবাদ নিতে এসেছি। ওদের নাম...

ওসি সাহেব কথা শেষ করতে দিলেন না। হৃক্ষার দিয়ে বললেন, হাজতে চুকে যাও। দেরি করবা না। এক থেকে তিনি পর্যন্ত শুনব, এর মধ্যে হাজতে চুকবে। এক—দুই—

আফতাব বলল, আপনি কী বললেন বুঝলাম না স্যার, কোথায় চুকে যাব?

হাজতে চুকে যাবে। আর কোথায়?

আফতাব ভীত গলায় বলল, আমার মেয়েরা কি আপনাকে উল্টাপান্টা কিছু বলেছে? ওদের কথা বিশ্বাস করার কিছু নাই।

ওসি সাহেব বিকট গলায় চিঞ্চকার দিলেন, ঘাউ!

আফতাব লাফ দিয়ে সরে গেল। বিকট ঘাউ সে আশা করে নি। ওসি সাহেব ছামাদের কাছে ঘাউ শুনেছিলেন। তার মন্তিক্ষ ঘাউ জমা করে রেখে দিয়েছিল, সময় বুঝে বের করেছে। আফতাব বিড়বিড় করে বলল, স্যার আমি নিরাপরাধ।

ঘাউ ঘাউ!

এবারের ঘাউ প্রচণ্ড নিনাদে। সেকেন্ড অফিসার এবং দু'জন কনস্টেবল ছুটে এল। আফতাব বলল, জোবেদা নিজে ফাঁসিতে ঝুলেছে। আমি নামাতে গেছি। মেয়েরা এটা বুঝে নাই। তারা ভেবেছে আমি ফাঁসিতে ঝুলায়েছি।

জোবেদা কে?

কেয়া খেয়ার মা।

সে ফাঁসিতে ঝুলল কেন? তার সমস্যা কী?

জানি না স্যার কী সমস্যা।

তোর কী সমস্যা?

আফতাব চুপ করে আছে। তার কলিজা শুকিয়ে আসছে। তিনি বছর আগের ঘটনা সবাই ভুলে বসে আছে। আজ হঠাতে কী হয়ে গেল।

ওসি সাহেব বললেন, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন হয় নাই?

হয়েছিল। পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে আতঙ্কিত্ব।

পুলিশকে কত টাকা দিয়েছিলি?

তিনি লাখ চারিশ হাজার। ডিটামাটি সব গেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট খবর দিয়ে আনাচ্ছি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জবানবন্দি দিবি। যা ঘটেছে সব খুলে বলবি।

স্যার, আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। বাচ্চাগুলোকে কে দেখবে?

আমি দেখব। সেকেন্ড অফিসার, হ্যান্ডকাফ পরায়ে চেয়ারের সাথে একে আটকে দাও। ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দাও। বদমাইশটা জবানবন্দি দিবে। দিবি না?

জি স্যার দিবি।

যে ওসিকে ঘূষ দিয়েছিলি তার নাম কী?

স্যার উনার নাম গফুর। মুখে বসন্তের দোগ।

কংকনকে হাজত থেকে বের করা হচ্ছে। সে বলল, খবর তাহলে হয়েছে। ওসি সাহেব মিষ্টয়ই পাতলা পায়খানা শুরু করেছেন। কাপড়চোপড় নষ্ট করে ফেলার কথা। হা হা হা।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, হা হা বন্ধ। তোকে ডলা দিতে নিয়ে যাচ্ছি। ফিমেল হাজত খালি, ঐখানে তোকে ডলা দেওয়া হবে। ওসি সাহেবের হকুম।

কংকন হতভম্ব গলায় বলল, ওসি সাহেবের না হয় মাথা খারাপ। ভাই, আপনার কি মাথা খারাপ? আমি ছাত্রীগের বিশিষ্ট কর্মী। বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক।

সেকেন্ড অফিসার গলা নামিয়ে বললেন, আমি ছাত্রীবনে ছাত্রদল করেছি। আপনাকে পাকিস্তানি ডলা আমি নিজে দিব। পনেরো মিনিট ডলার পর আপনি যদি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন তাহলে ডলা বন্ধ হবে। তা না হলে ডলা চলতেই থাকবে। তুলতুলা শরীর বানায়েছেন, ডলা দিতেও আরাম হবে।

কংকনের মুখে ক্ষচটেপ লাগানো হলো। কোনোরকম শব্দ করার তার উপায় রইল না।

আফতাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে। সে স্ত্রী হত্যার দায় স্বীকার করেছে। ওসি সাহেবের ঘাউ শব্দই তার জন্যে কাল হয়েছে।

কংকনও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে। তবে তার জন্যে পাকিস্তানি কৌশলের প্রয়োজন পড়েছে। কংকন বলেছে—

‘আমি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। পুলিশ কী করে যেন টের পায়। দৌড়ে আমাকে ধরে ফেলে। আমার পকেটে যে পিস্তল পাওয়া গেছে এটা আমার। বুকপকেটের ক্ষুরটা এক নাপিতের দোকান থেকে সংগ্রহ করেছি।’

প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে পিস্তল, ক্ষুর, চাপাতি, রাম দা, পুলিশের সংগ্রহে সবসময় থাকে।

কংকনের সঙ্গে তার স্ত্রী সুমনার টেলিফোনের কথাবার্তা মূল কাহিনীর জন্যে জরুরি না। তারপরেও উদ্ভৃতির লোভ সামলাতে পারছি না। পুরো টেলিফোনের কথাবার্তা ওসি সাহেবের সামনে হয় এবং কথাবার্তা রেকর্ড করা হয়। বিচারপর্ব শুরু হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা আলামত হিসাবে কোটে জমা দেওয়া হয়।

কংকন : হ্যালো সুমনা।

সুমনা : সারা দিন কোনো খৌজ নাই। মোবাইল হারায়ে ফেলেছ, তোমার তো উচিত ছিল আজ একটা মোবাইল কেনা। তুমি কোথায়?

কংকন : আমি ধানমণি থানায়।

সুমনা : থানায় কেন? কোনো সমস্যা? কথা বলছ না কেন? হ্যালো হ্যালো।

কংকন : আমি ধরা পড়েছি সুমনা।

সুমনা : কী করেছ যে ধরা পড়েছ। কথা বলো না কেন? হ্যালো হ্যালো।

কংকন : ছিনতাই।

সুমনা : ছিনতাই মানে? তুমি ছিনতাই করেছ?

কংকন : করার আগেই ধরা পড়েছি।

[এই পর্যায়ে সেকেন্ড অফিসার চাপা গলায় বললেন, আপনার পকেটে কি পাওয়া গেছে ভাবিকে কাইভলি বলেন, না বললে আবার পাকিস্তান।]

সুমনা : হ্যালো হ্যালো ।

কংকন : পুলিশ আমার পকেটে পিস্তল আর ক্ষুর পেয়েছে ।

সুমনা : পিস্তল, কার পিস্তল ?

কংকন : আমার ।

সুমনা : হায় খোদা, তুমি কী বলো !

[সেকেভে অফিসার বললেন, ভাবিকে বলুন, I love you, আজ
ভ্যালেনটাইন্স ডে ।]

কংকন : সুমনা, I love you.

আজ ভ্যালেনটাইন্স ডে জানার পর ওসি সাহেব খানিকটা বিমর্শ হয়ে
পড়লেন । কাকতালীয়ভাবেই তখন তার কাছে একটা টেলিফোন এল ।

নারীকর্ত্ত : হ্যালো !

ওসি : আপনি কে ? কাকে চান ?

নারীকর্ত্ত : ধমকাচ্ছেন কেন ? পুলিশে চাকরি করেন বলে কেউ
টেলিফোন করলেই ধমক দিয়ে শুরু করবেন ? সুরি বলুন ।

ওসি : আপনি কে ? কী চান ?

নারীকর্ত্ত : আমি রিনকি । আমি কিছু চাই না ।

ওসি : মিস রিনকি, ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই ক্ষমা চাই । ক্ষমা চাই ।

নারীকর্ত্ত : একবার ক্ষমা চাইয়েছেন যথেষ্ট । একশবার ক্ষমা চাই বলতে
হবে না ।

ওসি : আপনি আমাকে টেলিফোন করবেন চিন্তাই করি নাই । ম্যাডাম,
আপনাকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গেছি ।

নারীকর্ত্ত : অভিনন্দন কেন ? আমি কী করেছি ?

ওসি : আপনার বিয়ের খবরটা কাগজে পড়লাম । হাওয়া থেকে
পাওয়া । ছবিসহ নিউজ । আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে ।

নারীকর্ত্ত : আপনি মনে হয় নিয়মিত কাগজ পড়েন না । নিয়মিত কাগজ
পড়লে জানতেন যে যাসে একবার আমার বিয়ে হয় ।

ওসি : Oh my Good ! বিয়ে করেন নি ? আমার বুক থেকে মনে হচ্ছে
দুই মণ ওজনের গ্রানাইট পাথর নেমে গেছে ।

নারীকর্ত্ত : আমার বিয়ে হয় নি তাতে আপনার বুক থেকে পাথর নামল
কেন ?

ওসি : না মানে ইয়ে, আমি আপনার ভক্ত তো। ভক্তদের কাছে নায়িকার বিয়ে হওয়া দুঃসংবাদ। আমি কি বোঝাতে পেরেছি?

নারীকর্ত্ত : জি পেরেছেন। আচ্ছা শুনুন আমি খুবই অসুস্থ। জুর। একটু আগে থার্মোমিটার দিয়ে মেপেছি—একশ দুই। আপনি কি আমাকে দেখতে আসবেন?

ওসি : এক্ষুণি আসছি। ঠিকানা বলুন।

নারীকর্ত্ত : খালি হাতে আসবেন না। ফুল আনবেন। আজ ভ্যালেনটাইনস ডে।

ওসি: অবশ্যই ফুল আনব। অবশ্য। অবশ্যই, অবশ্যই।

নারীকর্ত্ত : আপনি আবার ভেবে বসবেন না যে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি।

ওসি : আমি ভাবছি না। নায়িকারা নায়কদের প্রেমে পড়ে। খাকি পোশাক পরা পুলিশের প্রেমে পড়ে না। নিয়ম নাই।

ওসি সাহেবের সঙ্গে দুই হাজার টাকা ছিল। তিনি সেকেন্ড অফিসারের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা ধার করে পাঁচ হাজার টাকার গোলাপ কিনলেন। পাঁচ টাকা করে গোলাপের পেস। এক হাজার গোলাপ পাওয়া গেল।

যেদিন তার স্ত্রী রেহনুমা ফরেজি যায় সেদিন ভোরবেলায় তিনি তার স্ত্রীকে এক হাজার গোলাপ উপহার দিয়েছিলেন।

জনেক মন্ত্রী টেলিফোন করেছেন। ওসি সাহেব থানায় নেই। টেলিফোন ধরলেন সেকেন্ড অফিসার। মন্ত্রী মহোদয় বললেন, আপনি কি অফিসার ইনচার্জ?

জি স্যার, ওসি সাহেব অপারেশনে গেছেন। আমি সেকেন্ড অফিসার। আমার নাম আখলাখ।

কংকন নামে কেউ কি আপনাদের কাস্টডিতে আছে?

জি স্যার।

তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট কর্মী। তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

অবশ্যই স্যার। আমি নিজে গাড়ি করে বাসায় পৌছে দিব।

ধন্যবাদ। আপনার নামটা যেন কী?

আখলাখ ।

আপনি ভালো অফিসার । আমি আপনার জন্যে হাই লেভেলে সুপারিশ করব ।

স্যার থ্যাংক যু ।

কংকনকে কতক্ষণের মধ্যে রিলিজ করছেন?

আপনার কাছ থেকে লিখিত অর্ডার পাওয়া মাত্র রিলিজ করে দিব ।
কংকন ভাইজানের নিউজ পত্রিকায় চলে গিয়েছে তো, এখন রিলিজ করলে পত্রিকাওয়ালারা আমাকে ধরবে । আপনার লিখিত অর্ডার পেলে বলতে পারব মন্ত্রীর লিখিত নির্দেশে সন্ত্রাসী ছেড়ে দিয়েছি ।

মন্ত্রী মহোদয় বললেন, হ্যঁ ।

আখলাখ বললেন, স্যার আমার সামনে একজন সাংবাদিক বসে আছেন । কংকন ভাইকে রিলিজ করতে বলছেন তো, উনি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান । উনাকে টেলিফোনটা দেই?

মন্ত্রী মহোদয় সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দিলেন ।

আখলাখের সামনে কেউ নেই । মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলার কৌশল সে শিখেছে ওসি নাজমুল হুদের কাছে । আখলাখ হাজতের দিকে গেলেন ।
কংকনকে বের করলেন । কংকন বলল, মন্ত্রীর টেলিফোন এসেছে?

আখলাখ বললেন, হ্যঁ ।

এখন বুঝবি কত ধানে কত চাল ।

আখলাখ বললেন, আমার আগে তুই বুঝবি । তোকে নিয়ে যাচ্ছি ডলা দিতে । যতবার মন্ত্রীর টেলিফোন আসবে ততবার ডলা খাবি ।

ভাই, আমি তো জবানবন্দি দিয়েছি । আপনি বলেছিলেন জবানবন্দি দিলে ডলা দিবেন না । ভাই, আপনার পায়ে ধরি, আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু যোগাযোগ করায়ে দেন । আমি তাকে বলব যেন আর কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ না করে । আপনাকে আমি ভাই ডাকলাম । ধর্মের ভাই ।

আখলাখ কংকনকে তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল । সুমনা বলল, তুমি ভয় পেয়ো না । আমি হাই লেভেলে যোগাযোগ করেছি । এখন যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ।

কংকন বলল, সব যোগাযোগ বন্ধ করো । তুমি কিসলুকে খুঁজে বের করো । যদি কেউ কিছু করতে পারে কিসলু পারবে । আর কেউ কিছু পারবে না ।

কিসলু সৎকাজের সন্ধানে বের হয়েছে। চুনোপুটি সৎকাজের বদলে রুইকাতলা টাইপ সৎকাজ তার ভাগে জুটেছে। বিনাইদহ থেকে এক ফ্যামিলি এসেছে ঢাকায়। বাস থেকে নামতে গিয়ে পরিবারের প্রধান ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে। এখন মারা যায়, তখন মারা যায় অবস্থা। কিসলু তাকে নিয়েই ছোটাছুটি করছে।

তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন ছয় ঘণ্টা পার না হলে কিছু বলা যাবে না। কিসলু ঠিক করেছে ছয় ঘণ্টা সে হাসপাতালেই থাকবে। কখন কী দরকার হয়। আহত মানুষটির স্ত্রী কিসলুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা, আপনি আমার ছেলে। কিসলু বলল, মা, অস্ত্রির হবেন না। এক মনে আল্লাকে ডাকেন। আমার মন বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্লা মেহেরবান।

ছয় ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই ডাক্তার বললেন, পেশেন্টের অবস্থা অনেক ইম্প্রভ করেছে। পেশেন্ট আশঙ্কামুক্ত।

কিসলুর এখানকার দায়িত্ব শেষ। সে প্রের সৎকাজের সন্ধানে পথে নেমেছে।

মেসের ঘরে হিমু শয়ে আছে। শহর জুড়ে লোডশেডিং। আকাশে থালার মতো চাঁদ ওঠায় শহর অক্ষকারে দুবে যায় নি। জানালা দিয়ে হিমুর ঘরে জোছনা চুকেছে। জোছনার কোনো রঙ থাকে না। শুধু সিনেমার জোছনা হয় নীল। হিমুর কাছে আজ রাতের জোছনা সিনেমার জোছনার মতো নীল লাগছে। জোছনারাতে বনে যাওয়ার নিয়ম। হিমু চোখ বন্ধ করে বলল, শহরটা অরণ্য হয়ে যাক। হিমু চোখ মেলল, হ্যাঁ শহরটা অরণ্য হয়ে গেছে। এখন শহরের অলিতে গলিতে হাঁটা মানে গহীন বনের ভেতরের পায়ে চলা পথে হাঁটা।

দরজার আড়াল থেকে কেউ একজন ক্ষীণ গলায় ডাকল, হিমু ভাই।

হিমু বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, কে ছামাদ?

জি হিমু ভাই।

বাইরে কেন? ভিতরে আসো।

লজ্জায় ঘরে ঢুকতে পারতেছি না। সারা দিন এক পিস টোস্ট বিস্কুট আর এক কাপ চা ছাড়া কিছুই খাই নাই। ভাত খাইতে মন চাইতেছে। চারটা ভাতের ব্যবস্থা করতে পারবেন?

হিমু বলল, বুঝতে পারছি না। নীল জোছনার রাতে হা করে জোছনা খাওয়া নিয়ম। ভাত খাওয়া ঠিক না।

তাহলে বাদ দেন। না খেয়ে আমার অভ্যাস আছে।

বাদ দিলাম। চলো আজ জোছনা খাব।

চলেন যাই। পুলিশের ভয়ে লুকায়া ছাপায় থাকি। স্বাধীন চলাফেরা বন্ধ। আপনার সঙ্গে আজ হাঁটব।

হিমু বলল, জোছনারাতে পুলিশ কাউকে ধরে না। নিয়ম নাই। ভয়ঙ্কর কোনো সত্ত্বাসীর দেখা পেলেও আজ রাতে পুলিশ তার দিকে তাকিয়ে হাসবে। নীল জোছনার নিয়ম তাই।

হিমু পথে নামল। তার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে তার বিশেষ কোনো গন্তব্য আছে। গন্তব্যহীন পথযাত্রা না। তারা দুজন প্রেসক্লাবের সামনে এসে দাঁড়াল। শহর এখনো অঙ্ককারে ভূবে আছে। ন্যাশনাল গ্রাউন্ডে নিচয়ই বড় ধরনের সমস্যা হয়েছে। সমস্যা হয়েছে তা আকাশের চাঁদ ধরতে পেরেছে। সে জোছনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আরে, হিমু ভাই না?

কে কিসলু?

জি।

সৎকাজ চালিয়ে যাচ্ছ?

এর উপরেই আছি। আজ সারা দিনে কী কী করেছি শুনেন। হাসপাতালে গিয়ে জিঞ্জেস করলাম কারও ‘A’ নেগেটিভ ব্লাড লাগবে কি না। ব্লাড দিলাম। তারপর একজনরে পাওয়া গেল রাস্তায় উস্টা খেয়ে পড়ে চশমা ভেঙে ফেলেছে। চশমা ছাড়া কিছুই দেখে না। আঙ্কা। তারে বাড়িতে নিয়া গেলাম। সে আমারে ছাড়বে না। ভাত খাওয়াবে। তারপর...

কিসলু! সৎকাজের বর্ণনা বন্ধ। আমি ছামাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। তোমাদের বঙবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের বাড়িটা ছামাদের। তুমি তাকে বাড়ির দখল বুঝিয়ে দিবে। আজ রাতেই নিয়ে যাবে। এই একটা সৎকাজে অনেক দূর আগাবে।

অবশ্যই আমি উনারে নিয়া যাব। বাড়ির দখল যেন তার থাকে সেই চেষ্টা নিব। হিমু ভাই, আমি অনেকদূর আগায়েছি। এখন অনেক কিছু বুঝতে পারি।

কী রকম?

ছামাদ ভাই সারা দিন কিছু খান নাই। উনার ভাত খাইতে ইচ্ছা করতেছে। এইটা পরিষ্কার বুঝতে পারতেছি।

ঠিকই বুঝেছ। তুমি আরও অনেকদূর যাবে। চলো হাঁটতে বের হই।

উনার খাওয়ার ব্যবস্থা আগে করি।

না।

তারা তিনজন হাঁটতে হাঁটতে ধানমতি লেকের পাড়ে চলে এল। কিসলু বলল, জোছনা ফাইট্যা পড়তাছে। ঠিক না হিমু ভাই?

হঁ।

চলেন লেকের ধারে বসি।

চলো।

তারা তিনজন কঁঠালগাছের নিচে এসে বসল। কঁঠালগাছের বড় বড় শিকড় বের হয়ে লেকের পানির দিকে নেমে গেছে। শিকড়ে বসার সুন্দর জায়গা তৈরি হয়েছে। প্রকৃতির সুন্দর হাতে বানানো বেঞ্চ। তিনজন চুপচাপ বসে আছে। কারও মুখে কোনো কথা নাই। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে কঁঠালগাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে। গাছে কাকের বাসা। হঠাৎ একসঙ্গে কয়েকটা কাক কা কা করে উঠল। এদের সঙ্গে আশেপাশের অনেক কাক যুক্ত হলো। চারদিকে কা কা কা কা। ছামাদ ভীত গলায় বলল, হিমু ভাই! ঘটনা কী?

হিমু বলল, প্রবল জোছনায় কাকদের মধ্যে বিভ্রম তৈরি হয়। তারা ভোর হয়েছে ভেবে ডাকাডাকি শুরু করে। প্রকৃতি যে শুধু মানুষের জন্যে বিভ্রম তৈরি করে তা-না, পশু পাখি সবার জন্যেই তৈরি করে।

কে যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। বাইশ-তেইশ বছরের একজন যুবক। তার হাতে একটা পুঁটলি। লেকের পানি ঘেঁসে সে এগুচ্ছে। পানিতে সুন্দর ছায়া। যেন দু'জন মানুষ এগিয়ে আসছে। একজন আসছে পানির ভেতর দিয়ে। যুবক এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, আপনারা এখানে কী করেন?

হিমু বলল, জোছনা দেখি ।

আপনাদের মধ্যে হিমু কে?

আমি ।

যুবক বলল, আপনারা কি রাতের খানা খেয়েছেন?

হিমু বলল, না ।

আপনাদের জন্যে খানা নিয়ে এসেছি ।

হিমু বলল, খাবার কে পাঠিয়েছে?

যুবক জবাব না দিয়ে পুটলি খুলে প্লাস্টিকের বাক্স বের করল । তিনটা বাক্স । বড় এক বোতল পানি । কাগজের প্লেট, প্লাস্টিকের চামচ ।

হিমু আবারও বলল, খাবার কে পাঠিয়েছে?

যুবক বলল, খাবার গরম আছে খেয়ে নেন । খাবার পাঠিয়েছেন রূপা আপা । উনি জানালা দিয়ে আপনাকে দেখেছেন । আপনি উনার বাড়ির সামনে দিয়ে এসে গাছের নিচে বসেছেন ।

হিমু বিড়বিড় করে বলল, আজ রাজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা । কাকদের কা কা চিৎকারের কারণে হিমুর কথা বোৰা গেল না । নীল জোছনায় কাকদের হৃদয়ে অস্থিরতা । তারা তাদের অস্থিরতা ছড়িয়ে দিতে চাইছে । মানুষ যেমন ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়, ফুল ছড়িয়ে দেয় সৌরভ ।

হিমুর আছে জল



কানের কাছে কেউ একজন বলছে, হিমু, চোখ মেল!

আমি চোখ মেলতে পারছি না। চোখের পাতা সীসার মতো ভারী। ভারী প্রসঙ্গে চোখের পাতাকে সীসার সঙ্গে তুলনা করা হয় কেন? অনেক ধাতু আছে সীসার চেয়ে ভারী, যেমন লোহা। আমরা কখনো বলি না, চোখের পাতা লোহার মতো ভারী। লেখকরা এক একটা জিনিস চালু করেন, সেগুলি চালু হয়ে যায়। প্রাচীনকালে বাতাসে প্রদীপ নিভত, তখন ধপ করে শব্দ হতো। লেখকরা লিখলেন, ‘ধপ’ করিয়া প্রদীপ নিভিয়া গেল। তা-ই চালু হয়ে গেল। ইলেকট্রিক বাতি নেভা প্রসঙ্গেও এখনকার লেখকরা লিখেছেন, দপ করে বাল্ব নিভে গেল।

আমি ডান পায়ে ঝাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ঘুম ভাঙ্গানোর সহজ উপায় পা দিয়ে ঝাঁকি দেওয়া। পারলাম না। হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেছে। পায়ের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ভালোই ঠাণ্ডা লাগছে। এতে ঘুম আরও গাঢ় হচ্ছে। হাত-পা গুটিয়ে কুকুরকুণ্ডলি নিদ্রা। মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো নিজের ওমে নিজে গরম হওয়া।

হিমু, চোখ মেল!

আবার শুনলাম। কোনো একজন আমার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেই কোনো একজনের গলা ক্রিকেটের ধারাভাষ্যকার চৌধুরী জাফরঢ্লাহ শরাফতের মতো ভারী। উনি আমাকে কেন ডাকবেন বুঝতে পারছি না। ক্রিকেটের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা কি কোনো স্মৃদৃশ্য? মনে হয় না। স্মৃদৃশ্য হলে যে ডাকছে তাকে দেখা যেত। চৌধুরী জাফরঢ্লাহ সাহেবকে স্মৃণে দেখারও কিছু নেই। আমি বিড়বিড় করে

বললাম, আপনি যে-ই হোন, কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করবেন না। বলতে বলতে ঘুম ভেঙে গেল।

প্রথম কিছুক্ষণ বুঝতেই পারলাম না আমি কোথায়। ঘুম ভাঙার পর নিজের অবস্থান বুঝতে দশ সেকেন্ড সময় লাগে। নিয়ম হচ্ছে এই দশ সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে থাকা। তারপর চোখ মেলে নিজের অবস্থান বুঝে নেওয়া। আমি তাই করলাম। অবস্থান জানা গেল।

আমি শুয়ে আছি দোতলা লঞ্চের ডেকে। অঙ্ককারে লঞ্চ চলছে। ইঞ্জিনের ধক ধক শব্দ হচ্ছে। একজন বৃন্দ ছাড়া আমার আশপাশে কেউ নেই। বৃন্দের চেহারা হো-চি-মিনের মতো। বয়স সতরের বেশি। পিঠ ধনুকের মতো খানিকটা বেঁকেছে। বৃন্দের চোখে মোটা কাচের চশমা। কাচ এতই মোটা যে পিছনের চোখ দেখা যাচ্ছে না। হাতে বেতের বাঁকানো লাঠি। ওনেছি হয়রত মুসা আলায়হেস সালামের লাঠি নাকি বাঁকা ছিল। লাঠির মাথায় চোখ আঁকা ছিল। এই বৃন্দের লাঠিতে চোখ নেই। চশমা এবং লাঠিতে বৃন্দকে মানিয়েছে। লঞ্চে কোনো শব্দের ফটোগ্রাফার থাকলে তাঁর অনেকগুলো ছবি উঠত। এই বৃন্দই কি আমাকে ডাকছিলেন? সন্তাবনা ক্ষীণ। বৃন্দের আমার নাম জানার কথা না।

বাজানের ঘুম ভাঙছে?

ইঁ।

শীতে কষ্ট পাইতেছিলেন, এইজন্যে আমার চাদরটা আপনার গায়ে দিছি। নয়া চাদর, আমার মেয়েজামাই খরিদ করে দিয়েছে।

এখন কি চাদর ফেরত চান?

বৃন্দ কিছু বলল না, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। সে নিচয়ই আমার কাছে ধন্যবাদসূচক কথাবার্তা আশা করছিল। নিজের গায়ের চাদর অন্যকে দিয়ে বৃন্দ কিছু প্রশংসা আশা করতেই পারে। মানুষ প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে।

আমি শোয়া থেকে বসলাম। আয়োজন করে হাই তুলতে তুলতে বৃন্দকে বললাম, দুটা টাকা দিন তো। ময়লা নোট দিবেন না। ময়লা নোট ভর্তি থাকে জীবাণু। এখন জীবাণু ছানাছানি করতে পারব না। হাতের কাছে লাইফবয় সাবান নেই যে হাত ধুয়ে জীবাণুর কাছ থেকে সুরক্ষা নিব।

বাজান, আপনার কথা কিছু বুঝতেছি না।

আরও সহজ করে বলি, দুটা টাকা দেন চা খাব।

চা খাওয়ার টাকা দিব?

হ্যাঁ। টাকা ছাড়া ওরা চা দিবে কোন দুঃখে!

আমি দিব?

হ্যাঁ, আপনি দিবেন। গায়ে চাদর দিয়েছেন, এখন চা খিলান।

দুই টাকা ভাংতি নাই।

ভাংতি না থাকলে পাঁচ টাকার একটা নোট দেন। তিন টাকা ফেরত দিব।

বৃন্দ অসহায় ভঙিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করতে করতে বলল, গায়ের চাদরটা ফিরত দেন।

আমি বললাম, এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ। হাত থেকে কিছু বের হয়ে গেলে আর ফেরত আসে না। কাজেই খামাখা চাদর চাদর করে মুখে ফেনা তুলবেন না। চাদরের ব্যাপারটা ভুলে যান।

বৃন্দ হতাশ গলায় বলল, বাজান এইসব কী কন?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, সহজ কথা দিয়ে শুরু করেছি। আরও কঠিন কথা শুনতে হবে। রাতে লঞ্চের হোটেলে খানা খাব। খানার টাকা দিবেন। লঞ্চের টিকিট কাটিলাই। টিকেটের টাকা দিবেন। হাঁকি পাঁকি করবেন না। হাঁকি পাঁকি বোঝেন তো?

বাজান! আমি তো বিরাট বিপদে পড়লাম।

বিপদে তো অবশ্যই পড়েছেন। মানুষ খাল কেটে কুমির আনে, আপনি চাদর বিছিয়ে বাঘ নিয়ে এসেছেন। ‘হালুম’।

আমার বিকট হালুম শুনে বৃন্দ চমকে খানিকটা পিছালেন। তাঁর চোখে সংশয়। তিনি ধরে নিয়েছেন চাদর ফেরত পেতে তাঁর ঝামেলা হবে। আমি বৃন্দের হাত থেকে টাকা নিয়ে বের হয়ে গেলাম। বৃন্দ চোখ বড় বড় করে আমার দিকে কিংবা আমার গায়ে তাঁর চাদরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দূর থেকে দেখলাম তাঁর ঠেঁট নড়ছে। সম্ভবত দোয়া পাঠ করছেন।

তিনতলা লঞ্চের দোতলায় চায়ের দোকান। এখানে শুধু চা বিক্রি হয় না, ভাতও বিক্রি হয়। অ্যালুমিনিয়ামের বিশাল সাইজের বেশ কয়েকটা ডেগ সাজানো আছে। ভাত বিক্রি শুরু হয় নি। দোকানের এক কোণায় সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে। সাইনবোর্ডে লেখা—‘চাঁপুর ক্রস করিবার পর

খানা দেওয়া হইবে।' খানার তালিকা দেওয়া আছে। ছোট ব্ল্যাকবোর্ডে চক
দিয়ে লেখা—

ইলিশ মাছ
ইলিশ মাছের ডিম
সবজি
ডাল-খাসি
মসুর ডাল
(মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করিবেন।)

কোন খাবারের কী মূল্য তা লেখা ছিল; এখন মুছে গেছে, কিংবা মুছে
ফেলা হয়েছে।

দোকানের সামনে বেঞ্চ পাতা। বেঞ্চে যুবক বয়সী দুইজন উদাস
ভঙ্গিতে চা খাচ্ছে। দুজনের গলাতেই লাল রঙের মাফলার। দুজনের গায়ের
শাট্টের রঙ হলুদ। তাদের চোখে চশমার ফ্রেমও একই। বোঝাই যাচ্ছে এরা
কঠিন বস্তু। বিয়ে করার সময়ও এরা চেষ্টা করবে একই পরিবারের দুই
বোনকে বিয়ে করতে। একজনের হাতে মোবাইল। মোবাইলে নোংরা
কোনো ভিডিও ক্লিপিং আছে। দুজনই আগ্রহ নিয়ে দেখছে এবং
খ্যাকশিয়ালের মতো খিকখিক ঝরে হাসতে গিয়েও হাসছে না। এদিক-
ওদিক তাকাচ্ছে।

দোকানের মালিক কাঠের উচু চেয়ারে বসা। মাথাভর্তি ঘন চুল ছোট
ছোট করে কাটা। ডাকাতের মতো চেহারা। এই লোকের দৃষ্টি ক্রমাগত
যুরছে, কোথাও স্থির হচ্ছে না। আমি চায়ের কাপ নিয়ে দুই যুবকের
মাঝখানে বসলাম। তারা সহজেই জায়গা ছাড়ল। বিরক্ত হলো না। যদিও
বিরক্ত হওয়ার কথা। দুই বস্তুর মাঝখানে হাইফেন হয়ে থাকা মোটেও
গ্রহণযোগ্য না। তাদের ভিডিও দেখা কিঞ্চিৎ বাধাগ্রস্ত হলো। চায়ে চুমুক
দিয়ে ডানপাশের যুবককে বললাম, চায়ে কর্পুরের গন্ধ পাচ্ছেন?

যুবক তার কাপে চুমুক দিয়ে বলল, হঁ।

কড়া গন্ধ না?

হঁ।

চায়ে কর্পুরের গন্ধ কেন পাওয়া যায় জানেন?

না।

জানতে চান? অবশ্যি না-জানাই ভালো। জেনে ফেললে কাপের বাকি
চা-টা থেতে পারবেন না। দুই টাকার চা নষ্ট হবে।

যুবক তীক্ষ্ণ গলায় বলল, বলেন তো কী ঘটনা।

আমি বললাম, ডেডবিডি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে হলে
চা পাতা দিয়ে মুড়ে নিতে হয়। চা-পাতার সঙ্গে থাকে কর্পুর। চা-পাতার
ভেষজগুণের কারণে ডেডবিডিতে পচন ধরে না। ঐ চা-পাতা পরে খুবই সন্তা
দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ডেডবিডির চা-পাতায় বানানো চায়ে থাকে
কর্পুরের গন্ধ। এখন বুঝেছেন?

পরিষ্কার বুঝেছি। আর বলতে হবে না।

যুবক চায়ের কাপ নামিয়ে আঙুল ফুটাতে লাগল। যুবকের চোখমুখ
শক্ত। পরিষ্কার বোৰা যাচ্ছে যুবক একটা ঘটনা ঘটাবে। বাঘ শিকারের
ওপর লাফ দিয়ে পড়ার আগে মাটিতে লেজ দিয়ে বাঢ়ি দেয়। মানুষের
লেজ না থাকার কারণে সে আঙুল ফুটায়। অনেকে থুথু ছিটায়।

এই যুবকের বক্ষু ভীতুপ্রকৃতির। সে চাপা গলায় বলল, বাদ দে দোস্ত।
বাদ দে।

বাদ দিব কেন?

ঝামেলায় যাওয়ার দরকার কী?

ঝামেলার প্রয়োজন আছে। এই হারামজাদার নাকটা আমি যদি না
ফাটাই আমার নাম শাকুর না। আমার নাম ‘কুকুর’।

আমি গলা নামিয়ে আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, শাকুর ভাই, ভিডিওতে
কী দেখাচ্ছেন, আমাকে দেখাবেন?

আমার কথা বলার ভঙ্গিতে হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক,
শাকুর ভাই আমার দিকে বক্ষু-ভঙ্গিতে তাকালেন। হাই তুলতে তুলতে
বললেন, প্রাইভেট জিনিস দেখছি। আপনার দেখা ঠিক না। দেখলে লজ্জা
পাবেন।

দেশি মেয়ে না বিদেশি?

দেশি।

মডেলকন্যা?

না, আমাদের অঞ্চলের মেয়ে। নিজে ইচ্ছা করে তুলেছে, এখন
আমাদের দুইজনকে দোষ দেয়। আমরা নাকি ফান্দে ফেলে ছবি তুলেছি।
আপনি বলেন, মেয়েছেলে কি ফান্দে পড়ার জিনিস? ফান্দে পড়িয়া বগা

কান্দে।—এই গান শোনা যায়। কিন্তু ফান্দে পড়িয়া ‘বগী’ কান্দে এমন গান নাই।

আমি বললাম, অতি সত্য কথা বলেছেন। এ রকম সত্য কথা সচরাচর শোনা যায় না।

তাহলেই বোঝোন।

আপনাদের ভিডিওর দোকান আছে?

হঁ। আমাদের ভিডিওর ব্যবসা। ভিডিও ফিল্ম বানাব। আমি পরিচালক। আমার প্রথম কাজ। নায়িকার সঙ্গানে ঢাকা গিয়েছিলাম।

নায়িকা পেয়েছেন?

একজন পেয়েছি। হাইট খুবই কম। এইটাই সমস্যা। কায়দা করে ক্যামেরা ধরতে হবে। অর্ডার দিয়ে এক ফুট হাইটের জুতা বানাতে হবে।

ভালো বামেলায় আছেন বুঝতে পারছি। আপনি কি চায়ের দোকানিকে সত্য মারবেন?

অবশ্যই। না মারলে বাপ-মায়ের দেওয়া আকিকা করা নাম চেঙ্গ করতে হবে। এটা ঠিক না।

মারামারি শুরু হবে কখন?

রাগ উঠাচ্ছি। রাগ এখনো উঠে নাই। আমার রাগ উঠতে দেরি হয়। এমনও হয়েছে রাগ উঠতে দেন্ত্রে দুই ঘণ্টা লেগেছে।

আমি উঠে পড়লাম। শাকুর ভাইয়ের রাগ উঠুক, তারপর দেখা যাবে কতদূর কী হয়। আপাতত লঞ্চ ঘুরেফিরে দেখা যাক। ভূ-পর্যটক রমানাথ। লঞ্চ-পর্যটক হিমু। আমার পর্যটন শুরু হলো লঞ্চের পেছন থেকে।

দুই হাত হাতকড়ায় আবদ্ধ একজনকে দেখা গেল। কোমর দড়ি দিয়ে বাঁধা। পায়ে ডাঙ্গাবেড়ি। মুখভর্তি দাঢ়ি। মাথায় বাবরি চুল। সাদা লুঙ্গির ওপর মাওলানা ভাসানী টাইপ সাদা পাঞ্জাবি। তার সঙ্গে চারজন রাইফেলধারি পুলিশ। সবাই পা লেঞ্চে মেঘেতে বসে আছে। তাদের কাছাকাছি লাল প্লাস্টিকের চেয়ারে একজন সাব-ইসপেষ্ট্র বসা। শার্টের পকেটে নাম লেখা—জাকির হোসেন।

উৎসুক কিছু মানুষ দূর থেকে দেখছে। কাছে আসার সাহস পাচ্ছে না। আমি এগিয়ে গেলাম। বিনীত গলায় বললাম, জাকির ভাই, আপনাদের কিছু লাগবে? চা-সিগারেট? লাগলে বলেন, এনে দিব।

জাকির হোসেন বিরস গলায় বললেন, কিছু লাগবে না।

তিনি ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকাচ্ছেন। কাঠির যে অংশে বারুদ
সেই অংশই কানের ভেতর ঢুকানো। তাকিয়ে থাকতে অস্বস্তি লাগে। মনে
হয় এই বৃক্ষি কাঠিতে আগুন ধরে যাবে।

আমি বললাম, স্যার হাতকড়া পরা মাওলানা সাহেবের ঘটনাটা কী?

ঘটনা তোমার জানার প্রয়োজন নাই।

আমি পত্রিকার লোক। ঘটনা জানলে নিউজ করে দিতাম। ছবিসহ
নিউজ। সঙ্গে আপনার মিনি ইন্টারভিউ।

কোন পত্রিকা?

আমি ‘কালের চিৎকার’ পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ লঞ্চ-সাংবাদিক। লঞ্চে ঘুরে
ঘুরে নিউজ সংগ্রহ করি।

হাতকড়া পরা মানুষটি আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছে। তার মুখ হাসি হাসি।
সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সাংবাদিক ভাই বসেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বসলাম। এইসব ক্ষেত্রে দেরি করতে নাই। জাকির
হোসেন কঠিন চোখে তাকালেন তবে কিছু বললেন না। তিনি কাঠি দিয়ে
কান চুলকিয়েই যাচ্ছেন। মনে হয় কাঠিতে আগুন না ধরা পর্যন্ত তিনি
থামবেন না।

আমি হাতকড়া বাঁধা মানুষটার দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনার নাম
কী?

আমি পীর হাবিব কুতুবি।

আপনি পীর নাকি?

জি। আমার হাজারের ওপর মুরিদ আছে। মুরিদানদের মধ্যে জজ
আছে, উকিল আছে, সাংসদ আছে। একজন প্রতিমন্ত্রী আছে।

বলেন কী!

সবই আল্লাহর লীলা, আমার কিছু না। ‘সুবাহানাল্লাহে ওয়াল হামদু
লিল্লাহে ওয়া-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর।’ অর্থ-‘আমি আল্লাহতালার
পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতালার জন্যে। আর তিনি
ছাড়া অন্য কোনো মা’বুদ নাই এবং আল্লাহতালাই সর্বশ্রেষ্ঠ।’

আপনার এই অবস্থা কেন?

পীর হাবিব কুতুবি হাসিমুখে বললেন, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ছিলাম।
এখন আমাকে বরিশাল সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানেই ফাঁসি দিবে।

ফাঁসি?

জি। বরিশাল হলো মফস্বল শহর। সেখানে ফাঁসির ব্যবস্থা কেমন কে জানে! ভালো থাকার কথা না। সরকারের কাজকর্ম কিছুই বুঝি না। তাদের উচিত ছিল আমাকে ঢাকায় ফাঁসি দেওয়া। তাদের খরচ বাঁচত। সাংবাদিক ভাই, আমার এই কথাটা মনে করে লিখবেন।

অবশ্যই লিখব। আপনার ফাঁসি হলো কেন? করেছিলেন কী?

আমি কিছুই করি নাই। আমার পালা জিন 'কফিল' করেছে। আমার দুই স্ত্রী এবং এক শালি তিনজনকে একসাথে খুন করেছে। দোষ পড়েছে আমার ঘাড়ে। তবে আশায় আছি শেষ মুহূর্তে জিন কফিল বুঝবে কাজটা সে অন্যায় করেছে। আদালতে গিয়ে বলবে, হজুরে কেবলা, পীর হাবিব কুতুবি নির্দোষ।

আদালতে সে যাবে কীভাবে? জিন চোখে দেখা যায় না বলে শুনেছি।

ভুল শুনেছেন। তারা নানান বেশ ধরতে পারে। কুকুরের রূপ নেয়, সাদা সাপের রূপ নেয়। মাঝে মধ্যে মানুষের বেশও ধরে।

জিন কফিল কি এখন আপনার সঙ্গে আছে?

জি আছে। পালা জিন। যাবে কোথায় বলেন? তবে সে এখন কঠে আছে।

কঠে কেন?

পানির উপর দিয়ে যাচ্ছি তো এই কারণে কঠ। জিন জাতি পানির উপর দিয়ে চলাচল করতে পারে না।

এটা জানতাম না।

আগুনের তৈরি জিনিস, বোঝেন না কেন? 'রাবির আলী মাছানিয়াদুরু
ওয়া আন্তা আরহামুর রাহেমীন।' অর্থ—'হে প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে কঠ
আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে এবং তুমি দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু।'

পীর সাহেব, জিন এখন কোথায়?

ওসি সাহেবের কোলে বসে আছে। জিন জাতি উঁচা জায়গায় থাকতে
পছন্দ করে।

ওসি সাহেব নড়েচড়ে বসলেন, আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায়
বললেন, হ্যালো সাংবাদিক! অনেক কথা শুনেছেন। এখন যান। খুচরা
আলাপ বন্ধ করেন।

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, একটা অনুরোধ। দুষ্টপ্রকৃতির খুনি জুন কফিল আপনার কোলে বসে আছে। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকাবেন না। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

কী দুর্ঘটনা?

মনে করুন কাঠির মাথা ভেঙে কানের ভেতর থেকে গেল। বিরাট টেনশন—কাঠির মাথায় আগুন ধরে যায় কি না।

ইউ গেট লস্ট।

চলে যাচ্ছ স্যার। প্রয়োজন পড়লে খবর দিবেন। আমি তিনতলার ডেকে আছি।

ওসি সাহেব ক্ষিণ্ণ গলায় বললেন, খামাখা বাতচিত করতেছেন কেন? নিষেধ করলাম না? সাংবাদিকের আমি ... ছিড়ি।

অশ্লীল কথা বলবেন না স্যার।

চুপ বললাম। চুপ।

চায়ের দোকান থেকে হইচইয়ের শব্দ আসছে। মনে হয় ধুন্দমার শব্দ হয়েছে। দৌড়াদৌড়ির শব্দ। চিৎকারের শব্দ। মাঝনদীতে লঞ্চ হঠাত থেমে গেল। প্রতি লঞ্চেই তিনজন আনসার থাকে। আনসারদের বাঁশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অতি ক্ষুদ্র ঝামেলার সময়ও দেখা যায় আনসাররা নিজেদের রাইফেল ফেলে দিয়ে প্রাণপণ শব্দে বাঁশি বাজায়।

জাকির হোসেন চিন্তিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে পুলিশি ধর্মক দিলেন, এখনো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যেতে বললাম না?

পীর সাহেব বললেন, সাংবাদিক ভাই থাকুক না। উনার সঙ্গে কথা বলে মজা পাচ্ছিলাম।

এত মজা প্রয়োজন নাই।

পীর সাহেব বললেন, আপনাদের নাই। মজা পাওয়ার অনেক সময় আপনাদের আছে। আমার মজার প্রয়োজন আছে। কারণ আমার সময় শেষ। সাংবাদিক ভাই, আপনাকে একটা আমল শিখায়ে দেই। এই আমল নিয়মিত করলে নাজাত পাবেন। আমাদের সবার জন্যে নাজাত প্রয়োজন, এমনকি জুন জাতির জন্যেও নাজাত প্রয়োজন।

আমি জাকির হোসেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, স্যার অনুমতি দেন। আমলটা শুনে যাই। আমার নাজাত পাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

জাকির হোসেন হ্যানা কিছু বললেন না। মনে হচ্ছে আমল শোনার অনুমতি দিলেন। পীর সাহেব বললেন, সাংবাদিক ভাই! যতবার ঘুমাতে যাবেন, ততবার এই আমল করবেন। খাসনিয়তে বলবেন, ‘আল্লাহয়া বি ইছমিকা আমতু ওয়া আহইয়া।’ অর্থ—‘হে আল্লাহ, তোমারই নামে আমি মৃত্যুর কোলে অর্থাৎ নিদ্রায় যাইতেছি এবং জীবিত হইব।’ সাংবাদিক ভাই মনে থাকবে?

থাকবে।

তাহলে যান হইচই কী হইতেছে খোঁজ নেন। আপনারা সাংবাদিক মানুষ। যেখানে হইচই সেখানেই সংবাদিক। যেখানে খুন-খারাবি সেখানে পুলিশ, যেখানে আল্লাহ-খোদার নাম সেখানে পীর মুরশিদ। যেখানে মদ মেয়েমানুষ সেখানেই দালাল।

আমি জাকির হোসেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, স্যার! হইচইটা কিসের সেই সঙ্কান নিয়ে আপনাকে কি জানাব?

জাকির হোসেন কঠিন গলায় বললেন, প্রয়োজন নাই।

পীর কৃতুবি বললেন, উনার প্রয়োজন নাই কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে। সাংবাদিক ভাই, কী ঘটনা আমাকে জানাবেন। আমি জিন কফিলের মাধ্যমে সংবাদ নিতে পারি। তবে সেই মিথ্যা কথা বলে। জিন জাতি মানুষের চেয়েও বেশি মিথ্যা বলে।

চায়ের দোকানের ঝামেলা এখনো লাগে নাই, তবে লাগবে। আনসারের বঁশি বাজানোর কারণ ভিন্ন। চলন্ত লধনে ছিনতাই হয়েছে। ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে। তার বয়স সতেরো-আঠারো। করুণ চেহারা। পায়জামা-পাঞ্জাবিতে তাকে নিতান্তই অসহায় দেখাচ্ছে। সে এক পান-ব্যবসায়ীর খুতির টাকা সরিয়েছে। টাকার পরিমাণ খারাপ না। দুই লাখ ছেচল্লিশ হাজার। পান ব্যবসায়ী এখন কোনো ঝামেলায় যাচ্ছেন না। টাকাটা ফেরত চাচ্ছেন। টাকা আনসারদের কাছে। তারা টাকা ফেরত দিবে না। তারা হেডকোয়ার্টারে টাকা জমা দিবে। প্রমাণ দিয়ে সেখান থেকে টাকা নিতে হবে।

লাল মাফলার শাকুর ভাই আমাকে দেখে বললেন, ঘটনা বুঝেছেন? আনসাররা টাকা মেরে দেওয়ার ধাক্কায় আছে। শাকুর ভাইয়ের দোষ বললেন, ইহা সত্য।

পান ব্যবসায়ী কোথায়?

পুলিশের ওসি সাহেবের কাছে গেছে। বোকাসোকা মানুষ। এ টাকা উদ্ধার করতে পারবে না। তবে আমি ব্যবস্থা নিব। আনসারের গলায় পাড়া দিয়ে টাকা বের করব। টাকা খরচ হবে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে।

পান ব্যবসায়ী কিছু পাবে না?

কিছু অবশ্যই পাবে। টাকা উদ্ধার করে দিব, সেই খরচ আছে না?
আছে।

একজন ওসি সাহেব লখেও আছেন তাকেও ভাগ দিতে হবে।

আমি বললাম, বেশি ভাগাভাগি করলে দেখা যাবে আপনার ভাগেই কিছু পড়ল না।

শাকুর ভাই বললেন, আমি টাকা নিয়ে কী করব? নাটক বানাচ্ছি টাকার প্রয়োজন আছে, তবে অন্যের টাকা কেন নিব? আমি ছাত্রলীগ বা জাতীয় ছাত্রদল করলেও একটা কথা ছিল। যে-কোনো টাকায় এদের হক আছে।
সত্য কথা বলছি না?

অবশ্যই।

নাটক করার অভ্যাস আছে?

না। তবে শখ আছে। শিখিয়ে দিলে পারব। আপনার মতো গুণী পরিচালকের হাতে পড়লে জীবন্তের একটা গতি হয়ে যাবে।

চোখ টেরা করতে পারেন?

চেষ্টা করলে পারব।

চোখ টেরা করে দেখান তো।

আমি চোখ টেরা করে দেখালাম। পরিচালক সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আপনাকে দিয়ে হবে। আমার একটা ক্যারেন্টার আছে, মেয়েছেলে দেখলেই টেরা হয়ে যায় এবং তোতলাতে শুরু করে। কমেডি ক্যারেন্টার। তোতলাতে পারেন?

সেইভাবে পারি না। তবে চেষ্টার ক্ষমতা হবে না।

তোতলাতে তোতলাতে বলুন তো, ‘কেমন আছ রিনা?’

কে কে কে মনআ ছুরি না।

বাহু ভালো হয়েছে। হান্ড্ৰেড পারসেন্ট O.K. আপনাকে নিয়ে নিলাম।

আমি পরিচালককে কদম্ববুসি করে ফেললাম। পরিচালক হষ্ট গলায় বললেন, ভিডিও ক্লিপ দেখতে চেয়েছিলেন, নেন আড়ালে নিয়ে দেখেন।

পাটখেতের ভেতরে ভিড়িও করা। ক্লিয়ার ভিউ পাবেন না। তারপরেও যা আছে যথেষ্ট। মেয়ের নাম সুলতানা, ক্লাস নাইনে পড়ে। এই বয়সেই পেকে ঝানু নারিকেল হয়ে গেছে। দেখেন কেমন খিলখিল হাসি। দেখলেন?

হঁ।

কেউ খিলখিল করে হাসতে হাসতে নেঁটা হতে পারে? তাও ক্যামেরার সামনে?

কাজটা কঠিন।

এলাকার সাংসদ লোকজন নিয়ে যখন আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন তাকেও আমি এই কথা বললাম। আমি অদ্ভুতে বললাম, স্যার খিলখিল করে হাসতে হাসতে কোনো মেয়ের পক্ষে কি ক্যামেরার সামনে কাপড় খোলা সম্ভব?

সাংসদ বললেন, আজকালকার মেয়েদের পক্ষে সবই সম্ভব। আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, চৰিশ ঘণ্টার মধ্যে অ্যাকশন চাই। আমার এলাকায় অনাচার হবে না।

আমি তখন ওসি সাহেবকে কুড়ি হাজার টাকা নজরানা দিলাম। ওসি সাহেব টাকা পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, ক্যামেরার সামনে এই অবস্থায় খিলখিল অসম্ভব। পুরো ঘটনা আপোষে ঘটেছে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। সাংসদদের সব কথা শুনলে আমাদের চলে না। আমাদের ইনকোয়ারি করতে হবে। কঠিন তদন্ত হবে। তারপর ব্যবস্থা।

শাকুর ভাই আপনার নাটকের নাম কী?

নাটকের নাম ‘কেঁদো না পারুল’। রোমান্টিক অ্যাকশন এবং হাই ফ্যামিলি ড্রামা। নাম কেমন হয়েছে?

আমি বললাম, প্যান প্যানা নাম হয়েছে। ‘কান্দিস না পারুল’ নাম হলে ভালো হতো।

দুই বঙ্গ মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। মনে হয় নাম পছন্দ হয়েছে।

শাকুর ভাইয়ের বঙ্গ বললেন, ‘কান্দিস না পারুল’ নামের মধ্যে পাওয়ার আছে। এটা নিয়ে আরও চিন্তা করা প্রয়োজন। আপনি মোবাইলে ভিডিও ক্লিপিং দেখতে থাকুন। নাটকের নাম আজ রাতেই ফাইনাল হবে।

আমি বললাম, মোবাইল ফোন আপনার কাছে থাকুক। অবসর সময়ে আপনার সঙ্গে আরাম করে দেখব। এইসব জিনিস একা দেখা যায় না।

সত্য কথা বলেছেন। যান কোথায় যাচ্ছেন, ঘুরে আসেন তারপর তিনি ভাই মিলে আরাম করে দেখব। দেখার মতো অনেক জিনিস আছে।

আমি দোতলার ডেকে চলে গেলাম। বৃন্দ আগের জায়গাতেই বসা। আমাকে দেখে করুণ গলায় বলল, বাজান। চাদরটা কি দিবেন? আমার শীত লাগতেছে।

আমি বললাম, লঞ্চ বন্ধ। বাতাস নাই। শীত লাগবে কেন?

বৃন্দ চিন্তিত গলায় বলল, লঞ্চ বন্ধ কী জন্যে?

জানি না। খোঁজ নিব?

বাজান! খোঁজ নেন। জানি না কী জন্যে যেন ভয় লাগতেছে।

লঞ্চের খোঁজ নিয়ে জানলাম, অবস্থা ভয়াবহ। একই সঙ্গে লঞ্চের হাল ভেঙ্গেছে, ইঞ্জিন নষ্ট হয়েছে। লঞ্চ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পানিতে ভাসছে। সারেঙের নাম খালেক। বাড়ি চট্টগ্রাম। তার জুর উঠেছে একশ পাঁচ। সে বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে। সকিনা'র মা নামে একজনকে চোখ বড় বড় করে খুঁজছে। যে সৌনি ঢালছে, কিছুক্ষণ পর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, ও সকিনা'র মা, তুই কডে? আঁর শরীর পুড়ি যার গৈ। তুই কডে?

লঞ্চ চাঁদপুরকে বাঁ-পাশে ঝোঁকে চলে যাচ্ছে। আব্দুল খালেক লাফ দিয়ে উঠে বিছানায় বসল। ঝলমলে চাঁদপুরের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বলল, যারগৈ! চাঁদপুর যারগৈ। চাঁদপুর চলে যাওয়াতে তাকে খুবই আনন্দিত মনে হচ্ছে।

এখন মধ্যরাত্রি। লঞ্চ মোহনায় দুলছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে ঝাড় শুরু হবে। ঝড়ের সময় লঞ্চকে কে সামলাবে বোঝা যাচ্ছে না। সারেং খালেকের জুর আরও বেড়েছে। মাথায় পানি ঢেলে এই জুর কমানো যাবে না। দমকল ডাকতে হবে।

অল্প বাতাস ছেড়েছে, এতেই লঞ্চ এপাশ-ওপাশ করা শুরু করেছে।

ছেট জেনারেটর এতক্ষণ চলছিল। কিছুক্ষণ আগে জেনারেটর বন্ধ হয়েছে। পুরোপুরি বন্ধ হয় নি, মাঝে মাঝে চালু হচ্ছে। এখন ভরসা হিমসমৃথ-১৮

কয়েকটা হারিকেন। আজকালকার চায়নিজ মোবাইলে টর্চলাইটের মতো থাকে। মোবাইলধারীরা তাদের টর্চলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এতে অঙ্ককার কমে নি, বরং বেড়েছে।

সারেঙের মাথায় যে পানি ঢালছে তার নাম হাবলু মিয়া। বয়স পনের-মোল। হাস্যমুখী। সম্ভবত তার জীবনের মটো হলো, ‘সর্ব অবস্থায় আনন্দে থাকতে হবে।’

আমি বললাম, লঞ্চের লোক বলতে কি তোমরা দু'জন? আর কেউ নাই?

কী বলেন স্যার! দুইজনে কি এতবড় লঞ্চ চলে? ইঞ্জিন মাস্টার আছে। খালাসি আছে। লঞ্চমালিকের ছোটপুলা কাদের সাব আছেন।

কাদের সাব কোথায়?

সারেঙের কেবিনে আছেন। উনার কাছে খবর্দার যাবেন না।

সমস্যা কী?

উনি অসামাজিক কাজে ব্যস্ত। তার উপর মাল খেয়েছেন। স্যারের কেবিনে মেয়েছেলে আছে।

বলো কী?

উনার সঙ্গে লাইসেন্স করা পিস্টল আছে। মিজাজও উগ্র। আমারে তাক কইৱা একবার গুলি দিছিলেন্তা নিশা অবস্থায় ছিলেন বইল্যা গুলি লাগে নাই। নিশা'র মধ্যেও 'উবগার' আছে।

নিশার উপকারের কথা ভেবেই হয়তো হাবলু মিয়া মনের আনন্দে হলুদ দাঁত বের করে হাসল। তার কাছ থেকে লঞ্চে অসামাজিক কাজের নানান গল্প শুনে ডেকে ফিরছি, হঠাত একটা কেবিনের জানালা খুলে গেল। আতঙ্কিত এক তরুণীর গলা শোনা গেল।

এক্সকিউজ মি! আপনি কি এই লঞ্চের কেউ?

আমি বললাম, হ্যাঁ। ম্যাডাম কী লাগবে বলুন? চা খাবেন? চা এনে দিব?

চা আমার সঙ্গে আছে। চা লাগবে না। আপনি এক মিনিটের জন্যে কেবিনে আসবেন? আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি।

সাঁতার জানেন না?

সাঁতার কেন জানতে হবে? লঞ্চ কি ডুবে যাবে নাকি?

হ্যাঁ দুববে । তবে সাঁতার জেনেও লাভ নেই । তারপরেও গাপপুর-গুপপুর করে কিছুক্ষণ ভেসে থাকা ।

প্রিজ আপনি কেবিনে এসে কিছুক্ষণ বসুন ।

আপনি একা?

জি আমি একা । আমি আমার মামার বাড়ি বরঞ্চনা যাচ্ছি । সবাই বলছিল বাই রোডে যেতে । আমি ইচ্ছা করে লঞ্চে যাচ্ছি । অনেকেই আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল । আমি কাউকে আনি নি । আমার আত্মায়স্বজননী সারাক্ষণ বকবক করে । ওদের বকবকানি শুনতে ভালো লাগে না ।

ওদের না এনে ভালো করেছেন । দলবল নিয়ে মারা যাওয়ার কোনো মানে হয় না । কবি রবীন্দ্রনাথ এইজন্যেই বলেছেন, একলা মরো, একলা মরোরে ।

উনি একা মরতে বলেছেন?

উনি একলা চলতে বলেছেন । মৃত্যুও তো অনিদিষ্টের দিকে চলা ।
লঞ্চ কি সত্যি দুববে?

ঝড় উঠলেই দুববে । ঝড় এখনো শুঁটে নি । ঝড় উঠলেই দেখবেন লঞ্চ ডানদিকে কাত হয়ে ভুস করে দুবে যাকে । আপনার সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরা আছে? ভিডিও ক্যামেরা থাকলে লঞ্চে ডোবার প্রক্রিয়াটা ভিডিও করে রাখতে পারেন । ভিডিও করার সময় বী দিকে থাকবেন । খেয়াল রাখবেন লঞ্চ দুববে ডানদিকে ।

ডানদিকে কাত হবে কেন?

কারণ লঞ্চের সোকজন ডানদিকে মালামাল বোঝাই করেছে ।

প্রিজ ভেতরে এসে কিছুক্ষণ বসুন । প্রিজ । আমার কাছে চার্জ লাইট আছে । চার্জলাইট জ্বালাচ্ছি ।

আমি কেবিনে ঢুকলাম । পাশাপাশি দুটা বিছানা । আমি মেয়েটির মুখোমুখি বসলাম । প্রথমবারের মতো তার দিকে ভালোমতো তাকালাম । কিছুক্ষণের জন্যে আমার বাকরূদ্ধ হলো ।

নদের চাঁদের সঙ্গে এই মেয়ের দেখা হলে তিনি বলতেন,

“বাড়ির কাছে শানে বাঁধা চারকোনা পুসকুনি
সেই ঘাটেতে তোমার সঙ্গে সাঁতার দিব আমি॥
অন্দরমহলে আমার ফুলের বাগান
দুইজনে তুলিব ফুল সকাল বিহান॥

চন্দহার পরাইয়া নাকে দিব নথ ।

নৃপুরে সোনার ঝুনুনি বাজবে শত শত ।”

এই মেয়ে নদের চাঁদের মহয়ার চেয়ে সুন্দর । মহয়ার চেহারায় নিচয়ই
আম্য ভাব ছিল । এই মেয়ে টাঁকশালের নতুন রূপার টাকার মতো ঝকঝক
করছে ।

অতি রূপবতীদের চেহারায় কোথাও-না-কোথাও কিছু ক্রটি থাকে ।
আমি ক্রটি খুঁজে বেড়াচ্ছি । এমন কি হতে পারে মেয়েটার একটা দাঁত
গেজা? কান ছোট বড়? নাকের ভেতর থেকে লোম উঁকিবুকি দিচ্ছে!

রূপবতী বলল, আপনি ট্যারা নাকি?

না । আমি একটা ভিডিও নাটকে সুযোগ পেয়েছি । নাটকের চরিত্র
সুন্দর মেয়ে দেখলেই ট্যারা হয়ে যায় । প্রাকটিসের ওপর আছি । আপনাকে
দেখে ট্যারা হওয়া প্রস্তুত করলাম । আপনার ভয় কি ক ক কমেছে?

তোতলাচ্ছেন কেন?

আমি যে চরিত্রটা করছি সে যে শুধু ট্যারা-তা-না । তোতলাও ।

ভালো কথা, আপনি করেন কী?

প্যাসেঞ্জারদের চা-পানি খাওয়াটা কেবিন ঝাঁট দেই । আপনি কি রাতে
খাবার খাবেন? আগে অর্ডার দিয়ে রাখতে হবে ।

আমি টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছি । বিশাল বড় টিফিন
ক্যারিয়ারে করে খাবার দিয়েছে, আমার মনে হয় লক্ষের অর্ধেক মানুষ
খেতে পারবে । আপনার নাম জানা হয় নি । আপনার নাম কী?

হিমু ।

আমার নাম ত্রুষ্ণা । আমি বাংলাদেশে থাকি না । Ph.D করছি
Physics-এ, ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন ।

থিসিসের বিষয় কী?

থিসিসের বিষয় বললে কি বুঝবেন?

বোঝার কথা না, তারপরেও বলুন ।

হিগস কণা । কখনো নাম শুনেছেন?

হিগস হচ্ছে ইশ্বরের কণা, এই কথা শুনেছি । তবে নামকরণ ভুল । সব
কণাই ইশ্বরের কণা । আপনার নাকে সামান্য সর্দির ইশারা দেখতে পাচ্ছি ।
সর্দি কণাও ইশ্বরের কণা ।

তৃষ্ণা নাক মুছতে মুছতে বলল, আপনি কি সত্যি লঞ্চের বয়?

তৃষ্ণার কথা শেষ হওয়ার আগেই লঞ্চ প্রবলভাবে দুলে উঠল। ৩৬০ ডিগ্রি ঘূরে গেল। মনে হয় বড় কোনো ঘূর্ণনে পড়েছে। তৃষ্ণা বলল, কী সর্বনাশ! হচ্ছেটা কি?

আমি বললাম, তেমন কিছু হচ্ছে না, লঞ্চ ঘূরছে। বিশ্বক্ষাণে সব কিছুই ঘূরে। সূর্য ঘূরে, পৃথিবী ঘূরে, ইলেক্ট্রন ঘূরে, লঞ্চ কেন ঘূরবে না? তৃষ্ণা! শাড়িতে আপনাকে খুবই সুন্দর লাগছে, তবে আপনি শাড়ি পাল্টে শার্ট-প্যান্ট পরে নিন।

কেন?

লঞ্চ ডুবলে শাড়ি পরে সাঁতার কাটা মুশকিল।

এইসব আপনি কী বলছেন? সত্যি কি লঞ্চ ডুববে?

ডুববে। আমি একটা লাইফ বেল্ট জোগাড় করে নিয়ে আসি। লাইফ বেল্ট নিয়ে কেবিনে ঘাপটি মেরে বসে থাকবেন। লঞ্চ ডুবে যাওয়ার পর লাইফ বেল্ট নিয়ে বের হবেন। এর মধ্যে খাওয়াওয়া করে নিন।

Oh God! Oh God!

Oh God, Oh God করবেন না। সরং ও আল্লাহ ও আল্লাহ করুন। আল্লাহপাক নানান ধরনের ভাষা দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় তাঁকে ডাকা পছন্দ করেন।

আপনি অবশ্যই লঞ্চের বয় বেয়ারা কেউ না। প্রিজ আপনার পরিচয় দিন।

কঠিন সমস্যায় ফেললেন।

কঠিন সমস্যা হবে কেন?

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মানুষ তার পরিচয় খুঁজে বেড়াচ্ছে, এখনো পরিচয় পায় নি। যেদিন সে তার পরিচয় পাবে সেদিনই সর্বজ্ঞানের সমাপ্তি।

আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ।

প্রিজ আরেকটা সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যান। আমার পাশের কেবিনে এক হাসবেন্ড-ওয়াইফ উঠেছেন। হাসবেন্ডের অনেক বয়স। স্ত্রী কমবয়েসী। ওরা কেবিনে উঠেই দরজা বন্ধ করেছেন। আর দরজা খুলছেন না। মাঝে মাঝে ঐ কেবিনে একটা মুরগি ডেকে উঠে, তখন মহিলা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। আমি কয়েকবার ডাকাডাকি করেছি, কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

মুরগি ডাকার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। রহস্যভেদের ব্যবস্থা করছি। আমি একটো চক্র দিয়ে আসি তারপর দরজা ভেঙে এদের বের করার ব্যবস্থা করব।

দরজা ভাঙতে হবে কেন?

দরজা না ভাঙলে এরা বের হবে না। এরা মোটেই স্বামী-স্ত্রী না। অসামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্যে কেবিন ভাড়া করেছে। সারা রাত আমোদ-ফূর্তি করতে করতে যাবে। ভোরবেলা পৌছবে বরিশাল। এরা দু'জন কেবিন থেকে নামবে না। সারা দিন কেবিনে থাকবে। খাওয়াদাওয়া করবে। রাতে ঢাকা ফিরবে। লঞ্চের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত।

আপনি জেনে বলছেন, নাকি অনুমানে বলছেন?

জেনেই বলছি। সারেঙের অ্যাসিস্টেন্ট হাবলু মিয়ার সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ভাব হয়েছে। সে-ই বলেছে। তিনি নম্বর কেবিনের এক প্রফেসর সাহেবও এই চৃক্ষিতে ভাড়া নিয়েছিলেন। তার ছাত্রী সঙ্গে যাবে। শেষ মুহূর্তে ছাত্রী আসে নি। প্রফেসর সাহেব মুখ ভোতা করে বসে আছেন। তার ভাড়ার টাকা পুরোটাই জলে গেছে। টাকা উন্ধু যে জলে গেছে তা না, তিনি নিজেও জলে যাবেন এই উজ্জ্বল সংস্কারনা দেখা দিয়েছে।

কালের চিত্কার পত্রিকার চলমান লঞ্চ সাংবাদিক হিসেবে কোথায় কী ঘটছে দেখা দরকার। আমি ভ্রমণে বের হলাম। তৃষ্ণা মেয়েটি ভয় পেতে থাকুক। ভয় ভাঙনোর জন্য যথাসময়ে তার কাছে যাওয়া যাবে। তৃষ্ণা ছাড়া লঞ্চের আর কাউকে ভীত দেখলাম না। সবাই স্বাভাবিক আচরণ করছে। লঞ্চ মোহনায় ঘুরপাক খাচ্ছে—এটা যেন কোনো ব্যাপার না।

এখন কালের চিত্কার প্রতিবেদকের প্রতিবেদন।

আনসার বাহিনী

আনসার বাহিনীর চার সদস্যের তিনজন টাকা নিয়ে পলাতক। একজন পাবলিকের কাছে ধরা খেয়েছে। তাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে তাকে পানিতে ফেলা দেওয়া হবে। যিনি তাকে পানিতে ফেলার ঘোষণা দিয়েছেন তার নাম রুস্তম। মধ্যবয়সী গাটাগোটা মানুষ। কুৎকুতে ঢোখ। চিরুকে ছাগলা দাঢ়ি। রুস্তম বরিশাল ট্রাকচালক সমিতির

কোষাধ্যক্ষ। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস আছে। কিছুক্ষণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনলাম।

প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা আমার। আনসার বাহিনী আমাদের রক্ষক হয়ে হয়েছে ভক্ষক। ছিনতাইয়ের টাকা উদ্ধার করে নিজেরা গাপ করে দিয়েছে। ভেবেছে পার পাবে? পার পাবে না। একজন ধরা খেয়েছে, তাকে পানিতে ফেলে দেওয়া হবে। সে যদি সাঁতার দিয়ে কূলে উঠতে পারে এটা তার ভাগ্য। যদি কূলে উঠতে না পারে, যদি সলিল সমাধি হয় সেটাও তার ভাগ্য। বলেন, আল্লাহু আকবার।

দুর্বল ভঙ্গিতে কয়েকজন মিলে বলল, আল্লাহু আকবার।

রুক্তম হৃৎকার দিয়ে বলল, তবে আপনারা যদি মনে করেন আমি একা তাকে পানিতে ফেলব আপনারা ভুল করেছেন। আমরা সবাই মিলে পানিতে ফেলব। এই জন্যেই কবি বলেছেন, সবে মিলে করি কাজ হারিজিতি নাহি লাজ। জনতার আদালত তৈরি হয়েছে। জনতার আদালতে সবার বিচার হবে। অপরাধী যে-ই হোক তাকে পানিতে ফেলা হবে। বলুন, আল্লাহু আকবার।

আবার দুর্বল ধ্বনি, আল্লাহু স্মাকিবার। রুক্তম রণহৃৎকার দিয়ে বলল, আপনাদের গলায় জোর নাই। পুরগির বাচ্চাও তো আপনাদের চেয়ে উঁচা গলায় কক কক করে। বুলন্দ আওয়াজ দেন, আল্লাহু আকবার।

আগের চেয়েও ক্ষীণ আওয়াজ উঠল, আল্লাহু আকবার।

অপরাধী

ছিনতাইকারী শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। তবে তাকে মোটেই চিন্তিত মনে হচ্ছে না। সে মার খায় নি এতেই খুশি। লক্ষ-বাস-ট্রেনের কামরায় ধরা পড়া ছিনতাইকারীর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরা পালিয়ে যেতে পারে না বলে মার খেতে খেতে শতকরা নরাই ভাগ ক্ষেত্রে মারা যায়। কিছু আছে বিড়ালের মতো কঠিন প্রাণশক্তি, এরা লুলা হয়ে বেঁচে থাকে। লুলা হওয়ার কারণে ভিক্ষার সুবিধা হয়। ভিক্ষুক শ্রেণীতে লুলা স্বামীর অনেক কদর। আর্মি অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়াররা রূপবর্তী স্ত্রী পায়। লুলা ভিক্ষুকরাও রূপবর্তী ভিক্ষুক স্ত্রী পায়।

চায়ের দোকানের মালিক এখনো ধরা খায় নি। সে চা বিক্রি করে যাচ্ছে। লাশের চায়ের ব্যাপারই মনে হয় চাপা পড়ে গেছে। তবে আমি নিশ্চিত যথাসময়ে বিষয়টা উঠবে।

চা-ওয়ালা নিজের মনে বিড়বিড় করছে—পানিতে ফেলব। তব বাপের পানি!

রুক্ষম বলল, ব্রাদার কিছু বলছেন?

না কিছু বলি নাই।

যা বলার আওয়াজে বলবেন। বিড়বিড়ানি বন্ধ। আপনার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হবে।

আমার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত?

পাবলিকের লাশের চা খিলাইছেন। পাবলিক আপনেরে ছাড়বে না।

চা-ওয়ালা বলল, পাবলিকের মা'রে আমি ...।

রুক্ষম বলল, হারামির পুত কী বলেছে আপনারা শুনছেন? জাহাত পাবলিক, আপনারা শুনছেন?

হৃনলাম।

শুধু শুনবেন? ব্যবস্থা নিবেন না?

অবশ্যই ব্যবস্থা নিব।

সামান্য ছাটাপুটির পরেই চা-ওয়ালা ধরা খেয়ে গেল। তার স্থান হলো ছিনতাইকারীর পাশে। ছিনতাইকারী নিচু গলায় বলল, কিছুক্ষণ রঙতামাশা করে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ওস্তাদ কোনো চিন্তা নাই।

চা-ওয়ালা বলল, তুই চুপ থাক বদমাইশ। ওস্তাদ ডাকবি না, আমি তোর ওস্তাদ না।

ছিনতাইকারীর আসল এক ওস্তাদ লঞ্চে আছে। তার খৌজ পাইলে রুক্ষ ম যে আছে নতুন লিডার হইছে হে পিসাব করে লুঙ্গি ভিজায়ে দিবে।

আসল ওস্তাদ কে?

উনার নাম আতর। আতর মিয়া।

নাম তো আগে শুনি নাই। ও আচ্ছা আচ্ছা শুনেছি। নাম শুনেছি। সে লঞ্চে কী জন্যে?

আছে কোনো মতলব। আমি জিগাই নাই। দেখা হয়েছে, সালাম দিয়েছি। উনি বলেছেন, ভালো আছ? আমি বলেছি, জি ওস্তাদ।

পীর সাহেব এবং পুলিশ বাহিনী

পুলিশ বাহিনী আগের জায়গাতেই আছে। তাদের সামনে দুটা হারিকেন। একটায় তেল শেষ। দপদপ করছে, যে-কোনো সময় নিভবে। ওসি সাহেব দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকানো বন্ধ করেছেন। কোনো একটা ঘটনা মনে হয় ঘটেছে। ওসি সাহেবের মুখ পাংশুর্বণ।

আমি বললাম, স্যার কেমন আছেন?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। বিরক্ত চোখে তাকালেন। পীর সাহেব বললেন, স্যারের অবস্থা কাহিল। জিন কফিল উনার পিছে লাগছে।

কী করছে সে?

দেয়াশলাইয়ের মাথা ভাঙছে। ভাঙা মাথা এখন স্যারের কানের ভেতরে। জিন কফিলের আমার মতো ভালো কেউ চিনে না। সে এখন কী করব শুনেন। ভাঙা মাথার মধ্যে ফায়ারিং করবে। ধূম কইরা আগুন জুলবে।

তাহলে তো বেকায়দা অবস্থা।

সাংবাদিক ভাই ধরেছেন ঠিক। অবস্থা বেগতিক। আমি সূরা বাকারা পড়ে জিনের এখনো সামলায়া রাখার চেষ্টানিতেছি। কতক্ষণ পারব জানি না। দোয়া রাখবেন।

অবশ্যই দোয়া রাখব।

এদিকে জিন খবর দিয়েছে বিরাট ঝড় উঠবে, লঞ্চডুবি হবে। জানমালের বেগমার ক্ষতি হবে।

দুটি হারিকেনের একটি দপ করে নিভে গেল। ওসি সাহেব চমকে উঠলেন। এতটা কেন চমকালেন বোৰা গেল না।

সাংবাদিক ভাই সাঁতার জানেন?

তা জানি। তবে এই সাঁতারে কাজ হবে না।

পীর সাহেব বললেন, সাংবাদিক ভাই অস্তির হবেন না, পানিতে ডুবে মৃত্যু এক অর্থে আল্লাহপাকের খাস রহমত।

বলেন কী?

শহীদের দরজা পাবেন। পানিতে ডুবে মৃত্যু হলেই শহীদের দরজা। বেহেশ্তে চলে যাবেন। আপনার সেবার জন্য থাকবে সত্তরজন হুর। গেলমান কতজন পাবেন সেই বিষয়ে কিছু বলা নাই, তবে বেগমার পাওয়ার কথা। এখন চেষ্টা করে দেখেন পানিতে ডুবে মরতে পারেন কি না। কাছে আসেন, কানে কানে একটা কথা বলি।

আমি কাছে এগিয়ে যেতেই ওসি সাহেব ধমক দিলেন, যেখানে আছেন
সেখানে থাকেন কাছে আসবেন না। আমি তারপরেও এগিয়ে গেলাম। পীর
সাহেব ফিসফিস করে বললেন, আমি পানিতে ঝাঁপ দেওয়ার ধাক্কায় আছি।
ঝাঁপ একা দিব না, ওসি সাহেবকে নিয়ে ঝাঁপ দিব। বুদ্ধি ভালো করেছি না?
হঁ।

ইচ্ছা করলে এখনই ঝাঁপ দিতে পারি, অপেক্ষায় আছি।

কিসের অপেক্ষা?

কানের ভেতরে দেয়াশলাইয়ের মাথা ফাটুক মজা দেখি। কানের
ভেতরে ফায়ারিং হলে ওসি সাহেব নিজেই পানিতে ঝাঁপ দিবে। আমাকে
ধাক্কা দিতে হবে না।

ওসি সাহেব বললেন, অনেক কথা হয়েছে, আর না। বিদায়। বিদায়।

ওসি সাহেবের গলায় আগের জোর নাই। তিনি খানিকটা পুতিয়ে
গেছেন।

ডি঱েষ্টর শাকুর এবং তার বক্তৃতা

এই দু'জন মূল রঞ্জমাঞ্চে অনুপস্থিত তাদের এক কোনায় বিছানা পেতে
আধশোয়া হয়ে থাকতে দেখা গেল। ডি঱েষ্টর সাহেবের হাতে মোবাইল
ফোন। দুই বক্তৃ গভীর অগ্রসর তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সুলতানার
কর্মকাণ্ড দেখছে। মিডিলক্লাস মানসিকতার নমুনা। ঝামেলা থেকে দূরে সরে
ব্যক্তিগত আনন্দে সময় কাটানো।

আমি চলে গেলাম একতলার নিচের মালঘরে। দুনিয়ার ড্রাম জড়ে
করা। শত শত বস্তা। বস্তায় পানি পড়ছে, ভিজছে। কী আছে বস্তায় কে
জানে। লাইফ বেল্ট পাওয়া গেল না।

হিমু ভাই, কিছু খুঁজেন?

আমি চমকে তাকালাম। টিনের ড্রামের উপর যে বসে আছে তাকে
চিনলাম না। মুখভর্তি দাঢ়িগোফের জঙ্গল। গায়ে নীল গেঞ্জিতে লেখা—

Life starts at forty.

লেখার নিচে নগুবক্ষা এক থাই তরঁণী। তরঁণী চোখ টিপ দিয়ে
তাকিয়ে আছে।

ভাইজান আমাকে চিনেছেন?

না ।

আমি আতর। এখন চিনেছেন? আতর মিয়া।

চিনলাম। গেঞ্জি তো পরেছ জবরদস্ত।

আতর মিয়া মুখ বিকৃত করে বলল, এই জিনিস মানুষ পরে! বাধ্য হয়ে পরেছি। লোকজন আমার দিকে তাকায় না গেঞ্জির মেয়েটার দিকে তাকায়ে থাকে। আমারে কেউ চিনে না।

তুমি পলাতক?

জে। র্যাবের হাত থেকে বাঁচার জন্য সুন্দরবন চলে যাচ্ছি। মাসখানিক থাকব। র্যাব ঠাণ্ডা হলে ফিরব। আমাদের কাছে খবর আছে মাসখানিকের মধ্যে র্যাব ঠাণ্ডা হবে।

সুন্দরবনে যে যাচ্ছ তোমাকে তো বাঘে থেয়ে ফেলবে।

ক্রসফায়ারের চেয়ে বাঘ ভালো। হিমু ভাই! সুন্দরবন যাবেন? সপ্তাহখানিক থাকলেন। ফরেস্টের বাংলোয় থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে। ফরেস্টের লোকজন দেখতাল করে। তাদের আদরযত্নও ভালো। ফ্রেশ হরিণের মাংস সাপ্লাই করে। র্যাব বা পুলিশ যখন আসে তখন বনবিভাগ এডভাস খবর দেয়। আমরা ডিপ ফরেস্টে চলে যাই।

তুমি কি আগেও ছিলে সুন্দরবনে?

কয়েকবার ছিলাম। র্যাবের যত্নগায় মাঝে মধ্যে যেতে হয়। হিমু ভাই! আপনাকে পেয়েছি এখন আর ছাড়ব না। সেবা করব। আপনাকে সেবা করা বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার।

আমি বললাম, হরিণের মাংস ছাড়া সুন্দরবনে আর কী পাওয়া যায়?

ফ্রেস চিংড়ি খাবেন। চামের চিংড়ি না। ভাঙন মাছ আস্ত ভেজে দিবে। মাখনের মতো মোলায়েম। সামুদ্রিক রিটা কখনো খেয়েছেন? সামুদ্রিক রিটা খাবেন, সারা জীবন মনে থাকবে। হিন্দু এক বাবুটি আছে। নাম হরি ভট্টাচার্য। তার হাতে হরিণের মাংস অপূর্ব। মাংসটা মধু দিয়ে মাখায়ে দু'দিন বাসি করে তারপর রান্না। আহা কী জিনিস! হিমু ভাই। এখন বলেন, লক্ষ্মে আপনার কোনো সেবা লাগবে? সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছুক্ষণের মধ্যে লক্ষ্মের দখল নিব।

একা?

আমারে চিনেন না হিমু ভাই? আমার কি দোকা লাগে? টাকা নিয়ে তিন আনসার পালায়েছিল। এদের ধরে টাকা উদ্ধার করেছি। তিনটাকে বাথরুমে

তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছি। ওসি সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার দিয়েছি। উনি আর শব্দ করবেন না। কিম ধরে থাকবেন। রুস্তম নামে একটা ফালাফালি করতেছে, তাকে একটা থাবড়া দিয়ে কন্ট্রোল নিজের হাতে নিব। তার আগে বলেন, আপনার কোনো সার্ভিস লাগবে?

না।

আমাকে শুধু একটা খবর দেন, লঞ্চটা কি ডুববে? লঞ্চ ডুবে যাবে, আপনে এডভাঞ্স খবর পাবেন না—এটা কখনো হবে না।

লঞ্চ ডুববে।

আতর ছেউ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সামান্য সমস্যা হয়ে গেল। যাই হোক অসুবিধা নাই। আপনি আছেন কোথায়?

কেবিনে। কেবিন নাম্বার চার।

পাঁচ নাম্বার কেবিনে ফুর্তি করার জন্য এক হারামজাদা মেয়ে নিয়ে আছে। খবর পেয়েছেন?

হঁ।

জাতি কোনদিকে যাচ্ছে খেয়াল করেছেন?

হঁ।

আমার মনের ইচ্ছা এই দুইটাকে সুন্দরবনে নিয়ে বাঘের হাতে ছেড়ে দেওয়া। লঞ্চ ডুবে গেলে সেটা সন্দেহ হবে না।

আমি বললাম, এরা দু'জন দরজা বন্ধ করে বসে আছে। আপাতত এদের বের করার ব্যবস্থা করো।

আতর বলল, চলেন যাই। বের করি। হালকা পাতলা দরজা। এক লাথি দিলেই ভেঙে হবে চাইর টুকরা।

আতর আমার সঙ্গে কেবিনের দিকে রওনা হলো। এখন আতর প্রসঙ্গে বলি। বায়তুল মোকাররমের সামনে আতর মিয়ার একটা আতর এবং তসবির দোকান আছে। দোকানের নাম—

‘দি নিউ মদিনা আতর হাউস’

দি নিউ মদিনা আতর হাউসে কার্টনে করে ছোটখাটো অস্ত্রের লেনদেন হয়। আতর মিয়ার সব অ্যাসিস্টেন্টের নাম পুলিশের সন্ত্রাসী তালিকায় আছে। আতরের নাম নেই। আতর মিয়ার কথা হচ্ছে—কোনো ইনসান আমার হাতে খুন হয় নাই। মানুষ হলেই ইনসান হয় না। মানুষের মতো

দেখতে অনেক হায়ওয়ান ঘুরে বেড়ায়। এরা অফ হয়ে গেলে জগতের উপকার হয়।

আতর মিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয়ের কাহিনীতে কোনো নাটকীয়তা নাই। সময় পেলে সেই গল্প করব। আজ সময় নেই। ঝড় শুরু হয়ে গেছে।

আচ্ছা, ঠিক আছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই গল্পটা করি। সেদিনও এরকম ঝড়-বৃষ্টি। মানুষের যেমন ডিপ্রেশন হয় সাগর-মহাসাগরেরও ডিপ্রেশন হয়। বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেশন। সাত নম্বর বিপদ সংকেত। ঢাকায় বৃষ্টি, দমকা বাতাস। কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজলাম। বৃষ্টির পানি বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। শরীর হিম হয়ে গেছে। এক কাপ গরম চা খেতে পারলে ভালো হতো। চায়ের দোকানের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—দি নিউ মদিনা আতর হাউস থেকে একজন হাতের ইশারায় আমাকে ডাকল। কাছে গেলাম। সেই লোক সন্দিঙ্গ চোখে আমাকে দেখতে লাগল। একসময় বলল, আপনার পাঞ্জাবি হলুদ?

আমি বললাম, হ্যাঁ বৃষ্টিতে ভিজে কমলা হয়ে গেছে।

বুঝতে পারছি। দূর থেকেই নিউ মদিনা হাউস দেখা যায়। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন কেন?

গরম চা খুঁজছি।

হ্যাঁ। হয়েছে। ‘গরম চা’। ফ্রেন্ট নিয়ে যান। ঘরে ঢুকেন।

আমি ঘরে ঢুকলাম। লোক গলা খাকারি দিয়ে বলল, আমার নাম আতর মিয়া। আপনার সঙ্গে আগে মুখোমুখি দেখা হয় নাই। আজ দেখা হলো। আপনাদের সঙ্গে ব্যবসা করে আরাম পেয়েছি। এই প্যাকেটে দুই লাখ পঁচিশ আছে। আমি গুনে দিয়েছি তারপরেও গুনে নিন।

আমি টাকা শুনতে পারি না। আপনি গুনেছেন এই যথেষ্ট। বেশি গুনলে টাকা কমে যায়।

আতর মিয়া বলল, টাকার প্যাকেটটা পলিথিন দিয়ে মুড়ে দেই। পকেটে রেখে দিন, বৃষ্টিতে ভিজবে না।

আমি বললাম, আমার পাঞ্জাবির পকেট নাই।

পকেট নাই কেন?

পকেট থাকলেই পকেটে টাকা-পয়সা রাখতে হয়। দিগদারি। আমি দিগদারি পছন্দ করি না।

করেন দিগদারির কাম আর দিগদারি পছন্দ করেন না?

আমি বললাম, গরম এক কাপ চা খাওয়ান আমি চলে যাব। টাকা
থাকুক আপনার কাছে।

টাকা নিবেন না?

না।

কবে নিবেন?

টাকা আমার না, আমি নিব না। যার টাকা সেও নিবে না। সে ধরা
খেয়েছে। এটা আমার অনুমান।

টাকা আপনার না?

না।

সাংকেতিক কথা ‘গরম চা’ কীভাবে বলেছেন?

এমনি বলেছি। মনে এসেছে বলেছি।

গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি ‘গরম চা’ বলেন কী? পয়েন্টে পয়েন্টে মিলে
গেছে।

আতর মিয়া কিম ধরে গেল। আতর মিয়া একটি কথাও বলল না। চা
আনল। চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তার মোবাইলে একটা
টেলিফোন এল। সে ইশারায় আমাকে দাঁড়াতে বলল। আমি দাঁড়ালাম।
টেলিফোন শেষ করে আতর বলল, আপনার কথা সত্য। উনি ধরা
খেয়েছেন।

আমি বললাম, পুরুষের জন্মই হয়েছে ধরা খাওয়ার জন্য। কেউ স্ত্রীর
হাতে ধরা খায়, কেউ পুত্র-কন্যার হাতে ধরা খায়। কেউ ধরা খায় প্রেমিকার
কাছে। আবার কেউ কেউ র্যাবের কাছে ধরা খায়।

আতর মিয়া বলল, আপনি কই থাকেন? আপনার ঠিকানা কী?

কেন?

যোগাযোগ রাখতাম।

কোনো প্রয়োজন নাই। হঠাৎ হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হবে সেটাই
তো ভালো।

আতরের সঙ্গে পরে আরও দুইবার দেখা হয়েছে। শেষবার দেখা হয়
মধ্যরাতে।

মধ্যরাত খুবই বিশ্ময়কর সময়। তখন পেঞ্জী মারে চিল। মধ্য দুপুর
থাকে ভূতের হাতে, মধ্য রাত পেঞ্জীর হাতে।

পেত্রী চিল মারতে থাকুক আমি ঘটনাটা বলি। কাওরান বাজারের সামনে দিয়ে আসছি। মাছের আড়তে এক বেচারি বলল, হিমু ভাই না? যান কই?

আমি বললাম, কোথাও যাই না। হাঁটতে বের হয়েছি।

একটা ইলিশ মাছ নিয়া যান। আজ ভালো ইলিশ আসছে। দেড় কেজি, দুই কেজি।

ইলিশ মাছ দিয়ে আমি করব কী?

ভাইজা খাবেন আর কী করবেন। টাটকা ইলিশ। এমন টাটকা ইচ্ছা করলে কাঁচাও খাইতে পারেন। কাঁচা ইলিশ কোনোদিন খাইছেন?

না।

আমার অনুরোধ রাখেন, একটা পিস হইলেও কাঁচা খায়া দেখেন। লবণের ছিটা দিবেন, কাগজি লেবু চিপ্যা লেবুর রস দিবেন। কচকচায়া খাবেন। এই হিমু ভাইরে সবচেয়ে বড় মাছটা গাইথা দে।

আমি বিশাল এক ইলিশ হাতে নিয়ে হাঁটছি। আমার পেছনে পেছনে দুটা কুকুর আসছে। রাজধানীর কুকুর বলশালী হয়। এরা যথেষ্ট বলশালী। হাঁটার মধ্যে জংলিভাব আছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লে ওরাও খানিকটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি বললাম তোরা কি কাঁচা ইলিশ খাবি?

দু'জনই ঘড়ঘড় শব্দ করলুক। কুকুরের ভাষা বুঝতে না পারার কারণে কী বলল বুঝতে পারলাম না।

আরও খানিকটা এগুতেই মাইক্রোবাসের দেখা পেলাম। মাইক্রোবাসের ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা হয়েছে। ড্রাইভার বনেট খুলে ইঞ্জিন ঠিক করার চেষ্টা করছে।

ড্রাইভারের পাশে চিন্তিত মুখে শুটকা টাইপের এক লোক টর্চ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। টর্চ একটু পরপর নিভে যাচ্ছে। আমি তাদের পাশে দাঁড়ালাম। কুকুরের ঘড়ঘড় শব্দ শুনে দু'জনই ফিরে তাকাল।

মাইক্রোবাসের ভেতর অত্যন্ত বলশালী একজন বসা। সে ঘাড় সোজা করে বলল, এই লোক কী চায়?

আমি বললাম, আমি কিছু চাই না। আপনার গাড়ি থেকে কড়া আতরের গন্ধ আসছে। আমার কুকুর দুটা আতরের গন্ধে অস্থির হয়ে গেছে।

কুকুর দুটা একসঙ্গে কলজে শুকিয়ে যাওয়ার মতো আওয়াজ করল। টর্চ হাতে ড্রাইভারের পাশের লোক হঠাৎ দৌড় দিল। তার দেখাদেখি

ড্রাইভার। কেউ দৌড়ালে জংলি কুকুর তার পেছনে পেছনে যাবে এটাই স্বাভাবিক। দুটা কুকুরই ছুটে গেল। একজন শুটকা লোককে কামড়ে ধরল, আরেকজন ড্রাইভারকে। তাদের চিৎকার শুনলাম, বাঁচান আমাদের বাঁচান।

আমি ডাকলাম, তোরা ফিরে আয়। শুটকা লোক ফুটপাতে পড়ে রইল। কুকুর দুটা ফিরে এল।

মাইক্রোবাসে বসা লোক ভীত গলায় বলল, আপনি কী চান?

আমি বললাম, আপনি গাড়িতে বস্তাভর্তি করে কাউকে নিয়ে যাচ্ছেন। যাকে নিয়ে যাচ্ছেন তার গা থেকে আতরের গন্ধ বের হচ্ছে। আমার ধারণা তার নাম আতর মিয়া। আপনার পরিকল্পনা কী? বস্তা বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ ট্রাই থেকে পানিতে ফেলা? বস্তায় ইট কি ভরা আছে? আপনি তো ভাই বিরাট ঝামেলায় আছেন। গাড়ি নষ্ট। লোকবলও কমে গেল। সঙ্গে মোবাইল ফোন আছে না? টেলিফোন করে লোক আনবার ব্যবস্থা করুন। অন্য গাড়ি আনুন। এই ধরনের জটিল কাজে সবসময় ব্যাকআপ ব্যবস্থা থাকতে হয়।

গাড়ির ভেতর থেকে ভোঁ ভোঁ শব্দ শোওয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টহল পুলিশ আসতে দেখা গেল। আমি মাইক্রোবাসে বসা লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভাইসাহেব, পুলিশ আসতেছে। আমার মনে হয় আপনার উচিত দৌড় দিয়ে পালানো। আতর মিয়াকে ধরার অনেক সুযোগ পাবেন।

মাইক্রোবাসের দরজা খুলল। ঐ লোক বের হলো। ঘেড়ে দৌড় দিল। পেছনে পেছনে কুকুর দুটা ছুটে গেল। সেও ধরাশায়ী হলো।

মানুষের বিপদ দেখে পুলিশ এগিয়ে আসবে এটাই স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। পুলিশ দুজনও উল্টোদিকে দৌড় দিল।

বস্তার ভেতর থেকে আতর মিয়াকে অর্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হলো। আতর মিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হিমু ভাই। আপনি মানুষ না অন্য কিছু! এখন থেকে আমি আপনার কেনা গোলাম।

কুকুর দুটাকে ইলিশ মাছ উপহার দিয়ে আমি কেনা গোলাম নিয়ে হাঁটা দিলাম। মধ্যযুগে মুনিবরা কেনা গোলাম নিয়ে হাঁটত। যুগের অভ্যাস বদলায় না। এই যুগেও আমি কেনা গোলাম নিয়ে হাঁটছি।

তৃষ্ণার কাছে ফিরে এসেছি। সে ভোল পাল্টেছে। শাড়ির বদলে জিন্সের প্যান্ট, গাঢ় হলুদ রঙের ফুলহাতো জামা। গলায় হলুদ পাথরের মালা। আগেরবার চোখের পাতা নীল ছিল। এখন হলুদ। এর মধ্যে চোখে রঙ করাও শেষ।

মেয়েরা ভয়ঙ্কর দুর্ঘাগেও সাজ ঠিক রাখতে ভোলে না।

আতর মিয়া আমার সঙে নেই। সে নাকি পাঁচ মিনিট পরে আসবে। রুক্ষমকে টাইট দিতে পাঁচ মিনিট লাগবে। পুরো টাইট দিবে না। ক্ষুর দুই পঁ্যাচের টাইট। ঘ্যাচ ঘ্যাচং।

আমাকে দেখে তৃষ্ণা কেবিন থেকে বের হয়ে এসে কোমল গলায় বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

জীবনানন্দ দাশ আমাদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন। ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’—বাক্যটি নানানভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিবারই শুনতে ভালো লাগে।

আমি বললাম, ভয় লাগছে?

তৃষ্ণা বলল, ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম। আপনাকে দেখে ভয় কমেছে। সত্যি কমেছে। আপনি আমার যেতে পারবেন না। এখানে থাকতে হবে।

পাশের কেবিনের মেয়ের কান্না খেমেছে?

হ্যাঁ, তবে মাঝে মাঝে ফেঁপানোর শব্দ হচ্ছে। এবং যথারীতি মোরগ ডাকছে।

আমি বললাম, মহা বিপদের সময় পশ্চাপাথি ডাকাডাকি করে শুনেছি, মোরগ মনে হয় সেই কারণেই ডাকছে।

কেবিনের ভেতর মোরগ আসবে কেন?

তাও কথা।

বাঁ-পাশের কেবিনের দরজা খুলে এক অদ্রলোক বের হলেন। তাঁর গায়ে আলজেরিয়া ফুটবল দলের জার্সির মতো স্লিপিং স্যুট। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাঢ়ি। অদ্রলোক ভয়ে চিমশা মেরে গেছেন। তাঁর ফ্রেঞ্চকাট দাঢ়িগোঁফ ঝুলে গেছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী হচ্ছে বলতে পারেন?

আমি বললাম, ঝড় হচ্ছে।

ঝড় হচ্ছে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমাদের করণীয় কী?

মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা ছাড়া তেমন কিছু করণীয় নেই। গণ তওবার আয়োজন হচ্ছে। তওবায় সামিল হতে পারেন। তওবা পড়ানোর জন্যে যোগ্য মাওলানার সন্ধানে কিছুক্ষণের মধ্যে বের হব। ইচ্ছা করলে আপনিও আমার সঙ্গে আসতে পারেন। In search of Godo-র মতো In search of মাওলানা।

You are talking nonsense!

অতি সত্য কথা বলেছেন।

লঞ্চ কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য কী করেছে? লঞ্চের মালিকপক্ষের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

মালিকপক্ষের এখন আর কেউ নাই। আমরা সবাই মালিক আমাদের এই লঞ্চের রাজত্বে। মালিকের খৌজখবর না করে একটা কাজ করতে পারেন। কড়া ঘুমের ওমুধ খেয়ে একটা দোয়া পড়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। যা ঘটবে ঘুমের মধ্যে ঘটবে। দোয়াটা হচ্ছে—‘আল্লাহর বি ইছমিকা আমতু ওয়া আহইয়া’। এর অর্থ ‘হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমি মৃত্যুর কোলে অর্থাৎ নির্দায় যাইতেছি এবং জীবিত হইব।’ তবে এই দফায় জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

ফাজলামি করছেন? আমি কে আপনি জানেন? আমি উষ্টুর জিল্লুর খান। হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট অব বাণিয়োকেমিস্ট্রি। স্টেট ইউনিভার্সিটি অব লালমাটিয়া।

ঢাকা শহরে এখন স্টেট ইউনিভার্সিটির ছড়াছড়ি। ধানমণির কোনো কোনো গলিতে তিনটা-চারটা করে ইউনিভার্সিটি। মাঝারি সাইজের বাড়ি ভাড়া করে ইউনিভার্সিটি বানানো হয়। বাড়ির গ্যারাজ হয় ভাইস চ্যাসেলর সাহেবের অফিস। সেই অফিসে এসি থাকে। বেশির ভাগ সময় এসি থেকে গরম বাতাস বের হয়। ফ্যান চললে ভাইস চ্যাসেলর সাহেবের আরাম হতো, কিন্তু এসি-তে যে ইজ্জত ফ্যানে তা নেই।

আমি বললাম, স্যার ভালো আছেন? ভেতরে এসে বসুন। লঞ্চ দুলছে, যে-কোনো সময় আপনি পড়ে যাবেন। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা দেখেও ভয় লাগছে। রেলিং ধরে দাঁড়ান।

তুমি কি লঞ্চের কেউ?

জি স্যার। আমি যাত্রীদের চা, পান-সিগারেট এইগুলা কেবিনে কেবিনে দেই। আমাকে কেবিন বয় বলতে পারেন। রাতের খানা কি খাবেন? এনে দিব? মেন্যু হলো—

ডাল-খাসি
ইলিশ মাছ
ইলিশ মাছের ডিম
সবজি
মসুর ডাল।

ডষ্টর জিল্লুর খান বস্তিওয়ালা ভাইদের ভাষায় চলে গেলেন। খ্যাক খ্যাক করে বললেন, হারামজাদা কেবিন বয়। তুই ফাইজলামি শুরু করেছিস কী জন্যে? যা মালিকপক্ষের কাউকে ডেকে আন।

স্যার! এইটা আমার ডিউটিতে পড়ে না। তারপরেও যেতাম। লক্ষ্মি মালিক পক্ষের একজন আছেন। তিনি অসামাজিক কর্মে ব্যস্ত আছেন। তাঁকে ডাকার সাহস আমার নাই, কারণ তাঁর সঙ্গে একটা লাইসেন্স করা পিস্তল আছে। সারেঙ আছেন। উনার ব্রেইন কাজ করছে না। উনি শুধু বলছেন, যার গৈ, চাঁনপুর যার গৈ। 'যার গৈ' কথাটার অর্থ হচ্ছে—চলে যায়। চাঁনপুর যার গৈ অর্থাৎ চাঁদপুর চলে যায়। লক্ষ্মি যখন দুবে যাবে তখন তিনি বলবেন, লক্ষ্মি যার গৈ। 'শ্রাবণ যার গৈ' মানে হচ্ছে শ্রাবণের দিন চলে যায়।

ডষ্টর জিল্লুর খান বললেন, হারামজাদা। থাপড়ায়ে আমি তোর দাঁত ফেলে দেব।

তৃষ্ণা এতক্ষণ চূপ করে ছিল। মনে হয় আমার কথাবার্তায় মজা পাচ্ছিল। সে বলল, আপনি অকারণে গালাগালি করছেন কেন?

ডষ্টর জিল্লুর খান বললেন, গালাগালি করা অবশ্যই ঠিক হচ্ছে না। এই কুত্রার বাচ্চাকে আমি লাখি দিয়ে পানিতে ফেলব। সেটাই হবে সঠিক কাজ।

প্রফেসর সাহেব বাক্য শেষ করার আগেই আতর মিয়া কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দরজা কোনটা ভাঙব?

আমি বললাম, পাশেরটা।

আতরের প্রচণ্ড লাথিতে দরজা ভেঙে গেল। কেবিনে চামচিকার মতো এক প্রৌঢ়, তার পাশে সম্পূর্ণ নগ্ন এক তরুণী। তরুণী আচমকা দরজা খোলায় হকচকিয়ে গেছে। গা ঢাকার কাপড় ঝুঁজছে। এইসব ক্ষেত্রে যা হয়—কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না। মার্ফিস ল কাজ করছে। মার্ফি সাহেবের সূত্র

বলে, ‘যখন যেটা প্রয়োজন তখন তুমি তা পাবে না। যখন প্রয়োজন নেই, তখন সেই জিনিসই চোখের সামনে পড়ে থাকবে।’ কেবিনের ডেতের কোনো মোরগ বা মুরগি দেখা গেল না।

অধ্যাপক সাহেব নগু তরুণী দেখে যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। চোখের পাতা ফেলা সাময়িক বন্ধ রেখেছেন।

আমি আমার গায়ের চাদর বের করে প্রৌঢ়ের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, চাদরটা দিয়ে ঢেকে দিন।

আতর মিয়া বলল, ঐ শিয়ালের বাচ্চা বাইর হ। ফুর্তি অনেক হইছে। ফুর্তি শেষ। বাইর হ কইলাম। এক্ষণ বাইর না হইলে যেটি চিপ দিয়া বাইর করব।

গাল ভাঙা চামচিকা মানব বের হয়ে এল। আতর মিয়া ভাঙা দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, সিস্টার, শইল ভালোমতো ঢাকেন। কেয়ামত শুরু হইছে আর আপনে নেঁটা বসা। এইটা কোনো কথা!

প্রফেসর সাহেব আতর মিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি হঠাৎ এসে কী শুরু করেছেন! Who are you?

আতর বলল, কিম ধইরা খাড়ায় পাঁক। কথা বললে থাপ্পড় খাবি।

তুমি চেনো আমি কে?

চিনার প্রয়োজন নাই। কিম্বামতের দিন কেউ কাউরে চিনবে না। আইজ কিয়ামত। আপনি আমারে চিনেন না, আমিও আপনেরে চিনি না।

ফ্রেঞ্চকাট বললেন, কেয়ামত হোক বা না-হোক আমাদের অদ্বৃত্ত শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

আতর বলল, এই দেখ আমার অদ্বৃত্ত।

প্রচও থাপ্পড়ের শব্দ হলো। ডষ্টের জিল্লার খান হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের কেবিনে ঢুকে গেলেন। দৃশ্যটিতে নিচয়ই কিছু হাস্যরস ছিল, তৃক্ষণ হেসে ফেলল। মানুষ ভয়ঙ্কর সময়েও হাসতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনজন রাশিয়ান সৈনিক নাজিদের হাতে ধরা পড়ল। তাদের ফায়ারিং ক্ষোয়াড়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। যে কমাত্তার শুলি করার নির্দেশ দিবেন, তিনি হঠাৎ বরফে পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। রাশিয়ান সৈন্য দু'জন হো হো করে হাসতে লাগল। তাদের মৃত্যু হলো হাসতে হাসতে।

আতর মিয়া আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হিমু ভাই! আপনি এই চামচিকারে জিঞ্চাসাবাদ করেন। আমি একটা চক্র দিয়া আসি। আইজ রাইতটা যাবে চক্রের উপরে। দুইটা আতরের শিশি পকেটে নিয়া বাইর হইছি, সাথে যন্ত্রপাতি নাই। একটা যন্ত্রের সঙ্গান পাইছি। লখও মালিকের পোলার লাইসেন্স করা যন্ত্র। গ্রেটা উদ্ধার করা বিশেষ প্রয়োজন।

আতর মিয়া নিমিষে উধাও হয়ে গেল। আমি চামচিকা মানবকে বললাম, ভাই আছেন কেমন?

চামচিকা মানবের মোবাইল বেজে উঠেছে। রিং টোন হিসাবে আছে মোরগের ডাক। এতক্ষণে মোরগ রহস্যের সমাধান হলো। চামচিকা মানব মোবাইলে বিড়বিড় করে কিছু কথা বলে মোবাইল পকেটে রেখে দিল। তাকে মোটেই বিব্রত মনে হলো না। থলথলে ভুঁড়ির নাদুন্দুন্দুস প্রৌঢ়। গায়ের পাঞ্চাবিটা সিঙ্কের। সে যে পান চিবুচ্ছে তা আগে লক্ষ করি নি। মুখ থেকে জর্দার কড়া গন্ধ আসছে। সে আয়োজন করে রেলিং এর-বাইরে পানের পিক ফেলল।

আমি বললাম, আপনার নাম কী?

রশীদ খান।

আমি বললাম, রশীদ ভাই ভালো আছেন?

রশীদ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে থমথমে গলায় বলল, দরজা যে ভেঙেছে সে কে?

তার নাম আতর। বায়তুল মোকাররমে তার একটা আতরের দোকান আছে। দোকানের নাম ‘দি নিউ মদিনা আতর হাউস’।

রশীদ বলল, আমি যদি ঐ শয়োরের বাচ্চার জান কবজ না করি আমার নাম রশীদ খান না। আমার নাম শয়োর খান।

আমি বললাম, জান কবজ করে আজরাইল। আপনি কি আজরাইল?

আমি আজরাইল না। আমি গার্মেন্টের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তবে বাংলাদেশে আজরাইল ভাড়া পাওয়া যায়।

ভাড়াটে আজরাইল দিয়ে কাজ হবে না। ঢাকা শহরের ভাড়াটে আজরাইল কন্ট্রোল করে আতর মিয়া। আপনার সঙ্গে তো মোরগ টেলিফোন আছে। মোরগ ফোনে আপনার ভাড়াটে যে-কোনো আজরাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাদের জিঞ্জেস করুন আতর মিয়াকে চেনে কি না।

আমি কী করব না করব সেটা আমার ব্যাপার। আপনি বলার কে?

আপনার ভালোর জন্য বলছিরে ভাই। আতর মিয়ার বিষয়ে ঠিক ধারণা থাকলে আপনারই সুবিধা। ভুল চাল দিয়ে বিপদে পড়বেন। আতর মিয়ার চড় খেয়ে একজন হামাগুড়ি পর্যায়ে চলে গেল। সে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে। এই যাত্রায় উঠে দাঁড়াতে পারবে এরকম মনে হচ্ছে না।

তৃষ্ণা খিলখিল করে হাসছে। এমন আনন্দময় হাসি শুধু কিশোরীরাই হাসতে পারে।

রশীদ খানের পকেটে মোবাইল ফোন বাজছে। মোরগ কঁকর কঁক করেই যাচ্ছে।

আমি বললাম, ভাই মোরগটা ঠাণ্ডা করুন। দেরি করলে মোরগ ডিম পেড়ে দিতে পারে। আপনার পরিচিত আজরাইলদের একজন টেলিফোন করেছে।

আপনাকে বলেছে কে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি জানি।

আমার হাসিতে ভদ্রলোক বিভ্রান্ত হলেন। তৃষ্ণাও খানিকটা বিভ্রান্ত হলো। মানুষকে বিভ্রান্ত করা মজার সম্পাদন। প্রকৃতি এই বিষয়টা সবসময় করে। মানুষকে রাখে বিভ্রান্তির ভেতর।

রশীদ টেলিফোন ধরেছেন। নিচুগলায় কথা বলছেন। নিচুগলার কথা আমি শনতে পাচ্ছি। তৃষ্ণাও পাচ্ছে, সে চকচকে চোখে বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে রশীদ বললেন, আতর মিয়া বলে কাউকে চেনো? একটা চোখ বড়। একটা ছোট। থুতনিতে কাটা দাগ।

জবাবে ওপাশ থেকে কী বলা হলো তা আমরা শুনলাম না, তবে রশীদ খানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, বলো কী! না না, আমি কোনো ঝামেলায় যাব না। ঝামেলায় যাওয়ার আমার প্রয়োজন কী? আচ্ছা রাখি।

রশীদ খান হতাশ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আবহাওয়া যথেষ্ট শীতল। বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়ার ঝাপটা, তারপরেও রশীদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আমি বললাম, আপনার কেবিনে যে মেয়েটা আছে সে কে?

আমার স্ত্রী।

তাহলে যান, কেবিনে ফিরে যান। ভাবীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করুন। সময় বেশি নাই, লঞ্চ ভুবে যাবে। একসঙ্গে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার একটা ব্যাপারও আছে।

রশীদ নড়লেন না। যেখানে ছিলেন সেখানে বসে রইলেন। তার পকেটের মোরগ আবার ডেকে উঠল, কঁকর কঁক।

আমি বললাম, আপনার আসল স্তৰী টেলিফোন করেছেন। টেলিফোন ধরুন। মহা বিপদের বিষয়টা তাকে জানান।

ত্রুটা বিশ্বিত গলায় বলল, আপনি কে টেলিফোন করেছেন তা ধরতে পারেন?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, মাঝে মাঝে পারি। সবসময় না।

যে টেলিফোন করছে তার নামও কি বলতে পারেন?

বেশিরভাগ সময় পারি না, তবে এখন বলতে পারব। যে মহিলা টেলিফোন করেছেন তাঁর নাম ময়না।

রশীদ খান ভয়াবহ চমক খেলেন। একবার বড় ধরনের চমক খেলে পরপর আরও দুবার খেতে হয়। এই জন্যেই প্রবচন দানে দানে তিনদান। রশীদ খান দ্বিতীয় চমক খেলেন। আতর আবার ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে এক তরুণী। তরুণী ভয়ে আতঙ্কে থ্রুথৰ করে কাঁপছে।

আতর আমার দিকে তাকিয়ে ইষ্ট গলায় বলল, সবচেয়ে কম ঝামেলার যত্ন জোগাড় করেছি। লঞ্চেক মালিকের পুলা ডাইল খায়া বমি কইরা বমির উপর পইড়া ছিল। আমি বললাম, পিস্তল কই রাখছেন, বাইর করেন। দেরি করবেন না। দেরি করলে পেটে পাড়া দিয়া বাকি বমি বাইর করব। বলেই পেটে পাড়া দিলাম। সাথে সাথে জিনিস চলে আসল আমার হাতে। যত্ন ভালো, মেড ইন ইতালি।

আমি বললাম, সঙ্গের মেয়েটা কে?

আতর হাই তুলতে তুলতে বলল, এর নাম সীমা। প্রফেসর সাহেবের ছাত্রী। স্যারের সঙ্গে ভ্রমণের জন্য এসেছিলেন। সুযোগ বুঝে লঞ্চের মালিকের ছেলের কেবিনে উনাকে চুকায়ে দিল। যে ভ্রমণের জন্যে উনি এসেছিলেন, সেই ভ্রমণই উনার হয়েছে। স্যারের বদলে লঞ্চ মালিকের ছেলে কাদেরের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন।

সীমা ফুঁপিয়ে উঠল। আতর বলল, সিস্টার! আপনার সারা শরীর বমিতে মাখামাখি। আগে টয়লেটে যান। সাবান দিয়ে ভালোমতো সিনান করে স্যারের কাছে যান। বিদ্যা শিক্ষা নেন।

তৃষ্ণা বিস্মিত দৃষ্টিতে সীমার দিকে তাকিয়ে আছে। তৃষ্ণা বলল, আপনার কাছে একস্ট্র্যাজেস না থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। আপনার গা থেকে বমির বিকট গন্ধ আসছে।

আমি বললাম, মেয়েটাকে কাপড় দিয়ে চল আমরা লঞ্চটা ঘুরে দেখি। এখানকার পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হোক।

তৃষ্ণা বলল, আপনি না বললেও আপনি যেখানে যাবেন আমি আপনার পেছনে পেছনে যাব। আজ রাতের জন্য আমি হব মেরীর little lamb.

লঞ্চ দূলছে। ভীতিকর দূলুনি না, আরামদায়ক দূলুনি। বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে। আমি তৃষ্ণাকে নিয়ে পরিদর্শনে বের হয়েছি। তৃষ্ণার হাতে খেলনার মতো দেখতে ভিডিও ক্যামেরা। এই মেয়েটির ভয়ডর এখন যে চলে গেছে তা বোৰা যাচ্ছে। মহা বিপর্যয়ের ছবি তুলতে পারার আনন্দেই এখন সে আনন্দিত।

তৃষ্ণা হঠাতে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, হিমু! আমরা মহা বিপদে আছি, কিন্তু আমার ভালো লাগছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি স্পিলবার্গের কোনো ছবিতে অভিনয় করছি। ছবির শেষ দ্রুত্যে লঞ্চ ডুবে যাবে, আমরা দু'জন একটা কাঠের তক্তা ধরে ভেসে থাকব।

আমি বললাম, অভিনেত্রী ঘন দিয়ে শুনুন। হাঁটার সময় রেলিং ধরে হাঁটুন। আপনার ক্যামেরা কিন্তু ভিজে যাচ্ছে।

ওটা ওয়াটারপ্রুফ ক্যামেরা, ভিজলেও কিছু হবে না। স্কুবা ডাইভিং-এ এই ক্যামেরা ব্যবহার হয়।

তাহলে তো কথাই নেই, লঞ্চ যখন ডুবে যাবে আপনিও ডুববেন এবং তখনো ছবি তুলবেন।

লঞ্চ ডুববে না। আমার মন বলছে ডুববে না। আমি আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বই লিখব। রিডার্স ডাইজেস্ট-এ একটা আর্টিকেলও লিখব। আপনি রিডার্স ডাইজেস্ট পড়েন?

না।

আমার একটা লেখা রিডার্স ডাইজেস্টে ছাপা হয়েছিল। Life নামে ওদের একটা সেকশন আছে। সেখানে মজার মজার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঘটনা ছাপা হয়। আমারটাও ছাপা হয়েছিল। একশ ডলার পেয়েছিলাম। শুধু আমার নাম ভুল ছেপেছে। লিখেছে Tritna, Bangladesh. রিডার্স

ডাইজেস্টটা আমার স্যুটকেসে আছে। আমি আপনাকে পড়তে দেব।
পড়বেন তো?

পড়ব।

আপনার প্রবল ESP ক্ষমতা। তাই না?

জানি না।

আমারও ESP ক্ষমতা আছে। যারা আমার ঘনিষ্ঠ, তারা আমার এই
ক্ষমতার বিষয়ে জানে।

জানারই কথা।

আপনি আমার একটা কথাও বিশ্বাস করছেন না। আপনার উপর
আমার রাগ লাগছে। এখানে একটু দাঁড়ান। আপনাকে জরুরি কিছু কথা
বলব।

এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে আপনি ভিজে যাবেন। বৃষ্টির ছাঁট আসছে।
আসুক। আমার কথা শুনলে আপনি কিন্তু ভয়ঙ্কর চমকাবেন।

অনেকদিন চমকাই না। আপনার কথা শুনে চমকালে ভালো হবে। বড়
ধরনের চমক লিভারের জন্য উপকারী।

ত্রুট্টা মুখ কঠিন করে বলল, আমি^{আমার} ESP ক্ষমতা বলছে আপনার সঙ্গে
আমার বিয়ে হবে। এই লক্ষ্মেই বিয়ে হবে। আমি পুরো বিষয়টা স্পষ্ট
চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি

কী দেখছেন?

আমি দেখছি লঞ্চ কাত হয়ে আছে। একজন বৃদ্ধ আমাদের বিয়ে
পড়াচ্ছেন। তার চোখে সুরমা। বৃদ্ধকে দেখামাত্র আমি চিনব। আপনার
ঠোঁটের কোণে হাসি। এর অর্থ আপনি এখনো আমার কথা বিশ্বাস করছেন
না।

অবশ্যই বিশ্বাস করছি। আমি মানুষকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসি।

ত্রুট্টা বলল, আমি আপনাকে চিনি না। আপনার বিষয়ে কিছুই জানি
না। তারপরেও আপনাকে বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কেন
জানেন?

না।

কারণ এই বিয়ে পূর্বনির্ধারিত। সবকিছুই যে পূর্বনির্ধারিত আধুনিক
বিজ্ঞান এখন এই সত্য হজম করা শুরু করেছে।

আমি জানতাম না। আমি শুনেছি Free will-এর কথা।

এই বিষয়ে আমরা বাসর রাতে তর্ক করব। বাসর হবে আমার
কেবিনে। আমার কাছে বেলি ফুলের দুটা মালা আছে। আরও লাগবে। কী
অস্ত্রত কো ইনসিডেন্স! স্যুটকেসে ফুল আঁকা একটা চাদর আছে। এখন
চলুন আমরা বুড়োটাকে খুঁজে বের করি।

চলো।

আমরা বুড়োর সন্ধানে প্রথম গেলাম লঞ্চের সারেঙের ঘরে।

এর আগে সারেঙেকে দেখেছি বিছানায় শোয়া। এখন দেখলাম বসা
অবস্থায়। সারেঙের চোখ রক্তবর্ণ। সারেঙ তৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে
পরিচিতজনের গলায় বলল, সকিনা! গম আছ নি? চাঁনপুর যার গৈ।

তৃষ্ণা বলল, এই বুড়া না।

আমরা দ্বিতীয় বুড়োর সন্ধানে বের হলাম। এই বুড়ো আমার পরিচিত।
তার কাছ থেকে চাদর নিয়েছিলাম। বুড়ো ঠিক আগের জায়গায় বসে
আছে। তার দৃষ্টি নিজের হাতের লাঠির দিকে। জাহাজ দূলছে, জাহাজের
সঙ্গে বৃন্দও দূলছে। মনে হচ্ছে বিশাল রকিং চেয়ারে সে বসা।

বৃন্দ আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, বাজান! আমার চাদর
কই?

আমি বললাম, চাদর জায়গামত্তেই আছে।

শীত লাগতেছে চাদরের প্রয়োজন ছিল।

আমি বললাম, ঝড় ঠিকমতো উঠুক, চাদর এনে রেলিং-এর সঙ্গে
আপনাকে বেঁধে দিব। যাতে উড়ে গিয়ে পানিতে না পড়েন।

তৃষ্ণা বলল, আপনি কি ইনাকে চেনেন?

আমি বললাম, চিনি। ঝাড়টা ঠিকমতো উঠলে জাহাজের যাত্রী সবাই
সবাইকে চিনবে।

তৃষ্ণা বলল, আপনাকে অতি জরুরি কথাটাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি।
আপনি কি ম্যারেড?

না।

দেখুন আমার অবস্থা। বিয়ের সব ঠিকঠাক করে ফেলেছি, অথচ
আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি, আপনি ম্যারেড কি না।

আমি বললাম, দুর্যোগের সঙ্গে স্বপ্নের মিল আছে। স্বপ্নে লজিক কাজ
করে না। ভয়াবহ দুর্যোগেও লজিক কাজ করে না। দুর্যোগের দৃশ্যগুলোও
হয় স্বপ্নের মতো ছাড়াছাড়া।

আপনার বিয়েতে আপত্তি নেই তো?

না।

আমার বয়স কিন্তু বেশি। আটাশ রানিৎ। বাঙালি ছেলেরা শুনেছি অশ্লবয়েসী মেয়ে বিয়ে করতে চায়। বাঙালি ছেলেদের অস্ত্র মানসিকতা। তারা খুবই কমবয়েসী মেয়ে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তাদের হতে হবে উচ্চশিক্ষিত। তাদের রূপ হতে হবে রাজকন্যাদের মতো। তাদের বাবার প্রচুর টাকাপয়সা থাকতে হবে। অথচ ছেলে কিন্তু ভ্যাগাবত। আপনি কি ভ্যাগাবত?

হ্যাঁ।

কী যত্নণা! আমি যে জিনিস পছন্দ করি না সবই আমার কপালে এসে ঝুঁটে।

বিয়েটা কি তাহলে বাতিল?

না। বাতিল কী জন্যে হবে? আপনার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বাতিল হলে আপনি খুশি হন। পাত্রী হিসেবে আপনি কি আমাকে অপছন্দ করছেন?

না। আমি তব মালধৈরের হব মালাকরু

কথাটার মানে কী?

আপনার জন্যে ফুলের মালা গঁথাব কাজটা আমি আগ্রহ নিয়ে করব।

কার কবিতা?

রবীন্দ্রনাথের।

শুনুন, কখনোই আমার সঙ্গে কবিতা কপচাবেন না। কবিতা হচ্ছে অলসের বিলাস। আমি অলস মানুষ পছন্দ করি না।

আচ্ছা।

তৃষ্ণা বলল, এই মুহূর্ত থেকে আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন। আমিও তুমি করে বলব। এতে আপনার কোনো সমস্যা আছে?

না।

হিমু! তোমার মধ্যে আমি গা ছাড়া ভাব দেখছি কেন? ঠিক করে বলো—স্ত্রী হিসেবে তুমি কি আমাকে পছন্দ করছ না? দয়া করে ঝেড়ে কাশ। আমার একটা গুণ শুনলে তুমি চমকে উঠবে। বলব?

বলো।

বেকারি আমি ভালো পারি। কোর্স নিয়েছি।

বেকারি কী?

কেক পেস্ট্রি এইসব বানানো। আমি যে স্টেটে থাকি সেখানে কুকি
বানানোর একটা কম্পিউটশন হয়। কুকি হলো বিস্কিট। আমি সেই
কম্পিউটশনে অনারেবল মেনশন পেয়েছি।

চমৎকার। ধরা যাক কয়েকটা ইঁদুর এবার।

এর মানে কী?

কবিতার লাইন।

বাঙালিদের রোমান্টিসিজম কয়েক লাইন কবিতা আবৃত্তিতে সীমাবদ্ধ।
আমার জন্যে খুবই বিরক্তিকর। আগে একবার বলেছি, এখন আরেকবার
বলছি, দয়া করে আমার সামনে কবিতা আবৃত্তি করবে না।
করব না।

শেষ পর্যন্ত বৃক্ষ খুঁজে পাওয়া গেল। তৃষ্ণা চেঁচিয়ে বলল, এই তো উনি!
আমি ইনাকেই স্বপ্নে স্পষ্ট দেখেছি।

তৃষ্ণা দেখাচ্ছে খুনের আসামি পীর কুতুবিকে। আমি বললাম, উনার
হাতে হাতকড়া পরানো। স্বপ্নেও কি তাই দেখেছে?

স্বপ্নে হাতকড়া দেখি নি। হাতকড়া কেন?

উনি তিনটা খুন করেছেন। তাকে বরিশাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফাঁসি
দেওয়ার জন্যে।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো। আমি উনার একটা মিনি ইন্টারভু নিতে
চাইলে উনি কি রাজি হবেন?

অবশ্যই রাজি হবেন। ইন্টারভু দেওয়ার জন্যে উনি মুখিয়ে আছেন।

আমাদের বিয়ের কাজি হবেন কি না তা আগে জেনে নেই?

জেনে নাও।

তৃষ্ণা পীর সাহেবের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, আচ্ছা শুনুন।
আপনি কি একটা বিয়ে পড়াতে পারবেন? আমরা দু'জন বিয়ে করব, কাজি
পাছিব না।

পীর সাহেব বললেন, বিয়ে পড়াতে পারব। কিন্তু এখন পারব না।
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিয়ে পড়ানো যায় না। এই মাসালা অনেকেই জানে না।
ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, বাঢ়-তুফান—এসবের মধ্যে বিয়ে হবে না।

কেন?

এগুলা হচ্ছে রোজ কেয়ামতের ছোট ছোট নমুনা। রোজ কেয়ামতে যেমন বিয়ে হবে না, এখনো হবে না। ঝড়ভুফান কমুক, বিয়ে পড়ায়ে দিব। দেনমোহর ঠিকঠাক করুন। আপনার হাতে ক্যামেরা না?

জি।

এই রকম একটা ক্যামেরা আমার স্তৰীর ছিল। শৌখিনদার মেয়ে ছিল। খামাখা ছবি তুলত। জিন কফিল যখন তারে খুন করে তখনো তার হাতে ক্যামেরা। আমার স্তৰী ছবি তোলার মধ্যে ছিল। জিন কফিল তার ঘরে চুকেছে এইটাও সে ক্যামেরায় ধরেছে। আজিব মেয়েছেলে।

তৃষ্ণা কিছু বুঝতে না পেরে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, জিন কফিলের বিষয়টা তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলব।

পীর সাহেব বললেন, এই দুনিয়ায় কিসিম দুইটা। জিন এবং ইনসান। বুঝায়া বলার কিছু নাই।

আমি বললাম, আপনার স্তৰী ক্যামেরায় কি জিনের ছবি উঠেছে?

উহ, আমার ছবি উঠেছে। জিন আমার জুপ ধরে তার ঘরে চুকেছে। জিনের এই ক্ষমতা আছে। আপনারা দু'জন এখন যান, এশার নামাজের সময় পার হয়ে গেছে। এখন নামাজ আদায় করব। সামান্য দেরি হয়েছে। ওসি সাহেবের কানে ফায়ারিং হোস্টেটা দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। ফায়ারিং এখনো হয় নাই। মনু বলতেছে নামাজে দাঁড়াব আর ফায়ারিংটা হবে। জিন কফিলের বদমাইসি। একটা মজার জিনিস দেখতে চাই, সে আমারে দেখতে দিবে না।

তৃষ্ণা বলল, ফায়ারিং কী? ইনার কথাবার্তা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

তৃষ্ণার কথা শেষ হওয়ার আগেই বাতাসের প্রবল ধাক্কায় লঞ্চ ডানদিকে কাত হয়ে গেল। পীর কুতুবি বিকট ধ্বনি দিলেন—আগ্নাহ আকবর!

ঝপাং শব্দ হলো, পীর কুতুবি ওসি সাহেবকে নিয়ে পানিতে ঝাপিয়ে পড়ল। পুলিশদের মধ্যে যে ব্যাপক চাপ্পল্য আশা করেছিলাম, তা দেখা গেল না। একজন শুধু পানিতে ছয় ব্যাটারি টর্চের আলো ফেলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আলোও নিভে গেল। টর্চ বৃষ্টির পানিতে ভিজেছে। কিছুক্ষণ আলো দিয়ে সে নিভে যাবে এইটাই নিয়তি।

ঘটনার আকস্মিকতায় তৃষ্ণা হতভয়। সে বিড়বিড় করে বলল, এরা তো ডুবে যাবে।

আমি ছেটি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, পীর কুতুবি দুববেন না। তিনি ডাঙ্গাবেড়ি পরা অবস্থায় মোহনা পার হবেন। ওসি সাহেবে ডুবে যাবেন। আমার ধারণা এর মধ্যে দুবেও গেছেন।

তৃষ্ণা বিড়বিড় করে বলল, কী সর্বনাশ!

আমি বললাম, সর্বনাশ তো বটেই। তোমার কাজিও কিন্তু ভেসে চলে যাচ্ছে। কাজি যার গৈ। কাজি যার গৈ।

‘যার গৈ’ ‘যার গৈ’ করছ কেন?

‘যার গৈ’ হচ্ছে ভেসে চলে যাচ্ছে।

তাতে তোমার এত আনন্দ কেন? মুসলমানদের বিয়েতে কাজিও লাগে না। আমি বইতে পড়েছি কবুল কবুল বললেই হবে।

তৃষ্ণার কথা শেষ হওয়ার আগেই গুলির শব্দ হলো।

পুলিশ চারজন লাফ দিয়ে উঠল। তাদের মুখ ফ্যাকাসে। ‘গুলি’ কী বস্তু পুলিশ সবচেয়ে ভালো জানে। গুলির শব্দে আতঙ্কে তারাই সবার আগে অস্ত্রির হয়।

তৃষ্ণা বলল, গুলি কোথায় হয়েছে?

পুলিশের একজন বলল, আমার বন্দুক থেকে মিস ফায়ার হয়ে গেছে ম্যাডাম।

তৃষ্ণা বলল, আপনা-আপনি গুলি হয়ে গেছে মানে কী? মানুষ মারা যেতে পারত।

যার বন্দুক থেকে গুলি হয়েছে সে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আল্লাহপাকের হৃকুম ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না আপা। চিন্তার কিছু নাই।

আমরা তাকিয়ে আছি কুতুবির দিকে। কুতুবি কিছুক্ষণের মধ্যেই লঞ্চের আড়ালে চলে গেলেন।

পুলিশদের একজন হাঁপ ছাড়ার মতো করে বলল, সবই আল্লাহপাকের ইচ্ছা।

লঞ্চের নিয়ন্ত্রণ এখন আতর মিয়ার হাতে। তার ক্ষমতার উৎস ভীত এবং ক্ষুধার্ত যাত্রী। বিপদে মানুষের ক্ষুধা বৃক্ষি পায়, চিন্তাশক্তি কমতে থাকে। লঞ্চ ডানদিকে কাত হয়েছে, যে-কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটবে। সেদিকে

নজর না দিয়ে যাত্রীরা খেতে বসে গেছে। আজ রাতের খাওয়া ফি। আতর মিয়ার সে রকমই নির্দেশ। খাওয়া নিয়ে ভালো হৈচে হচ্ছে। নতুন করে ডিম ভাজা হচ্ছে। অনেকেই ডিম ভাজা থাবে। কাঁচামরিচে ঝাল নেই কেন—এই নিয়েও তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। বেঞ্চে সবার জায়গা হয় নি। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতে প্লেট নিয়ে থাচ্ছে। মুরগির গিলা-কলিজার একটা লুকানো হাঁড়ির সঙ্কান পাওয়া গেছে। এই নিয়ে উল্লাস হচ্ছে। যাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, তারাও এক হাতা করে গিলা-কলিজা নিচ্ছে।

এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ফাসির আসামিরাও শেষ খাবার আগ্রহ নিয়ে থায়। কোন আইটেম কীভাবে রাঁধতে হবে তাও বলে দেয়। “সরিষার তেল দিয়ে ইলিশ মাছ অল্প আঁচে কড়া করে ভাজতে হবে। মাছ থেকে যে তেল উঠবে সেই তেল বা সরিষার তেল আলাদা করে বাটিতে দিতে হবে। ইলিশ মাছের সঙ্গে রসুনের কোয়া থাকতে হবে।”

ক্ষমতাচ্যুত রূপ্তম ঠোঁট কামড়াচ্ছে। তার দৃষ্টি আতর মিয়ার দিকে। আতর মিয়া তার লম্বা পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে আবার পকেটে রেখে দিয়েছে। রূপ্তম বুঝতে পারছে না পিস্তলটা আসল নাকি খেলনা। আজকাল খেলনা পিস্তলগুলো অবিকল আসলের মতো বানাচ্ছে। হাতে না নেওয়া পর্যন্ত আসল নকল বোঝার উপায় নেই। রূপ্তমের কাছে মনে হচ্ছে নকল। নকল না হলে পকেটে ক্রুক্রিয়ে রাখত না। সারক্ষণ হাতে রাখত।

নতুন কোনো চাল দিয়ে আতর মিয়ার হাত থেকে ক্ষমতা কীভাবে নেওয়া যায় তা-ই রূপ্তমের একমাত্র চিন্তা। মাথায় তেমন কোনো বুদ্ধি আসছে না।

লঞ্চের রেস্টুরেন্টের সামনে কিছু জায়গা খালি করা হয়েছে। এটাই এখন মঞ্চ বা জনতার আদালত। মঞ্চে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আতর মিয়া।

আতর বলল, ভাই ব্রাদার সবাই মন দিয়ে শুনেন। আমরা মহা বিপদে আছি। মাইনাস টু ফর্মুলা ঘটে গেছে। পীর সাহেব এবং ওসি সাহেব পানিতে পড়ে গেছেন। আপনারাও প্রস্তুত হয়ে যান। লঞ্চ অচল। শুরু হয়েছে ঝড়। এই ঝড় এখনো পাতলা। পাতলা ভাব থাকবে না। ঘন হবে। একতলায় বড় বড় সেগুন কাঠের টুকরা আছে। সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করবেন। দু'জন দু'জন করে একটা টুকরা বেছে নিবেন। হামলা হামলি বৰ্ক। এক টুকরা পানিতে ফেললাম, পঞ্চাশজন তাতে ঝাঁপায়ে পড়বেন—তা হবে না। ক্লিয়ার?

কেউ কোনো শব্দ করল না ।
রুস্তম বলল, আমার একটা কথা আছে ।
আতর বলল, কী কথা ?
আপনি একা নির্দেশ দিবেন, সেই নির্দেশে সবাই কাজ করবে তা তো
হবে না । একটা কমিটি হবে । নির্দেশ যাবে কমিটির মাধ্যমে ।

কমিটিটা করবে কে ?

জনগণ করবে । কমিটিতে আওয়ামী লীগ থেকে একজন থাকবে,
বিএনপির একজন থাকবে । সুশীল সমাজ থেকে একজন থাকবে । নকল
পিণ্ডল নিয়ে ফালাফালি করলে নেতা হওয়া যায় না ।

আতর বলল, চুপ ! আরেকটা শব্দ করলে গুল্পি । এই দেখ পিণ্ডল ।
হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখ আসল । আমি নকলের কারবার করি না ।

গুলি করবেন ?

অবশ্যই করব । আমার চোখের দিকে তাকা । তাহলেই বুঝবি আমি যা
বলি তা-ই করি । যা বলি না তাও করি ।

রুস্তম সমর্থন আদায়ের জন্যে এদিকশুরুদিক তাকাল । সবাই খাওয়া
নিয়ে ব্যস্ত । সমর্থন পাওয়া গেল না । রুস্তম বলল, আপনি আপনার মতো
কাজ করেন । আমি লক্ষের ডেকে আছি । তেমন কোনো প্রয়োজন হলে
ডাকবেন ।

আতর বলল, কানে ধর । কানে ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যা । আর
আসবি না ।

কানে ধরব ?

অবশ্যই কানে ধরবি ।

যাত্রীদের একজন বলল, কানে ধরতে বলছে কানে ধরে চলে যান ।
ঝামেলা করেন কী জন্য ? আছি বিপদে এর মধ্যে শুরু করেছেন ঝামেলা ।

যাত্রীদের একটা বড় অংশ বলল, কানে ধর । কানে ধর ।

রুস্তম কানে ধরতেই হো হো হাসির শব্দ উঠল । বিপদের সময়
ছোটখাটো মজাও অনেক মজাদার মনে হয় । কানে ধরে লিডারশ্রেণীর
একজন মানুষ যাচ্ছে । দেখতেই ভালো লাগছে । একজন হাততালি দিল ।
তার দেখাদেখি অন্যরাও হাততালি দিতে লাগল ।

আতর মিয়া হুক্কার দিল, হাততালি দেওয়ার মতো কিছু হয় নাই ।
বলেন, আঘাত আকবার । গলার রগ ফাটায়ে চিংকার দিবেন ।

বিকট চিৎকার শোনা গেল, আল্লাহু আকবার!

আতর বলল, এই লঞ্জে কিছু দুষ্ট লোক আছে। এইসব দুষ্ট লোকের কারণে আল্লাহপাক আমাদের উপর নারাজ হয়েছেন। দুষ্টরা সবাই এক এক করে আসবে। জীবনে বড় পাপ কী করেছে নিজের মুখে বলবে। তারপর তওবা করবে। রাজি?

বিকট আওয়াজ উঠল, রাজি।

সবার আগে আমরা প্রফেসর সাহেবকে দিয়ে শুরু করব। প্রফেসর সাহেব চার নম্বর কেবিনে আছেন। তাকে ধরে নিয়ে আসেন। কেবিনের সব যাত্রী এখানে ঢলে আসবে। আজ সব এক। কেবিনের যাত্রী ডেকের যাত্রী বলে কিছু নাই। পূর্ণ সমাজতন্ত্র। বলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

সবাই বলল, আলহামদুলিল্লাহ।

আতর বলল, মহা বিপদে লিভার লাগে একজন। দুই-তিনজন লিভার মানে দুই-তিন রকম চিন্তাভাবনা। মহা বিপদে আমাদের একটাই চিন্তা—‘বাঁচতে হবে’। চিৎকার দিয়ে বলেন, বাঁচতে হবে।

লঞ্জ কাঁপিয়ে চিৎকার, বাঁচতে হবে। চিৎকারের কারণেই হয়তো লঞ্জ ডানদিক থেকে বাঁ দিকে কাত হলো।

অধ্যাপক ডেন্টার জিল্লার খনি পিএইচডি (গ্লাসগো) হতাশ চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। তাঁর ফ্রেঞ্চকাট আগেই খানিকটা ঝুলে ছিল, এখন আরও ঝুলে পড়ল। দুজন তাঁকে দুপাশ থেকে ধরে ফাঁকা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল।

জিল্লার খান বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আপনারা আমার কাছে কী চান।

আতর মিয়া বলল, বড় বড় পাপ কী করেছেন সেটা বলবেন। তারপর তওবা করবেন।

Why?

সমাজের এইটাই সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত না মানলে লাখি দিয়ে পানিতে ফেলে দেওয়া হবে। এইটাও সমাজের সিদ্ধান্ত।

সমাজটা কী?

আমরাই সমাজ। দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি বলেন।

আমি অপরাধ করার মানুষ না। টুকটাক মিথ্যা হয়তো বলেছি, এর
বেশি কিছু না।

এর বেশি কিছু না?

অবশ্যই না।

তাহলে স্যার কিছু মনে করবেন না। আপনাকে এখন আমি লাখি দিয়ে
পানিতে ফেলব। কেউ যেন মনে না করে সমাজ একজন নির্দোষ মানুষকে
শাস্তি দিচ্ছে। এই জ্ঞানী প্রফেসর অসামাজিক কার্যের জন্য তার এক ছাত্রী
নিয়ে এসেছে। ছাত্রী নিজের মুখে কী ঘটনা ঘটেছে বলবে, তারপর সমাজ
সিদ্ধান্ত নিবে। ছাত্রীর নাম সীমা। সীমা সিস্টার উপস্থিত আছেন। সিস্টার
আসেন কিছু বলেন।

সীমা আতরের কাছে এগিয়ে গেল।

আতর বলল, আপনার ভয়ের কিছু নাই। আপনি আপনার স্যারের
ফান্দে পড়েছেন। ভুল করেছেন। এখন বলেন আপনি কি ভুল করেছেন?

সীমা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমরা যদি প্রফেসর সাহেবকে পানিতে ফেলে দেই আপনার আপত্তি
আছে?

সীমা চুপ করে রইল।

আতর বলল, সিস্টার, আমরা আপনার স্যারকে দুদিক থেকে ধরে
রাখব। আপনি ধাক্কা দিয়ে আপনার স্যারকে পানিতে ফেলবেন। পারবেন
না?

সীমা ভীত চোখে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না।

আতর বলল, চোখ বন্ধ করে পীর বদরের নামে এক ধাক্কা।

যাত্রীরা মহা উৎসাহে বলা শুরু করল, ধাক্কা ধাক্কা ধাক্কা।

ডেন্টার জিল্লার বললেন, এটা কোনো মগের মুল্লুক না। এখানে বিচার-
আচার আছে। ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দেওয়া কোনো বিচার না।

আতর বলল, সাঁতার জানেন না স্যার?

না।

পানিতে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। আপনি পানিতে নেমে
সাঁতার শিখবেন। মাইনাস টু ফর্মুলা আপনাআপনি হয়েছে। আপনাকে দিয়ে
হবে মাইনাস থ্রি ফর্মুলা।

যাত্রীরা মহা উৎসাহে চিংকার শুরু করল, মাইনাস থ্রি। মাইনাস থ্রি।

ডষ্টর জিলুর বললেন, এখানে বিচক্ষণ কেউ আছেন যিনি মাস হিস্টরিয়া বন্ধ করতে পারেন? প্লিজ হেলপ। প্লিজ।

তৎপূর্ণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যাও। আতর মিয়া তোমার কথা শুনবে। আমি বললাম, এখনো সময় হয় নি।

তৎপূর্ণ বলল, সময় কখন হবে? পানিতে ফেলে দেওয়ার পর?

হতে পারে।

মানুষ ধরে ধরে পানিতে ফেলবে আর তুমি নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?

আমি বললাম, মানুষের একটাই ভূমিকা। দর্শকের ভূমিকা। প্রকৃতি মানুষকে তৈরি করেছে শুধুই দেখার জন্যে। আশেপাশে নানা ঘটনা ঘটবে, সে দেখবে।

তৎপূর্ণ বলল, মানুষ ঘটনায় অংশগ্রহণ করবে না?

না করাই বাঞ্ছনীয়।

কোকর কোঁ করে মোরগ ডেকে উঠলুম। আমরা চমকে তাকালাম। রশীদ খানকে ধরে আনা হয়েছে। তার পক্ষে মোরগ ডেকেই যাচ্ছে।

রশীদ বুদ্ধিমান মানুষ। কী ঘটনা আচ করতে পারছে। ধনবান মানুষরা নিজের ধন রক্ষা করার প্রবণতাতেই সর্ব সমস্যায় আপোষে চলে যায়। রশীদ ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমাকে কী জন্যে ডেকেছেন বলুন।

আতর বলল, আপনি সারা জীবনে যা যা পাপ করেছেন এইসব আমরা শুনব।

রশীদ খান বললেন, আপনারা ভালো কথা শুনবেন। খারাপ কথা কেন শুনবেন? বরং আপনি দুটা ভালো কথা বলেন আমরা শুনি।

আতর খানিকটা হকচকিয়ে গেল। রশীদ খান বললেন, লঞ্চ ডুবে যাচ্ছে এরকম একটা গুজব উঠেছে। এই গুজবের কারণে সবার মাথা এলোমেলো। লঞ্চ সত্যি সত্যি ডুবে গেলে আমরা কীভাবে সবাই বাঁচব এখন সেই চেষ্টা করা উচিত। কে কী পাপ করেছে এইসব নিয়ে আলোচনা না। পাপ তো সবাই করে। কেউ ছোট পাপ, কেউ বড় পাপ। পাপের বিচারের মালিক তো আপনি না। বিচার হবে রোজহাশরে। ঠিক বলেছি?

ড. জিলুর উঁচু গলায় বললেন, অবশ্যই ঠিক বলেছেন। Right words at the right time.

রশীদ খানের পকেটে আবারও কোঁকর কোঁ শুরু হয়েছে। তিনি পকেট থেকে মোবাইল বের করে পানিতে ছুড়ে ফেলে বললেন, যা ব্যাটা পানিতে ডুবে কোঁকর কোঁ করতে থাক।

তার এই নাটক ভালো কাজ করল। দর্শকদের অনেকেই হেসে উঠল। বোৰা যাচ্ছে রশীদ খান তাঁর দিকের পাল্লা ভারী করছেন। মাস সাইকোলজি বলে, মহা বিপদে জনতার সিদ্ধান্ত অতি ক্ষুদ্র ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে বদলায়। বড় বড় ঘটনায় তেমন কিছু হয় না। মোবাইল পানিতে ফেলে দেওয়া ক্ষুদ্র ঘটনা কিন্তু তার প্রভাব বড়।

রশীদ খান বললেন, আমাদের মহা বিপদ। এর মধ্যে এক ভাইকে দেখি বন্দুক নিয়ে ভয়ঙ্গিতি দেখাচ্ছেন। একে পানিতে ফেলবেন তাকে পানিতে ফেলবেন বলে হামকি-ধামকি। আরে ভাই, বন্দুক কি আপনার একার আছে? অন্যের নাই? আমি চারটা গার্মেন্টসের মালিক। আমি কোনো প্রটেকশন ছাড়া লঞ্চে উঠব? হামজা কই?

হামজা এগিয়ে এল। বাংলা সিনেমার ফাইটারদের মতো তার চেহারা। মাথা চকচক করে কামানো। গলায় ব্রেসল বাঁধা। পরনে জিসের শার্ট-প্যান্ট। রশীদ খান বললেন, আমি বডিগার্ড। এর পকেটে একটা লুগার পিস্তল আছে। পিস্তলটা আমার লাইসেন্স করা। হামজা, পিস্তলটা বের করে পাবলিককে দেখা।

হামজা ওস্তাদের আদেশ মান্য করল। ফ্যাসফ্যাস গলায় বলল, কারো উপর ফায়ারিং করতে যদি হয় ইশারা দিবেন।

রশীদ খান বললেন, এখন খুন-খারাবির সময় না। এখন জানে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। আমি সবার সহযোগিতা চাই। আপনারা আছেন আমার সঙ্গে?

বিকট ধ্বনি উঠল, আছি! আছি!

শিশু এবং মহিলাদের বাঁচানোর চেষ্টা আগে করতে হবে। টিনের কিছু কাটা ড্রাম আমি লঞ্চে উঠার সময় দেখেছি। শিশুদের এইসব ড্রামে তুলে দেওয়া হবে। তাদের বাবা-মা ড্রাম ধরে ভাসবেন।

রুম্ভম আবার উদয় হয়েছে। তার চোখেমুখে আনন্দের ঝলকানি। আহত নেতার প্রত্যাবর্তন।

রশীদ খান বললেন, লঞ্চে আমি বেশকিছু অতি বৃদ্ধ যাত্রী দেখেছি। তাদের বিষয়ে কী করা যায় সেটা নিয়ে আমি চিন্তা করছি। আপাতত তারা এক জায়গায় গোল হয়ে বসে দোয়া ইউনুস পড়তে থাকুন। এই দোয়ার কারণে ইউনুস নবী মাছের পেট থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। আমরাও ইনশাআল্লাহ লঞ্চের পেট থেকে নাজাত পাব।

আতর মিয়া পিছিয়ে পড়েছে। পিছিয়ে পড়া ছাড়া গতি নাই। তার আবারও উদয় হওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়, যদি না বড় ধরনের কোনো অঘটন ঘটে।

ঝড়-বৃষ্টি দুটাই সাময়িক কমেছে। সাময়িক বলছি কারণ আকাশে মেঘের স্তূপ বাড়ে। বিদ্যুৎ চমকাতেই মেঘের স্তূপের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

আমি এবং তৃষ্ণা এখন কেবিনে। কেবিনের দরজা খোলা। বাতাসে ঝপাং করে একেকবার দরজা আচ্ছে পড়ে আবার বক্ষ হচ্ছে।

তৃষ্ণা বলল, একের পর এক নাটক হচ্ছে। আমার কী যে অন্তুত লাগছে! আমি নিজে এক ঝড়ের কারণে ক্ষী পরিমাণ বদলেছি ভেবে অবাক হচ্ছি। কী রকম বদলেছি শুনতে চাও?

চাই।

আমি ক্লাস নাইনে যখন স্পৰ্শি তখনই ঠিক করেছি জীবনে কখনো বিয়ে করব না। এখন কী আশ্চর্য বর সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি।

বর বলছ কেন? বিয়ে তো এখনো হয়নি!

হয় নি, হবে। যে কাজি ভেসে চলে গেছে সে আবারও ভেসে ফিরে আসবে। আমার সির্কুল সেঙ্গ তাই বলছে। আমার সির্কুল সেঙ্গের ব্যাপারটা তুমি তো বিশ্বাসই করো না। পীর কুতুবি ফিরে এলে বিশ্বাস হবে তো?

আমি বললাম, কেউ যদি প্রবলভাবে বিশ্বাস করে আমার এই ক্ষমতা আছে তাহলে প্রকৃতি তাকে সেই ক্ষমতা দিয়ে দেয়। কেউ যদি মনে করে আমার মিরাকল ঘটানোর ক্ষমতা আছে, তাহলে প্রকৃতি এই ক্ষমতা তাকে দিয়ে দেয়।

মিরাকল কিন্তু ঘটে। আমার জীবনে কয়েকবার ঘটেছে। শুনতে চাও?

চাই।

চা খেতে খেতে শুনবে? আমার ফ্লাক্সে চা আছে।

চা খাওয়া যেতে পারে ।

তৃষ্ণা চা বানাতে বলল, দুটা মিরাকল আমার জীবনে ঘটেছে ।
আজকেরটা হবে তৃতীয় ।

আজকের কোন মিরাকল?

তৃষ্ণা জবাব দেওয়ার আগেই লঞ্চের সামনের দিক থেকে হৈচৈ,
চেঁচামেচি শুরু হলো । আমরা দু'জনই ছুটে বের হলাম । তৃষ্ণার হাতে
ভিডিও ক্যামেরা । তেমন কোনো দৃশ্য হলে ভিডিও করে ফেলবে ।

ভিডিও করার মতোই দৃশ্য । কাঠের তক্তা ধরে দুজন ভাসছে । একজন
পীর কুতুবি, অন্যজন ওসি সাহেব । বাতাসের ধাক্কায় তারা লঞ্চের দিকে
ফিরে আসছে ।

তৃষ্ণা বলল, ‘ওরা দুজন যে কাঠের টুকরা ধরে ভেসে ভেসে আসছে
এটাকে কি তুমি মিরাকল বলবে না?’

আমার জবাব দেওয়ার আগেই পীর কুতুবির ক্লান্ত গলা শোনা গেল,
জিন কফিলের বদমাইশি । আমি সাঁতরায়া পাড়ে উঠতে পারতাম । বদ জিন
আমারে এক কাঠের টুকরা ধরায়া দিলাকায়া দেখি কাঠের টুকরার
অন্যদিকে ওসি সাহেব ।

তেমন কোনো ঝামেলা ছাড়াই দুজনকে লঞ্চে তোলা হলো । ওসি
সাহেব ‘পানি খাব’ বলেই অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন । পীর কুতুবি
স্বাভাবিক গলায় বললেন, একটা গামছা দিয়ে কেউ আমার মাথাটা মুছায়ে
দেন । আর এক কাপ হট টি দেন । দেশি বেনসন সিগারেট থাকলে ধরায়ে
আমার ঠোঁটে দেন ।

পীর কুতুবির প্রতিটি নির্দেশ পালিত হলো ।

সবাই এই দুজনকে ঘিরে আছে । লঞ্চ ডুবে যাওয়ার চিন্তা এখন মাথায়
নেই । মানুষ টেনশন বেশিক্ষণ নিতে পারে না । পীর কুতুবি এবং ওসি
সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সবার টেনশন দূর করেছেন ।

পীর কুতুবি বললেন, ওসি সাহেবের সার্টের পকেটে হাতকড়ার চাবি
আছে । চাবি দিয়ে হাতকড়া খুলেন । কতক্ষণ আর বান্ধা থাকব? হাত তুলে
মোনাজাত করতে হবে । হাত বান্ধা অবস্থায় মোনাজাত কবুল হয় না ।

কুতুবির হাতকড়া খুলে দেওয়া হলো । তিনি বললেন, হাজেরান ভাই ও
বোনেরা! এখন জিকির হ্রে । জিকির ছাড়া আমাদের উদ্ধার নাই । সবাই

বামদিকে বুকে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলবেন, আল্লাহ। হাত নামিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলবেন, হ্রঁ। বড় পীর সাহেব আন্দুল কাদের জিলানী সাহেব এইভাবে জিকির করতেন।

জিকির শুরু হয়ে গেছে। আমি তৃষ্ণাকে নিয়ে চলে আসব তখন দেখি ডিরেক্টর শাকুর ভাই চোখের ইশারায় আমাকে ডাকছেন। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। শাকুর ভাই বললেন, আপনার সঙ্গের মেয়েটা কে?

ওর নাম তৃষ্ণা।

চেহারা ছবি, ফিগার তো মারাত্মক।

কথা সত্য।

তাকে জিজ্ঞেস করে দেখেন তো ভিডিও নাটকে অভিনয় করবে কি না। রাজি হলে পার্কলির ক্যারেন্টার পেয়ে যাবে। নাটক চ্যানেল আইতে ইনশাল্লাহ প্রচার হবে। চ্যানেল আইয়ের একজন ক্যামেরা ক্রু আমার আপন মামাতো ভাই। তার মাধ্যমেই যোগাযোগ হবে।

আমি জিজ্ঞেস করে দেখব।

আপনার কি মনে হয় রাজি হয়ে যাবে?

আমি বললাম, মহা বিপদে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। রাজি হয়ে যেতে পারে।

ভাই, একটু চেষ্টা চালান।

তৃষ্ণার কোলে ল্যাপটপ। ভিডিও ক্যামেরায় যেসব ছবি তোলা হয়েছে তা চুকানো হচ্ছে ল্যাপটপে। সেখানেই এডিটিং হবে। হল্যান্ডের এক ভিডিও ফিল্ম ফেস্টিভলে পাঠানো হবে। ফেস্টিভলের নাম R Byte. সেখানে শুধু সত্য ঘটনা নিয়ে বানানো ছবির প্রদর্শনী হয়। তৃষ্ণার ধারণা প্রথম পুরক্ষার সে পেয়ে যাবে। পুরক্ষারের অর্থমূল্য দশ হাজার ইউরো।

আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে মহাবিপদ নিয়ে কিছু ইন্টারভু নিয়ে আসা। ফাঁকে ফাঁকে এইসব ইন্টারভু যাবে। ভিডিও ক্যামেরা কীভাবে চালাতে হয়, টেলিলেন্স কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সব শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ইন্টারভু নেওয়া শুরু করেছি। প্রথমেই সারেঙের অ্যাসিস্টেন্ট হাবলু।

হাবলু

হাবলু, ক্যামেরার লেপের দিকে তাকিয়ে কথা বলো ।

জি আছা ।

তোমার কি ধারণা লঞ্চ ভুবে যাবে?

ভুবতে পারে, সবই আল্লাহপাকের ইচ্ছা । উনার ইচ্ছা হলে ভুববে ।
উনার ইচ্ছায় ভাইসা থাকবে । আবার উনি ইচ্ছা করলে লঞ্চ আসমানে
উড়াল দিবে ।

আসমানে উড়াল দিবে?

অবশ্যই । স্যার, উড়ালপঞ্জি গান শুনছেন? ‘ও আমার উড়ালপঞ্জিরে’ ।
ফিল্মের গান?

না ।

শুনবেন? পুরাটা জানি ।

এই সময় উড়ালপঞ্জি শোনাবে?

আপনে বললে শুনাব । ভিডিওতে একটা শ্যুতি থাকল ।

পুরো গান শোনাতে হবে না । চার লাইন শোনালৈই হবে ।

হাবলু গানের চার লাইন গাইল । যুক্ত হয়ে শুনবার মতোই গান ।

সারেং খালেক

বিশ্ময়ের কথা সারেংগের জুর নেমে গেছে । এখন তিনি বিছানায়
আধাশোয়া । তার হাতে সিগারেট । শরীর যে এখন সুস্থ তার বড় প্রমাণ
হাতের সিগারেট । অসুস্থ শরীর নিকোটিন নিতে পারে না ।

কেমন আছেন?

আমি তো ভালোই আছি । লঞ্চ যায় যায় ।

এখন আমরা আছি কোথায় বলতে পারেন?

কিছুই বলতে পারি না ।

কম্পাস নাই?

লঞ্চ যাচ্ছে দক্ষিণে । এটা বলার জন্য কম্পাস লাগে না । ঘূরপাক খেতে
খেতে সাগরে গিয়ে পড়বে ।

ভুববে না?

স্টিল বড় ভুববে কেন?

টাইটানিকেরও স্টিল বডি ছিল। টাইটানিক দুবে গেছে।

টাইটানিক কী লঞ্চ আমি জানি না, তয় এই লঞ্চ দুববে না। লঞ্চের একতলা মালামাল ভর্তি। বাতাসের ধাক্কায় লঞ্চ কাত হয়ে পড়বে না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘূমান। ঘূম থেকে উঠে দেখবেন সব ঠিকঠাক। আমি আঠার বছরের সারেং। পানির হিসাব, ঝড়ের হিসাব, লঞ্চের হিসাব আমার জানা।

আঠার বছরের সারেং-জীবনে কখনো লঞ্চডুবি হয় নি?

দুইবার হয়েছে। প্রথম দুবল ছোট একতলা লঞ্চ। নাম এম এম এল মেঘনা।

মানুষ মারা গিয়েছিল?

মানুষ মারা যাবে না? যাত্রী যা উঠেছিল তার অধেক সাফ। একজন ব্রিফকেস ভর্তি টাকা নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল। তার কাছ থেকে ব্রিফকেস নেওয়ার জন্য সাত আটজন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। জীবন বাঁচানোর দিকে নজর নাই ব্রিফকেস নিয়ে হাতাহাতি! সব তলায়া গেল, ব্রিফকেইস ভাইসা রাইল। সেই ব্রিফকেইস পাইল আমারই অ্যাসিস্টেন্ট কামরুজ্জামান। টাকা কত ছিল বলে নাই। লঞ্চের চাকরি ছেড়ে বড়সিমেন্টের দোকান দিয়েছে। গাবতলীতে তিনতলা বাঢ়ি করেছে। বিস্ফোরণে দুটা।

দ্বিতীয় দফার এক্সিডেন্টের বিষয়ে বলুন।

এইটা ছিল বড় এক্সিডেন্ট। দোতলা লঞ্চ। নাম ‘এম ভি নাইলতাবাড়ি’। ‘এম ভি’ কী বুঝেন?

না।

এম ভি হলো মোটর ভেহিকেল আর এম এল মোটর লঞ্চ। এক্সিডেন্ট হয়েছে ঘন কুয়াশার কারণে। সাহেবরা এই কুয়াশারে বলে ‘ফগ’। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। এর মধ্যে লঞ্চ চলছে। লঞ্চের মালিক সঙ্গে আছেন। বরিশালে তাঁর নাকি জরুরি কাজ, পৌছাতেই হবে। তাঁর কারণেই এক ঘণ্টা আগে লঞ্চ ছেড়েছি। আমার বেকায়দা অবস্থা। ঘনঘন ‘বদর’ বাবার নাম নিতেছি।

বদর বাবাটা কে?

খোয়াজ খিজির। উনার কারবার পানিতে। লঞ্চে এক নতুন জামাই বউ নিয়ে যাচ্ছে। ডেকে তারা আমোদ-ফুর্তির বাজার বসায়েছে। আমি তাদের এক নজর দেখেও এসেছি। বর যেমন সুন্দর তার স্ত্রীও সুন্দর। সচরাচর এরকম দেখা যায় না। বউ সুন্দর হলে জামাই হয় বান্দরের খালাত ভাই।

এক্সিডেন্টের কথা শুনেন। অঙ্ককারের মধ্যে আজদহা এক ট্যাংকার সামনে
থেকে দিল ধাক্কা। লঞ্চ দুই ভাগ হয়ে গেল। ডুবে গেল দশ থেকে পনের
মিনিটের মধ্যে। সর্বমোট তিনশ ছারিশজন মারা গেছে। ছয়-সাত বৎসর আগের
কথা। সব পত্রিকায় উঠেছে। পত্রিকা পড়ার অভ্যাস থাকলে নিশ্চয় পড়েছেন।

জামাই বউ কি বেঁচে ছিল?

বউ বেঁচে ছিল। সাঁতার দিয়ে এক চরে উঠেছে। জামাই সাঁতার জানে
না। প্রাণে বাঁচার জন্য বউকে জাপটায়ে ধরেছিল। বউ অতি চালাক মেয়ে,
লাখি দিয়ে জামাইকে আগে সরায়েছে। শাড়ি গায়ে সাঁতার দেওয়া যায় না।
শাড়ি খুলে সাঁতার শুরু করেছে।

আপনি এত কথা জানলেন কীভাবে?

ঐ মেয়ে আর আমি একই চরে উঠেছিলাম। মেয়ের নাম সালমা।
তাকে পরে বিবাহ করি।

ইনিই কি সকিনার মা?

জি না। সকিনার মা আমার প্রথম স্ত্রী। আমার তিন স্ত্রী। তিনজনের
মধ্যেই আন্তরিক মিল মহৱত। প্রথমজন সংসার দেখে, দ্বিতীয়জন রান্না
দেখে। আর সালমা থাকে তার নিজের ঘরতো।

আপনি তো ভাগ্যবান মানুষ। আপনার দুই লঞ্চ পানির নিচে চলে গেল,
আপনি ঢিকে রইলেন।

আমাকে ভাগ্যবান অবশ্যই বলা যায়। যে দুইবার লঞ্চডুবি হয়েছে সেই
দুইবারই মক্ষায় হজ করে এসেছি। আমি ডাবল হাজি।

শুনুন হাজি সাহেব! সবকিছু তিনবার করে ঘটে। এই জন্যেই কথা
দানে দানে তিন দান। এই লঞ্চ ডুববে, আপনার তিন দান পূর্ণ হবে। হজ
করতে যাবেন আপনি, হবেন ট্রিপল হাজি।

ডবল হাজি আমার কথা শুরুত্বের সঙ্গে নিলেন বলেই মনে হলো। তিনি
হঠাতে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

লঞ্চমালিকের কনিষ্ঠপুত্র

কাদের সাহেব

কাদের সাহেবের নেশার ঘোর সামান্য কেটেছে। তিনি বিছানায় আধাশোয়া
হয়ে বসা। চোখ সত্ত্বিকার অর্থেই জবাফুলের ঘতো লাল। ঘরে বয়ি এবং
এলকোহলের মিশ্রণে তৈরি বিষাক্ত গন্ধ।

ভিডিও ক্যামেরা হাতে আমাকে দেখে বললেন, হ্র ইউ?
বোঝা গেল তাঁর ইংরেজি জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং তিনি সীমাবদ্ধ ইংরেজি
জ্ঞানেই কথা বলতে ভালোবাসেন।

আমি বললাম, স্যার আমি পত্রিকার লোক। আপনার একটা মিনি
ইন্টারভু নেব।

তিনি হৃষ্কার দিয়ে বললেন, 'Go Hell.'

লঞ্চ দুবে যাচ্ছে এই খবর কি পেয়েছেন স্যার? সাঁতার নিশ্চয়ই
জানেন? লুঙ্গি খুলে একটা প্যান্ট বা পায়জামা পরে নিলে ভালো হয়।
পানিতে লুঙ্গি খুলে গেলে বেকায়দা অবস্থা হবে। আমার অনুরোধ ড্রেসটা
বদলান।

কাদের সাহেব ইংরেজি থেকে বাংলায় ফিরে এলেন। বিড়বিড় করে
বললেন, হালারপুতে কয় কী? কথা শেষ করেই আবার বমির প্রস্তুতি
নিলেন। বমি ভিডিও করার কিছু নেই। তারপরেও কিছুক্ষণ ভিডিও
করলাম। মৃত্যু আতঙ্কে লোকজন বমি করছে—এই ফুটেজ ত্রুট্টি কাজে
লাগাতে পারে।

কাদের সাহেব বললেন, এই হালারপুত ছবি তুলবি না। ছবি তুললে
ফ্রেস বমি খাওয়ায়ে দিব।

ফ্রেস বা বাসি বমির ক্লেনেটাই খাওয়া ঠিক হবে না ভেবে চলে
এলাম।

হিনতাইকারী

এখন দড়ি বাঁধা অবস্থায়। চোখে ভরসা হারানো দৃষ্টি।

আমি বললাম, আছেন কেমন?

আছি ভালোই কিন্তু আমার খাওন দেয় নাই। খাওয়া নাকি শেষ।

নতুন করে রান্না হবে।

ভাত রান্নাতে পারে। চাউল আছে। হৃদা ভাত খাব।

আপনি একাই খাওয়া পান নাই?

হঁয়া আমি বাদ পড়েছি।

আপনার সাথে চায়ের দোকানের মালিক বাঁধা ছিল, সে কোথায়?

জানি না কই। তারে ছেড়ে দিয়েছে, আমি একা আটকা আছি।

ছিনতাইয়ের কাজ কোথায় শিখেছেন?

নিজে নিজে শিখেছি। এর জন্য তো স্কুল-ইউনিভার্সিটি নাই।

ছিনতাই করে সবচেয়ে বেশি উপার্জন কবে করেছেন?

এইবারই করলাম। লাভ কী হয়েছে বলেন? সব নিয়ে গেছে।
আনসাররা ভাগ বাটোয়ারা করে নিবে। এখন সাংবাদিক ভাই আপনি বলেন
তারা ছিনতাইকারী না? টাকাটা তো তারা আমার কাছ থেকে ছিনতাই
করল। ঠিক বলেছি না মিথ্যা বলেছি?

ঠিক বলেছেন। পড়াশোনা কতদূর করেছেন?

এসএসসি পাস দিয়েছিলাম। অংকে কত পেয়েছিলাম শুনলে ফাল দিয়ে
পানিতে পড়ে যাবেন।

কত পেয়েছিলেন?

৭৮। আর দুই পেলে লেটার হয়ে যেত। আমার সামনে সিট পড়েছিল
সলিলের। ক্লাসের ফাস্ট বয়। তার খাতা দেখে দেখে লিখেছি। একটা অংক
মে আর দেখায় না। আমি বললাম, মালাউনের বাচ্চা, খাতা দেখা। না যদি
দেখাস ভুঁড়ি গলায়ে ফেলব।

খাতা দেখায়েছে?

না। খাতা জমা দিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

তার ভুঁড়ি গলানোর ব্যবস্থা করেছিলেন?

না, মাফ দিয়েছি। ৭৮ তো কম না। লেটারের কাছাকাছি। বিয়ারিং
লেটার বলা যায়। সলিলের কোনো খোঁজ জানেন?

ইভিয়া চলে গেছে। ওদের যাওয়ার জায়গা আছে। ঝামেলা হলেই
ইভিয়া। আমাদের কোনো উপায় নাই। আফসোস। সাংবাদিক ভাই,
দেখেন না আমার কোনো ফুডের ব্যবস্থা করা যায় কি না।

লঞ্চ তো কিছুক্ষণের মধ্যে ভুবেই যাবে। খাওয়া নিয়ে চিন্তা করে লাভ
কী? আপনি তো সাঁতারও জানেন না যে কিছুক্ষণ সাঁতারাবেন।

আমি সাঁতার জানি না আপনারে কে বলেছে?

অনুমানে বলছি।

আপনার অনুমান ঠিক আছে। একবার পুসকুনির পানিতে পড়ে মরতে
বসেছিলাম। কে জীবন বাঁচায়েছে অনুমান করুন তো!

সলিল।

আপনার অনুমান সঠিক হয়েছে। মালাউনের বাচ্চা না থাকলে সেই দিনেই সব শেষ হতো।

সেটা কিন্তু খারাপ হতো না। তখন আপনি মারা যেতেন কুলের ছাত্র হিসাবে। এখন কলক নিয়ে মারা যাবেন। ছিনতাইকারী হিসাবে মারা যাবেন।

সাংবাদিক ভাই আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। নো টক। আপনার সঙ্গে কথা বলার আর সার্থকতা নাই।

পীর কৃতুবি

নদী সাঁতরানোর কারণে উনার অবস্থা এখন কাহিল। জিকির শুরু করে দিয়ে উনি এখন হা করে ঘুমুচ্ছেন। তার মুখের সামনে স্বাস্থ্যবান দুটা মাছ ভনভন করছে। দুটা মাছির মধ্যে একটার মতলব ভালো না। সে মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে কৃতুবির মুখে চুকে যাবে। ওসি সাহেব কৃতুবির পাশেই শুয়ে আছেন। তিনি কি এখনো অচেতন নাকি চেতনা ফিরেছে তা বোো যাচ্ছে না। দুজনের গায়ের ওপর কম্বল এক কম্বলের নিচে দুজন দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগছে।

ড. জিন্দুর ধানের ছাত্রী সীমা

ক্যামেরা মুখের সামনে ধরলে সীমা পালিয়ে যাবে ভেবেছিলাম। সীমা চোখমুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি : সীমা কেমন আছ?

সীমা : (নিচুপ)

আমি : তুমি কি শুধু স্যারের সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে যাও, নাকি অন্যদের সঙ্গেও যাও?

সীমা : (চাপা অর্থহীন শব্দ করল)

আমি : বলা হয়ে থাকে প্রস্টিটিউশন বাংলাদেশে নেই বলে ট্যুরিজমে আমরা পিছিয়ে আছি। ট্যুরিজমকে এগিয়ে নিতে তুমি এবং তোমার মতো মেয়েরা কী করতে পার এটা বলো। দেশের জন্য সবার কাজ করতে হবে, তাই না?

সীমা দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে পড়ল। ইন্টারভুর এখানেই সমাপ্তি।

আনসার বাহিনী প্রধান

আব্দুল খালেক

(জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পোলভল্টে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)

আমি আব্দুল খালেক। জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। এখন আমার অবস্থা দেখেন ছাতার এক ভাঙা লঞ্চে ডিউটি পড়েছে। কারণ কী জানেন? আনসার এডজুটেন্টের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। উনি আমার সম্মানটা দেখলেন না, লঞ্চে ডিউটি দিয়ে এমন বিপদে ফেলেছেন। জীবন নিয়ে ফিরব তা মনে হয় না। নিজের হাতে ছিনতাইকারী ধরে এতগুলো টাকা উদ্ধার করেছি সেই ঘটনা কেউ জানবে না।

না জানাই তো ভালো। ছিনতাইয়ের টাকা আপনারা ফেরত দেন নাই। আপনাদের হাত থেকেও টাকা ছিনতাই হয়েছে। আপনাদের একটা রাইফেলও পানিতে পড়ে গেছে বলে শুনেছি।

এইসব উড়া খবর কার কাছ থেকে পেয়েছেন?

আমরা সাংবাদিক মানুষ, খবর সংগ্রহ করাই আমাদের কাজ। শুনেছি আপনার রাইফেলটাই নাকি মিসিং।

কে বলেছে?

আপনার রাইফেল কই?

সেই কৈফিয়ত আপনাকে দিবশকেন? রাইফেল সেফ কাস্টডিতে আছে। ক্যামেরা বন্ধ করেন প্লিজ। আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

শেষ একটা কথা শুধু বলুন। জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আপনি স্বর্ণপদক বিজয়ী। তরুণ খেলোয়াড়দের উদ্দেশে কিছু বলুন।

আব্দুল খালেক গল্পীর গলায় বললেন, খেলোয়াড়কে হতে হবে শারীরিকভাবে ফিট। তাকে সবসময় অনুশীলনের মধ্যে থাকতে হবে। হারজিং নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। জয় এবং পরাজয় দুটাই হস্তিমুখে গ্রহণ করতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে, জীবন হলো জয়-পরাজয়ের ফুল দিয়ে গাঁথা এক মালা।

আমি বললাম, মুখস্থ বলেছেন বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ। এক ফটো সাংবাদিক ভাই আমার জন্যে লিখে দিয়েছিলেন। মুখস্থ করে রেখেছি। টেলিভিশনেও একই কথা বলেছি। চ্যানেল আইয়ের খেলাধুলা অনুষ্ঠানে দু'বার দেখায়েছে। বিকাল চারটায় একবার পরদিন সক্ষ্যবেলায় আরেকবার।

স্বর্ণপদকটা কোথায়?

এটার কথা ভাই আর বলবেন না। বিরাট ঝামেলা হয়েছে। ক্যামেরাটা বক্স করেন তারপর বলি।

আমি ক্যামেরা বক্স করলাম।

আব্দুল খালেকের মুখ এখন উজ্জ্বল। চোখ চকচক করছে।

আমার ছোট শ্যালিকার নাম রেশমা। সে আমার বিশেষ ভক্ত। আমি তাকে ছোটবোনের মতো স্নেহ করি। এর বেশি কিছু না। আমার স্ত্রী আবার অত্যন্ত সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মহিলা। আমরা দুজন একসঙ্গে নরমাল গল্পগুজব করছি দেখলেও সে উত্তেজিত হয়ে যায়, বোনকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে।

স্বর্ণপদক নিয়ে বাসায় ফিরেছি, আমার স্ত্রী দাঁত তুলতে ডেনটিস্টের কাছে গিয়েছে। ঘরে আমি আর রেশমা। রেশমাকে স্বর্ণপদকটা দেখালাম। সে পদক হাতে নিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলল। ঘটনাটা দেখে এত আনন্দ পেলাম! রেশমাকে বললাম, এটা তুমি রেখে দাও। তোমাকে দিলাম।

এই ঘটনার ফলাফল কী বুঝতেই পারছেন। আমার স্ত্রী বাঁটি নিয়ে গেছে রেশমাকে মারতে। এতবড় পদক পেয়েছি কোথায় আয়োদ-ফুর্তি হবে তা না বাঁটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি।

পদক এখন কার দখলে?

রেশমার দখলে। তার এক কথা—দুলাভাই আমাকে আদর করে দিয়েছেন, এটা আমি মরে গেলেও দিব না। প্রয়োজনে হাতের কজি কেটে দিব। তার কথায় যুক্তি আছে? আপনি কি বলেন?

যুক্তি আছে। পদকটা তো আপনার। আপনি যাকে ইচ্ছা দিবেন। ‘আমার ভোট আমি দিব যাকে ইচ্ছা তাকে দিব’ অনেকটা এইরকম।

এই তো আপনি বুঝেছেন।

রেশমার সঙ্গে মোবাইলে কথা হয়েছে?

না। আমি বিপদে আছি শুনলেই কেঁদে বুক ভাসাবে। তাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?

ভবিকে জানিয়েছেন?

মুটকিকে কিছু বলা না-বলা একই। তাকে কথা বললে এক্সট্রা একশ’ টাকা খরচ হবে।

কেন?

সে মুরগি ছদকা দিবে। একশ’ টাকার কমে মুরগি মিলে? তার স্বভাব হলো একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে সকালে উঠে মুরগি ছদকা। মুরগিতে কাজ হয় বলেন?

ঝড় যেভাবে উঠছে আমার মনে হয় দুজনের সঙ্গে শেষ কথা বলে
নেওয়া ভালো।

রেশমাকে সব জানাব আগেই সিন্ধান্ত নিয়েছি। মুটকিকে জানানোর
কিছু নাই।

ভাবি কি বেশি মোটা?

গ্ল্যান্ডের কী জানি সমস্যা। প্রতিদিনই মোটা হচ্ছে। কোনো রিকশা
তাকে নিতে রাজি হয় না।

পান ব্যবসায়ী তালেব মুনশি

আপনার টাকাই ছিনতাই হয়েছে?

জি।

এই নিয়ে আপনাকে কখনোই চিন্তিত দেখলাম না।

চিন্তা করে লাভ কী বলেন? আমি ধরে নিয়েছি টাকাটা ব্যবসায়ে
লোকসান হয়েছে।

টাকা ফেরত পাবেন বলে আপনার মনে হচ্ছে না?

কুমির যখন মুরগি গিলে তখন কি মুরগি পাওয়া যায়।

কুমিরের পেট কাটলে প্রাণ্যো যায়। আমার ধারণা আপনি টাকাটা
ফেরত পাবেন। লঞ্চ ডুবে গৈলে টাকাটা কাজে লাগবে না এটাই যা
সমস্যা।

তালেব মুনশি বললেন, কারোর না কারোর কাজে লাগবে। পানি থেকে
ডেডবডি তুলবে। মানিব্যাগ টাকার সঙ্গানে শরীর হাতাহাতি করবে। শুনেন
সাংবাদিক ভাই? লঞ্চডুবি হয়ে বহু লোক মারা গেছে। তাঁদের ডেডবডি
উদ্ধার হয়েছে। কারও কাছে মানিব্যাগ পাওয়া যায় নাই।

ঝড় হঠাতে করেই প্রবল আকার ধারণ করল। একসঙ্গে চার-পাঁচজন
আয়ানে দাঁড়িয়েছে। মহা বিপদের সময় আয়ান দিলে নাকি বিপদ কাটে।

আমি আয়ানের কিছু দৃশ্য ভিড়ও করলাম। ফুটেজ হিসাবে ত্বক্ষার
কাজে লাগবে। শেষ ইন্টারভু নিতে গেলাম বুড়োমিয়ার।

বুড়ো লাঠি হাতে আগের জায়গাতেই বসে আছে। লঞ্চ দুলছে। লঞ্চের
সঙ্গে সঙ্গে সেও দুলছে।

বুড়োমিয়া

আমি বুড়ো মিয়ার সামনে বসতে বসতে বললাম, এই নিন আপনার চাদর।
এখন খুশি?

বুড়ো বলল, চাদর দিয়ে কী করব! লঞ্চ যাবে তলায়ে।

ভয় পাচ্ছেন?

ভয় পাব কোন দুঃখে? অনেকদিন বাঁচলাম। একজীবনে যা দেখার
সবই দেখছি। খালি উড়োজাহাজে উঠি নাই।

এই নিয়ে কি আফসোস আছে?

সামান্য আছে।

রাতে তো কিছু খান নাই। ক্ষুধা লাগে নাই?

বেজায় ভুখ লাগছে। ভুখ কঠিন জিনিস। আপনারে বলতে লজ্জা নাই,
আমার স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন শেষরাতে। দুপুরে এমন ভুখ লাগছে। কাউরে
কিছু বলতে পারি না। বাড়িভর্তি আজীয়স্বজন। কান্দাকাটি চলছে। শেষে না
পাইরা বাজারে এক ভাতের হোটেলে ভাজ খাইলাম। আমার মনে হয়
আমার জীবনের সবচেয়ে মজার খানা ছিল সেইটা।

আইটেম কী ছিল মনে আছে?

মনে অবশ্যই আছে। শিংয়াছ আলু দিয়া রানছে। ইলিশ মাছের ডিম
পটল দিয়ে। কাঁঠালের বিচি আর হিদল দিয়ে একটা ভর্তা বানায়েছে, এমন
স্বাদের ভর্তা বেহেশতে আছে কি না কে জানে।

বেহেশতের খাওয়া খাদ্য কেমন হবে বলে আপনার ধারণা?

বৃক্ষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মুনশি মাওলানার কাছে শুনেছি।
আমরার মতো গরিব মানুষের জন্য খুব ভালো মনে হয় না।

মুনশি মাওলানার কাছে কী শুনেছেন?

ধরেন আপনার সামনে দিয়ে সুন্দর একটা পাখি উইড়া যাইতেছে।
সেই পাখির মাংস খাইতে ইচ্ছা হইল, তখনই পাখিটা রোস্ট হইয়া মুখের
সামনে ঝুলতে থাকবে। আপনি মাংস খায়া হাজিড ফেলবেন সঙ্গে সঙ্গে সেই
হাজিড পাখি হইয়া উইড়া যাবে।

চলুন খেতে যাই।

কই খাব?

খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বৃন্দকে হাত ধরে তুলছি ঠিক তখনি আতর মিয়া উপস্থিত। তার ভাব-
ভঙ্গি বিজয়ীর।

আতর বলল, হিয়ু ভাই ঘটনা শুনছেন?

না।

রশিদ খানের অ্যাসিস্টেন্ট হামজা দশ হাত পানির নিচে।

তুমি ফেলেছ?

নিজে নিজেই পা পিছলায়া পড়ছে।

ক্ষমতা এখন তোমার হাতে?

অবশ্যই। সত্য কথা বলতে কী, ক্ষমতা সবসময় আমার হাতেই ছিল।
আর কেউ না বুঝুক আপনার বুঝার কথা।

আমি হাসলাম। ক্ষমতাধর মানুষের সামনে কারণে অকারণে হাসতে
হয়।

আতর বলল, এখন আপনারে শেষ বারের মতো জিগাই, লঞ্চ কি
ডুবব? সব খবর আপনি এডভাস পান। এই খবর পাবেন না তা হবে না।

আমি নিঃশ্঵াস ফেলে বললাম, এই খবর আমি এখনো পাই নাই। তবে
ভাব ভঙ্গিতে মনে হয় ডুবে যাবে।

কী ভাব ভঙ্গি?

যেসব লঞ্চ, জাহাজ বা বিমানে প্রচুর শিশু থাকে সেগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো
কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই লঞ্চে শিশু নাই বললেই হয়। আমি মাত্র
দুজন মাকে দেখেছি তাদের বাচ্চা জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মা তাদের
জড়িয়ে আছে বলে বাচ্চাগুলো মোটেই ভয় পাচ্ছে না।

আজিব দুনিয়া! ঠিক না হিয়ু ভাই? অবশ্যই আজিব দুনিয়া।

গণ তওবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তওবা পড়াচ্ছেন পীর কুতুবি। কুতুবি
বললেন, হিন্দু ভাইরাও সামিল হয়ে যান। মহাপ্রলয়ের দিনে হিন্দু-মুসলমান
কিছু নাই, সব সমান। মানুষ মানুষে সম্পর্কও শেষ। অমুক আমার স্ত্রী,
অমুক বোন এইসবও নাই। সবাই অজ্ঞ করে আসেন। যাদের কাপড়চোপড়
নিয়া সন্দেহ আছে, তারা মাথায় তিন বালতি পানি ঢেলে আসেন। নাপাকি
দূর হবে।

শরীফ খান বললেন, একজন ফঁসির আসামি, তিনটা খুন করেছে, সে আমাদের তওবা পড়াবে এটা কেমন কথা! আর কেউ কি নাই?

পীর কৃতুবি বললেন, আপনি পড়ান। আপনি তো আমার চেয়ে লোক ভালো। আপনার চেহারা ছবিও খারাপ না। আল্লাহপাকের কাছে চেহারা ছবির দাম আছে।

আমি নিয়মকানুন জানি না।

নিয়মকানুন আমি বলে দিব। সূরা ফাতেহা দিয়ে শুরু তারপর দরদশরিফ পাঠ।

আমি দরদ জানি না।

পীর কৃতুবি বললেন, আমি বলব আপনি শুনে শুনে বলবেন। পারবেন না? মধ্যনাটকে যেমন হয়। আমি প্রমোট করব আপনি মূল পাঠ গাইবেন।

না পারব না।

গণ তওবার আয়োজন চলছে। আমি চলে এসেছি তৃষ্ণার কেবিনে। কেবিনের দরজা-জানালা বক্ষ। টেবিলের ওপর মোমবাতি জুলছে। আমি বললাম, মোমবাতি কোথায় পেয়েছে?

তৃষ্ণা বলল, হাবলু নামের ছেঁকেটা দিয়ে গেছে। অদ্ভুত ছেলে। মহাবিপদের সময় তার মুখভৰ্তি হাসি। নকল হাসি না, আসল হাসি।

আমি বললাম, মহা বিপদের সময় অনেক মানুষই হাসে। তামাশা করে। মজার মজার গল্ল করে। ফরাসি বিপ্লবের সময় কী হয়েছিল শোন। একজন অংকবিদ ছিল, নাম মেইনি। রাজপ্রাসাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে—এই কারণে গিলোটিনে তাঁর মাথা কাটা যাবে। তিনি গিলোটিনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। উৎসুক জনতা তাকে ঘিরে আছে। তিনি জনতার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন তারপর হাসিমুখে বললেন, আমি আপনাদের একটা ধাঁধা জিঞ্জেস করব। ধাঁধার উত্তর যিনি দিতে পারবেন তার জন্যে পুরক্ষার আছে। ভালো পুরক্ষার।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, কী পুরক্ষার?

মেইনি বললেন, আমার কাটা মাথাটা বাঢ়িতে নিয়ে যাবেন। এই হলো পুরক্ষার। চারদিকে হাসির ধূম পড়ে গেল। একসময় জনতা চেঁচাতে লাগল, উনাকে ছেড়ে দিন। উনাকে ছেড়ে দিন।

তৃষ্ণা বলল, ছেড়ে দেওয়া হলো?

না। যথাসময়ে গিলোটিনে মাথা কেটে আলাদা করা হলো।

তৃষ্ণা বলল, মরবিড গল্প বাদ দাও। মজার গল্প করো। মহা দুর্যোগে
মজার মজার গল্প করতে হয়। মরবিড সময়ে আনন্দের গল্প, আর আনন্দের
সময়ে মরবিড গল্প। চা খাবে?

না।

না বললে হবে না। ফ্লাক্সে চা আছে। এখন আমরা দুজনে মিলে চা
খাব।

তৃষ্ণি যে একগাদা খাবার এনেছ তার কি হবে?

যথাসময়ে খাবার খাব।

যথাসময়টা কখন?

তৃষ্ণা সহজ গলায় বলল, লঞ্চ যখন দুবতে শুরু করবে তখন।

আমি বললাম, লঞ্চ দুববে?

তৃষ্ণা বলল, হ্যাঁ দুববে। আমার সিঙ্গুলার সেল তাই বলছে। আচ্ছা এই
প্রসঙ্গ থাক এখন বলো, তৃষ্ণি কি কখনো কোনো মেয়েকে বলেছ, I love
you?

না।

বলো নি কেন? বলার মতো কাউকে পোও নি?

পেয়েছি কিন্তু এই বাক্যটি বলার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমার বাবা
বলে গেছেন দুটি বাক্য কখনোই বলা যাবে না। একটা হলো, I love you.
আরেকটা হলো I hate you. তার মতো, দুটি বাক্যের অর্থ একই।

তোমার বাবা কী করতেন?

তিনি কিছুই করতেন না। তাঁর একটা স্কুল ছিল। তিনি স্কুলের একমাত্র
শিক্ষক ছিলেন। আমি সেই স্কুলের একমাত্র ছাত্র। আমার যা কিছু শিক্ষা
সবই বাবার কাছ থেকে।

তাঁর স্কুলের নাম কী?

মহাপুরূষ বানানোর স্কুল। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে মহাপুরূষ
বানাতে চেয়েছিলেন।

কী বলছ এসব? মহাপুরূষ বানানো যায়?

বাবার ধারণা, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের মতো মহাপুরূষও বানানো যায়।

তৃষ্ণা বলল, মহাপুরূষরা কী করেন?

মহাপুরূষদের কাজ তো একটাই। ঘাঁৰে ঘাঁৰে বাণী দেন। ভক্তদের
সুন্দর কথা বলেন।

তুমি দয়া করে একটা বাণী দাও ।

মহাপুরূষ হতে পারি নি কাজেই বাণী নেই ।

তৃষ্ণা হাসতে হাসতে বলল, পুরো বাণী না দিলে অর্ধেক দাও ।

আমি বললাম, একজন দুবস্ত মানুষের চেতনা থাকে ভাস্ত ।

এর মানে কী?

আমি বললাম, মহাপুরূষদের বাণীর কোনো স্পষ্ট অর্থ থাকে না । সবই অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে । যে যার মতো অর্থ করে নেয় । তুমি তোমার মতো অর্থ করে নাও ।

তৃষ্ণা বলল, আমি কি আমার সামনে বসে থাকা মহাপুরূষের হাতে হাত রাখতে পারি?

আমি কিছু বলার আগেই দরজা ধাক্কা দিয়ে আতর ঢুকল । বাতাসের ঝাপ্টায় মোমবাতি নিভে গেল । আতর শাস্ত গলায় বলল, খারাপ খবর আছে ।

আমি বললাম, লক্ষ ডুবে যাচ্ছে?

হঁ ।

আমি বললাম, তাহলে আমরা ডিম্বীজ সেরে ফেলি । তৃষ্ণা তুমি টিফিন কেরিয়ার আতরের কাছে দাও । ঝাবার গরম করে আনুক । এই ফাঁকে আমরা চা খাব ।

আতর বিস্মিত গলায় বললেন, এখন খানা খাবেন? খানা মুখে রুচবে?

অবশ্যই রুচবে । দুর্ঘেগের সময় ক্ষুধা বেশি পায় । মুখের টেস্টবাড খুব এনার্জেটিক থাকে ।

আতর টিফিন কেরিয়ার নিয়ে চলে গেল । তৃষ্ণা বলল, তুমি কি টাইটানিক ছবিটা দেখেছ?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম ।

তৃষ্ণা বলল, ঐ ছবিতে দেখেছি টাইটানিক যখন ডুবছে তখন মিউজিশিয়ানরা অঙ্গু সুন্দর মিউজিক করছিল ।

আমি বললাম, ছবিতে করছিল । বাস্তবে ওরা প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছেটাছুটি করছিল ।

তৃষ্ণা বলল, আমাদের জীবন ছবির মতো হলে ভালো হতো । তাই না?

তৃষ্ণার কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাত করে বাতাস বৃষ্টি দুইই থেমে গেল । তৃষ্ণা মোমবাতি জুলাল । বাতির শিখা কাঁপছে না । স্থির হয়ে আছে ।

তৃষ্ণা বলল, অবাক কাও। ঘড় থেমে গেছে।

আমি নিঃশ্঵াস ফেলে বললাম, লক্ষণ খুবই খারাপ। প্রবল বিপর্যয়ের মাগে আগে প্রকৃতি শান্ত পরিবেশ তৈরি করতে ভালোবাসে। হিরোশিমায় ম্যাট্য বোমা পড়ার আগে সময়টা ছিল অপূর্ব সুন্দর। কন্যা-সুন্দর আলোয় শহর ভেসে যাচ্ছিল। গাছে গাছে পাখি ডাকছিল। মিষ্টি বাতাস বইছিল।

তোমাকে কে বলেছে?

বোমার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া একজন জাপানির আত্মাহিনী থেকে জনেছি।

কাজেই আমরা ডুবছি?

হ্যাঁ। তবে আমাদের হাতে সময় আছে। আমরা ভালো মতো ডিনার শেষ করব। যা ঘটার তারপর ঘটবে।

হাবলু এসে চুকল। তার মুখভর্তি হাসি। আমি বললাম, ঘটনা কিরে হাবলু?

হাবলু সব দাঁত বের করে বলল, লঞ্চ ডুবতাছে স্যার। একতলায় কোমর পানি। কান্নাকাটির ধূম পড়ছে।

আমি বললাম, খুব আনন্দ পাচ্ছ, তাই না হাবলু?

হাবলু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

তৃষ্ণা বলল, হাবলু সাঁতার জানো?

হাবলু বলল, ‘জে-না’। বলেই খিকখিক করে হাসি।

আমরা খেতে বসেছি।

খাবার আয়োজন ফার্ম ক্লাস ডেকে। কেবিন থেকে হাবলু এবং তৃষ্ণা খাবার নিয়ে আসছে। সব মিলিয়ে তেরজন অভুক্ত মানুষ পাওয়া গেছে।

ঝড়ের প্রকোপ একটু কম। এত আশান্বিত হওয়ার কিছু নেই। খবর পাওয়া গেছে ডুবন্ত চরে ধাক্কা খেয়ে লঞ্চের তলা ফেটে গেছে। লঞ্চে পানি উঠছে। দুটা চাপকল ব্যবহার করে পানি সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যে হারে পানি বের হচ্ছে তার চেয়ে বেশি পানি চুকছে। ছোটবেলার চৌবাচ্চার অংক। কেউ ঠিকমতো হিসাব করতে পারলে কতক্ষণে লঞ্চ ডুবে যাবে তা বের করে ফেলতে পারবে। অংক করার মুড়ে কেউ নেই, তবে ড. জিল্লুর রহমান ব্যাপারটা দেখছেন। কী হারে লঞ্চ ডুবছে সেটা মনে হয় তিনি

জানেন। তাঁর ছাত্রী পাশেই আছে। ড. জিলুর মাঝে মধ্যেই হতাশ চোখে ছাত্রীর দিকে তাকাচ্ছেন। তাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হচ্ছে। আগের বৈরী ভাব এখন আর নেই।

রশীদ খান এবং রুস্তম এই দুজনও চাপকলের তদারকিতে আছে। একটা চাপকল রুস্তম কিছুক্ষণ চাপছে, সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে রশীদ খান চাপছেন। তবে দুজনেরই কল চাপার দিকেই আগ্রহ। আতর মিয়ার নির্দেশ, দুজনের একজন যখন কল চাপবে না সে তখন কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আতর মিয়ার হাতে এখন পূর্ণ ক্ষমতা। ক্ষমতাধররা ক্ষমতার ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার বাহিনীর হাতে রাশিয়ান আর্মির আর্টিলারির এক ব্রিগেডিয়ার ধরা পড়েছিলেন। তাকে বলা হলো কুকুরের মতো জিভ বের করে রাখতে। যেই মুহূর্তে জিভ মুখের ভেতর চুকবে সেই মুহূর্তেই তাকে গুলি করা হবে। ব্রিগেডিয়ার জিভ বের করে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ডিরেষ্টের শাকুর এবং তার বন্ধু বড় একটা কাঠের তজা জোগাড় করেছে। দুজন সেটা আগলে রাখছে, কাউকে আশপাশে ঘেষতে দিচ্ছে না। কিছু মানুষ আছে মহা বিপদে আনন্দে থাকে। এরাও মনে হচ্ছে সেরকম।

আমাদের খেতে বসার সঙ্গে স্লাস্ট সাপারের কিছু মিল খুঁজে পাচ্ছি। নিউ টেস্টামেন্টে বলা যিশুখ্রিস্ট শেষ খাবার খেতে বসেন উপরের তলায় (আমরা ডেকে খেতে বসেছি)। নিচতলা থেকে খাবার নিয়ে আসছিল তাঁর দুজন অনুসারী (ডেক থেকে খাবার আনছে হাবলু এবং তৃষ্ণা)। যিশুখ্রিস্টের সদস্য সংখ্যা ছিল তের। আমরাও তেরজন। যিশুখ্রিস্টের সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা। আমাদের মধ্যে যেমন তৃষ্ণা। নিউ টেস্টামেন্ট খাবারের বর্ণনায় মাছের কথা উল্লেখ করেছে। আমাদের খাবারে মাছ আছে। তৃষ্ণা আস্ত একটা ইলিশ মাছ ভেজে এনেছে। লুকের বর্ণনায় (২২:৭-৩৮) তখন বাইরে আবহাওয়া ছিল খারাপ। খেতে বসা তেরজনের মধ্যে একজনের হাতে ছিল বাঁকা লাঠি।

বুড়ো মিয়ার হাতে একটা বাঁকা লাঠি। বুড়ো মিয়া সবাইকে একটা ধাঁধা দিয়েছেন। তাঁর ধাঁধাটি এরকম—এক বৃক্ষা আজরাইলের হাত থেকে বাঁচতে চায়। সে একটা কৌশল বের করল যেন আজরাইল তাকে খুঁজে না পায়। কৌশল কাজ করল। আজরাইল তাকে খুঁজে পেল না। কৌশলটা কী?

ত্রুট্টি বলল, আমি এই গল্পটা জানি। কৌশলটা কী বলতে পারব। তাতে অন্যদের মজা নষ্ট হবে। দেখা যাক অন্যরা কেউ পারে কি না। আমি আপনাকে কানে কানে কৌশলটা বলি।

ত্রুট্টি বৃক্ষের কানে কানে কিছু বলল। বৃক্ষ আনন্দিত গলায় বলল, আম্মা, হইছে। আম্মার বেজায় বুদ্ধি। এই ধাঁধার উন্নত কেউ দিতে পারে না। আপনে পারছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সবাই কৌশল বের করার চিন্তায় অস্থির। সবচেয়ে অস্থির আতর মিয়া। সম্ভবত কৌশল জানার প্রয়োজন তারই সবচেয়ে বেশি।

আতর মিয়া বসেছে ঠিক আমার পাশে। সে ইংলিশ মাছ খাচ্ছে না। মাছ খেলেই তার গলায় কাঁটা ফুটে। তা সে যে মাছই হোক। একবার নাকি পাবদা মাছ খেয়েও তার গলায় কাঁটা ফুটেছিল।

আমি বললাম, গলায় মাছের কাঁটা ফুটা নিয়ে একটি কথা ইন্দোনেশিয়ায় চালু আছে। কথাটা শুনতে চাও?

চাই।

দুষ্ট লোকদের গলাতেই সবসময় কাঁটা ফুটে। এটা নাকি প্রকৃতির নিয়ম। গলায় কাঁটা বিধিয়ে সারাক্ষণ মন্ত্র করিয়ে দেওয়া ‘তৃষ্ণি দুষ্ট’।

আতর বলল, এটা একটা ভুল কথা।

হতে পারে ভুল কথা।

আমি সবার সামনে ইংলিশ মাছ খাব। দেখবেন কাঁটা ফুটবে না। পরীক্ষা হয়ে যাবে।

সবাই তাকাচ্ছে আতর মিয়ার দিকে। আতর অনেকখানি মাছ খেয়ে হাসিমুখে বলল, কাঁটা লাগে নাই।

ত্রুট্টি বলল, এই মাছটি এমনভাবে রান্না হয়েছে যেন কোনো কাঁটা না থাকে। তারপরেও আপনার গলায় কাঁটা ফুটেছে। আপনি ভাব করছেন কাঁটা ফুটে নি। ‘ভদা-ভাত’ খান, কাঁটা চলে যাবে। আমরা মহা বিপদে আছি, লঞ্চ ডুবে যাচ্ছে—এইসময় আমরা কেন ভান করব? সবাই সত্যি কথা বলার চেষ্টা করব।

আতর মিয়া শুধু ভাত মাখিয়ে গেলার চেষ্টা করছে। শুধু ভাত গেলা কঠিন কর্ম। তাকে লঙ্ঘিত এবং বিব্রত মনে হচ্ছে। সবার দৃষ্টি এখন তার দিকে। গলার কাঁটা নামানোটাই এখন প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে মাঝে মাঝে অতি তুচ্ছ বিষয় প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

লাস্ট সাপারে তেরজনের মধ্যে একজন কোনো খাদ্য গ্রহণ করে নি। আমাদের মধ্যে সেই একজনও আছেন। তিনি হচ্ছেন পীর হাবিব কুতুবি। এখন আর পুলিশরা তার পেছনে নেই। সবাই নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। ফাঁসির আসামি কোথায় তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

হাবিব কুতুবি খাদ্য গ্রহণ করছেন না কারণ তিনি রোজা।

আমি বললাম, রাতের বেলা কিসের রোজা?

পীর সাহেব বললেন, সৌদি টাইমিংয়ে এখন দিন। আমি সেই টাইমে রোজা রেখেছি। আপনাদের কাছে বিষয়টা কি পরিষ্কার হয়েছে?

কেউ জবাব দিল না। পীর হাবিব বললেন, সময় হলো অন্তরের মধ্যে। অন্তরে আপনি যে সময় নির্ধারণ করবেন, আপনের সময় সেইটাই।

তৃষ্ণা বলল, আলোচনা ফিলসফির দিকে চলে যাচ্ছে। আপনি সাধারণ কথাবার্তা বলুন, যাতে আমরা সবাই বুঝতে পারি।

আতর মিয়া বিরক্ত গলায় বলল, আপনি থাকেন বাংলাদেশে, রোজা রাখেন সৌদি টাইমিংয়ে—এটা কেমন কথা! কিংতু বড় সৌদি পীর হয়েছেন আমাকে দেখান। গলার কাঁটা নামায়ে দেখুন।

পীর হাবিব বললেন, আপনার গলার কাঁটা আমি কেন জিন কফিলও নামাতে পারবে না। কারণ আপনার গলায় কাঁটা বিধে নাই। কাঁটা বিধেছে আপনার অন্তরে। অন্তরের কাঁটা আপনাকেই সরাতে হবে। অন্য কেউ পারবে না। দুষ্ট লোকের অন্তরে কাঁটা থাকে।

আতর মিয়া বলল, আপনি তো খুন করেছেন তিনটা। আপনার অন্তরে কাঁটা নাই?

এইখানে ভুল করেছেন। খুন আমি করি নাই। খুন করেছে জিন কফিল।

তৃষ্ণা বলল, এইসব হাস্যকর কথাবার্তা এখন বলবেন না। আমরা গল্পগুজব করছি, আনন্দে থাকার চেষ্টা করছি। গল্প শুনুন, আনন্দে থাকার চেষ্টা করুন।

আমি আনন্দেই আছি। মনে মনে জিগির করতেছি, এতেই আমার আনন্দ। খাওয়া শেষ করেন তারপর আমার সঙ্গে জিগিরে সামিল হন।

লাঠি হাতে বুড়ো মিয়া বলল, আমি যে আপনাদের একটা শীমাংসা দিছিলাম তার সমাধান কি দিব?

আমি বললাম, মীমাংসাটা নিয়ে আমরা সবাই চিন্তা করছি। এখন না সই ভালো।

তৎক্ষণাৎ বলল, একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমরা সবাই এই পর্যন্ত নে সবচেয়ে ভালো কাজ কী করেছি সেটা বলি। পীর কৃতুবিকে দিয়ে করি। আপনি বলুন।

পীর কৃতুবি বললেন, সত্যি কথা বলতে কী, আমি তেমন কোনো ভালো করি নাই। জিন কফিল করেছে। সে আমার স্ত্রী এবং দুই শ্যালিকাকে করেছে। এই ভালো কাজের জন্য সে বেহেশতবাসী হবে।

আমি বললাম, মানুষের বেহেশত আর জিনের বেহেশত কি আলাদা? একই বেহেশতে আমরা থাকব?

পীর কৃতুবি বললেন, তফসিরে বাইজাবিনে অর্থাৎ সূরায়ে জিনের সেরে আছে জিনদের দোজখ শীতল। সেখান থেকে মনে হয় আমাদের জিনদের বেহেশত দোজখ আলাদা।

তৎক্ষণাৎ বলল, আতর মিয়া আপনি বলুন এক জীবনে ভালো কাজ কী ছেন?

আতর বলল, প্রফেসর সাবরে কাণ্ডে থেরে খাড়া করাইয়া থুইছি—এইটাই র ভালো কাজ। পাছায় লাঠি দিয়া পানিতে ফেললে উন্নতমানের ভালো হইত। কী আর করা!

তৎক্ষণাৎ বলল, আপনার কাঁটা কি এখনো আছে?

আতর বলল, আগে ভাবছিলাম কাঁটা একটা ফুটছে। এখন মনে চছে দুইটা।

সবাই হেসে উঠল। আমরা আনন্দ পেতে শুরু করেছি। লাস্ট সাপারের ত সবাই আনন্দেই ছিলেন।

আনন্দভঙ্গ হয় খাবার শুরুর কিছুক্ষণ পর।

লাস্ট সাপারে রেডওয়াইন দেওয়া হয়েছিল। রেডওয়াইনের অভাব ব করছি। আমি তৎক্ষণাত দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার কাছে কি ওয়াইনের একটা বোতল আছে?

তৎক্ষণাৎ বলল, আমার কাছে রেডওয়াইনের বোতল থাকবে কেন?

তুমি সারা জীবন বিদেশে থেকেছ, এইজন্যে বললাম। সেখানে তো ব হিসেবে রেডওয়াইন থাওয়া হয়।

তুমি বিদেশে যাও নি তো এইজন্যেই বিদেশ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। বাঙালিরা সেখানে অত্যন্ত কনজারভেটিভ জীবনযাপন করে। পুরুষরা দাঢ়ি রাখে না, তবে মেয়েরা হিজাব পরে। হঠাৎ রেডওয়াইনের বিষয় এল কেন?

তুমি ওয়াইন খাও?

না। তবে আজ খেতে ইচ্ছে করছে।

তৃষ্ণা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার কাছে খুব দামি এক বোতল রেডওয়াইন আছে। স্পেনের তৈরি। কেন কিনেছিলাম জানি না। মনে হয় তুমি খেতে চাইবে ভেবে কিনেছি।

আমি বললাম, হতে পারে। সবকিছু যদি প্রিডিটারমিনড হয় তাহলে আমি যে আজ রাতে ওয়াইন খেতে চাইব এটাও পূর্বনির্ধারিত।

বুড়ো মিয়া বিরক্ত গলায় বলল, আশুজি, আপনার কথাবার্তা কিছু বুঝতেছি না। আমি যে মীমাংসা দিলাম তার কী উত্তর?

আমরা খাচ্ছি। লঞ্চ দুবছে। তৃষ্ণা ওয়াইনের বোতলের মুখ খুলতে খুলতে বলল, হাউ এক্সাইটিং!

কী সুন্দর যে তাকে লাগছে। আমি মনে মনে বললাম, ‘মুখের পানে চাহিনু অনিমেষ, বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।’ তৃষ্ণা চমকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে প্রিকটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি মাঝে মাঝে মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি।

নিচ থেকে বিকট হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় লঞ্চ তলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

প্রকাশকের বক্তব্য

লেখক যে জায়গায় উপন্যাস শেষ করেছেন, সেখানে উপন্যাস শেষ হয় না। লঞ্চ কি আসলেই দুবেছে? যদি দুবে গিয়ে থাকে তাহলে হিমুর কী হয়েছে? তৃষ্ণার পরিণতি কী?

এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা লেখকের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, হিমু এখন আমার প্রিপে নেই। সে অনেকটাই পাঠকের সম্পত্তি। উপন্যাসের শেষটা আমি পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কোনো পাঠক ইচ্ছা করলে লঞ্চ দুবিয়ে সবাইকে মেরে ফেলতে পারেন। আবার কেউ ইচ্ছা করলে উদ্ধারকারী জাহাজ আনতে পারেন।

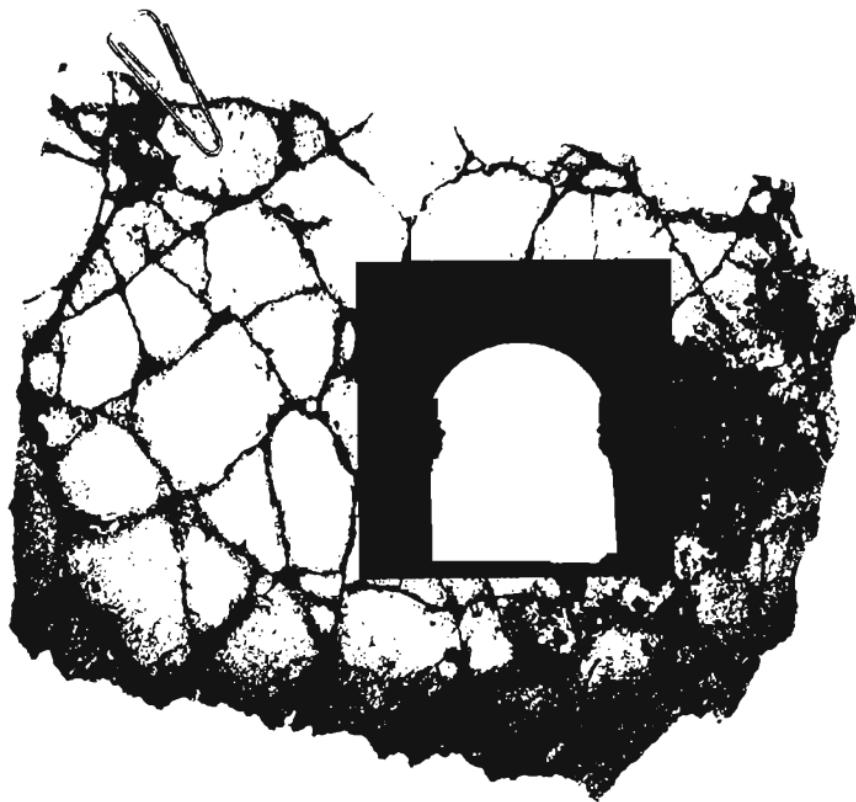
আবার কেউ তাদের ধারণায় যারা দুষ্ট তাদের মেরে ফেলে ভালোদের
বঁচিয়ে রাখতে পারেন। তবে তৎপর মরে যাওয়াই ভালো। সে বেঁচে
থাকলে হিমুর পেছনে ফেউ-এর মতো লেগে থাকবে। সেটা ঠিক হবে না।

আমরা হুমায়ুন আহমেদকে উপন্যাসের শেষ অংশ লিখে দেওয়ার জন্য
বিশেষভাবে অনুরোধ করার পর তিনি বলেন, আমার অতি প্রিয় উপন্যাসিক
জন স্টেনবেক বলেছেন, “একটি ভালো গল্প হলো কবিতার মতো, যার
শেষ থাকে না।” এরপর তিনি চার লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটি

Micheal Drayton-এর

"Since there is no help, come let us kiss and part.
Nay, I have done; you get no more of me.
And I am glad, yes glad with all my heart,
That thus so cleanly I myself can be free."

হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরী



মাজেদা খালা গলা নামিয়ে, প্রায় ফিসফিস করে বললেন, পরী দেখবি?

আমি বললাম, কি রকম পরী?

ডানাকাটা পরী।

আমি বললাম, ডানা কাটার ঘা শুকিয়েছে, না-কি ঘা এখনো আছে? শরীরে ঘা নিয়ে ঘুরছে, এমন পরী দেখব না।

মাজেদা খালা বিরক্ত মুখে বললেন, “তুই কি সহজভাবে কোনো কথা বলতে পারিস না। ডানাকাটা পরী দেখতে চাস না-কি চাস না? হ্যাঁ কিংবা না বল।”

খালা ওয়ালা কিংবা ডানাকাটা কোনো ধরনের পরীই আমার দেখতে ইচ্ছা করছে না। খালাকে খুশি করার জন্যে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

খালা আমার সামনে 3R সাইজের একটা ছবি রেখে বললেন, এই দেখ ডানাকাটা পরী।

আমি দেখলাম গৌফওয়ালা এক পরীর ছবি। তার মাথার চুল ত্রাসের মতো ছোট করে কাটা। চাইনিজ কাটের হলুদ রঙের একটা সার্ট তার গায়ে। সার্টের নিচে নীল রঙের হাফ পেন্ট। পরীর হাতে টেনিস র্যাকেট। কপালে ঘাম দেখে মনে হল টেনিস খেলে এসেছে।

খালা বললেন, কেমন দেখলি?

আমি বললাম, ভালো। গৌফওয়ালা পরীর কথা আগে শুনি নি। ছবি দেখে ভালো লাগল। ফ্রেঞ্চ কাট দাঢ়ি থাকলে আরো ভালো লাগতো।

খালা গলার স্বর আবারো খাদে নামিয়ে বললেন, ছেলে না, এ মেয়ে। গৌফ লাগিয়ে ছেলে সেজেছে। তার আসল ছবি দেখলে মাথা ঘুরে সোফায় কাত হয়ে পড়ে যাবি। দশ মিনিট উঠতে পারবি না। বুক ধড়ফড়ানি রোগ

হয়ে যাবে। এই দেখ আসল ছবি। এখন বল এই মেয়ে যদি পরী না হয় তাহলে পরী কে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

শুধু হ্যাঁ বললি। সুন্দর একটা কথা বল।

আমি বললাম, “কে বলে শারদ শশি এ মুখের তুলা পদনথে পড়ে আছে তার কতকগুলো।”

এর মানে কি?

এর মানে হল শরৎ রাতের চাঁদও এই মুখের তুলনা হবে না। শরতের পূর্ণ চন্দ্র পড়ে থাকবে এই তরঙ্গীর পায়ের নথের কাছে।

বাহু। তুই বানিয়েছিস?

কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন। ঝপবতী মেয়ে দেখলে উনার মাথা ঠিক থাকত না। নিজে বিয়ে করেছিলেন এক তড়কা রাঙ্গসীকে। ধূমসি আলুর বস্তা। গাত্র বর্ণ পাতিল কালো। দুটা দাঁত খরগোসের মতো সব সময় ঠোঁটের বাইরে।

ভারতবাবু এই মেয়েকে বিয়ে করল কেন?

মহিলার উচ্চবংশ বলে বিয়ে করেছিলেন। কবিরা আবার বংশের দিকে দুর্বল।

রাঙ্গসীর কথা বাদ দে এলিতা মেয়েটাকে বিয়ে করবি? ধান্দাবাজি না, এক কথায় জবাব দে। হ্যাঁ না-কি না?

পরীর নাম এলিতা?

হ্যাঁ। বাবা-মা রাশিয়ান, এলিতা জন্মস্থে আমেরিকান। ফটোগ্রাফির উপর কোর্স করেছে। বাংলাদেশে আসছে স্টিল ছবি তুলতে। নাম The Food. ঢাকায় আসবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। তুই হবি তার গাইড।

আমিতো ইংরেজিই জানি না। গাইড হব কীভাবে?

খালা বললেন, এই মেয়ে চিচার রেখে বাংলা শিখে তারপর আসছে। ওরা যা করে সিরিয়াসলি করে। তোর মতো অকারণে রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটে না। বাংলাদেশে আসবে তাই বাংলা শিখেছে। তার চায়না যাওয়ার প্রোগ্রাম থাকলে চায়নিজ শিখতো রাশিয়ান ভাষা সে জানে।

আমি বললাম, ভাষাবিদ পণ্ডিত পরী বিয়ে করা বিপদজনক তারপর তুমি যখন বলছ বিয়ে করব। বিয়ে কি মেয়ে ঢাকায় পৌছার পরপরই হবে? মেয়ে জানে যে আমাকে বিয়ে করছে?

মেয়ে কিছুই জানে না । তুই সারাক্ষণ মেয়ের সঙ্গে থাকবি । তোর উন্ডট
উন্ডট কথাবার্তা শুনে মেয়ে তোর প্রেমে পড়ে যাবে । প্রেম একটু গাঢ় হলেই
আমি কাজি ডেকে বিয়ে দিয়ে দেব । তুই মেয়ের হাত ধরে চলে যাবি
আমেরিকা । তোর একটা গতি হয়ে যাবে । এখন বুঝেছিস আমার প্ল্যান ।

এই মেয়ের সঙ্গে তুমি জুটলে কীভাবে?

ইন্টারনেটে । এলিতা আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড । তার বয়স একুশ । তার
একটাই দুঃখ এখনো না-কি সে কোনো বুদ্ধিমান ছেলে দেখে নি । তার
কাছে পুরুষ মানেই গাধা ।

ছেলে সেজেছে কেন?

বাংলাদেশে আসবে এই জন্যে ছেলে সেজেছে । ছেলে সেজেই
আসবে । যতদিন থাকবে ছেলে সেজে থাকবে । সে এক নিউজে শুনেছে
গরিব দেশে সাদা চামড়ার মেয়ের একা যাওয়া মানেই গ্যাং রেপড হওয়া ।
এলিতা ভেজিটেরিয়ান । সকালে কি নাস্তা খায় জানিস তিনটা কাঁচা ওকরা ।

ওকরা কি জিনিস?

ওকরা হল চ্যাড়স ।

দুপুরে কি খায়? অর্ধেকটা কাঁচা লাউট

হিমু ফাজলামি বন্ধ । আমি এই মেয়েটার বিষয়ে সিরিয়াস । আমি চাই
তুইও সিরিয়াস হবি । তোদের দুজনের বিষয়টা মাথায় কীভাবে এসেছে
জানিস?

ঘন্টে পেয়েছ!

ও আল্লা! সত্যিতো । কীভাবে বললি? আসলেই ঘন্টে পেয়েছি এলিতা
যখন জানলো সে ঢাকায় আসছে তখনি স্বপ্নটা দেখলাম । দুপুরে খাওয়া
দাওয়া করে শুয়েছি । হাতে গল্পের বই । গল্প পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি
তখন স্বপ্নটা দেখলাম । একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে তোরা দু'জন যাচ্ছিস ।
পেছনে ব্যান্ডপার্টি । তোর পরনে সৃষ্ট টাই । এলিতার পাশে তোকে মোটেই
বেমানান লাগছে না । সুন্দর লাগছে । এলিতা পরেছে লাল জামদানি । তোর
গলার টাইটা লাল ।

আমি খালাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, সৃষ্ট লাল টাই কোথায় পাব?

খালা বললেন, ড্রেস নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না । তোর খালুর
সৃষ্ট টাই আমি আলাদা করে রেখেছি ।

মাপে হবে না ।

একটু উনিশ বিশ হবে। কারো চোখে পড়বে না। আমার সামনে
পরতো দেখি। টাই এর নট বাঁধতে পারিস?
না।

আমি বেঁধে দিচ্ছি। শিখে নে।

এখন পরতে হবে?

হ্যাঁ। তোর খালু বাসায় ফেরার আগেই স্যুট টাই নিয়ে বিদায় হয়ে যা।
এখন থেকে সারাক্ষণ স্যুট টাই পরে থাকবি। নয়তো আসল দিনে ঝামেলায়
পরবি গা কুটকুট করবে। টাই গলায় ফাঁসের মতো লাগবে।

স্যুট টাই পরলাম। খালা বললেন, কোটটা সামান্য লুজফিটিং হয়েছে।
এটাই ভালো। আজকাল লুজফিটিং-এর চল। যা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
দেখ তোকে কি সুন্দর মানিয়েছে। তোর চেহারা যে এত সুন্দর আগে
খেয়াল করি নি।

আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি—নকল হিমু। আয়নার হিমুকে মনে
হচ্ছে এই হিমু ব্রিফকেস নিয়ে ঘুরে। সে বিনাই ধান্দাবাজ, সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে
যায়, বোতল খায়।

খালা বললেন, নিজেকে দেখেতো মুঝ হয়ে গেছিস। পুরুষ মানুষকে
বেশিক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখেতে হয় না, চরিত্র খারাপ হয়। এখন জুতা
পর। জুতা ফিট করে কি-না দেখি।

অনেক চেষ্টা করেও জুতা পায়ে ঢুকানো গেল না। মোজাসহ, মোজা
ছাড়া নানানভাবে চেষ্টা করা হল। খালা বললেন, টাকা দিচ্ছি একজোড়া
জুতা কিনে নিবি। ব্ল্যাক সু কিনবি। নিচে গাড়ি আছে। গাড়ি নিয়ে তোর
খালুর এই স্যান্ডেলটা পরে চলে যা। জুতার দোকানে গাড়ি থেকে নামবি।
কিছুক্ষণ স্যান্ডেল পরা থাকলে কিছু হবে না।

আমি গাড়ি এবং স্যান্ডেল ছাড়াই বের হলাম। হিমুর কিছুটা আমার
মধ্যে থাকুক। স্যুট টাইয়ের সঙ্গে খালি পা।

টাকা শহর বদলে গেছে। কিভাবে বদলেছে কতটুকু বদলেছে?

ক. টাকা শহরের চলমান মানুষ এখন কেউ কারো দিকে তাকায় না।

আমি আধুনিক্টাৱ উপৰ স্যুট পরে খালি পায়ে হাঁটছি কেউ বিষয়টা
ধৰতে পারছে না। কেউ আমার পায়ের দিকে তাকাচ্ছেই না।

খ. ঢাকা শহরে মুঢি সম্প্রদায় বলে এক সম্প্রদায় ছিল। তারা প্রথমে তাকাতো পায়ের দিকে। পায়ের জুতা স্যান্ডেলের অবস্থা দেখত। তারপর তাকাতো মুখের দিকে। জুতা ওয়ান টাইম আইটেম হয়েছে বলে মুঢি সম্প্রদায় বিলুপ্ত। জুতার দিকে তাকিয়ে থাকার কেউ নেই।

গ. ঢাকা শহরের মানুষের বিস্মিত হ্বার ক্ষমতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। দু'জন আমাকে আপাদমস্তক দেখেছে। একজন দেখে হাই তুলল। দ্বিতীয় জন পানের পিক ফেলে উদাস হয়ে গেল।

তবে শিশুদের মধ্যে বিস্মিত হ্বার ক্ষমতা কিছুটা এখনো আছে। স্কুল ফেরত এক বালিকা অনেক ঝামেলা করে তার মা'র দৃষ্টি আমার খালি পায়ের দিকে ফেরাল। বিড়বিড় করে কিছু বলল। মা ধমক দিয়ে তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বালিকা যাবে না। কাজেই আমি এগিয়ে গেলাম। আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, খুকি তোমার কী খবর?

মেয়েটা সামাজিকতার ধার দিয়ে গেল ~~মার্কেট~~ অবাক হয়ে বলল, আপনার পায়ে জুতা নেই কেন?

আমি বললাম, আমি জুতা আবিকারের আগের মানুষ বলে পায়ে জুতা নেই।

মেয়ের মা তার হাত ধরে হ্যাচকা টান দিয়ে বললেন, তানিজা চলতো।

তানিজা বলল, খালি পায়ে হাঁটলে অসুখ হয় আমার চিচার বলেছেন।

আমি বললাম, তানিজা তাকিয়ে দেখ ঢাকা শহরের বেশির ভাগ ভিক্ষুক খালি পায়ে হাঁটে। এদের অসুখ হয় না।

মেয়ের মা আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, প্রিজ আমাদের বিরক্ত করবেন না।

আমি বললাম, বিরক্ত করছি না গল্প করছি। আপনি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনার কি ধারণা আপনার মেয়েকে আমি ছিনিয়ে নিয়ে যাব। তারপর টেলিফোন করে বলব তানিজাকে ফেরত পেতে হলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নিয়ে সক্ষ্যার পর আজিমপুর গোরস্তানের কাছে চলে আসবেন। র্যাব বা পুলিশে খবর দিলে মেয়েকে জীবিত পাবেন না।

কেন আপনি অকারণে কথা বলে যাচ্ছেন? কেন আমাদের বিরক্ত করছেন? আপনার সমস্যা কী?

আমার একটাই সমস্যা পায়ে জুতা নেই। সুট টাই পরে খালি পায়ে হাঁটছি। এ ছাড়া কোনো সমস্যা নেই। তানিজার টিচার আবার বলেছেন খালি পায়ে হাঁটলে অসুখ হয়। এটা নিয়েও সামান্য টেনশানে আছি।

মেয়ের মা মেয়েকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমিও তাদের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। একটা খেলা শুরু হয়েছে। খেলাটার শেষ দেখা দরকার। রান করি বা না করি ক্রিজে টিকে থাকতে হবে। আশরাফুলের মতো শূন্য রানে আউট হলে চলবে না।

মহিলা কয়েকবারই চেষ্টা করলেন রিকশা ঠিক করতে। কোন রিকশা রাজি হল না। মহিলা হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একের পর এক ইয়েলো ক্যাব তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, থামাচ্ছে না। মহিলা হাঁটা শুরু করেছেন। আমিও তাদের সঙ্গে হাঁটছি।

তানিজা মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসছে। আমি তার হাসি ফেরত দিচ্ছি। হাসাহসির সময় মেয়ের মা ‘বাঘিনী Look’ দিচ্ছেন। সাধারণ বাঘিনী না, আহত বাঘিনী। যে কোনো সময় আমার উপর ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। আমি তাদের পেছনে পেছনে কলাবাগানের গলির ভিতর চুকে গেলাম। মহিলা নিজের বাড়ির সামনে চলে এসেছেন বলে স্বন্তি ফিরে পেয়েছেন। আতঙ্কে চেহারা কালো হয়ে গিয়েছিল, চেহারায় কিছুটা জেল্লা ফিরে এসেছে তিনি বাড়ির গেটে হাত রাখতে রাখতে বললেন, অনেক যত্নগা করেছেন আর কত? এখন যান।

আমি বললাম, এক জোড়া স্পেয়ার জুতা কি আপনাদের হবে? জুতা পরে চলে যেতাম। তানিজা বলল, বাবার অনেকগুলো জুতা আছে আপনি নিয়ে যান।

তানিজার মা ঠাস করে মেয়ের গালে চড় দিয়ে তাকে নিয়ে বাড়িতে চুকে গেলেন। ধড়াম করে দরজা বন্ধ করলেন। আমি গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মহিলা কী করবেন বুঝতে পারছি না। স্বামীকে খবর দিবেন, পুলিশকে খবর দিবেন। বিরাট ক্যাচাল শুরু হবে।

খারাপ কী? আমিতো এখনো ক্রিজে আছি। দরজা বন্ধ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও আনন্দ আছে। বাড়ির ভেতরের মানুষদের টেনশানে ফেলার আনন্দ। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে অন্যদের টেনশানে ফেলে সে আনন্দ পায়। সৃষ্টিকর্তাও আমাদের টেনশানে ফেলে আনন্দ পান বলেই মানবজাতি সারাক্ষণ টেনশানে থাকে।

মানুষের মহত্বম গুণের একটির নাম কৌতৃহল। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যের মূলে আছে মানুষের অপার কৌতৃহল। ঢাকা শহরের মানুষরা এই মহৎগুণের অধিকারী। তবে এই মহৎগুণের কারণে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যে তাদের কিছু যে হয়েছে তা-না। ঢাকা শহরের মানুষের কৌতৃহল ক্ষুদ্র গভীরে আবদ্ধ। গরমের সময় কেউ যখন শসা খায় তখন তাকে ঘিরে পথগুশজন মানুষ দাঁড়িয়ে থেকে শসা খাওয়া দেখে। আখের রস বের করা যন্ত্র ঘিরেও চান্দি পয়তালিশজন কৌতৃহলী মানুষ সব সময় দেখা যায়। শ্রমিকরা যখন রাস্তা ঝুঁড়ে পাইপ বসায় তখন শ'খানেক মানুষকে রাস্তার দু'পাশে বসে থাকতে দেখা যায়।

কৌতৃহলের কারণেই আমাকে ঘিরে পঁচিশ ব্রিশজন মানুষ দাঁড়িয়ে গেল। কৌতৃহলী মানুষরা সংঘবদ্ধ থাকে এবং তাদের একজন লিডার থাকে। এখানকার লিডারের মাথায় বাটলদের মতো লম্বা চুল। তিনি ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। বাতাসে তার বাবরি চুল নাচছে। অত্যন্ত বলশালী মানুষ। পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাতা গোটানো। দেখে মনে হয় ঘোসাঘুসির জন্যে প্রস্তুত। তিনি আমার কাছে এসে বললুম, ভাইসাব অনেকক্ষণ আপনি এই বাড়ির গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। ষষ্ঠিমা কী বলুনতো। কোনো সমস্যা? আমার নাম এ আলম।

আমি বললাম, এই বাড়ির একটা বাচ্চা মেয়ের নাম তানিজা। সে তার বাবার এক জোড়া জুতা আমাকে দিবে বলেছিল। জুতার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। জুতা দিচ্ছে না।

আলম আমার খালি পায়ের দিকে তাকালেন। মনে হচ্ছে তিনি মর্মাহত। ক্ষুক গলায় বললেন, জুতা দিবে না। এটা কেমন কথা। অবশ্যই জুতা দিতে হবে।

তিনি মাথার বাবড়ী চুলে একটা বড় ধরনের ঝাঁকি দিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে তেজি গলায় বললেন, দেখুন কী অবিচার। একটা লোক খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জুতা দিচ্ছে না।

কৌতৃহলী জনতাকে জুতা দিচ্ছে না শুনে মর্মাহত বলে মনে হল। তারা বলল, জুতা দিতে হবে। জুতা না দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

আধ ঘণ্টার মাথায় দেড়শ'র মতো লোক জমে গেল। গলির রাস্তা বদ্ধ হয়ে গেল। জনতার মধ্যে একদলকে মনে হচ্ছে জঙ্গি ভাবাপন্ন। তারা একটু পরপর ঝংকার দিচ্ছে জুতা দে। জুতা দে। জুতা না দিলে বাড়ি জুলায়া দিমু।

এর মধ্যে অনেক ঝামেলা করে সাদা রঙের প্রায় নতুন একটা প্রাইভেট কার ছুকেছে। ড্রাইভার কয়েকবার হণ্ড দিতেই জঙ্গি জনতা ফ্রপ খেপে গেল। প্রাইভেট কারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। ড্রাইভার দরজা খুলে পালাতে যাচ্ছিল। দৌড়ে তাকে ধরা হল। মেরে আধমরা করে জুলন্ত গাড়ির পাশে শুইয়ে রাখা হল।

আলম সাহেব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন-

‘বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম। আল্লাহপাক বলেছেন, মা সাবেরিনা। অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করুন। আপনারা অস্থির হবেন না। ধৈর্য ধারণ করুন। আমি নিজে ঐ বাড়িতে যাচ্ছি। তাদেরকে অতি ভদ্রভাবে জুতা দিতে বলব। যদি জুতা না দেয় তাহলে আমরা হার্ড লাইনে যাব। আমরা দাবি আদায় করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।’

এর মধ্যে একটা লাল রঙের গাড়িকে গলির মোড়ে দেখা গেল। যদিও জনতা ধর ধর করে ছুটে গেল। ড্রাইভার অতি বৃক্ষিমান। গাড়ি ঘুরিয়ে নিমিষে পালিয়ে গেল।

তিন জোড়া জুতা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ব্রাউন জুতা জোড়া ভালো ফিটিং হল। আমি জুতা পরে গলি থেকে বের হয়ে পড়লাম। আমার ধারণা ঘটনা আরো অনেক দূর গড়ারে। একটা ইয়েলো ক্যাব কজা করা হয়েছে। আগুন ধরানোর চেষ্টা চলছে জাগ্রত জনতা আশেপাশের বেশ কয়েকটা বাড়ির দরজা ধাক্কাচ্ছে এবং স্নেগান দিচ্ছে, জুতা দে। জুতা দে!

গলি থেকে বের হবার মুখে দেখি পুলিশ এবং র্যাবের গাড়ি গলিতে ছুকছে। এই দুই গাড়ির পেছনে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে এ্যাম্বুলেন্সও যাচ্ছে।

পরদিন সকালে দুই হাতে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় আলম সাহেবের ছবি ছাপা হল।

দুর্ধর্ষ জুতা সন্ত্রাসী আলম আটক।

(নিজৰ প্রতিবেদক)

কলাবাগানের গলিতে সন্ত্রাসী আলমকে আটক করা হয়েছে। সে তার দলবল নিয়ে জুতা সংগ্রহ অভিযানে নেমেছিল। প্রথমে সে গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্তার কাছে ভদ্র ভাষায় জুতা চাইতো। জুতা না দিলে বা জুতা দিতে

দেরি হলে তার দল শুরু করত তাওব। তার দলের হাতে দু'টি প্রাইভেট
কার ভস্মীভূত হয়েছে। প্রাইভেট কারের আরোহীরা নিজেদের পায়ের জুতা
খুলে দিতে রাজি না হওয়ায় এই কাগু।

সন্ত্রাসী আলমকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সে মুখ খুলছে না।
বার বার বলছে নসিব সবই নসিব। ঘটনায় ‘নসিব’ নামধারী কেউ যুক্ত কি-
না তাও অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

অনেকেই ধারণা করছেন জুতা সংগ্রহ অভিযানের পেছনে জুতা
বিক্রেতাদের হাত আছে। তারা জুতার কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টায় আছে।

বাংলাদেশ পাদুকা বিক্রেতা সমিতির সভাপতি হাজি চাঁন মিয়ার সঙ্গে
যোগাযোগ করা হলে তিনি অভদ্র ভাষায় প্রতিবেদকের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু
করেন। এক পর্যায়ে বলে উঠেন “...পুত তোরে আমি জুতা খিলায়া দিয়ু।”

প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে এমন ব্যবহার কখনো আশা
করা যায় না।

বিষয়টার আমরা সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছি।

একটি চৈনিক প্রবাদ আছে—“তুমি কাউকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিতে চেষ্টা
করো যেন সে খাদ থেকে উঠতে না পারে।” এই প্রবাদের ব্যাখ্যা হল— খাদ
থেকে উঠতে পারলে সে প্রতিশেধ নেবে। তাকে সেই সুযোগ না দেয়া।

আলম জুতা সন্ত্রাসী হিসেবে এখন থানা হাজতে। চৈনিক প্রবাদ অনুসারে
আমার চেষ্টা করা উচিত যেন তিনি জামিনে বের হতে না পারেন। চৈনিক
প্রবাদ আমাদের জন্যে খাটে না। আমাদের প্রবাদ হচ্ছে—কাউকে খাদে
ফেলতে হলে তুমি নিজে তা করবে না। অন্যকে দিয়ে করাবে। খাদে পড়ে
যাওয়া ব্যক্তির প্রতি প্রচুর সহানুভূতি দেখাবে। যার সাহায্যে তুমি অসহায়
মানুষটিকে খাদে ফেলেছ এক পর্যায়ে তার নাম তুমি প্রকাশ করে তাকেও
বিপদে ফেলবে। সব শেষে মানব চরিত্রের অবক্ষয় নিয়ে হা-হ্তাশ করবে।
দৈনিক পত্রিকায় চিঠি লিখবে। চিঠির শিরোনাম, “দেশ আজ কোথায়
যাচ্ছে?” দেশের বিখ্যাত কবিদের কবিতা শিরোনামে ব্যবহার করলে চিঠি
সহজে ছাপা হবে। উদাহরণ, “উন্নত উটের পিঠে চলেছে শব্দেশ।”

আমি ঠিক করলাম যে জুতাজোড়া নিয়ে এত কাণ্ড সেই জুতাজোড়া
আলমকে দিয়ে আসব। পুলিশ ইচ্ছা করলে জুতাজোড়া আলামত হিসেবে
ব্যবহার করতে পারে।

স্যুট টাই পরে খালি পায়ে তৈরি হলাম। খালু সাহেবের প্যান্টের
পকেটে হাত দিয়ে খানিকটা চমকালাম। প্যান্টের পকেটে মানিব্যাগ। বেশ
কিছু হাজার টাকার নেট দেখা যাচ্ছে। সবুজ নেটও কিছু আছে।
আমেরিকান ডলার। নানান ধরনের কার্ড। আমেরিকান এক্সপ্রেস, ভিসা
জাতীয় হাবিজাবি। কিছু কাগজপত্র ক্লিপ দিয়ে আটকানো। নিচয়ই অতি
জরুরি।

মানিব্যাগ হারিয়েছে এই খবর খালু সাহেবের এরমধ্যে জেনে ফেলার
কথা। বাসায় নিচয়ই ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে।

খালু সাহেব হাইপারটেনশানের রুগ্নি। আমি নিশ্চিত তিনি বিছানায়
পড়ে গেছেন এবং তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। খবর নেবার জন্যে
যাজেদা খালাকে টেলিফোন করলাম। খালা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন,
তোর খালুর মানিব্যাগ পকেটমার হয়েছে।

বল কি? টাকা পয়সা কি পরিমাণ ছিল?

টাকা পয়সা নিয়ে তোর খালু মাথা ব্যথা না। জরুরি একটা টেলিফোন
নাম্বার লেখা ছিল, ঐ নাম্বারটা হারানোতেই সে অস্থির।

কার নাম্বার?

কার নাম্বার সে বলছে না।

নাম্বার মোবাইল ফোনে সেভ করা যায়। এই নাম্বার সেভ করা নেই
কেন?

আমি কীভাবে বলব?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, খালু সাহেবের কোনো গোপন বান্ধবীর
নাম্বার না তো?

পাগলের মতো কথা বলছিস কেন? এই বয়সে তার আবার গোপন
বান্ধবী কী?

খালা। একটা চীনা প্রবাদ আছে,

“বিড়াল, কাক এবং বৃক্ষ পুরুষ এই তিন শ্রেণীকে বিশ্বাস করবে না।”
চায়নিজরা মোক্ষম মোক্ষম প্রবাদ বের করেছে। কোনটাই ফেলনা না।

খালা হতভম গলায় বললেন, কি বলছিস তুই? তোর কথাবার্তা শুনেতো
আমার হাত পা কাঁপা শুরু হয়েছে। আমি কি তোর খালুকে চেপে ধরব?

হাইপারটেনশানের রুগ্নী বেশি চাপাচাপি করা ঠিক হবে না। মানিব্যাগ
উদ্ধার হোক তারপর টেলিফোন রহস্যের জট খোলা হবে।

মানিব্যাগ উদ্ধার হবে কীভাবে?

দোয়া কালাম পড়তে থাক। বাসায় নিয়ামূল কোরান আছে না? সেখানে
দেখ হারানো জিনিস ফেরত পাবার দোয়া আছে। এক মনে পড়তে থাক।

হিমু! তুইতো আমাকে বিরাট টেনশানে ফেলে দিলি। তুই এক্ষুণি
বাসায় আয়।

এখন আসতে পারব না। থানা হাজতে যেতে হবে।

জুতা সন্ত্রাসী আলমকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত মনে হল। এক চোখে
কালসিটা পড়েছে অন্যটা টকটকে লাল সেখান থেকে পানি পড়েছে। তিনি
মেঝেতে পা ছড়িয়ে হাজতের দেয়ালে হেলান্ত দিয়ে বসে আছেন, বিড় বিড়
করছেন। নিশ্চয়ই কোনো দোয়া কালাম পড়েছেন। মসজিদ এবং থানা
হাজত হল এক মনে আল্লাহকে ডাকার জায়গা।

আমি হাজতের লোহার শিকের ওপাশ থেকে বললাম, আলম ভাই
কেমন আছেন?

তিনি চমকে তাকালেন তবে আমাকে চিনতে পারলেন না। ঝামেলার
সময় দেখা মানুষকে ঝামেলা মুক্ত অবস্থায় বেশিরভাগ সময় চেনা যায় না।

আমি বললাম, মেরেতো দেখি আপনাকে তঙ্গ বানিয়ে ফেলেছে।

আপনি কে?

আমার নাম হিমু। আমি এসেছি আলামত জমা দিতে। জুতাজোড়া
এনেছি। আপনাকে কোটে তুললে আলামত লাগবে। ওসি সাহেব কী
বলেছেন? আপনাকে কোটে তোলা হবে? না-কি কয়েকদফা ডলা দিয়ে
ছেড়ে দেবে?

আলম হতাশ গলায় বললেন, ওসি সাহেব দশ হাজার টাকা চেয়েছেন।
টাকা দিলে মামলা কোটে উঠবে না। আমি দশ হাজার টাকা কই পাব?
দু'টা প্রাইভেট টিউশানি করে মাসে আড়াই হাজার টাকা পাই। পত্র-
পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়ে গেছে। টিউশানিওতো এখন থাকবে না।

আমি বললাম, না থাকারই কথা। সন্ত্রাসীকে কে শিক্ষক হিসাবে
রাখবে? উন্নতমানের সন্ত্রাসী হলে একটা কথা ছিল। জুতা সন্ত্রাসী।

কী বিপদে পড়লাম দেখেন। রাতে কিছু থাই নাই। সকালেও না। টাকা
দিলে এরা থানা এনে দেয়। টাকা নাই থানাও নাই।

আমি বললাম, মশাৰ কামড় থাচ্ছেন না? মশা এবং ছারপোকা
কামড়ালে ক্ষুধা কমে। বৈজ্ঞানিক সত্য। পাঞ্জাবিটা খুলে রাখুন। ভালোমতো
মশা কামড়াক। কম্বল বিছিয়ে শয়ে পড়ুন। ছারপোকা চলে আসবে।

আপনাকে চেনা চেনা লাগছে। আপনার পরিচয়?

আমি সেই লোক যার জন্যে আপনি জুতা সন্ত্রাসী হয়েছেন।

আলম অবাক হয়ে বলল, আপনি আলামত নিয়ে এসেছেন?

জি। আলামতের অভাবে পুলিশের বেশির ভাগ মামলা হয় নড়বড়ে।
আমাদের উচিত পুলিশকে সাহায্য করা।

আলম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আজিব দুনিয়া।

পোশাকের যে আলাদা ইজ্জত আছে এটা কবি শেখ সাদী বুঝেছিলেন।
রাজসভাতে রান্ধি জামা কাপড় পরে গিয়েছিলেন বলে তাকে সবার পেছনে
বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি পরে ডিন জরির ঝালর দেয়া পোশাকে
উপস্থিত হলেন। তাঁকে সমাদরে প্রথম সারিতে বসানো হল। মনের দুঃখে
তিনি লিখলেন—

“রাজসভাতে এসেছিলাম
বসতে দিলে পিছে
সাগর জলে শুক্রে ভাসে
মুক্তা থাকে নিচে।”

আমার স্যুট টাই দেখে ওসি সাহেব বিভ্রান্ত হলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে
দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, স্যার বসুন।

আমি বসতে বসতে বললাম, ভালো আছেন?

ওসি সাহেবে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়তে গিয়ে আমার খালি পায়ের দিকে
তাকালেন। তাঁর ক্রু কুঁচকে গেল। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমি
বললাম, জুতা পায়ে নেই কিন্তু আমার সঙ্গে আছে। এই ব্রাউন পেপার
ব্যাগে। দেখতে চান?

আপনার সমস্যা কী?

আমি বললাম, সমস্যা আমার না, সমস্যা দেশের। জুতা সন্ত্রাসী নামে নতুন সন্ত্রাসী গ্রহণ বের হয়েছে। এরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে দেখা যাবে শুধু জুতা নিচে না। জুতার সঙ্গে পায়ের পাতা কেটে নিচে। মনে করুন আপনার বুট জুতা জোড়া নিয়ে গেল, বুটের ভেতর আপনার পায়ের পাতা।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার কথাবার্তা অত্যন্ত এলোমেলো কি জন্যে এসেছেন বলুন।

আমি হাসিমুখে বললাম, হাজতে আলম নামে একজন বসে আছে। শুনলাম দশ হাজার টাকা ঘূৰ দিতে হবে। আপনারা ঘূৰটা কি ক্রেডিট কার্ড নেবেন? আমার কাছে ভিসা, আমেরিকান এক্সপ্রেস দুই-ই আছে।

ওসি সাহেব পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, আপনাদের ঘূৰ গ্রহণ কর্মকাণ্ড আরো আধুনিক করা উচিত। থানার দরজাতেই লেখা থাকবে, ভিসা কার্ড, আমেরিকান কার্ডে ঘূৰ লেনদেন করা যাবে। ভালো কথা ঘূৰের উপর কি ভ্যাট আছে?

ওসি সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, এতক্ষণ আপনাকে চিনতে পারি নি। এখন চিনেছি। আপনি হিমু। স্যুট টাই এভ্রি টংটা কী জন্যে? আপনি কি জানেন পুলিশকে ঘূৰ সাধার অপরাধে আপনাকে হাজতে চুকাতে পারি?

আমি বললাম, জানি। আবার এও জানি চালে সামান্য ভুল করলে আপনি চলে যাবেন খাগড়াছজ্জিৎ। স্ট্যান্ড রিলিজ। সেখানে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে বুলো হাতি। থানাওয়ালারা সব রাতে থানা ফেলে হাতির ভয়ে গাছে উঠে বসে থাকে। ঘূৰখোর অফিসাররা মানসিকভাবে দুর্বল থাকে। হাতি দেখলেই তারা হাত পা ছেড়ে দেয়। ধূস্তুস করে পাকা ফলের মতো গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ওসি সাহেব আপনি অতি দুর্বল মনের একজন মানুষ। আমাকে হাজতে ঢোকানোর সাহস আপনি সঞ্চয় করতে পারছেন না। আমার সঙ্গে আপনি আপনি করে কথা বলছেন। বিশিষ্ট কেউ আমার পেছনে আছে এই ধারণা আপনার মধ্যে বন্ধুমূল হয়ে গেছে। চা খাব। ওসি সাহেব চা খাওয়ানতো।

ওসি সাহেবের হাতে কাঠ পেনসিল। তিনি পেনসিল দিয়ে টেবিলে ঠক ঠক করছেন। মনের অস্ত্রিতার পেনসিল প্রকাশ বলা যেতে পারে। তিনি আমার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবেন এখনো বুঝা যাচ্ছে না। দুর্বল মনের মানুষের প্রধান ত্রুটি সিদ্ধান্তহীনতা, তবে তিনি যেভাবে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন তাতে মনে হয় চবিশ ঘণ্টা হাজতে থাকতে হতে পারে।

তিনি হাতের পেনসিল টেবিলে নামাতে বললেন, দুধ চা খাবেন
না রং চা?

দুধ চা।

উইথ সুগার?

জি। প্রচুর হাঁটাহাঁটি করিতো টাইপ টু ডায়াবেটিস এখানো আমাকে
ধরতে পারে নি।

ওসি সাহেব পেনসিল দিয়ে ইশারা করলেন। চায়ের কাপে চামুচ নাড়ার
মতো করলেন। গন্ধীর গলায় বললেন, চা খেয়ে সুবোধ বালকের মতো
হাজতে চুকে পড়বেন। আপনাকে অন্ত্র আইনে ফ্রেফতার করা হল।

আমি বললাম, অন্ত্র কোথায়?

ওসি সাহেব বললেন, আমাদের কাছে কিছু অন্ত্র, গুলি, জর্দার কোটা
মজুদ থাকে। যাদের চোখ খারাপ, চোখে শুধু ঘুঘু দেখে ফাঁদ দেখতে পায়
না তাদের জন্যে এই ব্যবস্থা। অন্ত্র আইনে ফ্রেফতার করে উদ্ধার করা অন্ত্র
আলামত হিসাবে জমা দেয়া হয়।

পত্রিকায় ছবিও তো ছেপে দেন।

না, আমরা সব সময় ছবি ছাপি না। কাগজওয়ালাদের ইনভলব করলে
সমস্যা বেশি হয়।

ছবিটা ছাপা হলে ভালো হবেগতো। আমার স্যুট টাই পরা কোনো ছবি
নাই।

ওসি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাব ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে
কঠিন কোনো কথা বলতে চান। কথা মাথায় আসছে না।

চা চলে এসেছে। পেনসিলের ইশারা ভালো হয় নি। দুধ চা চেয়েছিলাম
এসেছে রং চা। আমি চায়ে চুমুক দিয়ে তৃণির ভান করে বললাম, ওসি
সাহেব একটা ধাঁধার জবাব দিতে পারবেন। জবাব দিতে পারলে পুরস্কার
আছে। ধাঁধাটা হল, মূরগির দাঁত কয়টা?

ওসি সাহেব ঘোঁট টাইপ শব্দ করলেন। হঠাৎ করেই তাঁর মুখ রক্তশূন্য
হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা আছে। কোন এক সময় পরিষ্কার
হবে।

আমি হাজতে আলমের পাশে গিয়ে বসলাম। হতভব আলমকে
বললাম, আলামত জমা দিতে গিয়ে ধরা খেয়েছি। অন্ত্র আইনে মামলা

হবে। সাত আট বছর জেলের লাপসি খেতে হতে পারে। জেলের বাবুচি
কেমন কে জানে।

আলম বিড়বিড় করে বলল, কি সর্বনাশ।

আমি বললাম, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা অর্থহীন। পদার্থবিদরা বলা
গুরু করেছেন আজ কাল এবং পরশু আসলে একই সময়। নাস্তা কী খাবেন
বলুন। আপনার নাস্তার ব্যবস্থা করি। গরম পরোটা কলিজা ভুনা খাবেন?
থানার আশেপাশে ভালো রেস্টুরেন্ট থাকে, হাজতিরা ভালো খেতে পছন্দ
করে।

আলম বলল, আপনার সঙে টাকা আছে?

আছে।

এক প্যাকেট সিগারেট আনায়ে দেন। সিগারেটই খাব।

ব্যবস্থা করছি। হাজতে এই প্রথম?

জি।

আনন্দে সময় কাটানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সামনে যে দেয়ালটা
দেখছেন মনে করুন এটা একটা ২৯ ইঞ্জিন কাল্পার টিভি। টিভিতে বাংলাদেশ
নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট খেলা দেখাচ্ছে। স্মৃতির করে খেলা দেখুন।

ভাই সাহেব এই সব কী বলেন? আপনার তো মাথায় সমস্যা আছে।

সমস্যা আমাদের সবার মাথায় আছে। যাই হোক দেয়ালে টিভি দেখার
চেষ্টা চালিয়ে যান। মনোসংযোগ করুন। আপনি পারবেন। আমি এর মধ্যে
নাস্তা আর সিগারেটের ব্যবস্থা করছি।

আলম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, আজ কাল এবং পরশু আসলে
একই সময় ব্যাপারটা বুঝলাম না। যদি বুঝিয়ে বলেন।

আমি বললাম, যারা এই কথা বলছেন তারা নিজেরাও বুঝতে পারছেন
না। আমি কী বুঝাব। এই সব উচ্চ চিন্তা বাদ দিয়ে টিভি দেখুন।

হাজতি সব মিলিয়ে আমরা তিন জন। একজন বালক হাজতি, বয়স
বার তেরের বেশি হবে না। নাম কাদের।

আমরা তিনজনই গভীর আগ্রহে কালিখুলি মাথা শূন্য দেয়ালের দিকে
তাকিয়ে আছি। বালক হাজতির উৎসাহ সবচে বেশি। সে চোখের পলকও
ফেলছে না, হা করে তাকিয়ে মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। সেন্ট্রিদের
একজন অবাক হয়ে বলল, আপনারা কী দেখেন?

বালক হাজতি বলল, টিভিতে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড খেলা দেখি।

টিভি কই?

ঐ তো টিভি। ‘ডিস্টাব’ দিয়েন না তো। ইচ্ছা হইলে খেলা দেখেন।

হাজতিরা টিভিতে খেলা দেখছে এই খবর নিশ্চয় ওসি সাহেবের কাছে পৌছেছে তাকেও একবার দেখলাম পেনসিল হাতে উঁকি দিয়ে যেতে। এই ভদ্রলোক পেনসিল ছাড়া চলতেই পারেন না বলে মনে হচ্ছে। দুর্ধর্ষ আসামী ধরার সময় পিস্তলের মতো পেনসিল তাক করেন কি-না কে জানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ডাক পড়ল। ওসি সাহেব খবর দিয়েছেন। আমি বলে পাঠালাম, খেলার মাঝখানে উঠে আসতে পারব না। লাঞ্চ ব্রেকে আসব। হাই টেনশানের খেলা।

ওসি সাহেব এবং আমি মুখোমুখি বসে আছি।

তিনি যথারীতি হাতের পেনসিল নাচাচ্ছেন। আড়চোখে আমাকে মাঝে মধ্যে দেখছেন। বুঝতে পারছি আমাকে নিয়ে কোনো হিসাব নিকাশ হচ্ছে। কী বলে কথা শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না বলে সময় নিচ্ছেন। আমিই আলোচনা শুরু করলাম। আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, স্যার আপনি কি লক্ষ করেছেন পেনসিল সব সময় আটতল ফিলিং হয়। গোল হয় না। কারণটা জানেন?

না।

বলব?

ওসি সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উপেক্ষা করে বললাম, আটতলের কারণে পেনসিল সহজে টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ে না।

আপনার কাছ থেকে বিরাট জ্বান লাভ করলাম। আপাতত মুখ বন্ধ করুন। প্রশ্ন করলে জবাব দিবেন।

অবশ্যই জবাব দেব। একটাই অনুরোধ কঠিন প্রশ্ন করবেন না। সায়েন্স বাদ। আমি বিজ্ঞানে দুর্বল। পৃথিবীর ওজন কত জিজেস করলে বলতে পারব না। এটম বোমা কে আবিষ্কার করেছেন তাও বলতে পারব না।

গুলাম হাজতিদের নিয়ে টিভি দেখছিলেন।

ঠিকই শুনেছেন। বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের খেলা। না দেখে পারছি না।

আর যাই করেন পুলিশের সঙ্গে ফাজলামি করবেন না।

পুলিশের সঙ্গে কোনো ফাজলামিতো করছি না। দেয়ালের সঙ্গে করছি।

আমি আপনার বিষয়ে খবর নিয়েছি আপনি অতি ধুরঙ্কর একজন মানুষ। ধুরঙ্কর কিভাবে টাইট করতে হয় আমি জানি।

জানলে টাইট করে দিন। তবে একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। যে টাইট করে সে একই সময় নিজে লুজ হয়। আপনি আমাকে যতটা টাইট করবেন নিজে ঠিক ততটাই লুজ হবেন। এটা বিজ্ঞানের সূত্র।

বিজ্ঞানের সূত্র? আমাকে বিজ্ঞান শেখান?

আপনাকে কীভাবে বিজ্ঞান শেখাব? আমি আগেই স্বীকার করেছি আমি সায়েসে দুর্বল। তবে নিউটনের সূত্রে আছে-To every action there is an equal and opposite reaction. আপনি আমাকে টাইট দিলে নিউটনের সূত্র অনুসারে আপনাকে লুজ হতে হবে। অর্থাৎ আপনার ব্রেইনের নাট বল্টু লুজ হতে থাকবে। দু'একটা খুলেও পড়ে যাবে। একদিন দেখা যাবে পেনসিল হাতে পথে পথে ঘুরছেন। যাকেই দেখছেন তার সঙ্গেই পেনসিলের ইশারায় কথা বলছেন। সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন, মুরগির কি দাঁত আছে। কেউ আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছে না বলে জবাব দিতে পারছে না।

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেস, বার বার মুরগির দাঁতের প্রশ্ন আসছে কেন?

এই ধাঁধাটা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাব দিতে পারেন নি বলে আবার মুরগির দাঁত চলে এসেছে।

চা খাবেন?

খাব। দুধ চা, চিনিসহ। দয়া করে পেনসিলে অর্ডার দেবেন না। আপনার পেনসিলের অর্ডার কেউ বুঝতে পারে না।

চা চলে এসেছে। এবার কোনো ভুল হয় নি। চা ঠিক আছে। আলাদা পিরিচে চার পাঁচটা বামুন সিঙাড়া। এক সঙ্গে পাঁচ ছয়টা মুখে দেয়া যায়।

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, আপনাকে কি আমি ছেট্ট একটা গল্প বলতে পারি?

না। চা খান, সিঙাড়া খান। গল্প বলতে হবে না।

হজুগে বাঙালি নিয়ে একটা রসিকতা করতে চাচ্ছিলাম। এই রসিকতা থেকে বুঝা যাবে আপনি আসল পুলিশ অফিসার না-কি ভেজাল। রসিকতা শুনে আপনি যদি শব্দ করে হাসেন তাহলে আপনি ভেজাল। আসল পুলিশ অফিসার কখনো জোকস শুনে হাসে না।

গল্প বলুন শুনি ।

ওসি সাহেব মুখের চামড়া আরো শক্ত করতে চাচ্ছেন । পারছেন না ।
গল্প শোনার লোভ তাঁর মধ্যে কাজ করছে । হজুগের এই গল্প আমি
অনেকের সঙ্গে করেছি । যারা শুনেছে তারা সবাই হো হো করে হেসেছে ।
শুধু পুলিশ অফিসাররা কেউ হাসেন নি । আমি গল্প শুরু করলাম ।

এক ভদ্রলোক মতিঝিলে কাজ করেন । সত্ত্বর তলায় তাঁর অফিস ।
একদিন তিনি মন দিয়ে ফাইল দেখছেন তখন হত্তদন্ত হয়ে তার রুমে
পিওন চুকে উত্তেজিত গলায় বলল, স্যার খবর শুনেছেন আপনার স্ত্রীতো
আপনার গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন!

ভদ্রলোক চূড়ান্ত অপমানিত বোধ করে জানালা খুলে লাফ দিলেন ।
লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, আরে আমারতো গাড়িই নাই ।
ড্রাইভারের প্রসঙ্গ আসছে কেন?

কংক্রিটের মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগ মুহূর্তে মনে হল, আরে
আমিতো এখনো বিয়েই করি নি ।

ওসি সাহেব শব্দ করে হেসে উঠলেন । ভানেক কষ্টে হাসি থামালেন ।

আমি বললাম, ভাই আপনিতো জেঙ্গাল পুলিশ অফিসার ।

ওসি সাহেব বললেন, আমি বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল পাওয়া
অফিসার । এখন পর্যন্ত এক টাঙ্কু ঘূৰ খাই নি ।

এই জন্যেই তো আপনি ভেজাল ।

ওসি সাহেব হাতের পেনসিল নামিয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন,
একটা কাগজে আপনার নাম ঠিকানা লিখে চলে যান ।

ছেড়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ ছেড়ে দিচ্ছি ।

আমি যাব না ।

যাবেন না মানে?

আমার সঙ্গে আরো যে দু'জন আছে তাদেরকে না নিয়ে যাব না । আমি
একজন রাশিয়ান পরী বিয়ে করতে যাচ্ছি । আমার লোকবল নাই । এরা
থাকলে নানান ভাবে সাহায্য করবে । গায়ে হলুদের ব্যাপার আছে । মেয়ের
বাড়িতে মাছ পাঠাতে হবে । বিয়েতে আপনি উপস্থিত থাকলে আমি খুবই
খুশি হব স্যার ।

ওসি সাহেব হাতের পেনসিল নামিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন ।

সন্ধ্যার দিকে আমরা তিনজনই ছাড়া পেলাম। আলম এবং বালক হাজতি কাদের আমার মেসে থাকতে এল। কাদের ঘোষণা করল সে বাকি জীবন আমার সঙ্গে থাকবে। আমার সেবা করবে। গা হাত পা টিপে দিবে।

আলম এই জাতীয় কোনো কথা বললেন না তবে তিনি জানালেন যে মেস বাড়িতে থাকবেন সেখানে তাঁর মুখ দেখানোর অবস্থা নেই। মেসে অনেক টাকা বাকিও পড়েছে, কাজেই...

গত সাতদিনে আমার জীবনে যে সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে তা আলাদা শিরোনামে লিখছি। পাঠকদের সুবিধার জন্যে। পাঠকরা যে সব ঘটনা জানতে চান শিরোনাম দেখে তা ঠিক করবেন। ঘটনা প্রবাহ নিম্নরূপ।

রাশিয়ান পরী

তার ঢাকায় আসার সময় হয়ে গেছে। আগামী বৃহবার সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনসে আসছে। মাজেদা খালাকেসে একটি e-mail পাঠিয়েছে। খালা তার কপি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এর বাংলা-

আমার খাদ্য : নিরামিশ। মাঝে মধ্যে ডিম চলতে পারে। রাতে ফলাহার করি। একটা আপেল (সবুজ), একটা কলা এবং থাই পেপে। লাক্ষে আমি এক গ্লাস রেড ওয়াইন থাই (৭৫ ml). ঘুমাতে যাবার আগে ব্ল্যাক কফি।

বাসস্থান : আমি সাধারণ বাংলাদেশী একটি পরিবারের সঙ্গে থাকতে চাই। পেইং গেস্ট হিসেবে থাকব। এটাচড বাথরুম থাকতে হবে। টয়লেট পেপার থাকতে হবে। এই বাথরুম অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। টয়লেটে অবশ্যই হট ওয়াটারের ব্যবস্থা থাকবে। দরজা জানালায় নেট থাকবে যাতে মশা মাছি না আসে। বেডশিট এবং টাওয়েল প্রতিদিন সকল দশটার মধ্যে বদলাতে হবে। ঘরে অবশ্যই এসি থাকতে হবে। ইন্টারনেট কানেকশান লাগবে।

যাতায়াত : আমার জন্যে একটা সাইকেল লাগবে। আমি সাইকেলে যাতায়াত করব। যে আমার গাইড তাকেও সাইকেলে সর্বক্ষণ আমাকে হিমসমগ্র-২৩ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com রাশিয়ান পরী ৩৫৩

অনুসরণ করতে হবে। গাইড প্রতিদিন একশ ডলার করে পাবে। তার খাওয়া-দাওয়া এর মধ্যেই ধরা থাকবে। আমার মেয়ে পরিচয় গাইড নিজে জানবে কিন্তু কাউকে জানাতে পারবে না।

গাইড : গাইডের ইংরেজি ভাষায় দখল থাকতে হবে। আমি বাংলা ভাষা শিখে এসেছি তারপরেও কিছু কথা হয়তোবা আমি বাংলায় প্রকাশ করতে পারব না। গাইডকে বুদ্ধিমান হতে হবে। থার্ডওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে বকর বকর করতে পারাকেই বুদ্ধিমত্তা ধরা হয়। আমার গাইড অতিরিক্ত কথা একেবারেই বলবে না।

আলম এবং বালক হাজতি কাদের

মেসে আমার পাশের ঘরটি তাদের জন্যে ভাড়া নিয়েছি। আলম দিন রাত চৰিশ ঘণ্টা এই ঘরে থাকেন। ঘর থেকে বের হন না। দাঢ়ি গোফ কামান না। যে কোনো কারণেই হোক তিনি মহাদুচ্ছিত্যায় আছেন। দুচ্ছিত্যাগ্রস্ত মানুষের চুল দাঢ়ি দ্রুত বাড়ে। তারও বেড়েছে। লম্বা দাঢ়ি গোফে তার চেহারায় ঝিখিভাব চলে এসেছে। তাকে দেখে মনে হয় সারাক্ষণ বিশেষ কিছু নিয়ে ভাবছেন। তিনি কেরোসিন কুকার কিনেছেন। দুইবেলা নিজে রান্না করে নিজের খাবার নিজেই খেন। কাদেরকে ভাগ দেন না। এ নিয়ে কাদেরের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আলম যেমন সারাক্ষণ ঘরের ভেতর থাকেন, কাদের থাকে বাইরে। রাতে হঠাত হঠাত আসে। তাকে দেখে মনে হয় সে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। পরিকল্পনা সে কারো কাছে প্রকাশ করছে না। সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। মাথা নিচু করে মেঝেতে বসে থাকে। আমার চোখের দিকে তাকায় না।

একরাতে আমি নিজ থেকেই বললাম, কিছু বলবি?

হঁ।

বলে ফেল। পেটে কথা জমিয়ে রাখা ঠিক না। পেটে বেশিদিন গোপন কথা থাকলে এ্যাপেন্সিসাইটিস ফুলে যায়। ব্যথা শুরু হয়। তখন আর অপারেশন ছাড়া গতি থাকে না।

একটা খুন করতে চাই ভাইজান।

খুন করতে চাইলে কর। এত চিন্তার কি আছে?

কাদের চমকে মাথা তুলে তাকালো। আবার চোখ নামিয়ে ফেলল। সে আমার কথায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত।

কারে খুন করতে চাই শুনবেন?

না। যাকে খুন করবি সেতো শেষই হয়ে যাবে। তার কথা শুনে লাভ কী?

খুনের তারিখ ঠিক করেছি। বুধবার দিবাগত রাত।

ঐ তারিখটা বাদ দে। ঐ দিন তোকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাব। পঞ্জিকা দেখে ভালো একটা তারিখ বের করে দিব। ভালো কাজ চিন্তা ভাবনা করে করতে হয় না। মন্দ কাজ অনেক চিন্তা ভাবনা করে করতে হয়।

কাদের বলল, ধরা পড়লে পুলিশ ফাঁসিতে ঝুলাবে না?

তোর বয়স কম ফাঁসিতে ঝুলাবে না। সংশোধন কেন্দ্রে পাঠাবে। সংশোধন কেন্দ্র অপরাধের বিরাট ট্রেনিং সেন্টার। সেখান থেকে ইনশাম্মাহ মারাত্তক সন্ত্রাসী হয়ে বের হবি। লোকে তোকে খাতির করবে। টহল পুলিশের সঙ্গে দেখা হলে টহল পুলিশের সালাম পাবি।

ভাইজান আর শুনতে চাই না। চুপ করেন।

আমি চুপ করলাম।

মাজেদা খালু, খালু সাহেব এবং মানিব্যাগ সমাচার

খালু সাহেবের সঙ্গে তাঁর হারানো মানিব্যাগ নিয়ে আমার কথা হয়েছে। মুখ্যমুখ্য না, টেলিফোনে।

আমি : খালু সাহেব ভালো আছেন। আপনার প্রেসারের অবস্থা কী?

খালু : আমার প্রেসার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার নিজের প্রেসার নিয়ে মাথা ঘামাও।

আমি : মানিব্যাগটা কী পাওয়া গেছে?

খালু : হারানো মানিব্যাগ কখনো পাওয়া যায়? খেজুরে আলাপ আমার সঙ্গে করবে না। Stupid.

আমি : খালু সাহেব!

নিজ উদ্যোগে আমি আপনার মানিব্যাগের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি এবং কিছু ফল পেয়েছি।

খালু : কিছু ফল পেয়েছে মানে কী?

আমি : ধোঁয়া বাবা বলেছেন মানিব্যাগ অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিছু টাকা হয়ত পাওয়া যাবে না। বাকি সব পাওয়া যাবে।

- খালু : আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ?
- আমি : আমি ইয়ার্কি করব কেন? ধোঁয়া বাবা যা বলছেন তাই বললাম।
উনি মানিব্যাগে বাংলাদেশি টাকার পরিমাণ বলতে পারেন নি তবে
আমেরিকান ডলারের সাতশ ডলার আছে এটা বলে দিয়েছেন।
- খালু : কী বললে?
- আমি : জরুরি কিছু কাগজপত্র ক্লিপ দিয়ে আটকানো এটাও বললেন।
- খালু : (খানিকটা নরম) ধোঁয়া বাবাটা কে?
- আমি : উনি আধ্যাত্মিক মানুষ। বৃড়িগঙ্গার ওপাশে থাকেন। কোনো খাদ্য
গ্রহণ করেন না। শুধু ধোঁয়া খান।
- খালু : ধোঁয়া খান?
- আমি : জি। সিগারেট বা গাঁজার ধোঁয়া না। তেজা খড় পুড়ানো ধোঁয়া
খেয়ে জীবনধারণ করেন।
- কালু : এই সব বুজুর্কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল?
- আমি : বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার। মানিব্যাগ পাওয়া গেলেই
তো হল। তা ছাড়া শেকসপিয়ারে বলে গেছেন— There are
many things in heaven and earth. উনার কথাও ফেলে দেয়ার
মতো না। এত বড় একজন নাট্যকার।
- খালু : যারা নিজে stupid, তারা অন্যদের stupid ভাবে। তুমি stupid
বলেই আমাকে stupid ভাবছ। ধোঁয়া বাবা সম্পর্কে আর কথনোই
কিছু বলবে না।
- আমি : জি আচ্ছা বলব না। মানিব্যাগ পাওয়া গেলে কী করব?
[খালু সাহেবের টেলিফোন রেখে দিলেন]

মাজেদা খালার সঙ্গে আমার রোজই কথা হচ্ছে। তিনি দু'টি বিষয়
নিয়ে উত্তেজিত। এলিতার ঢাকায় আসা এবং খালু সাহেবের মানিব্যাগে রাখা
টেলিফোন নাম্বার।

মাজেদা খালা জানিয়েছেন তিনি টেলিফোন নাম্বার বিষয়ে গোপন
অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মোটামুটি নিশ্চিত পরকীয়া জাতীয় কিছু।
তিনি জানিয়েছেন সত্যি যদি এমন কিছু হয় তাহলে তিনি খালু সাহেবের
মুখে এসিড ছুঁড়বেন। শুধু পুরুষরাই মেয়েদের মুখে এসিড ছুঁড়বে তা হবে
না। এসিড কিনে দেয়ার দায়িত্ব তিনি আমাকে দিয়েছেন।

আমি দুই লিটারের একটা পানির বোতলে সাদা ভিনিগার ভর্তি করে খালাকে দিয়ে এসেছি। ভিনিগারও এক ধরনের এসিড। খালা ভিনিগার লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর আলমিরাতে। সব এসিড ভয়ঙ্কর না। ভিনিগার এসিড হলেও সুখাদ্য।

পেনসিল ওসি

পেনসিল ওসি সাহেবের আসল নাম আবুল কালাম। তিনি এই নিয়ে তৃতীয় দফা আমার কাছে এসেছেন।

ভদ্রলোক ইংরেজি সাহিত্যে MA. তাঁর গায়ে যখন পুলিশের পোশাক থাকে না তখন তাঁকে অধ্যাপক বলেই মনে হয়।

তিনি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে আসেন এটা পরিষ্কার। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার না। আমার ধারণা আমি পুলিশের নজরদারিতে আছি। পুলিশ মাঝে মাঝে কঠিন অপরাধীদের ছেড়ে দেয়। পেছনে ফেউ লাগিয়ে রাখে। অপরাধী কোথায় যায় কার কাছে যায় এইসব মনিটার করা হয়।

ওসি সাহেবের দেখলাম কাদের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ।

কাদের ছেলেটা কি আপনার সঙ্গেই থাকে?

হ্যাঁ। যাবার জায়গা নাই।

কাদের আগে কোথায় ছিল জানেন?

না।

জানতে ইচ্ছা হয় না?

না। না-জানাই ভালো। এ জগতে সবচে সুখী হচ্ছে যে কিছুই জানে না যেমন চার বছরের নিচের বয়সের শিশু। ...

আমি অনেকের কাছে শুনেছি আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। আমার সিগারেটের প্যাকেটে কয়টা সিগারেট আছে বলতে পারবেন?

না।

মানিব্যাগে কত টাকা আছে সেটা জানেন?

না।

আপনার বিষয়ে কেন ছড়াল যে আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে?

মানুষ মিথ তৈরি করতে ভালোবাসে। আপনি ইংরেজি সাহিত্যের MA আমাকে আপনার পছন্দের একটা ইংরেজি কবিতা শনান।

কেন?

এমনি। আপনি কিম ধরে আছেন। আমিও কিম ধরে আছি। কিম
কাটানোর ব্যবস্থা।

I have been here before,
But when or how I cannot tell.
I know the grass beyond the door.
The sweet heen smell,
The sighing sound, the lights around the shore.

ওসি সাহেব কবিতা শেষে উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, আবার কবে
আসবেন?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। আমি হঠাতে করে বললাম, পায়ের
আলতা খুব সুন্দর জিনিস কিন্তু আলতাকে সব সময় পায়ে পড়ে থাকতে হয়
এর উপরে সে উঠতে পারে না।

ওসি সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, হঠাতে আলতার প্রসঙ্গ তুললেন কেন?

এমনি তুললাম। আলাপ আলোচনাৰ মানুষ প্রায়ই প্রসঙ্গ ছাড়া কথা
বলে। ননসেঙ্গ রাইম যেমন আছে, ননসেঙ্গ কথাবার্তাও আছে।

ওসি সাহেব বললেন, আমাৰ স্ত্ৰীৰ নাম আলতা এটা আপনি জানেন?
আগে জানতাম না। এখন জানলাম।

ওসি সাহেব কঠিন চোখে কিছুক্ষণ আমাৰ দিকে তাকিয়ে থেকে চলে
গেলেন। অদ্বোক বড় ধৰনেৰ ধাক্কা খেয়েছেন। ধাক্কা সামলাতে কিছু সময়
লাগবে।

তানিজা এবং তার বাবাৰ জুতা

তানিজাকে তাৰ বাবাৰ জুতা ফিরিয়ে দিয়েছি। বাসায় তখন তানিজা এবং
তাৰ কাজেৰ মেয়ে ছাড়া কেউ ছিল না। সদৱ দৱজা তালাবদ্ধ। কথা হল
জানালা দিয়ে।

আমি বললাম, তালাবদ্ধ কেন?

তানিজা বলল, মা বাইৱে গেছে তো এই জন্যে। তালা খোলা থাকলে
অনেক সমস্যা।

সমস্যা বেশি থাকলে তালাবন্দ থাকাই ভালো । আমি তোমার বাবার
জুতা ফিরিয়ে দিতে এসেছি ।

আপনার রঙ পছন্দ হয় নি? অন্য রঙ দেব?

রঙ ঠিক আছে । ঠিক করেছি জুতা পরব না ।

চা খাবেন । চা দেব ।

দাও এক কাপ চা ।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে চলে এলাম ।

এলিতা ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌছল ডিসেম্বর মাসের চার তারিখ । বৃথাবার
সময় সকাল নটা । দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি, জেট লেগ, অপরিচিত নতুন দেশে
প্রথম পা দেওয়ার শক্ষায় সে খানিকটা বিপর্যস্ত ।

সে ছেলে সেজে আসে নি । মেয়ে সেজেই এসেছে । কালো টপের সঙ্গে
লাল, হলুদ, সবুজ রঙের স্কার্ট । রঙগুলো একটির গায়ে একটি মিশে
সাইকাডেলিক আবহ তৈরি করেছে । আমার সঙ্গে কাদের । সে বিড় বিড়
করে বলল, কেমুন সুন্দর মেয়ে দেখছেন ভাইজান? সাক্ষাৎ হুৰ ।

কাদেরের হাতে প্ল্যাকার্ড ধরা । সেখানে বাংলায় লেখা মি. এলিত ।
এলিতার আকার বাদ দেয়া হয়েছে নামের মধ্যে পুরুষ ভাব আনার জন্য ।

এলিতা এগিয়ে এল ।

আমি বললাম, তোমার না পুরুষ সেজে আসার কথা ।

এলিতা বলল, পাসপোর্টে লেখা আমি মেয়ে, পুরুষ সেজে আসব
কীভাবে?

মাজেদা খালা বলেছিলেন, এলিতা চিচার রেখে বাংলা শিখে এসেছে ।
তার বাংলার নমুনায় আমি চমৎকৃত । সে বলল, ‘আইচা টিক চে’ । আমি
বললাম, এর মানে কী? এলিতা বলল, এর অর্থ হয় It's O.K. তখন বুঝা
গেল সে বলছে ‘আচ্ছা ঠিক আছে’ । তার অস্তুত বাংলায় আচ্ছা ঠিক আছে
হয়ে গেল ‘আইচা টিক চে’ ।

তার আরো কিছু বাংলা,

উষ্ণ লগ চে : উষ্ণ লাগছে । অর্থাৎ গরম লাগছে ।

খাইদ ভল চে : খাদ্য ভালো লাগছে ।

কিনিত বিরাকত : কিঞ্চিৎ বিরক্ত ।

পাঠকদের সুবিধার জন্যে তার সঙ্গে কথোপকথন সহজ বাংলায় লেখা হবে । তবে দু'একটা বিশেষ ধরনের বাংলা ব্যবহার করা হবে । কাদেরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর এলিতা অবাক হয়ে বলল, “বালকের চশখু পবিত্রতা হয় ।” অর্থাৎ এই বালকের চোখের মধ্যে পবিত্রতা আছে ।

ইয়েলো ক্যাব নিয়ে আমরা ঢাকার দিকে যাচ্ছি । সে আগ্রহ নিয়ে ঢাকা শহর দেখছে । তার চোখে খানিকটা বিস্ময় বোধ । সে বলল, তোমাদের শহরতো যথেষ্ট পরিষ্কার ।

তুমি কি ভেবেছিলে? নোংরা ঘিঞ্চি শহর দেখবে?

হ্যাঁ । আমাকে তাই বলা হয়েছে । রাস্তায় এত দামী দামী গাড়ি দেখেও অবাক হচ্ছি । রিকশা কোথায়? আমি ওনেছি ঢাকা রিকশার শহর । গায়ে গায়ে রিকশা লেগে থাকে । ফুটপাত দিয়ে কেউ হাঁটতে পারে না । রিকশার উপর দিয়ে হাঁটতে হয় ।

রিকশা প্রচুর দেখবে । এটা ভিআইপি মোড এই রোডে রিকশা চলাচল করে না ।

আমি যে বাড়িতে পেইং গেস্ট থাকব সেখানে কি যাচ্ছি?

মাজেদা খালার বাসায় ত্রৈমাসকে রাখার প্রাথমিক চিন্তা ছিল । সেটা ঠিক হবে না । তিনি তাঁর স্বামীর গায়ে এসিড ছুড়ে মারার জন্যে আলমারিতে এক বোতল এসিড লুকিয়ে রেখেছেন । এসিড ছোড়াছুড়ির মধ্যে উপস্থিত থাকা কোনো কাজের কথা না ।

এসিড ছুড়ে মারা মানে?

এসিড ছুড়ে মুখ ঝলসে দেয়া এ দেশে স্বাভাবিক ব্যাপার । মনে কর কোনো ছেলে কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল । মেয়ে রাজি না হলেই মুখে এসিড ।

Oh God.

আমি যদি তোমাকে প্রেমের প্রস্তাব দেই সঙ্গে সঙ্গে না বলবে না । কায়দা করে এড়িয়ে যাবে ।

না বললে আমার মুখে এসিড মারবে?

সম্ভাবনা আছে । আমি তো এই দেশেই বাস করি ।

লেগপুলিং করবে না । আমি কোথায় থাকব সেই ব্যবস্থা কর ।

তোমাকে হোটেলেই থাকতে হবে। পেইং গেস্ট হিসেবে কেউ তোমাকে রাখতে রাজি হবে না।

কেন রাজি হবে না?

রাজি না হবার অনেক কারণ আছে। মূল কারণ একটাই। মূল কারণ কেউ তোমাকে বলবে না। আমি বলে দেই?

দাও।

মূল কারণ হল তুমি পরীর মতো ঝুপবতী একটি মেয়ে। এমন ঝুপবতী একজনকে কোনো গৃহকর্ত্তা বাড়িতে জায়গা দেবে না। তাদের স্বামী তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায়।

এলিতা শব্দ করে হাসছে। তার হাসি দেখতে এবং হাসির শব্দ শুনতে ভালো লাগছে। বাংলাদেশের কিশোরীরা শব্দ করে হাসে। একটু বয়স হলেই হাসির শব্দ গিলে ফেলে হাসার চেষ্টা করে। চেষ্টাতে সাফল্য আসে। এক সময় হাসির শব্দ পুরোপুরি গিলে ফেলতে শিখে যায়। হারিয়ে ফেলে চমৎকার একটি জিনিস।

এলিতা বলল, প্রচণ্ড ঘূম পাচ্ছে।

ঘূমিয়ে পড়। যথাসময়ে জাগিয়ে দিবো।

একবার ঘূমিয়ে পড়লে কেউ আঝাকে জাগাতে পারে না।

চিন্তা নেই, ঘূমত অবস্থাকেই ধরাধরি করে তোমাকে হোটেলের রুমে নিয়ে তুলব।

তুমি যে বাড়িতে থাক সেখানে আমাকে নিয়ে যাও।

আমি কোনো বাড়িতে থাকি না। মেসে থাকি। সেখানে তোমাকে নেয়া যাবে না।

কেন?

মেস হচ্ছে পায়রার খুপরির মতো ছোট ছোট কিছু রুম। সেই সব রুমে আলো বাতাস ঢোকা নিষিদ্ধ। কমন বাথরুম। বাথরুম ব্যবহার করতে হলে লাইনে দাঁড়াতে হয়। মেসের মালিক মশা, মাছি, তেলাপোকা, এইসব পুরুষেন।

বল কী! কেন পুরুষেন?

যারা মেসে থাকে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করার জন্যে পুরুষেন।

তুমি ঠাণ্টা করছ?

না।

আমি প্রথম তোমার মেসে যাব তারপর অবস্থা দেখে ডিসিশান নেব।
তা করতে পার।
আমি এখন ঘূমিয়ে পড়ব।
এমনি এমনি ঘূমিয়ে পড়বে? না-কি আমাকে ঘুম পাঢ়ানি গান গাইতে
হবে?

তুমি ঘুমপাঢ়ানি গান জান?

জানি। তবে আমাদের দেশে পুরুষদের ঘুম পাঢ়ানি গান গাওয়া
নিষিদ্ধ। ঘুম পাঢ়ানি গান শুধু মা গাইবেন।

আশ্চর্য তো।

আশ্চর্যের সবে শুরু। তুমি আরো অনেক আশ্চর্যের সন্ধান পাবে।

প্রিজ একটা ঘুম পাঢ়ানি গান গাও।

আমি গাইলাম,

ঝুকু ঘুমালো
পাঢ়া জুড়ালো
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে শান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

এলিতা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তুর্ণেনিভের এক উপন্যাস পড়েছিলাম,
“যে নারীকে ঘুমন্ত অবস্থাতে সুন্দর দেখায় সেই প্রকৃত রূপবর্তী।”
এলিতাকে প্রকৃত রূপবর্তী বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইয়েলো ক্যাবে
উপস্থিত থাকলে বিড় বিড় করে বলতেন—

দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্গেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা।

পকেটে মোবাইল বাজছে। মাজেদা খালা ধার হিসেবে আমাকে এই
মোবাইল দিয়েছেন। যত দিন এলিতা বাংলাদেশ থাকবে ততদিন মোবাইল
আমার সঙ্গে থাকবে যাতে আমি সব সময় খালার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে
পারি।

হিমু এলিতা কি এসেছে?

হ্তঁ।

তার অবস্থা কী?

সে গোঁফ কামিয়ে মেয়ে হয়ে গেছে।

ফোনটা এলিতার কাছে দে কথা বলি। তোকে কিছু জিজ্ঞেস করা অর্থহীন।

এলিতা ঘুমাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে তাকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাঢ়িয়েছি। এখন সে আছে গভীর ঘুমে। এই মৃহূর্তে স্বপ্ন দেখছে।

বুঝলি কি করে স্বপ্ন দেখছে?

REM হচ্ছে। তাই দেখে বুঝছি?

REM আবার কি?

Rapid eye movement. চোখের পাতা দ্রুত কাঁপছে। সুন্দর কোনো স্বপ্ন দেখার সময় এই ঘটনা ঘটে। যখন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন কেউ দেখে তখন চোখের পাতার সঙ্গে ঠোঁটও কাঁপে।

আমার সঙ্গে চালবাজি করবি না।

আচ্ছা যাও করব না।

এলিতা উঠবে কোথায়?

এখনো বুবতে পারছি না। সুয়ে ভাঙ্গুক তারপর ডিসিশান হবে।

ও তোর ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে না কি?

না।

এক কাজ কর আস্তে করে মেয়েটার মাথা তোর কাঁধে এনে ফেল। ও যেন বুবতে না পারে।

লাভ কী?

ঘুম ভেঙে এলিতা দেখবে তোর ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে তাতে লজ্জা পাবে। লজ্জা থেকে প্রেম।

লজ্জা থেকে প্রেম হয় এটা জানা ছিল না।

খালা বললেন, রাগ থেকে প্রেম হয়, ঘৃণা থেকে প্রেম হয়, অপমান থেকে প্রেম হয়, লজ্জা থেকে হয়।

আমি বললাম, তোমার কথায় মনে হচ্ছে সব কিছু থেকে প্রেম হয়। হয় না কি থেকে সেটা বল।

তুইতো বিপদে ফেললি।

খালা সুসংবাদ আছে এলিতা নিজে থেকেই আমার ঘাড়ে মাথা রেখে
যুমাচ্ছে ।

ভেরি গুড় । একটা ছবি তুলতে পারবি?

ছবি কীভাবে তুলব?

তোকে যে মোবাইলটা ধার দিয়েছি সেখানে ছবি তোলার অপসান
আছে । অপসানে যা । এক হাতে মোবাইলটা তোদের দু'জনের মুখের কাছে
এনে বাটনে টিপ দে ।

আমি ছবি তুললাম না । এলিতার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় থাকলাম ।

এলিতা এখনো ঘুমাচ্ছে । মেসে আমার বিছানায় বাচ্চাদের মতো
কুকড়িমুকড়ি ঘুম । এই ঘরে দিনের বেলাতেও কিছু ড্রাকুলা মশাকে দেখা যায় ।
ড্রাকুলা মশাদের বিশেষত্ব হচ্ছে এরা কানের কাছে ভন্ডন করে না । সরাসরি
রক্তপান । ধর তক্তা মার পেরেক টাইপ । ড্রাকুলা মশাদের হাত থেকে
এলিতাকে বাঁচানোর জন্যে তার বিছানায় আলম মশারি খাটিয়ে দিয়েছেন ।

ঘুম ভাঙলেই এলিতার ক্ষিধে পাবেন সেই ব্যবস্থাও আলম করে
রেখেছেন । গফরগাঁয়ের গোল বেগুনের চাকড়ি হলুদ লবণ মাখিয়ে রাখা
হয়েছে । নতুন আলু কুচি কুচি করে লবণ পানিতে ভেজানো । দেশি মুরগির
ডিমে সামান্য দুধ দিয়ে প্রবলভাবে ফেটানো হয়েছে । কালিজিরা চাল এনে
রাখা হয়েছে । দশ মিনিটের মোটিসে খাবার দেয়া হবে ।

আমি আলমের ঘরে বসে আছি । বালক হাজতি কাদের নেই । কোথায়
গেছে কখন ফিরবে কিছুই বলে যায় নি ।

আলম বলল, হিমু ভাই আমি চিন্তা করে একটা বিষয় পেয়েছি ।

কী পেয়েছেন?

একটা রহস্যের সমাধান পেয়েছি ।

এখন বলা যাবে না । অন্য কোনো সময় বলব ।

আপনার যখন বলতে ইচ্ছা করবে, বলবেন ।

আমি যে দিনরাত দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকি, খামাখা
বসে থাকি না । চিন্তা করি ।

এখন কী নিয়ে চিন্তা করছেন?

আজ কোনো চিন্তা শুরু করতে পারি নাই । গতকাল চিন্তা করেছি মশা
নিয়ে ।

মশা নিয়ে কী চিন্তা?

দুপুরবেলা মশা গালে কামড় দিয়েছে। গাল ফুলে গেছে তখন শুরু করলাম মশা নিয়ে চিন্তা। মানুষের যেমন শেষ বিচারের দিনে হিসাব নেয়া হবে মশারও কি হবে? আমাদের যেমন দোজখ বেহেশত আছে মশাদের কি আছে? দুষ্ট মশাদের আল্লাহপাক কি দোজখের আগুনে পুড়াবেন?

আপনার কী মনে হয়?

আমার মনে হয় পুড়াবেন না। অতি তুচ্ছ মশা মাছিকে শান্তি দেয়ার কিছু নাই।

আমি বললাম, আল্লাহর কাছে মানুষতো মশা মাছির মতোই তুচ্ছ। মানুষকে তিনি কেন শান্তি দিবেন?

আলম গভীর হয়ে বলল, এটাও একটা বিবেচনার কথা। এটা নিয়ে আলাদা ভাবে চিন্তা করতে হবে।

এলিতার ঘূম ভাঙল রাত আটটা বাজার কিছু আগে। লোডশেডিং হচ্ছে বলে বাতি জ্বলছে না। টেবিলের উপর দুটা মোমবাতি জ্বলছে। মশারির ভেতর এলিতা অবাক হয়ে বসে আছে। ঘরে আলো আঁধারের খেলা। এলিতা বিস্মিত গলায় বলল, আমি কোথায়?

আমি বললাম, তুমি আমাদের মেস বাড়ির একটা ঘরে।

আমার মাথার উপরে জালের মতো এই তাবুটা কী?

একে বলে মশারি। ঘুমের মধ্যে যেন মশা বা মাছি তোমাকে বিরক্ত না করে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আমি ভেবেছিলাম মারা গেছি। মৃত্যুর পর আমার আত্মাকে আটকে রাখা হয়েছে। কি যে ভয় পেয়েছিলাম।

ভয় কেটেছে?

হ্যাঁ। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

দশ মিনিটের মধ্যে তোমার খাবার ব্যবস্থা হবে। আজ আমরা যা দিব তাই খাবে। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তোমাকে হোটেলে পৌছে দেব। এখানকার টয়লেটগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ তারপরেও একটা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

এলিতা বলল, আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার ভয় কেটেছে আসলে
কাটে নি। আমার এখনো মনে হচ্ছে আমি মৃত। আমার ‘soul’ তোমার
সঙ্গে ঘুরছে।

আমি বললাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি আলো ঝলমল ফাইভস্টার
হোটেলে যাবে তখন আর নিজেকে মৃত মনে হবে না।

খেতে বসে এলিতা বলল, কাঁটাচামচ কোথায়? আমিতো হাত দিয়ে
খেতে পারি না।

আমি বললাম, বাংলাদেশের খাবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে তারপর মুখে
দিতে হয়। এটাই নিয়ম। একবেলা আমাদের মতো খেয়ে দেখ।

এলিতা খাওয়া শেষ করল গল্পীর মুখে। খাবার তার পছন্দ হচ্ছে কি না
তা তার মুখ দেখে বুঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ভুক্ত কৃচকাচ্ছে তা দেখে
মনে হয় খাবার ভালো লাগছে না।

এলিতা খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমি আমার
জীবনে ভালো যত খাবার খেয়েছি আজকেরটা তার মধ্যে আছে। আমি
'Food' শিরোনামে যে সব ছবি তুলব সেখানে এই খাবারের ছবিও
থাকবে। গরম ভাত থেকে ধোঁয়া উড়জ্জিৎ। গরম ভাত একজন হাত দিয়ে
স্পর্শ করছে। আজকের খাবারের শেফ কে?

আমি আলমকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এলিতা অবাক হয়ে বলল,
আপনার চোখে পানি কেন?

আলম বলল, সামান্য খানা বিষয়ে এত ভালো কথা বলেছেন এই জনে
চোখে পানি এসেছে। সিস্টার আমি ক্ষমা চাই।

এলিতা বলল, আপনার চোখের পানি দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছি।
আপনি কি ফুল টাইম শেফ? কোন রেস্টুরেন্টে কাজ করেন?

আলমের চোখে পানির পরিমাণ আরো বাড়ল। তার চরিত্রে যে এমন
সঁ্যাতসঁ্যাতে ব্যাপার আছে তা এই প্রথম জানলাম। আমি এলিতাকে বললাম
আলম কোনো প্রফেশনাল কুক না। তিনি নিজের খাবার নিজে রেঁধে খান।
দরজা জানালা বন্ধ করে দিন রাত চিন্তা করেন।

এলিতা বিস্মিত গলায় বলল, কী চিন্তা করেন?

জটিল সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে যেমন—গতকাল চিন্তা করেছেন
মশাদের ‘soul’ আছে কি-না তা নিয়ে—
বল কী!

তোমার যদি চিন্তার কোনো সাবজেক্ট থাকে আলমকে বললেই তিনি চিন্তা শুরু করে দেবেন।

চিন্তার জন্যে তিনি কি কোন ফিস নেন?

না।

আমরা এলিতাকে সোনারগাঁ হোটেলে নামিয়ে দিয়ে এলাম। আলম বললেন, সিস্টার যাই? এই দু'টি শব্দ বলতে গিয়ে তার গলা ভেঙে গেল এবং চোখ ছলছল করতে লাগল। এলিতা অবাক হয়ে বলল Oh God! what a strange man.

এলিতা তার প্রথম ছবির সন্ধানে বের হবে। বাহন হিসেবে সে সাইকেল চেয়েছিল। সাইকেলের বদলে রিকশার ব্যবস্থা হয়েছে। রিকশা এলিতার পছন্দ হয়েছে। এলিতার পেছনে পেছনে আমার থাকার কথা, আমি আরেকটা রিকশা নিয়েছি। আমাদের সঙ্গে একটা ভ্যানগাড়িও আছে। সেখানে আলম এবং কাদের বসে রইছে। তাদের সঙ্গে নামান ধরনের রিফ্লেকটর, সান গান। ছবি তুলতে এত কিছু লাগে জানতাম না।

এলিতা বলল, আমরা দু'জন্মতো এক রিকশাতেই যেতে পারি।

আমি বললাম, তা সম্ভব না।

সম্ভব না কেন?

গায়ের সঙ্গে গা লেগে যেতে পারে।

তাতে অসুবিধা কী?

আমি বললাম, গায়ের সঙ্গে গা লাগলে তোমার শরীরের ইলেক্ট্রন আমার শরীরে চুকবে। আমার কিছু ইলেক্ট্রন যাবে তোমার শরীরে। দু'জনের মধ্যে বক্ষন তৈরি হবে। এটা ঠিক হবে না।

এলিতা বিরক্ত গলায় বলল, এমন উদ্ভৃত কথা আমি আগে শুনি নি। আমি অনেকের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বাসে ট্রেনে ঘুরেছি। কারো সঙ্গেই আমার কোনো বক্ষন তৈরি হয় নি।

আমি বললাম, কেন হয় নি বুঝতে পারছি না। বক্ষন হবার কথা। একজন সাধুর সঙ্গে তুমি যদি কিছুদিন থাক তোমার মধ্যে সাধু স্বভাব চলে আসবে। দুষ্ট লোকের সঙ্গে কিছুদিন থাক তোমার মধ্যে চুকবে দুষ্ট স্বভাব।

বক্তৃতা বন্ধ কর। বেশি কথা বলা মানুষ আমি পছন্দ করি না।

আমি বললাম, ছট করে মাঝখান থেকে বক্তৃতা বন্ধ করা যায় না। শেষটা শোন। আমাদের কালচার বলে পাশাপাশি সাত পা হাঁটলে বঙ্গুত্ত হয়। তুমি ছবি তুলতে এসেছ, দেশের কালচার মাথায় রেখে ছবি তুলবে। এখন বল কিসের ছবি তুলবে?

ডাস্টবিনের ছবি। ডাস্টবিনে মানুষ খাদ্য অনুসন্ধান করছে এরকম ছবি।

এই ছবি তুলতে পারবে না।

কেন পারব না? তোমাদের দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এই জন্যে পারব না?

আমি বললাম, এলিতা শোন। দেশের ভাবমূর্তি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। এই ছবি তুলতে পারবে না কারণ ডাস্টবিনে এখন কেউ খাদ্য খুঁজে না।

এলিতা বলল, তুমি সীকার করতে চাইছ না কিন্তু আমি জানি তোমাদের দেশে ডাস্টবিনে খাবার খোঁজা হয়। আমি ভিডিও ফুটেজ দেখেছি।

বানানো ফুটেজ দেখেছ। আমাদের দারিদ্র্য দেখতে তোমাদের ভালো লাগে বলেই নকল ছবি তোলা হয়। আমি তোমাকে ঢাকা শহরের প্রতিটি ডাস্টবিনে নিয়ে যাব। যদি এরকম দৃশ্য পাও অবশ্যই ছবি তুলবে।

এলিতা বলল, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?

আমি বললাম, আমি মোটেও রেগে যাচ্ছি না। তুমি চাইলে ডাস্টবিনে খাবার খুঁজে এমন কিছু নকল ছবি তোলার ব্যবস্থা করা যাবে। কয়েকজন টোকাইকে বললেই এরা খাবার খোঁজার চমৎকার অভিনয় করবে। টোকাইরা ভালো অভিনয় জানে। বাংলাদেশে টোকাই নাট্য দল পর্যন্ত আছে।

টোকাই কী?

যারা ফেলে দেয়া জিনিসপত্র খুঁজে বেড়ায় এরাই টোকাই।

এলিতা বলল টোকাই লাগবে না। আমি টোকাই ছাড়াই ছবি তুলব। মিথ্যা ছবি আমি তুলি না।

ঢাকা শহরের ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে বিকাল পর্যন্ত ঘূরলাম। কোথাও খাবারের সন্ধানে কাউকে ঘূরতে দেখা গেল না। এক জায়গায় একটা

বালিকাকে পাওয়া গেল সে নাকে জামা চাপা দিয়ে কাঠি দিয়ে ঘয়লা ঘঁটাঘাটি করছে। সে জানালো ডাস্টবিনে মাঝে মাঝে দামী জিনিস পাওয়া যায়। সে নিজে একবার একটা মোবাইল ফোন পেয়েছিল। একশ টাকায় একজনের কাছে বিক্রি করেছে।

খাবারের ছবি একটা শেষ পর্যন্ত তোলা হল। ফুটপাতে পা নামিয়ে খালি গায়ে এক বৃক্ষ ললিপাপ আইসক্রিম খাচ্ছে। বৃক্ষের মাথার চুলদাঢ়ি ধৰ্বধবে সাদা। তার হাতের আইসক্রিমের রঙ টকটকে লাল। সাদা এবং লালের কন্ট্রাস্টে সুন্দর দেখাচ্ছে।

এলিতা বলল, খুব সুন্দর ন্যাচারাল আলো পেয়েছি। ছবিটা ভালো হবে।

আমি বললাম, এই আলোর আমাদের দেশে একটা নাম আছে। একে বলে কন্যা সুন্দর আলো। এই আলোর বিশেষত্ব হচ্ছে কালো মেয়েদের এই আলোয় ফর্সা লাগে।

তোমার দেশে ফর্সা লাগাটা খুব জরুরি?

হ্যাঁ। আমরাও তোমাদের মতো।

আমাদের মতো মানে?

তোমাদের দেশে তামাটে গায়ের রঙ হওয়া খুবই জরুরি। অনেক ডলার খরচ করে রোদে পুড়ে তোমরা গায়ের রঙ বদলাও। আমরা শুধু বিশেষ এক সময়ের আলো পায়ে মেঝে ফর্সা হয়ে যাই। এ জন্যে আমাদের টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না।

এলিতা বলল, তুমি কি প্রমাণ করার চেষ্টা করছ যে তোমরা শ্রেষ্ঠ?

কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করছি না।

এলিতা বলল, এই বৃক্ষ খালি গায়ে বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস কর আমি যদি তাকে একটা সার্ট বা স্যুয়েটার কিনে দেই সে কি নেবে?

তুমি সার্ট বা স্যুয়েটার উপহার হিসেবে দেবে, না-কি ভিক্ষা হিসেবে দেবে? উপহার হিসেবে দিলে তাকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করে উপহার দেই না।

এলিতা বলল, তুমি বাজে তর্ক করতে পছন্দ কর। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর বের হব না।

আমি কি চলে যাব?

হ্যাঁ।

আমি বললাম, আলম আর কাদের থাকুক। ওরাতো আর কথা বলে
তোমাকে বিরক্ত করছে না। দু'জনই মুক্ষ হয়ে তোমার কর্মকাণ্ড দেখছে।
ওরা থাকুক।

আমার আজকের দিনের পেমেন্টটা আলমের হাতে দিয়ে দিও।

আমি রিকশা থেকে নেমে হেঁটে রওনা দিলাম। ইচ্ছা করছে মাথা
ঘুরিয়ে এলিতার মুখের ভাব দেখি। কাজটা করা গেল না কারণ আমার
মহান পিতা এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করে গেছেন—তার বাণিসমগ্রের
একটির শিরোনাম বিদায়। তিনি লিখেছেন—

বিদায়

পুত্র হিমু। তুমি যখন কারো কাছ থেকে বিদায় নিয়ে
যাত্রা শুরু করবে তখন পেছনে ফিরে তাকাবে না।
পেছনে ফিরে তাকানো অর্থ মায়া নামক ভাস্তিকে প্রশ্রয়
দেয়া। তুমি তা করতে পার না। যত্যুপথযাত্রী মানুষ
কখনো কারো কাছ থেকে বিদায় নেয় না। তখন মায়া
নামক ভাস্তি তাকে ত্যাগ করে ভয় নামক অনুভূতি প্রাপ
করে। সে পৃথিবী ছেড়ে যাতে চায় না। মহাপুরুষরাই
শুধু মৃত্যুর সময় উপস্থিত সবার কাছ থেকে বিদায় নেন।

সন্ধ্যাবেলা আলম এবং কাদের বিমর্শ মুখে ফিরে এল। তারা আমার
জন্যে খামে ভর্তি করে একশ ডলারের একটা নোট এনেছে। তার সঙ্গে
এলিতার লেখা চিঠি। চিঠি ইংরেজিতে লেখা, Dear Himu দিয়ে শুরু করা
হলেও Dear শব্দটি কেটে দেয়া হয়েছে। চিঠির বঙ্গানুবাদ—

হিমু,

তোমার প্রাপ্য ডলার পাঠানো হয়েছে। তোমাকে
কিছু কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। তুমি বুদ্ধিহীন
একজন মানুষ। বুদ্ধিহীনরাই তর্কবাজ হয়। বুদ্ধির অভাব
তর্ক দিয়ে ঢাকতে চায়।

তুমি নানান বিষয়ে আমাকে শিক্ষিত করার চেষ্টা
করে যাচ্ছ। বিষয়টা অত্যন্ত বিরক্তিকর। আমি তোমার

দেশে শিক্ষা সফরে আসি নি। নিজের কাজ নিয়ে
এসেছি।

তোমাকে কঠিন কঠিন কথা লিখলাম। তার জন্যে
আমি যে খারাপ বোধ করছি—তা-না। তোমার সার্ভিসের
আমার আর প্রয়োজন নেই।

তবে মি. আলম এবং কাদেরকে আমার প্রয়োজন।
ওরা নিয়মিত আসবে। আলোচনা সাপেক্ষে তাদের
পেমেন্ট ঠিক করা হবে।

এলিতা

আমার বেকার জীবনের শুরু, আলম এবং কাদেরের কর্মময় সময়ের
শুরু। এরা দু'জন ভোরবেলা ভ্যান নিয়ে চলে যায়, সঙ্গ্যাবেলা ফিরে। এদের
কাছ থেকে নানান ধরনের ছবি তোলার গল্প শুনি। কয়েকটি উল্লেখ করা
যায়। ফটোগ্রাফের নামগুলো আমার দেয়া। এলিতা নিশ্চয়ই ইংরেজিতে
সুন্দর নাম দেবে।

কুকুর এবং ইলিশ

এই ফটোগ্রাফটা কাওরান বাজার মাছের আড়তে তোলা। একজন ইলিশ
মাছের ঝাঁকা নিয়ে বসেছে। কুচকুচে কালো এক কুকুর এসে ইলিশ মাছ
মুখে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। কুকুরের পেছনে দুনিয়ার ছেলেপুলে। কুকুর ইলিশ
মাছ মুখে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। রাস্তার দু'পাশের গাড়ি থেমে আছে।
ফটোগ্রাফটা এই সময়ে তোলা। কুকুর ইলিশ মাছ মুখে নিয়ে অবাক হয়ে
তাকাচ্ছে। তাকে নিয়ে এত হৈ চৈ কেন হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না।

পিতা পুত্র এবং সাগর কলা

এই ফটোগ্রাফটা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের বেঞ্চে তোলা। পিতা এবং পুত্র
বসে আছে। বাবার হাতে একটা সাগর কলা, ছেলের হাতে একটা সাগর
কলা। বাবা তার হাতের কলা ছেলেকে খাওয়াচ্ছে। ছেলে তার হাতের কলা
বাবাকে খাওয়াচ্ছে।

ইটালিয়ান হোটেলের রুটি

রাস্তার পাশে ইটবিছানো খাবারের দোকান। অতি বৃদ্ধ একজন রুটি খাচ্ছে। তার হাতে কাচা মরিচ। সে কাচা মরিচের দিকে তাকিয়ে রুটি খাচ্ছে।

কসাই এর চা পান বিরতি

ফটোগ্রাফটা নিউমার্কেটের কসাই এর-দোকানে তোলা। গরুর বড় বড় রান ঝুলছে। রানের ফাঁকে কসাইকে দেখা যাচ্ছে। তার হাতে গ্লাসভর্তি চা। একটা গরুর কাটা মাথা কসাইয়ের পাশে রাখা। মনে হচ্ছে গরুর মাথা অবাক হয়ে কসাইয়ের চা পান দৃশ্য দেখছে।

এলিতা আমাকে বিদায় করে দিয়েছে, কাজেই মাজেদা খালার মোবাইল ফেরত দিয়ে আসতে হবে। আমি মোবাইল ফেরত দিতে গেলাম। খালু সাহেবের মানিব্যাগ সঙ্গে নিলাম। কিছু টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম এলিতার ডলার ভেঙে টাকা করে নিলাম, ভৱপরেও পঞ্চাশ টাকা কম হল।

মাজেদা খালা আমাকে দেখেই তাঙ্ক গলায় বললেন, এলিতা মেয়েটা কত অভদ্র তুই জানিস?

নাতো।

ওকে কয়েকবার টেলিফোন করেছি বাসায় লাঞ্চ করতে বলেছি সে আসে নি। টেলিফোন করি, মিসকল হয়ে থাকে এই মেয়ে কল রিটার্ন করে না। তার জন্যে সব কিছু করে দিলাম আমি এখন কি-না আমাকেই চিনে না। নিজেকে সে কী ভাবে? রূপবতী মেয়ে হয়ে আমার মাথা কিনে নিয়েছে? আমার মাথা এত সস্তা না। এখন বল তোর সঙ্গে তার ব্যবহার কেমন। অভদ্র মেয়ের গাইড হবার দরকার নেই। তুই চাকরি ছেড়ে দে।

খালা থামতেই আমি বললাম, চাকরি ছাড়ার উপায় নেই খালা। এলিতা আমার চাকরি নট করে দিয়েছে। চার দিন হল পথে পথে বেকার ঘূরছি।

বলিস কী?

বিয়েটা মনে হয় হল না।

এই নিয়ে তুই ভাবিস না। রূপ দিয়ে কিছু হয় না। মেয়েদের রূপ আর পদ্মপাতার জল একই। মন খারাপ করিস না।

আচ্ছা করব না । খালু সাহেবের টেলিফোনের ব্যাপারটা কিছু হয়েছে?

আমার ধারণা ধরে ফেলেছি । লোক লাগিয়েছি সে পাতা লাগাচ্ছে ।
আমার কাছে বাহান্তর ঘণ্টা সময় চেয়েছিল । আগামীকাল বাহান্তর ঘণ্টা পার
হবে ।

এসিড কবে ঢালবে?

বুঝতে পারছি না ।

তাড়াছড়া করবে না । তাড়াছড়ার ব্যাপার না । এসিড ঠিকমতো ঢালতে
হবে । বেঁচে থাকলেও চোখ যেন যায় ।

মাজেদা খালা হতভম্ব গলায় বললেন, এইসব কি ধরনের কথা ।

আমি বললাম, তুমি মুখে এসিড ঢালবে সব ঠিক থাকবে তাও তো হবে
না ।

মাজেদা খালা বললেন, তুই একটা ক্রিমিন্যাল । তুই আর এই বাড়িতে
আসবি না ।

খালু সাহেবের পরকীয়া প্রেমের কী হবে? এতবড় একটা অন্যায় চোখ
বুঝে সহ্য করবে?

একটা কেন দশটা পরকীয়া করুক্তির জন্যে আমি চোখ গেলে দিব?
তুই আমাকে ভাবিস কী? তোর এফিডের বোতল নিয়ে এক্ষুণি বিদায় হ ।

আর এ বাসায় আসব না ।

অবশ্যই না ।

খালু সাহেবের সঙ্গে শেষ দেখা করে যাই ।

খালু সাহেব শোবার ঘরে আধশোয়া হয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পড়ছেন ।
টিভি চলছে, টিভিতেও ন্যাশনাল জিওগ্রাফি । ডাবল একশান ।

আমাকে চুক্তে দেখে খালু সাহেব মহা বিরক্ত গলায় বললেন, ছট করে
ঘরে চুকে পড়লে? সামান্য ভদ্রতার ধারও ধার না । ব্যক্তিগত শোবার
ঘরতো গণ বৈঠকখানা না । ইচ্ছা হল, চুকে পড়লে ।

আমি বললাম, ধোঁয়া বাবার কাছে গিয়েছিলাম উনি মানিব্যাগ উদ্ধার
করেছেন । মানিব্যাগ নিয়ে এসেছি । সব ঠিকঠাক আছে কি-না দেখে নিন ।

হতভম্ব খালু সাহেব মানিব্যাগ হাতে নিলেন । উল্টে পাল্টে দেখলেন ।
চোখ ছানাবড়া হওয়া বলে একটা কথা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত আছে । খালু
সাহেবের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তবে বেশ বড় সাইজের ছানাবড়া । আমি
বললাম, ধোঁয়া বাবা আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ।

কেন?

মানিব্যাগ থেকে উনি পঞ্চাশটা টাকা রেখে দিয়েছেন। খড় কিনবেন। খড়ে পানি দিয়ে ভোজনো হবে। সেই ভোজ খড় জুলানো হবে। এতে প্রচুর ধোয়া হয়। খালু সাহেব! যাই ভালো থাকবেন। আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দেখা হবে না কেন?

মাজেদা খালা আমাকে এ বাড়িতে অবাস্তুত ঘোষণা করেছেন।

আমি চলে এলাম। খালু সাহেব তাকিয়ে রইলেন তাঁর মানিব্যাগের দিকে।

মেসে ফিরে দেখি আমার ঘরের সামনে টুলের উপর পেনসিল ওসি বসা। তাঁর মুখ গল্পীর হাতে পেনসিলের বদলে ফ্লাক্ষ।

আমি বললাম, বাইরে বসে আছেন কেন? আমার ঘরের দরজা খোলা। ঘরে বসে অপেক্ষা করলেই হত। কোনো কাজে এসেছেন না-কি সামাজিক সৌজন্য সাক্ষাৎ? আসুন ঘরে গিয়ে বসি।

ওসি সাহেব ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের উপর চায়ের ফ্লাক্ষ রাখতে রাখতে বললেন, দুটা কাপের ব্যবস্থা করুন। ফ্লাক্ষে চা নিয়ে এসেছি।

ট্যাবলেট সিঙাড়া আনেন্তেমি?

না। পরেরবার আনব। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সত্য জবাব দেবেন। কাদের কোথায়?

সে আছে এলিতার সঙ্গে। এলিতাকে ছবি তুলতে সাহায্য করছে। এলিতা হল...

এলিতার বিষয়টা জানি। সে বাংলাদেশে কেন এসেছে তাও জানি। আমি কাদেরের বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।

সে আমাকে জানিয়েছে সে ঠিক করেছে একটা খুন করবে। দিন তারিখ আমার ঠিক করে দেয়ার কথা। পঞ্জিকা দেখে ভালো দিন বের করব। পঞ্জিকা কেনা হয় নি।

পঞ্জিকার জন্যে খুন আটকে আছে?

আমি বললাম, শুধু পঞ্জিকা না। শাহরুখ খানের জন্যেও আটকা আছে।

সে কে?

বলিউডের কিং খানকে চেনেন না? আপনারতো চাকরি যাবার কথা। কাদের আর্মি স্টেডিয়ামে কিং খানের খেলা দেখার পর খুনটা করবে। তিনি হাজার টাকার টিকিট কাটবে। তার হাতে এখন টাকা আছে। এলিতা প্রতিদিন তাকে বিশ ডলার করে দিচ্ছে।

আমি দুটা গ্লাসের ব্যবস্থা করলাম। গ্লাস ভর্তি চা নিয়ে দু'জন মুখোমুখি বসেছি। ওসি সাহেবের মুখ আরো অঙ্ককার হয়েছে। আমি বললাম, আলতা ভবি কেমন আছেন।

ওসি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তার বিষয়ে কথা বলার জন্যে আমি আপনার এখানে আসিনি। আমি এসেছি কাদেরকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবার জন্যে। ওকে টোপ হিসেবে বাইরে ছেড়ে রাখা হয়েছে। আমাদের ইনফরমেশন যা জোগাড় করার করেছি। এখন তাকে আটক করা যায়।

আমি বললাম, এতদিন যখন অপেক্ষা করেছেন আরো কয়েকটা দিন করুন। কিং খানের খেলাটা হয়ে যাক।

উনি কী খেলা দেখাবেন?

আমি জানি না কী খেলা দেখাবেন। নিচয়ই ভালো কোনো খেলা। বাংলাদেশের মানুষ আধাপাগল হয়ে গেছে। আমি ভাবছি মিস এলিতাকেও খেলাটা দেখাব। উনি রাজি হলে হয়।

চা খাওয়া শেষ হবার পরেও ওসি সাহেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কাদের এবং আলম ফিরে এল। ওসি সাহেব খানিকক্ষণ কাদেররের দিকে তাকিয়ে তাকে এ্যারেস্ট না করেই চলে গেলেন।

‘বাটারফ্লাই এফেস্ট’ নামের একটা বিষয় আছে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকরা বাটারফ্লাই এফেস্টকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। ‘পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রজাপতির পাখার কাঁপনে অন্যপ্রান্তে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবড় হতে পারে এই হল বাটারফ্লাই এফেস্ট।’

ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজের সামনের রাস্তায় বাটারফ্লাই এফেস্টের লীলাভূমি। কিছুদিন পরপর এইসব রাস্তায় ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটে যার উৎপত্তি হয়ত রেইনফরেস্টের কোনো গাছের পাতার কাঁপন।

ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় এই ঘটনাই এখন ঘটছে আমি তার একজন দর্শক।

দু'টা বাসে আগুন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি দোতলা বাস। বাস দু'টির অপরাধ কি কেউ বলতে পারছে না। বিনা অপরাধেতো কেউ শাস্তি পায় না। বাস দু'টি নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোনো অপরাধ করেছে।

হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে কয়েকটা প্রাইভেট কারের কাচ ভাঙা হয়েছে। মনে হয় আরো হবে। গাড়ির কাচ ভাঙার দৃশ্য সুন্দর। কাচগুলো পাউডারের মতো গুড়া হয়ে যায়। গুড়া অবস্থায় ঝিকমিক করে আলো দেয়।

ঢাকা কলেজের পাশেই সায়েস ল্যাবরেটরির মোড়ে পুলিশ ফাঁড়ি। সেখান থেকে কয়েকজন পুলিশ এসেছিল। ছাত্ররা ধাওয়া করে তারা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফেরত পাঠিয়েছে। পুলিশরা এখন সিগারেট ধরিয়ে রিলাক্স করছে। তাদেরকে আনন্দিত মনে হচ্ছে। অল্পতেই ঝামেলা থেকে উদ্ধারের আনন্দ।

টায়ার জ্বালানো হয়েছে। টায়ার থেকে বুন্কা বুন্কা ধোঁয়া বের হচ্ছে। আমি মোটামুটি নিরীহ টাইপ একজনকে তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্র। চেনার উপায় কলেজের মনোযোগ বসানো হাফ হাতা সার্ট হিটলার টাইপ গোঁফ রেখেছে, কিন্তু তাকে দেখাচ্ছে চার্লি চ্যাপলিনের মতো।) জিজেস করলাম, ভাই ঘটনা কী?

তিনি বললেন, ঢাকা কলেজের এক ছাত্রকে ধাক্কা দিয়ে বাস থেকে রাস্তায় ফেলেছে।

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, বলেন কী! ঢাকা কলেজের ছাত্র পরিচয় পাবার পর তাকে তো কোলে করে নামানো দরকার ছিল। কোলে করে নামিয়ে টা টা বাই বাই বলে একটা ফ্লাইং কিস।

আপনি কে?

আমি কেউ না। দর্শক। আপনারা চমৎকার খেলা খেলছেন, দর্শক লাগবে না?

চার্লি চ্যাপলিন হঠাতে উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। গলা উচিয়ে ডাকতে লাগলেন, হামিদ ভাই! হামিদ ভাই এদিকে আসেন। এই লোক ছাত্রদের নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলছে।

হামিদ ভাই নামে যাকে ঢাকা হল তিনি অসম্ভব ব্যক্তি। তিনি পেট্রোল দিয়ে গাড়িতে আগুন ধরানোর দায়িত্বে আছেন। পেট্রোল ভর্তি জেরিকেন নিয়ে ছোটাছুটি করছেন।

আমি বললাম, হামিদ ভাই ব্যস্ত আছেন যা করার আপনাকেই করতে হবে। একটা প্রশ্নের উত্তর দিনতো গাড়িতে আগুন দেয়ার পেট্রোল কি আপনাদের কাছে মজুদ থাকে?

প্রশ্নের উত্তর পাবার আগেই বিকট শব্দে দু'টা ককেটল ফাটলো। একই সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি তাকে টেনে কোলে তুললাম।

এর মধ্যে হামিদ ভাই এসে দাঁড়িয়েছেন। হামিদ ভাই এর পাশে আরেকজন তার হাতে চাপাতি। চাপাতি নিশ্চয়ই মেজে ঘসে রাখা হয়। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে।

হামিদ ভাই বললেন, এই লোক সমস্যা করছে? হ্যালো ব্রাদার আপনি কে?

আমি বললাম, আলাপ পরিচয় পরে হবে। এই মেয়েটাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আপনাদের কাঙ্কারখানা দেখে বেচারি আনন্দে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

হামিদ ভাই বললেন, অল্পের উপর ছাড়ি পেয়ে গেলেন। এই মেয়ে না থাকলে আপনার আজ খবর ছিল।

চাপাতি ভাইয়া চাপাতি দুলিয়ে কি খবর হতে পারে তার নমুনা দেখালেন।

যে মেয়েটি আমার কোলে তাকে আমি চিনি। তার নাম তানিজা। বেচারী নিশ্চয়ই তার বাবা কিংবা মা'র সঙ্গে এই এলাকায় কেনাকাটা করতে গিয়ে বাটরাফাই এর চক্রে পড়েছে।

তানিজাকে ডাঙ্কারখানায় নেয়ার আগেই তার জ্ঞান ফিরল। সে বেশ স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে সামান্য কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি বললাম, তানিজা আমাকে চিনেছে?

তানিজা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ফিস ফিস করে বলল, মা কোথায়?

আমি বললাম, মা নিশ্চয়ই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমি যথাসময়ে তোমাকে মা'র হাতে তুলে দেব। আইসক্রিম খাবে?

হ্তঁ।

কোন ফ্রেজার?

ভ্যানিলা। আপনার পা খালি কেন?

তানিজা! আমি সব সময় খালি পায়েই থাকি।

কেন?

মাটি হচ্ছে আমাদের মা। মায়ের স্পর্শ শরীরে সারাক্ষণ লাগানো
আনন্দের ব্যাপার না?

তানিজা বলল, মাটি মা হল আপনি তো মাকে পাড়িয়ে তার উপর
হাঁটছেন।

আমি তানিজার যুক্তিতে চমৎকৃত হলাম। শিশুরা মাঝে মাঝে সুন্দর
যুক্তি দেয়।

প্রথমে তানিজাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেলাম সেখানে কেউ নেই।
দরজায় তালা লাগানো। বাসায় কাজের মেয়ে আছে। সে তালাবন্ধ যাতে
বের হতে না পারে। কাজের মেয়ের কাছে মেসের ঠিকানা দিয়ে এলাম।

পেনসিল ওসি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে জানলাম হারানো শিশুর বিষয়ে
এখনো কেউ থানায় যোগাযোগ করে নি।

তানিজা তার মায়ের মোবাইল নাম্বার জানে সেখানে টেলিফোন করা
হল কেউ ধরল না। তানিজা তার বাসা কোন অফিসে চাকরি করে তা
বলতে পারল না।

তানিজা দুপুরে কী খাবে?

পিজা খাব। আর ঠাণ্ডা কোক খাব। মা আমাকে ঠাণ্ডা কোক খেতে দেয়
না।

ঠাণ্ডা কোক খেলে কি হয় জান?

না।

টনসিল ফুলে যায়। জুর হয়।

তাহলে তো বিরাট সমস্যা।

দুপুরে আমরা পিজা খেলাম। তানিজা ঠাণ্ডা কোক খেতে খেতে বলল,
মামা চল এখন মাকে খুঁজে বের করি।

মেয়েটা কিছুক্ষণ হল আমাকে মামা ডাকা শুরু করেছে। গোপন কথা
বলা শুরু করেছে। আজ তার জন্মদিন এটা জানলাম। জন্মদিনে তার মা
রাতে তাকে পিজাহাটে নিয়ে যাবে বলেছিল। এখন যেহেতু দুপুরে পিজা
খাওয়া হয়েছে, রাতে না খেলেও চলবে।

মামা তুমি কি জান আমার বাবা আমাদের সঙ্গে থাকে না ।

জানি না তো ।

মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা থাকে । মা বাবাকে বলল, এই মুহূর্তে
তুমি বের হয়ে যাবে । বাবা বলল, এত রাতে আমি কোথায় যাব? মা বলল,
জাহান্নামে যাও । বাবা বলল, জাহান্নাম আমি কোথায় পাব?

তোমার বাবাকেতো মনে হচ্ছে রসিক মানুষ ।

হঁ । মা রসিক মানুষ পছন্দ করে না । মা বাবাকে ডাকে গোপাল ভাড় ।

গোপাল ভাড় কে তুমি চেন?

আমি চিনি না । আমার মনে হয় সে দুষ্ট লোক । তাই না?

হতে পারে ।

বড়দের ঝগড়া করতে হয় না ।

অবশ্যই হয় না ।

বাবাকে বকে দিও ।

নিশ্চয়ই বকে দিব ।

মা'কে কিন্তু বকা দিও না । মা খুব রাগী । বকা দিলে মা রাগ করবে ।

খুব রাগী হলে তাকে বকা দেবসো । রাগী মেয়েদের আমি খুবই ভয়
পাই ।

আমি আমার মা'কে অল্পভয় পাই । বাবা বেশি ভয় পায় ।

অল্প ভয় পাওয়াই ভালো ।

আমরা আবার ঢাকা কলেজের সামনে ফিরে গেলাম । অঙ্গুর মা মেয়ের
সঙ্গানে সেখানেই ঘোরাঘুরি করার কথা । তাকে পাওয়া গেল না । ঢাকা
কলেজের সামনের রাস্তা পুরোপুরি স্বাভাবিক । গাড়ি চলছে, রিকশা চলছে ।
ফুটপাত দখল করে হকাররা বসে আছে । কমইন মহিলারা জামা কাপড়
দেখে বেড়াচ্ছে । কিছুই তাদের পছন্দ হচ্ছে না । কলেজের ভেতর ক্লাসও
মনে হয় শুরু হয়েছে । আমি নিশ্চিত চাপাতিওয়ালা বিছানার নিচে চাপাতি
রেখে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রির ক্লাস করছে ।

তানিজা বলল, মা'কে পাওয়া না গেলে অসুবিধা নাই । মামা আমি
তোমার সঙ্গে থাকব ।

আমি বললাম, আমারও কোনো অসুবিধা নাই । রাতে জন্মদিনের কেক
কাটার ব্যবস্থা করতে হবে ।

মামা আমি চিড়িয়াখানায় যাব। আমাকে কেউ চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায় নি। মা বলেছিল জন্মদিনে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে।

চল চিড়িয়াখানায় যাই। জীবজন্তু দেখে আসি।

রাতে আমি খাব বার্গার।

বার্গারের সঙ্গে ঠাণ্ডা কোক খাবে না? .

হঁ খাব।

চিড়িয়াখানার জীবজন্তু দেখে আমি তানিজাকে নিয়ে চলে গেলাম সোনারগাঁ হোটেলে। মেয়েটাকে কিছুক্ষণের জন্যে এলিভার হাতে দিয়ে দেয়া যাক। তানিজা এখন বিরতিহীন কথা বলে আমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।

এলিভা আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলে বলল, কি ব্যাপার?

আমি বললাম, তুমি আমাকে একশ ডলার দিয়েছ। আমার পেমেন্ট ঠিক হয় নি। বাকি টাকাটা নিতে এসেছি।

একদিন কাজ করেছ একশ ডলার দিয়েছি।

এয়ারপোর্টে তোমাকে আনতে গিয়েছিলাম। ঐ দিনের হিসাবতো ধর নি।

সবি। আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে এই মেয়েটা কে?

ওকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। ওর নাম তানিজা।

পথে কুড়িয়ে পেয়েছ মানে কী? তোমাদের দেশে কি এমন শিশু পথে কুড়িয়ে পাওয়া যায়?

আমি বললাম, হ্যাঁ আমাদের দেশে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। যথাসময়ে বাবা মা এসে তাদের নিয়ে যায়। তোমার দেশে যে সব শিশু হারিয়ে যায় তাদের কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না। গত বছরের স্ট্যাটিস্টিকসে এসেছে তিনশ পনেরো জন শিশু হারিয়েছে যাদের খোঁজ কেউ জানে না। ভুল বলেছি?

এলিভা জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

তুমি কি তানিজাকে কিছুক্ষণ রাখতে পারবে? রাত দশটা পর্যন্ত। রাত দশটার মধ্যে তার বাবা এসে মেয়েকে নিয়ে যাবে।

তারা জানবে কীভাবে যে এই মেয়ে আমার কাছে আছে?

জানবে। যে কোনোভাবেই হোক জানবে।

এলিতা বলল, আমি কোনো ঝামেলায় জড়াব না। এই মেয়েকে রাখব
না।

আমি বললাম, আজ তোমার জন্মদিন। জন্মদিনে একা একা থাকবে?
জন্মদিন জান কীভাবে?

তুমি নিজের সম্পর্কে যে ই-মেইল পাঠিয়েছ সেখানে জন্মদিন লেখা
আছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি জান? আজ তানিজা মেয়েটিরও জন্মদিন।

এলিতা তানিজার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাপি বার্থডে তানিজা।
তানিজা মিষ্টি করে হাসল। তানিজা এখনো কথা বলা শুরু করে নি। কথা
বলা শুরু করলে এলিতা বুবাবে কি জিনিস রেখে যাচ্ছি।

এলিতার কাছ থেকে একশ ডলার নিয়ে সোনারগাঁ হোটেলের বেকারি
থেকে জন্মদিনের কেক কিনে এলিতার ঘরে পাঠিয়ে দিলাম।

কেকের উপর ফুল লতা পাতার ফাঁকে বাংলায় লেখা

তানিজা

এলিতা

হারিয়ে যাওয়া সব সময়ই আনন্দময়।

এলিতার এই বাংলা পড়ে বুঝতে পারার কথা।

মেসে ফিরে দেখি তানিজার মা আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে
আছেন। কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। আমাকে দেখেই তাঁর প্রথম
কথা, আমার মেয়ে কই?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আপনার মেয়েকে উপহার হিসেবে
একজনকে দিয়ে এসেছি। ঐ মেয়ের ছিল জন্মদিন। জন্মদিনের উপহার।

কী বললেন?

কী বললাম তাতো শুনেছেন। তারপরেও আরেকবার স্পষ্ট করে বলছি,
আপনার মেয়েকে উপহার হিসেবে একজনকে দিয়ে এসেছি।

আমি আপনাকে খুন করে ফেলব।

খুন করতে চাইলে করতে পারেন। আসুন ঘরে আসুন। কি পদ্ধতিতে
খুন করবেন সেটা শুনি।

আমি আপনাকে র্যাবের হাতে তুলে দিব। র্যাব আপনাকে ক্রসফায়ারে
মারবে।

ক্রসফায়ারে মেরে ফেললে তো আপনি মেয়ের কোনো সঙ্গান পাবেন না। ক্রসফায়ারের কথা আপাতত ভুলে যান। আসুন শর্ত নিয়ে আলোচনা করি।

শর্ত মানে। কিসের শর্ত?

যে শর্তে আমি আপনাকে তানিজার সঙ্গান দিতে পারি।

মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবেন আবার শর্ত দেবেন? মগের মূল্লক পেয়েছেন?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমার কাছে মগের মূল্লক না। আমার কাছে বাংলা মূল্লক। আপনার কাছে মগের মূল্লক। স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করে আলাদা হয়ে যাবেন। মেয়ে হারিয়ে ফেলবেন। যে আপনার মেয়েকে খুঁজে পেয়েছে তাকে ক্রসফায়ারে দেবেন?

কথার কচকচানিতে আমি যাব না। এক্ষুণি আমার মেয়েকে দিতে হবে। যদি না দেন তার পরিণাম ভালো হবে না।

আপনি চিংকার বন্ধ করে স্বামীকে নিয়ে আসুন। দু'জনে মুচলেকা দিন কখনো ঝগড়া করবেন না তারপর মেয়ের সঙ্গান দেব। তার আগে না। ভালো কথা আপনার হাতে সময় কিন্তু বেশি নেই। আপনার মেয়ে দেশের বাইরে চলে যাবে। মনে হয় ইতিমধ্য যাবে। জানেন নিশ্চয়ই ইতিয়া থেকে বাংলাদেশে গরু আসে, বিনিষ্টয়ে আমরা নানান বয়সের মেয়ে পাচার করি।

আমার শেষ কথাতে কাজ হল। তানিজার মা টেলিফোন করে তানিজার বাবাকে আনলেন। এই ভদ্রলোক মেয়ে হারানোর কথা কিছুই জানতেন না। সব শুনে তাঁর হার্ট এ্যাটাকের মতো হল। বুকে হাত দিয়ে বিড় বিড় করে বললেন, শাহানা আমার বুকে ব্যথা করছে। আমার বুকে ব্যথা করছে।

শাহানা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, কাগজে কি লিখতে হবে বলুন। আমরা লিখে দিছি।

আমি বললাম, কিছু লিখতে হবে না। দু'জন এক সঙ্গে মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাবেন এটাই যথেষ্ট। আপনার মেয়ে আছে সোনারগাঁও হোটেলে রুম নাম্বার ৭৩২, এই রুমে একটা পরী থাকে। পরীটার নাম এলিতা। আপনার মেয়েকে পরীর হেফাজতে রেখে এসেছি।

মা-বাবা দু'জনই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তারা আমার কথায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত। আমি বললাম, দেরি করবেন না চলে যান।

তানিজার বাবার মনে হয় আবার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। তিনি বুকে হাত দিয়ে কুঁ কুঁ শব্দ করছেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েকে দেখতে পাবেন। উঠে দাঁড়ান তো।

তানিজার বাবা বললেন, ভাই আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।

আমি বললাম, আজ রাত্তায় রাত্তায় কিছুক্ষণ হাঁটব তারপর আমার এক খালাতো ভাই বাদলের সঙ্গানে যাব। ওকে অনেক দিন দেখি না।

তানিজার বাবা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, ভাই মেয়েটাকে পাব তো?

আমি বললাম, অবশ্যই পাবেন। স্বামী স্তৰী দু'জনে মিলে ভালোবাসা এবং মমতায় তাকে রাখবেন। আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হলে এই মেয়ে আবারো হারিয়ে যাবে। এটা যেন মাথায় থাকে। দ্বিতীয়বার হারিয়ে গেলেও ফেরত পাবেন। তৃতীয়বার হারালে আর পাবেন না। একে বলে দানে দানে তিন দান। তিনের চক্র।

বেল টিপতেই মেজো খালু (বাদলের বাবা) দরজা খুলে দিলেন, আমাকে দেখে হাহাকার ধ্বনি তুললেন। হিমু সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমার খালা চলে গেছেন।

খালা চলে গেলে খালুর পুশি হওয়া উচিত। উনি মনের সুখে ছাদে বোতল নিয়ে বসতে পারবেন। হাহাকার ধ্বনির অর্থ বুঝলাম না।

খালু হতাশ গলায় বললেন, দুপুরে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছে। সে শাহরুখ খানের প্রোগ্রাম দেখবে। আমি বললাম পুরুষ মানুষেরা স্টেজে ফালাফালি করবে এটা দেখার কী আছে। তোমার খালা বলল, আমি তোমার সঙ্গে বাস করব না। আমি বললাম, নো প্রবলেম। গো টু শাহরুখ খান। তার কোমর জড়িয়ে ধরে নৃত্য কর। কথা শেষ করার আধগঢ়টার মাথায় সে সুটকেস গুছিয়ে চলে গেল।

আমি বললাম, শাহরুখ খানের কাছে নিশ্চয়ই যান নি। নিজের বাবার বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন। আপনি এত অস্ত্রির হচ্ছেন কেন?

খালু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, মূল ঘটনা তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার খালা কিংখানের কাছে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না। সে আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে। আমার বোতল নিয়ে গেছে।

বলেন কী! উনিও বোতল ধরেছেন?

সব কিছু নিয়ে ফাজলামি করবে না। ঘটনা বুঝার চেষ্টা কর। আমি একটা সিঙ্গেল মন্ট ছাইকি এনে রেখেছি। উভদিন দেখে বোতল খুলব। তোমার খালা চলে গেছেন এটা একটা শুভ দিন। বরফ প্লাস সব নিয়ে বোতলের খৌজ করতে দেখি বোতল নাই। তোমার অতি চালাক খালা আমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এই কাজ করেছে। এখন কী করি বল?

বরফ মেশানো পানি খেয়ে শুয়ে থাকবেন।

আবার ফাজলামি? তুমি গাড়ি নিয়ে যাও। তোমার অতি চালাক খালার কাছ থেকে বোতল রিলিজ করে নিয়ে আস।

আমি বললাম, খালা মদের বোতল নিয়ে তার বাবার বাড়িতে যাবেন না। আপনার বোতল তিনি কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।

কোথায় লুকিয়ে রাখবে?

নিজের শোবার ঘরে রাখবেন না। সেখানে ধর্মের বই পত্র আছে। বোতল ভেঙে ফেলেও দিবেন না। বাঙালি মেয়েরা দামি জিনিস তা সে যতই ক্ষতিকর হোক, ফেলে না। ডেট এক্সপ্রেস হওয়া ওষুধও জমা করে রাখে।

খালু ধরক দিয়ে বললেন, মূল কঢ়াইয়ে আস। তোমার বুদ্ধিমত্তা খালা বোতল কোথায় লুকিয়েছে?

আমার ধারণা তার বাথরুমে। বেসিনের নিচের কাবার্ডে যেখানে ফিনাইল জাতীয় জিনিসপত্র থাকে, কিংবা বাথরুমে ডাস্টবিনে।

খালু অলিম্পিকের দৌড় দিয়ে ছুটে গেলেন এবং অলিম্পিকের সোনা পাওয়ার মতো মুখ করে বোতল কোলে ফিরে এসে জড়ানো গলায় বললেন, “হিমু ছাদে আস।” বোতল কোলে নিয়েই তাঁর নেশা হয়ে গেছে।

দু'জন ছাদে বসে আছি। খালু সাহেব আশঙ্কাজনক গতিতে বোতল নামিয়ে দিচ্ছেন। আমার প্রতি মমতা এবং ভালোবাসায় তিনি এখন সিক্ত।

হিমু।

জি খালু সাহেব।

আমি যে তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি তা-কি তুমি জান?

জানতাম না। এখন জেনেছি।

তোমাকে দেখলে বিরক্ত হবার মতো ভাব করতাম, এটা আসলে অভিনয়। আমি সেই ব্যক্তি যে মনের ভাব গোপন রাখতে পছন্দ করে। এই

বিষয়ে কবিগুরুর একটা লাইন আছে। এখন মনে পড়ছে না। মনে করার চেষ্টা করছি।

চেষ্টা করার দরকার নেই। মনে পড়লে পড়বে।

আমার কি ধারণা হিমু, আমি তোমার খালাকেও পছন্দ করি? তাকে গো টু কিংখান বলা ঠিক হয় নি। হিমু! তোমার কি ধারণা বেহেশত দোজখ এই সব কি আছে? (পেটে জিনিস বেশি পড়লে খালু সাহেব ধর্ম নিয়ে আলোচনায় চলে যান।)

আমি বললাম, ধর্ম আলোচনাটা থাক।

তোমার কি ধারণা আমি মাতাল হয়ে গেছি? এখনো আমার লজিক পরিষ্কার দশ থেকে উল্টা দিকে গুনতে পারব। দশ নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক। হয়েছে?

হয়েছে।

একশ থেকে উল্টা দিকে গুনে এক পর্যন্ত আসতে পারব। শুরু করব?

না। আপনার নেশা কেটে যেতে পারে। ঘুমিয়েও পড়তে পারেন।

ঘুমিয়ে পড়ব কেন?

সংখ্যা নিয়ে গুনাগুনি শুরু করলে ঘুম আসে। মানুষ ভেড়া গুনতে গুনতে ঘুমায়।

খালু সাহেব গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে গগনা শুরু করলেন, একশ, নিরানবই, আটানবই, সাতানবই... ... বিরাশি পর্যন্ত এসে তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। আমি ‘নেশা’ বিষয়ে আমার বাবার উপদেশ মনে করার চেষ্টা করলাম।

নেশা

পুত্র হিমু! নেশাগ্রস্ত মানুষের আশেপাশে থাকা আনন্দময় অভিজ্ঞতা। নেশাগ্রস্ত মানুষে মনের দরজা খুলে এবং বক্ষ হয়। কখন খুলছে কখন বক্ষ হচ্ছে তা সে বুঝতে পারে না। তুমি নেশাগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে এই বিষয়টি ধরতে চেষ্টা করবে। মহাপুরুষরা কোনো নেশার বস্ত্র গ্রহণ করা ছাড়াই তার মনের দরজা খুলতে পারেন এবং বক্ষ করতে পারেন। আমি নিশ্চিত একদিন তুমিও তা পারবে।

এলিতা আমার ঘরে বসে আছে। তার চোখ ফোলা, মনে হয় একটু আগে
কেঁদেছে। আমেরিকান মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মতো অকারণে
কাঁদে কি-না তাও জানি না। মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ এবং
প্রচণ্ড দৃংখে মানুষ ঠোঁট কামড়ায়। মেয়েরা নিচের ঠোঁট, পুরুষরা উপরের।
এলিতা দুটা ঠোঁটই কামড়াচ্ছে।

তার সমস্যা কী?

আমি বললাম, চা খাবে?

এলিতা প্রবলভাবে মাথা বাঁকাল। সে চা খাবে না। তার ভাবভঙ্গ
থেকে মনে হচ্ছে সে আবারো কান্নার উপক্রম করছে। আমি বললাম, কী
সমস্যা?

এলিতা হাহাকার ধ্বনি তুলে বলল, আমার ক্যামেরা পকেটমার
হয়েছে।

আমি বললাম, তোমার বাংলা ভুল হয়েছে। পকেট থেকে কিছু চুরি
হলে পকেটমার। তোমার এই বিশাল ক্যামেরা কোনো পকেটে আটবে না।
হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে?

হঁ।

তাহলে ছিনতাই হয়েছে। ছিনতাই চোখের সামনে হয়। পকেটমার হয়
আড়ালে।

আমি তোমার কাছে বাংলা শিখতে আসি নি।

কি জন্যে এসেছ?

ঘটনাটা জানাতে, আমার সব ছবি এই ক্যামেরায়। কী চমৎকার সব
ছবি তুলেছি।

আবার তুলবে।

পাগলের মতো কথা বলছ কেন? কোন ছবিই দ্বিতীয়বার তোলা যায়
না।

যাবে না কেন?

প্রথম তোলা ছবির লাইট দ্বিতীয়বার ঠিক থাকে না। পৃথিবী ঘূরছে
আলো প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে।

পৃথিবী স্থির হয়ে থাকলে একই ছবি দ্বিতীয়বার তোলা যেত?

প্রিজ স্টপ ইট। তোমার সঙ্গে বক বক করতে ইচ্ছা করছে না। কাঁদতে
ইচ্ছা করছে।

কাঁদো। তোমাকে কাঁদতেতো কেউ নিষেধ করছে না। কেঁদে মন ঠিক কর। কেঁদে কেঁদে বিজ্ঞানী নিউটন হয়ে যাও।

তার মানে কী?

বিজ্ঞানী নিউটন বিশাল এক অংকের বই এর পাত্রলিপি তৈরি করেছিলেন। নাম ‘প্রিসিপিয়া ম্যাথামেটিকা’ তার আদরের কুকুর জুলন্ত মোমবাতি ফেলে পাত্রলিপি পুড়িয়ে ফেলে। নিউটন বইটা আবার নতুন করে লেখেন। তুমিও নতুন করে ছবি তুলবে।

আমি যে সব মোমেন্ট ক্যামেরায় ধরেছি সেগুলো কোথায় পাব?

নতুন মোমেন্ট তৈরি হবে।

এলিতা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তোমার কাছে আসাই আমার ভুল হয়েছে। আমাকে শুধু একটা কথা বল, তোমাদের পুলিশ কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?

অবশ্যই পারবে। তারা ছিনতাই এর পুরো ঘটনাটা লিখবে। কোথায় ছিনতাই হয়েছে, ক্যামেরার দাম, ছিনতাইকারীর চেহারার বর্ণনা সব লেখা হবে। একে বলে General Diary. সংক্ষেপে GD লেখালেখির পর তুমি চলে আসবে। পুলিশ খাতা বক্স করে চাঙ্গাবে, পা নাচাবে।

তুমি বলতে চাচ্ছ এইসব লেখালেখি অর্থহীন?

সবকিছুইতো অর্থহীন। পথিকী যে ঘূরছে এটা অর্থহীন না। না ঘূরলে কী ক্ষতি হত?

এলিতা মুখ কঠিন করে বলল, আমি যাচ্ছি।

আমি বললাম, হোটেলে গিয়ে তো মন খারাপ করেই থাকবে তারচে চল ধোঁয়া বাবা'র কাছে যাই। দেখি তিনি কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন কি-না।

ধোঁয়া বাবা মানে?

ইংরেজিতে Smoke Father. একজন আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। জীন পরী এইসব অনুশ্য প্রাণী পুষেন। তিনি অনেক কিছু বলতে পারেন। এমনও হতে পারে তোমার ক্যামেরা কোথায় আছে তার সঙ্কান দিলেন। ক্যামেরা উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন।

এলিতা বলল, দিস ইজ বুলশিট।

আমি বললাম, বুলশিট হোক বা কাউ ডাঃ হোক চেষ্টা করতে দোষ কী। কবি বলেছেন,

“নাই কোনো শেষটা

করে যা চেষ্টা।”

ডুবন্ত মানুষ খড়খুটা ধরে ভেসে উঠতে চায়। ক্যামেরার শোকে অস্থির তরুণী ধোঁয়া বাবা ধরবে এটাই স্বাভাবিক।

নৌকায় বুড়িগঙ্গা পার হচ্ছি। এলিতা নিজেকে কিছুটা সামলেছে, অবাক হয়ে চারপাশ দেখছে। অবাক হবার মতো কিছু চারপাশে নেই। যয়লা আবর্জনায় দৃষ্টিত এবং বিষাক্ত নদী। লঞ্চ স্টিমার ভঁা ভঁা করছে। অসংখ্য নৌকা ভাসছে। দেখে মনে হচ্ছে পানিতে ঘোঁট পাকানো ছাড়া এদের কারোরই কোনো গন্তব্য নেই। নৌকা দুলছে, এলিতা মনে হয় খানিকটা ভয় পাচ্ছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, নৌকা ডুবে যাবে নাতো?

আমি বললাম, ডুবতে পারে। তুমি সাঁতার জান না?

না।

আমি বললাম, সাঁতার জেনে মরার চেয়ে সাঁতার না জেনে মরে যাওয়া ভালো।

ভালো কেন?

অল্প পরিশ্রমে মৃত্যু। বাঁচার জন্মে হাত পা ছুড়ে ঝান্ট হতে হবে না। তাছাড়া পানিতে ডুবে মরার জন্মে এই সময়টা বেশ ভালো।

কেন?

পানি গরম। শীতের সময় নদীর পানি থাকে গরম।

তোমার উন্নত কথা শোনার মানে হয় না। আর একটি কথাও বলবে না। শুধু যদি কিছু জানতে চাই তার উন্তর দেবে।

আচ্ছা।

আমরা যার কাছে যাচ্ছি, স্মোক ফাদার। তাকে কি টাকা পয়সা দিতে হবে?

খুশি হয়ে কিছু দিলে উনি নেন। না দিলেও অসুবিধা নেই। উনার চাহিদা অল্প। ধোঁয়া খেয়ে বাঁচেন তো। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটের ঝামেলা নেই। ফ্রেস ধোঁয়া হলেই চলে।

তুমি বলতে চাচ্ছ উনি ধোঁয়া খেয়ে বাঁচেন?

সবাই তাই বলে।

আমাকে এইসব তামাশা বিশ্বাস করতে বলছ?

বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার। তবে বিশ্বাস করাই নিরাপদ।
কারণ কবি বলেছেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

এলিতা বলল, তোমার সঙ্গে আসা ভুল হয়েছে। ক্যামেরার শোকে
অস্থির ছিলাম। লজিক কাজ করছিল না। ঠিক করে বল তোমার অন্য
কোনো মতলব নেইতো? ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে নির্জন কোনো জায়গায়
নিয়ে যাবার মতলব করবে না। আমি ক্যারাটে জানি। ক্যারাটেতে ব্ল্যাক
বেল্ট পাওয়া মেয়ে তাছাড়া আমার সঙ্গে স্প্রে আছে।

স্প্রেটা কী?

আমেরিকান মেয়েরা নিজেদের প্রটেক্ট করার জন্যে ব্যাগে স্প্রে রাখে।
চোখের উপর স্প্রে দিয়ে দিলে জন্মের মতো অঙ্ক হয়ে যাবে।

তোমার সঙ্গে স্প্রে আছে?

অবশ্যই। আমি স্প্রে ছাড়া চলাফেরা করি না। স্প্রে ব্যাগে আছে।

তোমার সঙ্গেতো ব্যাগ নেই। আমার ধরণে ক্যামেরার সঙ্গে তোমার
হ্যান্ডব্যাগও ছিনতাইকারী নিয়ে গেছে। সে এখন মলমপাটি হয়ে গেছে।
স্প্রে মেরে পথচারীকে অঙ্ক করে টাক্ক পয়সা নিয়ে যাচ্ছে।

এলিতা কঠিন চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ডাগর আবির কারণে
চোখে কঠিন্য আসছে না।

আমরা ধোঁয়া বাবার আস্তানায় সন্ধ্যা মেলানোর আগে আগে
পৌছালাম। প্রচুর দর্শনার্থী বাবার জন্যে অপেক্ষা করছে তবে আমরা সঙ্গে
সঙ্গে ডাক পেলাম।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘর। এক কোনায় লাল গামছা কোমরে জড়িয়ে ধোঁয়া
বাবা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসে আছেন। তাঁর মাথার উপর লাল সালুর চাদর।
একপাশে মালশায় ঘনঘনে কয়লার আগুন মাঝে মধ্যে সেখানে ধূপের দানা
ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ধূপের গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ সব মিলিয়ে দম বন্ধ হয়ে
আসার মতো পরিবেশ। বাবার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তিনি মাঝে
মাঝে কারণ ছাড়াই বিকট হা করছেন তখন মুখের ভেতরে লাল জিভ দেখা
যাচ্ছে। মুখের ভেতরটা থাকে অঙ্ককার। অঙ্ককারে লাল জিভ কেন দেখা
যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। আলো বিশেষজ্ঞ এলিতা হয়ত বলতে পারবে।

এলিতা বলল, Oh God. What is this.

ধোঁয়া বাবা বললেন, হিমু ভাই আছেন কেমন?
আমি বললাম, ভালো।
সাদা চামড়ার এই ছেমড়ি কে?
ফটোগ্রাফার। সমস্যায় পড়ে এসেছে।
ছেমড়ি বাংলা বুঝে?
খুব যে বুঝে তা বলা যাবে না।
ধোঁয়া বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, আমিতো হালার ইংরেজি জানি না।
ছেমড়ির সঙ্গে কথা কমু ক্যামনে?
যা পারেন বলেন। আমি দোভাষির কাজ করব।
ছেমড়িরে বলেন, তার কী সমস্যা যেন বলে।
আমি এলিতাকে বললাম, তোমার কী সমস্যা বাবাকে বুঝিয়ে বল।
বাবা শুনতে চাচ্ছেন।

এলিতা বলল (ইংরেজিতে), আমি নিজেকে এইসব বুজুক্কির সঙ্গে
জড়াতে চাছি না। ঘরে আমার দয় বন্ধ হয়ে আসছে।

আমি বললাম, শুরু যখন করেছে শ্রেষ্ঠতা দেখ। ক্যামেরা হারিয়েছে
এটা বল।

এলিতা কঠিন গলায় বলল আমি কিছুই বলব না। ন্যুইসেন্সের সঙ্গে
যুক্ত হব না। আমাকে বোকা মনে করার কোন কারণ নেই।

ধোঁয়া বাবা বললেন, ছেমড়ি চিন্নায় কেন?

আমি বললাম, মনের দুঃখে চিন্কার করছে। দায়ী ক্যামেরা হারিয়ে
মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে।

ক্যামেরা গেছে কোন জায়গায়?

ধোঁয়া বাবার এই বাংলা এলিতা বুঝতে পারল। সে বিরক্ত গলায় বলল,
সোনারগাঁ হোটেলের সামনে।

কী ক্যামেরা?

নাইকন। আমি আর কিছু বলব না আমি বাইরে যাব। আমার চোখ
'Hot' হয়েছে। এলিতা চোখ ডলতে ডলতে ঘর থেকে বের হল। ধোঁয়া
বাবা বললেন, হিমুভাই বসেন। অনেক দিন পরে আপনারে দেখে মনে
আনন্দ হয়েছে।

আমি বললাম, আনন্দের হাত ধরে আসে নিরানন্দ।

ধোঁয়া বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাও ঠিক। কানাঘুসা চলতেছে।
যে কোনদিন পুলিশের হাতে ধরা থাব।

ক্যামেরা কি পাওয়া যাবে?

সিদ্ধিকের এলাকা। পাওয়াতো যাবেই। কতক্ষণে পাওয়া যায় সেটা
কথা। আপনি সাদা ছেমড়ি নিয়ে অপেক্ষা করেন। আমি পাস্তা লাগাই।
রাতে খাওয়া দাওয়া না করে যাবেন না। দাওয়াত কবুল করেছেন?

করলাম।

শুকরিয়া।

ধোঁয়া বাবার ঘরের ধোঁয়া কমে আসছিল। বাবার নির্দেশে একজন এসে
ধোঁয়া বাড়িয়ে দিল। বাবা ক্ষীণ গলায় ডাকলেন, হিয়ু ভাই।

আমি বললাম, কী বলতে চান বলে ফেলুন।

মৃত্যুভয় ঢুকেছে বুঝেছেন। পেরায় রাতেই স্বপ্ন দেখি ফাঁসির দড়িতে
বুলতেছি কিন্তু মরণ হচ্ছে না। বিবাট কষ্টের ব্যাপার। কী করি বলেন তো।

ধোঁয়া খেতে থাকুন আর কী করবেন।

ধোঁয়া বাবার আনন্দায় এলিতাকে নিয়ে রাতের খাবার খেলাম। কাচি
বিরিয়ানি, মূরগির রোস্ট, দৈ মিষ্টি। এলিতা বলল, অদ্ভুত রান্না। এত ভালো
খাবার কম খেয়েছি।

আমি বললাম, পীর ফর্কিরদের দরবারে খানা সব সময় ভালো হয়।

ডিনার শেষ হবার আগেই এলিতার ক্যামেরা চলে এল। ক্যামেরার
সঙ্গে তার চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর নিশ্চয়ই স্প্রেটাও আছে। চোখ
অঙ্গ করার স্প্রে।

এলিতা আবারো বলল, Oh God. এটা কীভাবে সম্ভব?

আমি বললাম, এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব আবার সবই অসম্ভব।
আমার ধারণা বাবা জীন পরীদের সাহায্যে কাজটা করেছেন।

এলিতা বলল, Holy man ধোঁয়া বাবা যে এত পাওয়ারফুল তা আগে
বুঝতে পারি নি। আমি তাঁর Dociple হতে চাই। এটা কি সম্ভব?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই একটু আগেইতো বলেছি
পৃথিবীতে সবই সম্ভব আবার সবই অসম্ভব। ক্যামেরায় যে সব ছবি তুলেছ
সেগুলো ঠিক আছে কি-না আগে দেখ। ধোঁয়া বাবার শিষ্য হবার চিন্তা বাদ
দাও। উনার শিষ্য হলে সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

রাতে দুঃখপূর্ণ দেখবে। ফাঁসিতে ঝুলছ কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে না। মৃত্যুর জন্যে একজন ছটফট করছে কিন্তু সে মরতে পারছে না, বিরাট কষ্টের ব্যাপার না?

এলিতা হতাশ গলায় বলল, You are so confusing.

আমি একাতো না। আমরা সবাই confused প্রাচীন মায়া সভ্যতায় বলা হয়, ঈশ্বর মরছে confused বলেই আমরা সবাই confused .

সোনারগাঁ হোটেলে তাকে নামিয়ে চলে আসছি সে আমাকে চমকে দিয়ে বলল, হিমু! তুমি আজ থেকে যাও।

আমি বললাম, কোথায় থাকব?

আমার ঘরে থাকবে। আমরা সারারাত গল্প করব।

আমি বললাম, হায় সখা এত স্বর্গপূরী নয় পুল্লে কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়।

এলিতা বলল, এর মানে কী?

আমি বললাম, কবিতার লাইন। ব্যাখ্যা করা কঠিন।

এলিতা বলল, এর মানে কি এই যে তুমি থাকবে না।

আমি বললাম, ঠিকই ধরেছি আমি যাই। তুমি আরাম করে যুমাও।

আমি হাঁটা ধরেছি এলিজুতাকিয়ে আছে।

ঢাকা শহরে রাতে আকাশ দেখা যায় না বলে পথচারীদের মাঝে মাঝে খুব সমস্যা হয়। আকাশে হয়ত ঘন মেঘ করেছে, বেচারা বুঝতে পারল না। হড়মড়িয়ে নামল বৃষ্টি। শোবার ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে যে আছে সে তখন মনের আনন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা যাপন পড়তে পারে। পথে যে নেমেছে তার মহাবিপদ। বৃষ্টি শুরু হলেই রিকশা সিএনজি কিছুই পাওয়া যাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তায় পানি উঠে যাবে। সেই পানিতে এক সময় ফুটপাত ঢেকে যাবে। ম্যানহোল সবই ফুটপাতে। এই শহরে ম্যানহোলের ঢাকনা ঢুরি করে এমন একদল মানুষই আছে। তারা সেরদরে ম্যানহোলের ঢাকনা বেচে কিংবা কটকটিওয়ালার কাছে ঢাকনার বিনিময়ে কটকটি কিনে থায়। রাতের ঢাকায় বৃষ্টি হচ্ছে আর কেউ ম্যানহোলের ভেতর ঢুকে যায় না এমন ইতিহাস নেই।

ফুটপাতে পানি উঠে গেছে কাজেই ফুটপাত ছেড়ে আমি পথে নেমেছি।
আমার গা ঘেঁসে একটা প্রাইভেট কার গেল। আমি কাদাপানিতে মাখামাখি।
প্রাইভেট কারের জানালা খুলে একজন মাথা বের করে বলল, ‘দাদা! সরি।’

গাড়ির ভেতর থেকে প্রবল হাসির শব্দ ভেসে এল। বিচ্ছি কারণে
অন্যের দুর্দশায় আমরা আনন্দ পাই।

সারাগায়ে কাদাপানি মেখে আমি দাঁড়িয়ে আছি। বিরামহীন বৃষ্টি
পড়ছে। গায়ের কাদা বৃষ্টির পানিতে ধূয়ে যাবার কথা, তা যাচ্ছে না।
আমার ইচ্ছা করছে সোনারগাঁ হোটেলে ফিরে এলিভাকে বলা, “আজ
রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্ত।”

আরেকটা গাড়ি এসে আমাকে দ্বিতীয়বার ভিজিয়ে দিল। মজা মন্দ না।
আমার ধারণা একের পর এক গাড়ি আসবে অসহায় পথচারীকে ভিজিয়ে
আনন্দ পাবে। নিশ্চিন্তাতে মানুষকে আনন্দ দিতে পারছি এটা খারাপ না।

আমি অপেক্ষা করছি এমন একটা গাড়ির যে দূর থেকে আমাকে দেখে
গতি কমিয়ে দেবে। এই গাড়ি আমার গা ঘেঁসে যাবে কিন্তু আমাকে ভিজাবে
না। এমন ঘটনা ঘটার পর আমি মেসে ফ্রিব তার আগে না।

মজার এক খেলা শুরু হয়েছে। দূর থেকে গাড়ির হেড লাইট দেখামাত্র
আমি রোমাঞ্চিত বোধ করছি। শুরুই গাড়ি মনে হয় আমাকে ভিজাবে না।

ঝাঁ ঝম। পাজেরো গাড়ি আমাকে ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এবার আসছে এক চক্ষু গাড়ি। নিশ্চয়ই ট্রাক। ট্রাকের দুটা হেড
লাইটের একটা বেশির ভাগ সময় নষ্ট থাকে।

ঝাঁ ঝাম! ট্রাকও ভিজিয়ে দিল। দেখা যাক এবার কী আসে। আমার
কাজ অপেক্ষা করা আমি অপেক্ষা করছি।

ঝড় বৃষ্টির রাতের জন্যে ঢাকা শহরে বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা
করে। এই তথ্য আর কেউ জানুক না জানুক টহল পুলিশরা জানে। এই
প্রাণীগুলো দেখতে মানুষের মতো তবে সামান্য লম্বা। এরা রাতের
অঙ্ককারেও চোখে কালো চশমা পরে থাকে বলে এদের চোখ দেখা যায় না।
শীত গ্রীষ্ম সব সময় এরা হাতে গ্লাভস পরে থাকে বলে হাতও দেখা যায়
না। একা কাউকে পেলেই এরা কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। পাখির মতো
কিচকিচ করে কথা বলে। হ্যান্ডসেকের জন্যে হাত বাড়ায়।

একবার এদের একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কেন জানি
মনে হচ্ছে আজও দেখা হবে। আমি এদের নাম দিয়েছি পক্ষীমানব।
টহল পুলিশরা বলে ‘বেজাত’। এদের কোনো জাত নেই।

একটা প্রাইভেট কার স্লো করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।
পেছনের সিটে বসা আরোহী জানালা খুলে উদ্ধিঘ গলায় বলল, ভাই!
আপনার কোনো সমস্যা।

কোনো সমস্যা নেই।

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাসা কোথায় বলুন। নামিয়ে
দিচ্ছি।

অদ্রলোকের চোখে কালো চশমা। উনি কি পক্ষীমানবদের কেউ?

বৃষ্টিতে ভেজার ফল ফলেছে, জুরের ঘোরেশোরীর ও চেতনা আচ্ছন্ন। কড়া
ঘুমের ওষুধ খাবার পরেও ঘুম না এলে যেমন লাগছে আমার ঠিক সে রকম
লাগছে। শরীরের একটা অংশ ঘুমিয়ে পড়েছে অন্য অংশ জেগে আছে। সুন্দি
ও জাগরণের মাঝামাঝি ত্রিশঙ্খ অবস্থা। স্বপ্ন দেখছি, স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে।
প্রতিটি স্বপ্নেই আবহ সংগীত হিসেবে বৃষ্টির শব্দ। স্বপ্নে ফিলর হিসাবে
পক্ষীমানবকে দেখছি। তিনি উদ্ধিঘ গলায় বলছেন, আপনার কী সমস্যা?

একটা স্বপ্নে এলিতাকে দেখলাম। তার হাতে ক্যামেরা। আমার হাতে
সানগান। আমি আলো ফেলছি, এলিতা ছবি তুলছে। আমরা এগুচ্ছি
পিছিল সুরক্ষের ভেতর দিয়ে। সুরক্ষের গায়ে প্রাচীন মানুষদের আঁকা ছবি।
এলিতা ক্যামেরায় সেই সব দৃশ্য ধরছে। সে দুটা বাইসনের পেছনে
একদল শিকারির ছবি তুলল। স্বপ্নে অস্তৃত অস্তৃত ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক
মনে হয়। যেমন বাইসনের ছবি তোলার সময় এলিতা বাইসনদের বলল,
তোমরা একটু আমার দিকে ফের। আমি তোমাদের চোখ পাচ্ছি না। সঙ্গে
সঙ্গে দুটা বাইসন ক্যামেরার দিকে ফিরল। স্বপ্নে ব্যাপারটাকে মোটেই
অস্বাভাবিক মনে হল না।

আমার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। যে পানি ঢালছে তার মুখ দেখতে
পাচ্ছি না। শুধু কানের পাশ দিয়ে নেমে যাওয়া শীতল পানির স্নোত অনুভব

করছি । এতে আমার সুবিধা হচ্ছে পানি যে ঢালছে তাকে কল্পনা করে নিতে পারছি । তার সঙ্গে মনে মনে কথাবার্তা বলছি ।

কল্পনা করছি মাজেদা খালা পানি ঢালছেন । তার গা থেকে কড়া জর্দার গন্ধ আসছে । মাজেদা খালা বললেন, জুর কীভাবে বাঁধালি? বৃষ্টিতে ভিজেছিস?

হঁ ।

তোর সঙ্গে এলিতা মেয়েটা ছিল?

না ।

ওকে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজলি না কেন?

লাভ কী?

বৃষ্টি ভিজাভিজি থেকে প্রেম হয় । হিন্দী সিরিয়েলে দেখেছি ।

এলিতার প্রসঙ্গ আসতেই মাজেদা খালার জায়গায় এলিতা চলে এল । এখন সে পানি ঢালছে । একই সঙ্গে চুলে আঙুল বুলাচ্ছে ।

হ্যালো হিমু ।

হ্যালো ।

আমার কথা শুনে হোটেলে থেকে গেলে আজ এমন জুরে কাতরাতে না ।

হঁ ।

সারারাত দু'জনে গল্প করতাম । আমার ঝুঁড়িতে অনেক গল্প ।

হঁ ।

একটা লাভ হয়েছে ভুল করে শিখেছ ।

সবাই ভুল থেকে শেখে না । কেউ কেউ আছে একের পর এক ভুল করেই যায় ।

এলিতা মিলিয়ে গেল তখন চলে এলেন আমার মা । তবে তিনি এলেন বাচ্চা একটা মেয়ে হয়ে । মেয়েটি আমার চেনা, তানিজা । মেয়েটির এক হাতে তার বাবার জুতা জোড়া তারপরেও সে আমার মাথায় পানি ঢালছে এবং চুল বিলি করে দিচ্ছে । জুরে অর্ধচেতন অবস্থায় সবই সম্ভব । আমার শিশু ঘূমপাড়ানি গান গেয়ে আমাকে ঘূম পাড়াতে চাইছেন । তবে গানের কথা এলোমেলো । প্রতিটি লাইনের শেষে সুরেলা লম্বা টান আছে—

কে ঘুমালো রে
পাড়া জুড়ালো রে
বর্গি কোথায় রে...

গান থামিয়ে মা বললেন, তোকে আমি একটা হলুদ ছাতা কিনে দেব।
এরপর থেকে হলুদ ছাতা মাথায় দিয়ে রোদে ঘূরবি বৃষ্টিতে যাবি। তোর
কিছু হবে না।

প্রবল জুরে কতদিন আচ্ছন্ন ছিলাম তা জানি না। কখন হাসপাতালে
ভর্তি করা হয়েছে তাও জানি না। এখন মোটামুটিভাবে হলেও বিছানায়
আধশোয়া হয়ে বসতে পারছি। চামুচে করে নিজে নিজে স্যুপ খেতে
পারছি। স্যুপ বিশ্বাদ, এও ব্যাধির অংশ। শরীর ব্যাধি মুক্ত হলে স্যুপ তার
স্বাদ ফিরে পাবে।

সকাল। আমার সামনে হাসপাতালের ব্রেকফাস্ট। ডিম সিন্ধু, কলা,
পাউরুটি জেলি।

হাসপাতালের বিছানা ঘেঁসে পেনসিল ওসি সাহেবে বসে আছেন। আমি
তাঁর নাম মনে করতে পারছি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে পড়বে। ব্রেইন
খাতা-পত্র উল্টে নাম খোঁজা শুরু করেছে।

ওসি সাহেবের বললেন, আপনি নাশতা খাচ্ছেন দেখে ভালো লাগছে।
নিউমোনিয়ায় আপনার দুটা লাংসই আক্রান্ত হয়েছিল। একটা পর্যায়ে
ডাক্তাররা পর্যন্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি হাসলাম। এই হাসির সঙ্গে রোগমুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই।
হাসার কারণ ওসি সাহেবের নাম মনে পড়েছে। তাঁর নাম আবুল কালাম।
তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র।

ওসি সাহেবের আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আপনাকে
হাসপাতালে ভর্তি করেছে আপনার আমেরিকান বান্ধবী এলিতা।
হাসপাতালের খরচপাতিও সে দিচ্ছে।

আমি বললাম, এলিতা কি দেখতে আলতা যেয়েটির মতো?

ওসি সাহেব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, কীভাবে বুঝলেন?

আমি বললাম, কোনো অলৌকিক উপায়ে বুঝি নি। আলতার কথা
বলার সময় আপনার গলার স্বর যেভাবে কোমল হয়ে যেত এলিতার কথা
বলার সময় আপনার গলা একই ভাবে কোমল হয়েছে।

ওসি সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। গম্ভীর গলায় বললেন, যাই।
আপনি ভালোমতো সুস্থ হয়ে উঠুন আপনার সঙ্গে কথা আছে। জরুরি কথা।
এখন বলুন।

না। এখনও বলার সময় আসে নি।

এলিতা এসেছে। তার চোখ মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। আমার
রোগমুক্তি দেখে সে আনন্দিত এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই।
অন্য কোনো কারণ আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা জানা যাবে।

কারণ জানা গেল। এই ক'দিনে সে অসুস্থির ভালো কিছু ছবি তুলেছে।
এর মধ্যে একটি ছবি হল, হয় সাত বছরের একটা নগৃ ছেলে বৃষ্টিতে
ভিজতে ভিজতে পাউরুটি খাচ্ছে। পাউরুটি যেন ভিজে না যায় সে জন্যে
একটা হাত মেলে সে ছাতার মতো পাউরুটির উপর ধরে আছে।

এলিতা বলল, তোমার অসুস্থি অবস্থায় একটা ছবি আছে। ছবিটা প্রিন্ট
করে তোমাকে দেখাব। ছবি দেখে সঙ্গে সঙ্গে তোমার চোখে পানি আসবে।
তানিজা মেয়েটি তার মাকে নিয়ে তোমাকে দেখতে এসেছিল।

সে তোমাকে হলি জমজম ওয়াটার খাওয়াবে। বোতলে করে সে হলি
ওয়াটার নিয়ে এসেছে। চামচে করে তোমার মুখে মেয়েটা পানি ধরেছে সেই
পানি তোমার গাল বেয়ে বিচ্ছিন্ন নামছে। একই সঙ্গে মেয়েটা কাঁদছে।
তোমার গালের পানি এবং মেয়েটার গালের পানি চকচক করছে। ন্যাচারাল
আলোয় তোলা ছবি। অসাধারণ।

আমি বললাম, তোমার ছবির সাবজেক্ট হতে পেরেছি এতে আমি খুশি।
তুমি আমার চিকিৎসার খরচ কেন দিয়েছ ব্যাখ্যা করলে ডাবল খুশি হব।

টাকা ফেরত দেবে?

কীভাবে দেব? আমি অন্যের টাকায় প্রতিপালিত ভিক্ষুক বিশেষ।

অন্যের দয়া গ্রহণ করতে তোমার সমস্যা হয় না?

সৃষ্টিকর্তার দয়া গ্রহণ করতে যদি আমার সমস্যা না হয় তাহলে অন্যের
দয়া গ্রহণ করতে সমস্যা কেন? সব মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর প্রকাশিত।
কাজেই আমি ওধুমাত্র ঈশ্বরের দয়াই নিছি।

এলিতা মুখ চোখ কুঁচকে বলল, Oh God! এই বাক্যটি বলা মনে হয়
তার মুদ্রা দোষ। কারণে অকারণে বলে।

এলিতা বলল, তোমার প্রিয় রঙ কী?

নীল।

এই রঙ প্রিয় হবার পেছনে কি কোনো কারণ আছে; না এমনিতেই
প্রিয়।

কারণ আছে, আমাদের দৃশ্যমান জগতের বড় অংশ আকাশ। আকাশ
নীল।

এলিতা বলল, তুমি শুনলে অবাক হবে আমি তোমার প্রিয় নীল রঙের
একটা শাড়ি কিনেছি।

হঠাতে শাড়ি কেন?

আমি ঠিক করে রেখেছিলাম যেদিন তোমার রোগমুক্তি হবে আমি নীল
শাড়ি পরে উপস্থিত হব।

শাড়িতো পর নি।

শাড়ি পরতে যে এত কিছু লাগে জানতাম না। স্কার্টের মতো আভার
গার্মেন্টস। টপস-এর মতো একটা ড্রেস, যাই হোক হোটেলের সাহায্যে
দর্জি ডেকে ব্যবস্থা করেছি। শাড়ির অন্য অংশগুলো দর্জি এখনো দেয় নি।

আমি বললাম, কোনো অসুবিধা নেই আমি কল্পনা করে নিছি তুমি
শাড়ি পরে আমার সামনে বসে আছ। আমি খুব ভালো কল্পনা করতে পারি।

Oh God.

ও গড় বলে আঁধকে উঠলো কেন?

এলিতা গল্পীর গলায় বলল, যে শাড়ি পরা অবস্থায় আমি বসে আছি
কল্পনা করতে পারে সে নগ্ন অবস্থায় আমি বসে আছি এই কল্পনাও করতে
পারে। এ জন্যেই Oh God. বলেছি। হিমু এখন আমি উঠব। তোমার কাছে
ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সরি।

হঠাতে ক্ষমা প্রার্থনা কেন?

অন্য আরেক দিন বলব। আজ না। তোমাকে রিলিজ করছে কবে?

জানি না।

সমস্যা নেই। আমি জেনে নিছি। তোমাকে রিলিজ করার দিনে আমি
নীল শাড়ি পরে আসব।

আচ্ছা।

হাসপাতাল থেকে যেসে ফিরেছি। নীল শাড়ি পরে এলিতার আসার
কথা ছিল সে আসে নি।

আলম সাহেব ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। আমি এসেছি
জেনেও তিনি দরজা খুললেন না। আমার রোগমুক্তির জন্যে তিনি এক
হাজার রাকাত নামাজ মানত করেছেন। দিনে ৭০ রাকাত থেকে ১০০
রাকাতের বেশি পড়তে পারেন না বলে মানত মাঝামাঝি পর্যায়ে আছে।
মানত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি দরজা খুলবেন না।

কাদেরের কোনো খৌজ পাওয়া গেল না।

আমি হাসপাতালে ভর্তির দিন থেকে না-কি সে নিখৌজ।

দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকা অনেকটা বিদেশ বাসের মতো। বিদেশ
ভ্রমণ শেষ হলে দেশে ফেরার জন্যে প্রাণ ঘ্যান ঘ্যান শুরু করে।

মেসে পা দিয়েও আমার প্রাণের ঘ্যানঘ্যানানি দূর হল না। ঢাকার পথে
ঘাটে ঘূরতে ইচ্ছা করল। শরীরের এই অবস্থায় ‘হন্টন’ প্রক্রিয়া সম্ভব না।
আমি সারা দিনের জন্যে রিকশা ভাড়া করলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত রিকশা নিয়ে
ঘূরব বিনিময়ে আমার সঙ্গে টাকা পয়সা যা আছে সব তাকে দিয়ে দেব।
অনেকটা জুয়া খেলার মতো।

রিকশাওয়ালা মধ্যবয়স্ক, নাম ইছহাকু সে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
আমার দিকে তাকিয়ে থেকে রাজি হলেনমিনমিনে গলায় বলল, চা নাশতা
দুপুরের খানা এইগুলা কার?

আমি বললাম সব তোমার আমার খাওয়ার পয়সাও তুমি দেবে। রাজি
আছ?

ইছহাক বলল, স্যার উঠেন।

রিকশা নিয়ে ঘণ্টাখানেক শহরে ঘূরে মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করতে
গেলাম।

মাজেদা খালা বাসায় ছিলেন না। খালু সাহেব ছিলেন, তিনি আমাকে দেখেই
বললেন, তোমার খালা বাসায় নেই। দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবে না।

আমি বললাম, আপনারা আছেন কেমন?

ভালো আছি। এখন বিদায় হও।

বিদায় হলাম। মাজেদা খালা এবং খালু আমার অসুখের খবর পান নি।

পরের স্টেশন বাদলদের বাড়ি। সেখানে বিরাট হৈ চৈ। মেজো খালু
চার ব্যাগ বাজার নিয়ে ফিরেছেন। গাড়ি থেকে নেমেছে তিন ব্যাগ।
আরেকটার খৌজ পাওয়া যাচ্ছে না। খালু সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে
বিরক্ত গলায় বললেন, এখন বামেলায় আছি, বিদায় হও তো।

আমি বললাম, দুপুরে আপনার এখানে খাব ভেবেছিলাম। সঙ্গে একজন গেস্ট আছে। আমার রিকশাওয়ালা বারান্দায় খাবার দিলেই হবে।

গেট লস্ট, গেট লস্ট।

ইছহাক আমাকে দুপুরের খাবার খাওয়ালো রাস্তার পাশের রেস্টুরেন্টে। ইট বিছিয়ে খাবার দেয়া হয় বলে এইসব রেস্টুরেন্টের আরেক নাম ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট।

আগুন গরম মোটা মোটা রশ্টি।

হিনুল শুটকির জিভ পুড়ে যাওয়ার মতো ঝাল ভর্তা।

মুরগির গিলা কলিজা।

ইছহাক বলল, স্যার পেট পূরা হইছে?

আমি বললাম, আরাম করে খেয়েছি ইছহাক।

ইছহাক বলল, এখন ডাবল জর্দা দিয়ে একটা পান মুখে দিয়া একটা ছিরগেট ধরান। দেখবেন দুনিয়ার মধ্যে বেহেশত নামব। দশ পনরো মিনিট শুইয়া কি বিশ্রাম নিবেন?

বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হয়।

রেস্টুরেন্টের সঙ্গেই নীল রঙের শুল্পাথিনে তাঁবুর মতো ঘর। মেঝেতে শীতল পাটি এবং বালিশ। বালিশ পরিষ্কার। আধঘণ্টার জন্যে বিশ্রামের ভাড়া দশ টাকা। ইছহাক দশ টাকা দিয়ে আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করল।

ডাবল জর্দার পান এবং সিগারেট হাতে আমি বিশ্রামে গেলাম। আধঘণ্টার জায়গায় এক ঘণ্টা কাটিয়ে ফিরলাম। ইছহাক রিকশার সিটে বসে চা খাচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, আরাম হইছে স্যার।

আমি বললাম আরাম হয়েছে। মাঝে মাঝে এখানে বিশ্রামে আসব। ইছহাক এখন মূল কথা শোন। আমার কাছে টাকা পয়সা কিছুই নাই। চুক্তিমতো তুমি আমাকে আমার মেসে নামিয়ে চলে যাবে।

ইছহাকের কোনো ভাবান্তর হল না। হাসিমুখে বলল স্যার কোনো অসুবিধা নাই। একটা ঘটনা শুনেন স্যার পাঁচ ছয় বছর আগের কথা। আপনের মতো চুক্তিতে এক স্যার আমার রিকশায় উঠল। সন্ধ্যাবেলা রিকশা থাইকা নাইমা বলল, এই নাও আমার কাছে এগারো হাজার টাকা আছে। নিয়ে যাও। মালিকের রিকশা আর চালাবা না। নতুন রিকশা কিনবা।

আমি নয়া রিকশা খরিদ করেছি। শাদী করেছি। ঘটনাটা কি এখন আপনার ইয়াদ হইছে?

না।

আপনারে চিনতে আমার দেরি হয়েছে। আমার দোষ নাই। আপনার চেহারা নষ্ট। দেইখা মনে হয় ছায়ার কচু গাছ। গায়ে চান্দর থাকনে হলুদ পাঞ্জাবি চোখে পড়ে নাই। স্যার ভালো আছেন?

ভালো আছি।

শহরে ঘুরতে ইচ্ছা করলেই মোবাইলে মিস কল দিবেন চইলা আসব। নয়া মোবাইল খরিদ করেছি।

ইচ্ছাক আমার মোবাইল নাই।

আচ্ছা যান ডিউটিতে বাহির হইয়া প্রথম আপনের খোঁজ নিব।

কোন প্রয়োজন নাই ইচ্ছাক। মাঝে মাঝে দেখা হওয়াই ভালো।

ইচ্ছাক বলল, আপনের শরীর বেশি খারাপ করেছে। শরীরের যত্ন নিবেন। গরিবের এই অনুরোধ।

রাশিয়ান পরী আমাকে দীর্ঘ এক চিঠি লিখেছেন। চিঠি ডাকে বা কুরিয়ার সার্ভিসে আসে নি। আমার অনুপস্থিতিতে সে নিজেই এসে দিয়ে গেছে। চিঠি ইংরেজিতে লেখা। মাঝে মাঝে কিছু বাংলা শব্দ ঢুকেছে। তার বাংলায় যে কোন উন্নতি হয়েছে তা মিলো যাবে না। প্রিয় হিমু লিখতে গিয়ে লিখেছে ‘পিতৃ হিমু।’ আমি মোটামুটি ঠিক করে দিলাম।

এলিতার চিঠি

প্রিয় হিমু,

তোমার দীর্ঘরোগভোগের পেছনে আমার ভূমিকা আছে। আগে ব্যাখ্যা করি। ধোঁয়া বাবাকে দিয়ে শুরু করা যাক। আমি যখন ক্যামেরা ফেরত পেলাম তখনই বুঝলাম লোকটি ভয়ঙ্কর এক ক্রিমিন্যাল। ঢাকা ক্রাইম ওয়ার্ল্ডের গড় ফাদার। তা-না হলে হারানো ক্যামেরা এত দ্রুত আমার হাতে আসবে না। কিন্তু আমি ভান করলাম ধোঁয়া বাবার অলৌকিক ক্ষমতায় আমি মুক্ষ। আমি তার শিষ্য হবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলাম। ধোঁয়া বাবার পরিচয় আমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে এই তথ্য নিশ্চয়ই আমি

জানাব না। আমার অভিনয় ভালো হয়েছিল। মনে হয় তুমি ধরতে পার নি।

তোমার সঙ্গে এমন একজন ক্রিমিন্যালের স্থ্যতার বিষয়টা কিছুই বুঝলাম না। একজন সাধুর সঙ্গে পরিচয় হবে একজন সাধুর। ক্রিমিন্যাল চিনবে ক্রিমিন্যালকে।

তোমার কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটি আমি জানতে চাছিলাম বলেই তোমাকে রাতে হোটেলে থেকে যেতে বলি। আমার যৌন সঙ্গী হবার জন্যে না।

আমার প্রস্তাৱ শুনে তুমি অবাক হলে, আহত হলে এবং লজ্জিত হলে। আমার ধারণা তুমি ঘৃণাবোধও করেছ। তোমার সেই দৃষ্টি এখনো আমার চোখে ভাসে।

ঝড় বৃষ্টির রাতে তুমি বের হয়ে গেলে এবং নিজেকে কষ্ট দেবার জন্যে সারারাত বৃষ্টিতে ভিজলে। কী করে জানলাম? নিজেকে কষ্ট দেবার এই ধরনের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আমি কয়েকবার শিয়েছি। একবারের কথা বলি, মা'র উপর রাগ করে তুষারপাতের মধ্যেই ঘর ছেড়ে বের হয়েছি। অধম্যত অবস্থায় পুলিশ আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হিমু শোন! আমি একজন ব্রোকেন পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা স্কুলের ফুটবল কোচ ছিলেন। এলকোহলিক হবার কারণে তার চাকরি চলে যায়। চরম অর্থনৈতিক সংকটে আমি এবং মা দিশাহারা হয়ে যাই। মা সমস্যার সুন্দর সমাধান করেন। তিনি বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ফোস্টার পিতামাতার কাছে।

আমার রূপ আমার কাল হয়ে দাঁড়ায়। তের বছর বয়সে আমার ফোস্টার পিতা এক দুপুরে আমার শোবার ঘরে ঢুকেন। দরজা বন্ধ করে আমার মুখ চেপে ধরেন যাতে আমি শব্দ করতে না পারি। আমার ফোস্টার মা বাড়িতে ছিলেন না। তিনি তাঁর বৃন্দ পিতামাতাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

এই ঘটনা আমি গোপন করে যাই। আমি আমার ফোস্টার মা'কে কষ্ট দিতে চাই নি। আমি সরকারের কাছে কোনো কারণ না দেখিয়েই ফোস্টার পরিবার বদলবার আবেদন করি।

এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে সেখান থেকে অন্য জায়গায় এমন চলতেই থাকে। সব জায়গায় যে একই ঘটনা ঘটেছে তা না। আমার ভেতর তখন অস্ত্রিতা কাজ করছিল।

আমি আমার নারী সত্তার উপর এতই বিরক্ত হই যে পুরুষের পোশাক পরতে শুরু করি। নিজেকে পরিচয় দিতাম পুরুষ হিসেবে। আমার পুরুষ নাম ছিল ‘পিটার’। এই নাম আমি নিয়েছি পিটার দ্য গ্রেটের কাছ থেকে।

রাশিয়ান জার পিটার দ্য গ্রেটকে নিশ্চয়ই চেন। তোমার ব্যাপক পড়াশোনা, না চেনার কথা না। এই মহান জার রাজকীয় নৌকায় করে প্রয়োদ ভরণে বের হয়েছিলেন। হঠাতে দেখলেন দূরে একটা সাধারণ জেলে নৌকা ডুবে যাচ্ছে। নৌকার আরোহী একটা বাচ্চা ছেলে সাঁতার না জানার কারণে ডুবে যাচ্ছে। পিটার তাকে রক্ষা করার জন্যে পাখিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শিশুটি উদ্ধার পেল কিন্তু পিটার দ্য গ্রেট মারা গেলেন।

পুরুষ হতে গেলে এমন পুরুষই হতে হয়। তোমার মতো পুতু পুতু পুরুষ না। বৃষ্টির পানি মাথায় লাগানো পনেরো দিনের জন্যে জুরে পড়ে কুঁ কুঁ করতে লাগলে।

তোমাকে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম কারণ পরশু ভোরবেলা আমি চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করছে না।

এই চিঠি লিখতে লিখতে একবার মনে হচ্ছে কী দরকার ফিরে গিয়ে। অন্তত সুন্দর এই দরিদ্র দেশটায় থেকে যাই না কেন। যে হিমু আমার সঙ্গে Hide and seek খেলছে তাকে গোপন কামরা থেকে ঝুঁজে বের করে আনি।

আমি যখন হাইস্কুলে পড়ি তখন একটি প্রেমপত্র পাই। শুনলে অবাক হবে আমি পুরুষদের ভাষ্যমতে ভয়ঙ্কর রূপবতী হলেও একটি প্রেমপত্র ছাড়া দ্বিতীয় প্রেমপত্র পাই নি। প্রেমপত্রটি কে পাঠিয়েছে তাও কিন্তু অজানা। বেচারা সম্ভবত নিজেকে প্রকাশিত করতে লজ্জাবোধ করছে। সে যাই হোক প্রেমপত্রে একটা কবিতা লেখা ছিল।

I am your man
That is what I am
And I am here to do
Whater I can.

সুন্দরভাবে কবিতা না? ‘এই মেয়ে শোন। আমি তোমার পুরুষ। তোমার জন্যে সম্ভব যা কিছু সবই আমি করব।

আমি সুন্দর রেডিও এন্ড কাগজে এই চিঠির একটি জবাব লিখে রেখেছি।

I am your girl
That is what I am
And I am here to do
Whater I can.

এখন ভাবছি এই জবাবটা তোমাকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। ভয় নেই, ঠাট্টা করছি।

এখন কি তুমি আমাকে কিছুটা বুঝতে পারছ? সাধারণত দেখা যায় একজন মানুষ অন্য একজনকে বুঝতে পারে না। মূল কারণ ‘হাইড এন্ড সিক’ গেম। মানুষ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে। সে চায় অন্যরা তাকে খুঁজে বের করুক।

তোমাকে আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না। একদিকে ধোঁয়া বাবার মতো ভয়ঙ্কর অপরাধীর সঙ্গে

তোমার ব্যক্তি অন্যদিকে মানুষের প্রতি তোমার মমতা। তানিজা মেয়েটির কথা ভাব। তুমি চমৎকারভাবে তাদের বাবা মা'র সমস্যার সমাধান করে দিলে। Fairy tale এর মতো তারা এখন সুখে আছে। এর মধ্যে তারা একদিন আমাকে লাঞ্ছ খাইয়েছে। সারাদিন তাদের সঙ্গে থেকেছি রাতেও থাকতে হয়েছে। কারণ তানিজা মেয়েটি কিছুতেই আমাকে হোটেলে ফিরতে দেবে না।

এই মেয়েটির মতো আমারো বাবা মা'কে নিয়ে একটি সুখের সংসার হতে পারত। হয়নি কারণ সেখানে হিমু বলে কেউ ছিল না।

তোমার আশেপাশে যারা থাকে তারা তোমাকে কী চোখে দেখে তা নিশ্চয়ই তুমি জান। একটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। একদিন কাদেরের সঙ্গে গল্প করছি কী প্রসঙ্গে যেন তোমার কথা উঠল। আমি বললাম, তোমার হিমু ভাইজান একজন ধান্দাঙ্গ বদ লোক। কাদের বলল, হিমু ভাইজানের সিংয়া কেউ যদি মন্দ কথা বলে আমি তার কল্পা ফাল্পায়ে দিব।

আমি বললাম, সত্য কল্পা ফেলবে।

কাদের বলল, অবশ্যই। মাটির কসম, পানির কসম আর আগুনের কসম।

আমি ফলের ঝুঁড়িতে রাখা ছুরি বের করে বললাম, এই নাও, ছুরি। এখন আমার কল্পা ফেল। সে ছুরি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রাইল, তার চোখে আগুন ঝক ঝক করছে। ঠিকমতো দেখাশোনা না করলে এই ছেলেটি কিন্তু ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হয়ে বের হবে। সম্ভব হলে আমি তাকে নিয়ে আমেরিকা চলে যেতাম।

এই ছেলেটির জন্যে কিছু কি করা যায়? কাদের আমাকে কী ডাকে জান? 'মাইজি'। আমি বললাম 'মাইজি' শব্দের মানে কী?

সে জবাব দেয় না। হোটেলের বাঙালি কর্মচারীদের কাছে শুনলাম, মাইজি মানে মা। একটি অজানা অচেনা

ছেলে দিনের পর দিন আমাকে মা ডেকে যাচ্ছে আর
আমি বুঝতেই পারি নি। আশ্চর্য না?

কাদেরের জন্যে আমি দশ হাজার ডলার রেখে
যাচ্ছি। তুমি ব্যবস্থা করো।

তুমি ভালো থেকো।

এলিতা।

আলমের বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে। তার মানতের নামাজ আগেই
শেষ হয়েছিল এখন আবার নতুন কোনো মানতের নামাজ শুরু হয়েছে।
দরজা জানালা পুরোপুরি বক্ষ। গভীর রাতে আলমের ঘর থেকে ধূপের গন্ধ
পাওয়া যায়। গন্ধের সঙ্গে হঁ হঁ শব্দও ভেসে আসে। হঁ হঁ শব্দের কারণ
পরিষ্কার না, জিগির হতে পারে।

আলমের ছোট ভাই বদরুল ভাইয়ের খৌজে এসে 'টাসকি' খেয়েছে।
সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ভাইজান আপমার কী হয়েছে?

আলম উদাস গলায় বলল, কিছু হয়েছাই। ধর্ম কর্ম নিয়া আছি। মাঝে
মাঝে চিন্তার জগতে যেতে হয়। চিন্তার জগৎ বড়ই বিচিত্র।

এমনতো আপনি ছিলেন ~~তামাঙ্গ~~

আলম উপদেশ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, সব মানুষের জীবনে একবার
একটা ঘটনা ঘটে। তখন শুরু হয় সমস্যা। লাইন বদল হয়।

বদরুল বলল, লাইন বদল হয় মানে কী?

আলম দুলতে দুলতে বলল, (যে কোনো কথা বলার সময় সে ধর্মগ্রন্থ
পড়ার সময় যে দুলুনিতে মানুষ দুলে, সেই ভাবে দুলে।) ট্রেইন এক লাইনে
চলে লাইন বদল করা ট্রেইনের পক্ষে সম্ভব না। মানুষ ট্রেইনের মতো এক
লাইনে চলে। তবে বিশেষ ঘটনার পর নতুন লাইন পাওয়া যায়।

আপনিতো পীর ফকিরের মতো কথা বলা শুরু করেছেন।

চিন্তা ভাবনা করে কথা বলি বলে এ রকম মনে হয়।

বদরুল বলল, আপনার জীবনে বিশেষ কী ঘটনা ঘটেছিল যে আপনি
এমন হয়েছেন?

আলম হাই তুলতে তুলতে বলল, একজোড়া জুতা ছিনতাই করেছিলাম।
সেই থেকে শুরু। ব্রাউন কালারের চামড়ার জুতা। অন্য কালারের জুতা

ছিনতাই করলে হয়ত এ রকম হত না। তুচ্ছ ঘটনার বড় পরিবর্তন হয়। এটা আমি চিন্তার মাধ্যমে পেয়েছি।

বদরূল বলল, প্রয়োজনে আরেকবার জুতা ছিনতাই করে ঝামেলা কাটান দেন। আপনারে দেখে ভয় লাগতেছে। ইয়া মারুদ! কী মানুষ ছিলেন কী হইছেন। চলেন আমার সঙ্গে দেশে যাই।

আলম বলল, একটা চিন্তার মধ্যে আছি, চিন্তা শেষ হোক তারপর যাব ইনশাল্লাহ।

কী চিন্তার মধ্যে আছেন?

দুনিয়ার সব মানুষ যদি ভালো হয়ে যেত তাহলে দুনিয়ার অবস্থাটা কী হত সেটা নিয়ে একটা চিন্তা।

বদরূল হতভম্ব গলায় বলল, লাইলাহ ইল্লালাহ আপনেরতো মাথাও খারাপ হয়ে গেছে। মাথায় পাগলের তেল দিয়ে ছায়াতে বসায়ে রাখতে হবে।

আলম বলল, একদিনে অধিক কথা বলে ফেলেছি। আর কথা বলব না। এখন বিদায় হও।

বদরূল হতাশ হয়ে বিদায় নিল।

আলমের বিষয়টা নিয়ে আমি শুধু চিন্তিত হবার মতো কিছু দেখছি না। সব মানুষই জীবনে একবার হলেও পাগলামির দিকে যেতে থাকে। এক সময় নিজেই ব্রেক কশে। আবার আগের অবস্থানে ফিরে।

আমার কাছে সমস্যা অনেক বেশি মনে হচ্ছে কাদেরের। সে চোখ উঠা রোগ নিয়ে ফিরেছে। দুই চোখ শুকনা মরিচের মতো লাল। মাথা কামিয়ে ফেলেছে। তার কথাবার্তাও খানিকটা এলেমেলো।

আমি বললাম, খুন করার যে কথা ছিল সেটা করেছিস?
না।

সুযোগ পাস নাই?

সুযোগ ছিল।

সুযোগ মিস করলি কেন? সুযোগতো সব সময় পাওয়া যায় না।
সাহসের সমস্যা?

আমার সাহসের অভাব নাই। ঘটনা আমি এক মাসের মধ্যে ঘটাব।

যে তোর হাতে খুন হবে সে কি এটা জানে?

না।

তাকে জানানো উচিত না? তুই সাহসী মানুষ। সাহসী মানুষ গোপনে
কিছু করে না।

কাদের মুখ বিকৃত করে বলল, আপনেতো আমারে ভালো ঝামেলায়
ফেলছেন।

এত বড় ঘটনা ঘটাবি। আর ঝামেলা নিবি না?

কাদের হতাশ চোখে তাকাচ্ছে। টকটকে লাল চোখের কারণে তার
হতাশাটা অন্য রকম লাগছে।

তোর চোখের যে অবস্থা ডাঙ্কারের কাছে যা।

কাদের বলল, ডাঙ্কার লাগবে না। পীর সাহেব ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন।
চোখ কটকট করতেছিল, পীর সাহেবের এক ফুঁয়ে কটকট ভাব শেষ। এখন
আরামে আছি।

পীর কোথায় পেয়েছিস?

কাদের উদাস গলায় বলল, ঘরের পীর। আলম স্যার। উনার মধ্যে
পীরাতি নাজেল হয়েছে।

বলিস কী?

কাদের দুঃখিত গলায় বলল, ঘরের পীরের ভাত নাই। এইটাই নিয়ম।
উনারে এখন সবাই চিনে। আপনার পাশের ঘরে থাকে, আপনি চিনেন না।

এলিতা দেশে চলে যাবে। তাকে বিদায় দিতে এয়ারপোর্টে যাব।
কাদেরকে বললাম, যাবি আমার সঙ্গে?

নাহ।

না কেন? এই মেয়েটা তোকে এত পছন্দ করে।

কাদের বলল, সাদা চামড়ার মানুষের অন্তর থাকে কালা। কালা
অন্তরের মানুষের সঙ্গে কাদের মিশে না।

আলমকে বললাম, আপনি চলুন। এলিতাকে এয়ারপোর্টে হ্যালো বলে
আসি।

আলম বলল, আপনি একলাই যান। আমি একটা বিশেষ চিন্তায় আছি।

আমি বললাম, সব মানুষ ভালো হয়ে গেলে পৃথিবীর কী হত এই চিন্তা?
হঁ।

আমি বললাম, চিন্তাটা জরুরি। আপনি চিন্তা করতে থাকুন, আমি
একাই যাই।

আপনি একা যাবেন এটা আবার মনে সায় দিতেছে না। চলেন যাই।
চিন্তা কিছুক্ষণ বক্ষ থাকুক।

আলম যাচ্ছে শুনে কাদেরও নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজি হল।

আমরা এয়ারপোর্টে উপস্থিত হয়েছি। বিদায় পর্ব শেষ হয়েছে। এলিতা
ইমিগ্রেশনে ঢুকতে যাবে। তখন সামান্য ঝামেলা হল। আলম হেঁচকি তুলে
কাঁদতে শুরু করল।

এলিতা বলল, কী হয়েছে?

আপনি চলে যাবেন মন্টা মানতেছে না।

এলিতা বলল, কাঁদবেন না প্রিজ। একজন বয়ক মানুষ কাঁদছে দেখতে
খুব খারাপ লাগছে।

আলম কান্নার সঙ্গে শুরু করল হেঁচকি। এলিতা বলল, আরে কী
আচর্য! এই পর্যায়ে আলম মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেল। কাদের এতক্ষণ
চৃপচাপ ছিল এখন সেও আসরে নামল। এলিতাকে হঠাতে দু'হাতে জড়িয়ে
ধরে বলল, মাইজি! আপনারে যাইতে দিব না।

আমাদের চারপাশে লোক জমে গেল। সিকিউরিটির দু'জন এসে
এলিতাকে বলল, কী সমস্যা?

এলিতা বলল, কোনো সমস্যাও নেই। এরা আমাকে যেতে দিবে না।

সিকিউরিটির লোক বলল, যেতে দিবে না মানে? মেরে হাজির গুড়া
করে দিব। আপনি ইমিগ্রেশনে ঢুকে পড়ুন। আমরা দেখছি।

এলিতা বলল, আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আমি ফ্লাইট
ক্যানসেল করব। এরা যেদিন আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিবে সেদিনই
যাব। তার আগে যাব না। I promise.

এলিতা এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি আমাদের মেসে এসে উঠেছে। আমি
আমার ঘরটা তাকে ছেড়ে দিয়েছি। মেস জীবনের সঙ্গে সে চমৎকারভাবে
নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। কাদের তার ঘরেই মেঝেতে বিছানা করে ঘুমায়।
ঘূম ভাঙার পর শুরু হয় দু'জনে যৌথ ঘর পরিষ্কার। হার্ডওয়ারের দোকান
থেকে এলিতা হ্যান্ড মপ, ফিলাইল, ব্রাস এইসব কিনেছে। প্রতিদিন সে
বাথরুমও পরিষ্কার করে। মেসের অন্য বোর্ডাররা ভালো লজ্জায় পড়েছে।
তারা বলছে, ম্যাডাম আপনি কেন এই কাজ করবেন? এলিতা বলেছে,
আমি একা তো করব না। আপনারাও করবেন।

মেসের রান্নাঘর পরিষ্কার হয়েছে। ডাইনিং ঘর এখন বাকবাক করছে। মেস ম্যানেজার শামসুন্দিন হতাশ গলায় বলে, হিমু ভাইজানের মেমসাৰ তো ভালো বিপদে ফেলছে। জুতা পায়ে দিয়া ডাইনিং ঘরে চুকা যাবে না এটা কেমন কথা? ডাইনিং ঘরতো মসজিদ না।

এলিতা নিজের খরচে প্রচুর স্যান্ডেল কিনেছে। স্যান্ডেলে নাস্বার দেওয়া। যে গুলোতে নাস্বার ওয়ান লেখা সেগুলো বাথরুমে যাবার স্যান্ডেল। যেগুলোতে নাস্বার টু লেখা সেগুলো ডাইনিংয়ে ঢোকার সময় পরতে হবে।

মেস ম্যানেজার শামসুন্দিন বলেছে, এই ম্যাডাম যেদিন বিদায় হবে সেদিন আমি দশজন ফকির খাওয়াৰ আৱ মিলাদ দিব।

শামসুন্দিনের বিরক্ত হবার ভালোই কারণ আছে। সন্ধ্যার পৰ থেকে তার ঘৰ চলে যাচ্ছে এলিতার দখলে। সেখানে এলিতার নাইট স্কুল। স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা মাত্ৰ দুই। কাদেৱ এবং মেসেৱ বাৰুচিৰ এসিস্টেন্ট জৱিনা। জৱিনাও কাদেৱেৰ মতো এলিতাকে মাইজি। জৱিনাৰ বয়স চল্লিশ। এই বয়সে তার পড়াশোনাৰ অঞ্চল দেখে এলিতা মুঝ।

নৈশ স্কুল চলাকালীন সময় শামসুন্দিন তার অফিস ঘৰেৱ বাইৱে টুল পেতে বসে থাকে। হতাশ গলায় বিড় বিড় কৱে, “স্কুল এইখানে থামবে না। আৱো পুলাপান যুক্ত হবে। আলমত পাইতেছি। আমি গেছি।”

আলমেৱ পীৱালিৰ খবৱে ছড়িয়েছে। তার কাছে দোয়া নিতে লোকজন আসছে। আলম দোয়া প্ৰাৰ্থীদেৱ মাথায় হাত রেখে দীৰ্ঘ দোয়া কৱে। এই সময় তার চোখ দিয়ে টপ টপ কৱে পানি পড়তে থাকে।

পীৱৱা বিশেষ নামে পৰিচিত হন। আলমেৱ নাম হয়েছে অঞ্চল ভাইপীৱ। কথায় কথায় তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে বলে এই নাম।

অবস্থা যে দিকে যাচ্ছে তাতে মনে হয় অল্লদিনেৱ মধ্যেই দেখা যাবে তার ভক্তৱা অঞ্চলভাই পীৱেৱ জন্যে ভৱজৱা খানা বানিয়ে দেবে। বাংসৱিক উৱস হবে। বাস ভৱিত মুৱিদৱা আসবে।

একদিন পেনসিল ওসি সাহেব আমাকে খবৱ পাঠিয়ে থানায় নিয়ে গেলেন। গলা নামিয়ে বললেন, আলতা মেয়েটাৰ উদ্দেশ্যটা কী বলুনতো শুনি। দয়া কৱে ঘেড়ে কাশবেন।

আমি বললাম, আলতা আপনার স্তু। তার উদ্দেশ্য আমার চেয়ে
আপনার ভালো জানার কথা।

ওসি সাহেবের লজ্জিত গলায় বললেন, এলিতা বলতে গিয়ে ভুলে আলতা
বলেছি। দু'জনের নামের মধ্যের মিলটা কি লক্ষ করেছেন?

ইঁ।

আলতা বেঁচে থাকলে দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ছবি নিতাম।
আলতা ভাবী মারা গেছেন কবে?

বিয়ের রাতে মারা গেছেরে ভাই। বিষ খেয়ে মারা গেছে। তার অন্য
একজনকে পছন্দ ছিল। তার বাবা-মা আমার সঙ্গে জোর করে বিয়ে
দিয়েছিল। আমি কিছুই জানতাম না। হাসপাতালে আলতার মাথা কোলে
নিয়ে বসেছিলাম। কী কষ্টের মৃত্যু চোখের সামনে দেখলাম।

ওসি সাহেবের চোখে পানি এসে গিয়েছিল। তিনি দ্রুত নিজেকে
সামলে নিয়ে বললেন, এলিতা মেয়েটা কিন্তু পুলিশের নজরদারিতে আছে।
তার বিষয়ে সাবধান।

সাবধান কেন?

অনেক বছর আগে অতি রূপবর্তী ওক আমেরিকান তরুণী বাংলাদেশে
এসেছিল। প্রচুর ড্রাগ সহ ধরা শুরু হয়েছিল। মেয়েটার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
হয়েছিল। আমেরিকার এক মিস্টারের চেষ্টায় মেয়েটা পাঁচ বছর জেল
খাটার পর মুক্তি পায়।

আপনার কি ধারণা এলিতাও এরকম কেউ?

কথার কথা বললাম ভাই। পুলিশে চাকরি করার কারণে মন হয়েছে
ছোট। মানুষের ভালোটা চোখে পড়ে না। শুধু মন্দটা চোখে পড়ে। সরি।

আমাকে ডেকেছেন কি এলিতার বিষয়ে সাবধান করার জন্যে?

না না। একজন হাজতি আপনার জন্য ব্যস্ত। একবার শুধু দেখা করতে
চায়।

ধোঁয়া বাবাকে ধরেছেন?

ইঁ।

মনে হচ্ছে আরেক বার পুলিশ মেডেল পাবেন।

পাওয়ার সন্তান আছে। ধোঁয়া বাবা কঠিন জিনিস। সে গোপনে কী
কথা না-কি আপনাকে বলবে। গোপন কথাটা শনে এসে যদি আমাকে
বলেন খুশি হব। না বললেও ক্ষতি নাই। পেটে গুতা দিয়ে কথা বের করব।

ধোঁয়া বাবা একা ধরা পড়ে নাই। দলবল সহই ধরা পড়েছে। তার সাগরেদোরা তাকে ঘিরে রেখেছে। আমি হাজতের শিক ধরে দাঁড়াতেই ধোঁয়া বাবা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফিস ফিস করে গোপন কথাটা বললেন। আমি গোপনে কথা শুনে চলে এসেছি। আমি হিমু, হিমুদের অনেক গোপনে কথা শুনতে হয়। গোপন কথা গোপন রাখাই হিমুদের নিয়ম।

আমি আমার পুরানো হন্টন জীবন শুরু করেছি। কোনো কোনো রাতে মেসে ফেরা হয় না। হঠাত হঠাত এলিতা আমার সঙ্গে বের হয়। তখন দূর থেকে পুলিশের একটা গাড়ি আমাদের অনুসরণ করে। গাড়িতে বসে থাকেন পেনসিল ওসি সাহেব। তিনি কি পুলিশ নজরদারির কারণে অনুসরণ করেন, না-কি তাঁর মৃত স্ত্রীর ছায়ার পেছনে পেছনে যান? এর উত্তর জানা নেই।

পথে হাঁটার সময় এলিতা অস্তুত অস্তুত কথা বলে। সব কথাই তার বাবাকে নিয়ে। একবার বলল, আমার মনের অনেক কষ্টের মধ্যে একটি কষ্ট হল বাবা কখনো আমাকে আদর করে কোনো নেয় নি। বাবার ধারণা ছিল আমি তাঁর মেয়ে না। অথচ আমি দেখতে বাবার মতো। বাবার বুকে ডানদিকে জন্ম দাগ আছে। ইংরেজি ছোট অক্ষরের ‘e’-র মতো। আমারো আছে। তুমি দেখতে চাইলে দেখোক। দেখতে চাও?

না।

এই ‘e’ লেখার মানে কী কে জানে।

আমি বললাম, এর অর্থ eternity. তোমরা দু’জন eternity পর্যন্ত যুক্ত।

এলিতা ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সুন্দর বলেছ। মৃত্যুর আগে আগে বাবা তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি লিখেছিলেন।

আমি বললাম, কী লেখা সেই চিঠিতে? নিশ্চয়ই চিঠি তোমার মুখ্য। বল শুনি।

এলিতা বলল, চিঠিটা অবশ্যই আমার মুখ্য। তোমাকে শোনালেই আমি কাঁদতে থাকব। এখন আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে না।

আমি বললাম, প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে যখন কাঁদতে ইচ্ছা করে না তখন কাঁদতে হয়।

এলিতা বলল, বাবা লিখেছেন—মা আমার ভুল হয়েছে। ভুল করাটাই আমার জন্যে স্বাভাবিক। কিছু কিছু মানুষের জন্ম হয় ভুল করার জন্যে। আমি সেই দুর্ভাগদের একজন। মা আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা করো না। আমি তোমার ক্ষমার যোগ্য না।

এলিতা কাঁদছে। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, অনেকদিন পর কাঁদলাম। এখন হাসতে ইচ্ছা করছে। আমাকে হাসাতে পারবে?

এলিতাকে হাসানোর জন্যে কিছু করতে হল না। এলিতা নিজেই খিলখিল করে হাসতে শুরু করল।

একদিন এলিতাকে নিয়ে মাজেদা খালার বাড়িতে গেলাম। মাজেদা খালা বললেন, “হিমু এই মাগিতো তোর প্রেমে হাবুড়ুরু থাচ্ছে।”

আমি বললাম, খালা সাবধান। এলিতা এখন সব বাংলা বুঝে এবং বলতে পারে।

মাজেদা খালা হকচকিয়ে গেলেন। এলিতা হাসতে হাসতে বলল, মাগি'র অর্থ মেয়ে মানুষ। কিন্তু এই শব্দটা খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে আমি আপনার কথায় কিছু মনে কঢ়িয়িনি।

খালু সাহেব এলিতার সঙ্গে আমেরিকান অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ শুরু করলেন। প্রেসিডেন্ট বুশ এবং বারাক ওবামা বিষয়ে জটিল আলোচনায় চলে গেলেন।

এই ফাঁকে আমি খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, খালু সাহেবের মানি ব্যাগে যে নাম্বার পাওয়া গেছে তার সর্বশেষ অবস্থা কী? যার নাম্বার তাকে আইডেন্টিফাই করা গেছে?

খালা বিরস গলায় বললেন, হ্যাঁ। যার নাম্বার সেই হারামজাদা নিউমার্কেটের কসাই। গরুর মাংস বিক্রি করে। তোর খালু তার কাছ থেকে মাংস কিনে। মেজাজ এমন খারাপ হয়েছে। এই খবর বের করতে চলিশ হাজার টাকা খরচ করেছি। বাদ দে কসাইটার কথা, তোদের মেসে না-কি অতিক্ষমতাধর এক পীর সাহেব থাকেন। অশ্রুবাবা নাম।

অশ্রুবাবা না, অশ্রুভাই। বাবা পর্যায়ে উনি এখানে উঠতে পারেন নি।

খালা গলা নামিয়ে বললেন, তার কাছ থেকে তাবিজ এনে দিতে পারবি? মাথার চুল পড়া বন্ধ হবার তাবিজ। মাথার সব চুল পড়ে যাচ্ছে।

যথাসময়ে তাবিজ পাবে। উরসের দাওয়াতের চিঠিও পাবে।

এক বৃষ্টির রাতে আমি এলিতাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে বের হলাম। এলিতা বলল, হিমু আমার কখনো ফ্যামিলি বলে কিছু ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, I have a family.

আমি বললাম, পরিবার মানেই তো যদ্রগা। সুখী সেই জন যার কেউ নেই।

এমন কেউ কি আছে যার কেউ নেই?

আমি বললাম, আছে। তারা মানুষের মতোই কিন্তু মানুষ না। প্রবল বড় বৃষ্টির রাতে এরা রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে। আমি এদের নাম দিয়েছি পক্ষীমানব। পক্ষীমানবদের চেনার উপায় হচ্ছে তাদের চোখে থাকে সানগ্লাস। হাতে গ্লাভস। তাদের হাতের আঙুল পাখির নখের মতো বলে এরা আঙুল গ্লাভসের ভেতর লুকিয়ে রাখে।

হিমু তুমি আমায় লেগ পুলিং করছ।

না লেগ পুলিং না। আমি একবার একজনকে দেখেছি। এদের খুব চেষ্টা থাকে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার কিন্তু পারে না।

এলিতা বলল, তুমি অদ্ভুত অদ্ভুত কৃষ্ণা বল। কোনটা বিশ্বাস করব কোনটা করব না, বুঝতে পারি না।

পক্ষীমানবদের কথা বিশ্বাস করতে পার। তাদের গলার স্বর অদ্ভুত মিষ্টি।

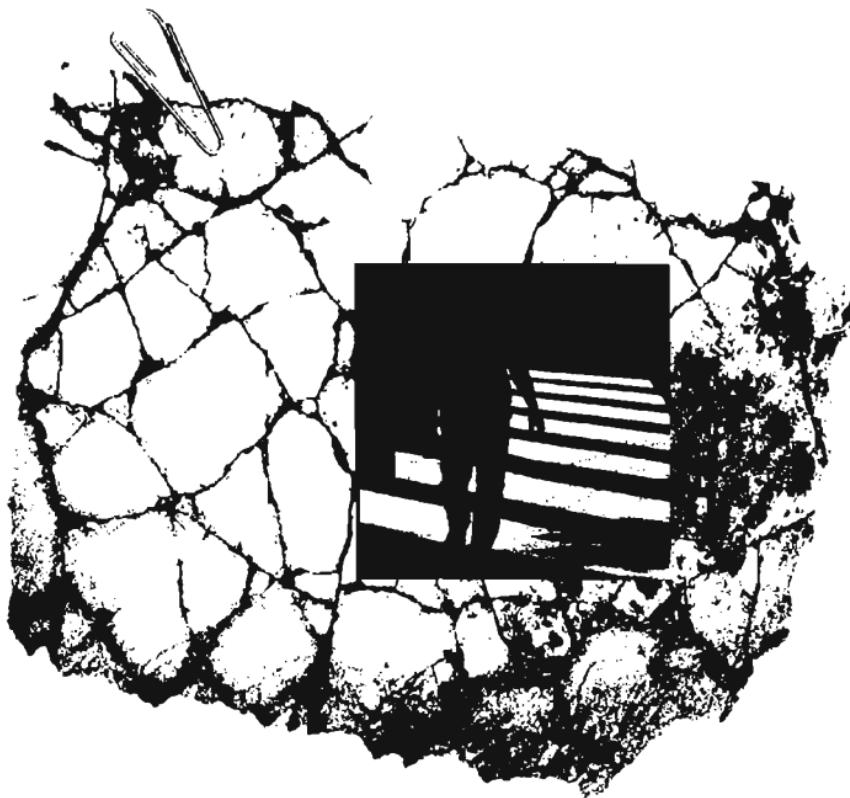
ঝড় বৃষ্টির রাত হলেই এলিতা আমার সঙ্গে পক্ষীমানবের সন্ধানে বের হয়।

মানব জাতির সমস্যা হচ্ছে তাকে কোনো না কোনো কিছুর সন্ধানে জীবন কাটাতে হয়। অর্থের সন্ধান, বিড়ের সন্ধান, সুখের সন্ধান, ভালোবাসার সন্ধান, ঈশ্বরের সন্ধান।

আমি আর এলিতা সন্ধান করছি সামান্য পক্ষীমানবের।

এলিতার একটি ছবি Toronto Photographic Association এর বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। ছবিটিতে আমি আছি। তানিজা আমাকে জমজমের পানি খাওয়াচ্ছে।

হিমু এবং হার্ভার্ড Ph.D. বল্টু ভাই



হার্ভার্ডের Ph.D. দেখেছিস?—বলেই মাজেদা খালা চোখ গোল করে তাকিয়ে রইলেন। যেন তিনি কঠিন এক ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছেন, যার উপর তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তাঁকে একই সঙ্গে আনন্দিত এবং উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কপালে উত্তেজনার বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঠোটের কোণে আনন্দের চাপা হাসি। খালা তাঁর গোল চোখ আমার দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে এনে গলা নামিয়ে বললেন, এই হাঁদারাম! হার্ভার্ডের ফিজিঙ্গের Ph.D. দেখেছিস কখনো?

আমি বললাম, না। দেখতে ভয়ঙ্কর?

খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ভয়ঙ্কর হবে কেন? অন্যরকম।

অন্যরকমটা কী?

সারা গা থেকে জ্বানের আভা বের হওয়ার মতো অন্যরকম।

বলো কী!

বড় বড় দিশেহারা চোখ। দেখলেই এমন মায়া লাগে।

আমি বললাম, চোখ দিশেহারা কেন?

খালা বললেন, ফিজিঙ্গের জটিল সমৃদ্ধি পড়েছে, এইজন্যে দিশেহারা। এখন সে কাজ করছে ‘ঈশ্বর-কণা’ নিয়ে। যতই সে পড়েছে, ততই দিশেহারা হচ্ছে। আহা বেচারা! ঈশ্বর-কণার নাম শুনেছিস কখনো?

না। ঈশ্বর যে কণা হিসেবে পাওয়া যায় তা-ই জানতাম না।

খালা বললেন, আমিও জানতাম না। বাংলাদেশে কেউ মনে হয় জানে না।

আমি বললাম, বাংলাদেশ বাদ দাও, ঈশ্বর নিচেও হয়তো জানেন না যে তাঁকে কণা হিসেবে পাওয়া যায়।

হিমসমগ্র-২৭ দুনিয়ার পাঠক এক হও! হিমা www.amarbari.com বুল্ট ভাই ৪১৭

খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, সৈশ্বর জানবেন না এটা কেমন কথা! উনি
সবই জানেন।

হার্ভার্ড সাহেবকে চেনো কীভাবে?

সে তোর খালু সাহেবের বন্ধুর ছেলে।

Ph.D. সাহেবের নাম কী?

ডষ্ট্র আখলাকুর রহমান চৌধুরী। ভুল বলেছি, চৌধুরী আগে হবে।
ডষ্ট্র চৌধুরী আখলাকুর রহমান। ফুল প্রফেসর অব থিওরেটিকেল ফিজিক্স।
ভেনডারবেল্ট ইউনিভার্সিটি।

ডাকনাম কী?

ডাকনাম দিয়ে কী করবি?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, যারা জটিল অবস্থানে থাকে তাদের
ডাকনাম খুব হাস্যকর হয়। দেখা যাবে উনার ডাকনাম বল্টু।

বল্টু!

হ্যাঁ বল্টু। পেরেকও হতে পারে। আবার গোল্লা-ফোল্লাও হওয়া বিচ্ছিন্ন না।

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, যতই দিন যাচ্ছে তোর কথাবার্তা ততই
অসহ্য হয়ে যাচ্ছে। চা-কফি কিছু খাবিশুব্দের মধ্যে।

খাব।

কী দেব, চা না কফি?

দুটাই দাও। এক চুমুক চা খেয়ে এক চুমুক কফি খাব। ডাবল
অ্যাকশন। হার্ভার্ড Ph.D.-র কথা শনে খিম ধরে গেছে। ডাবল অ্যাকশন
ছাড়া গতি নেই। ইউরোপ-আমেরিকা হলে বলতাম, নিট দুই পেগ ছইক্ষি
দাও, অন দয়া রক।

খালা বললেন, আমি যে তোর মুকবি, গুরুজন, এটা মনে থাকে না?
লাগামছাড়া কথাবার্তা।

খালা হয়তো আরও কিছু কঠিন কথা বলতেন, তার আগেই মোবাইল
ফোন বাজল। তিনি ফোন নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। মোবাইল ফোনের
নিয়ম হচ্ছে—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না। হাঁটাহাঁটি
করে কথা বলতে হয়।

মিনিট তিনেক পার করে খালা উদয় হলেন। এখন তাঁকে পদার্থবিদ
সাহেবের মতো খানিকটা দিশেহারা দেখাচ্ছে। মুখের ভঙ্গি কাঁচুমাচু। আমি
বললাম, খালা, কোনো সমস্যা?

খালা নিচু গলায় বললেন, ও টেলিফোন করেছিল। ওর ডাকনাম সত্যই বল্টু। ওরা দুই যমজ ভাই। একজনের নাম 'নাট', আরেকজনের নাম বল্টু। একসঙ্গে নাট-বল্টু। ওদের বাবা ছিল পাগলাটাইপের। এইজনে নাট-বল্টু নাম রেখেছে। কী বিশ্রী কাণ্ড!

তুমি মন খারাপ করছ কেন? বল্টু নাম তো খারাপ কিছু না। ডষ্টের বল্টু—
শুনতেও ভালো লাগছে। নাট-বল্টু দুই ভাইকে নিয়ে সুন্দর ছড়াও হয়—

নাট বল্টু দুই ভাই
রিকশা চড়ে, দেখতে পাই।
রিকশা যায় মতিঝিল
বল্টু হাসে খিলখিল।
নাটের মুখ বক্ষ
তার গায়ে গন্ধ।

খালা কঠিন গলায় বললেন, চুপ কর। মুখ বক্ষ।

আমি মুখ বক্ষ করলাম। খালা বললেন, বল্টু উঠেছে সোনারগাঁও হোটেলে। রূম নম্বর চার শ' একুশ। ত্যেকে খবর দিয়ে এনেছি—বল্টুকে কিছু জিনিস দিয়ে আসবি।

আমি বললাম, সহজ নামের মজাত্য দেখলে? তুমি নিজেও এখন সমানে বল্টু ডাকছ। বল্টুভাইকে এখন আর দূরের কেউ মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ঘরের মানুষ। সে এমন একজন যে দুই চাসে 'ইন্টার' পাস করেছে। অনেক চেষ্টা করেও কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে নি। তার এখন প্রধান কাজ মেয়ে-স্কুলের গেটের সামনে হাঁটাহাঁটি করা। ফ্লাইং কিস দেওয়া।

তুই কি চুপ করবি? নাকি একটা থাপ্পড় দিয়ে মুখ বক্ষ করব?

চুপ করলাম।

খালা বললেন, ও লুঙ্গি-গামছা আর একটা বাংলা ডিকশনারি চেয়েছে।
সব আনিয়ে রেখেছি। তুই দিয়ে আয়।

নো প্রবলেম। লুঙ্গি, বাংলা ডিকশনারি বুঝলাম। গামছা কেন? কাদের
সিদ্ধিকীর দলে জয়েন করার পরিকল্পনা কি আছে?

খালা হতাশ গলায় বললেন, এত কথা বলছিস কেন? তুই কিন্তু বল্টুর
সঙ্গে কোনো ফাজলামিটাইপ কথা বলবি না। ও অতি সম্মানিত একজন
মানুষ। প্রফেসর ইউনিসের মতো নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পারে।

তাহলে তো বিরাট সমস্যা।

কী সমস্যা?

নানান মামলা মোকদ্দমায় জড়াতে হবে। বাংলাদেশে নোবেল প্রাইজ পাওয়া লোকজনদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

আবার বকবকানি শুরু করেছিস। চুপ করতে বললাম না?

বল্টুভাইকে দেখে আমি চমকালাম। Ph.D. শনলেই আমাদের চোখে চাপাভাঙ্গা বিরক্ত চোখের মানুষের ছবি ভাসে, যার ঠোঁটে থাকে অবজ্ঞার হাসি। যাদের এমন ভারী ডিগ্রি নেই তাদের দিকে এরা এমনভাবে তাকান যেন বনমানুষ দেখছেন। হার্ভার্ডের এই Ph.D. অত্যন্ত সুপুরুষ। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। মাথাভর্তি সাদাকালো চুল। মাজেদা খালার কথা সত্য। উনার চোখে দিশেহারা ভাব।

হার্ভার্ডের Ph.D.-র কোমরে হোটেলের টাওয়েল পঁয়াচানো। তিনি খালি গায়ে বিছানার ওপর বসে আছেন। তাঁর বাঁ-হাতে চায়ের কাপ। ডানহাতে একটা চামচ। তিনি চায়ের কাপে চামচ ঝুঁটিয়ে চা তুলে এনে মুখে দিচ্ছেন। শিশুরা গরম চা এইভাবে খায়। বয়স্ক কাউকে এই প্রথম দেখলাম।

আমি বললাম, বল্টুভাই, ভালো আছেন।

তিনি বললেন, ভালো আছি।

আপনার জন্যে কয়েকটা জিনিস এনেছি। মাজেদা খালা পাঠিয়েছেন।

ডিকশনারি কি আছে?

হ্যাঁ আছে।

একটু কষ্ট করে দেখবে ডিকশনারিতে ‘তুতুরি’ বলে কোনো শব্দ কি আছে? তুমি কি এই শব্দ আগে শুনেছ?

না।

পিজ খুঁজে দেখো। তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে ভেবে বসবে না আমি তোমাকে অবজ্ঞা করছি। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। বাংলা একটা স্ট্রেঞ্জ ভাষা—আপনি তুমি তুই।

আমি বললাম, জাপানি আরও খারাপ ভাষা, সেখানে পাঁচ সম্মোধন। অতি সম্মানিত আপনি, সম্মানিত আপনি, তুমি, তুই, নিম্নশ্রেণীর তুই।

বল্টুভাই ‘Oh God!’ বলে গরম চা খানিকটা বিছানায় ফেলে দিলেন। এখন তাকে শিশুদের মতো অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে।

আমি ডিকশনারি খুলে বললাম, শব্দটা আছে। এর অর্থ ‘সাপুড়ের বাঁশি’।

গুড়। ডেরি গুড়।

আমি বললাম, আপনি চামচে করে চা খাচ্ছেন কেন?

ঠোঁট পুড়ে গেছে। গরম কাপ ঠোঁটে লাগাতে পারছি না। এইজন্যে চামচে খাচ্ছি। ঠোঁট কীভাবে পুড়েছে জানতে চাও?

না। 'ফুতুরি' দিয়ে কী করবেন?

কিছু করব না। অর্থটা শুধু জানলাম। ফুতুরি একটা মেয়ের নাম। আমি মেয়েটার কাছে তার নামের অর্থ জানতে চাইলাম। সে অর্থ বলতে পারল না। এরপর যখন তার সঙ্গে দেখা হবে, তাকে নামের অর্থ বলে দেব। সে নিশ্চয়ই খুশি হবে। তোমার কি ধারণা, খুশি হবে না?

খুশি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কম কেন?

আপনি তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, তুমি মূর্খ মেয়ে, নিজের নামের অর্থ জানো না। এটা তার ভালো লাগার কথা না।

তাহলে ওই প্রসঙ্গ থাক। নামের অর্থ বলার দরকার নেই। একটা কাজ করলে কেমন হয়—বাংলা ডিকশনারিটা তাকে উপহার দিয়ে যদি বলি, এই মেয়ে, দেখো তো তোমার নামের অর্থ খুঁজে পাও কি না। এই বৃদ্ধি তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?

বল্টুভাইকে আমার কাছে মোসমুটি স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হলো। তবে আমার প্রতি তাঁর আচরণে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে। আমি তাঁর কাছে নিতান্তই অপরিচিত একজন। তিনি আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছেন যেন আমি তাঁর অতি পরিচিত একজন। এত পরিচিত যে তাঁকে বল্টুভাই ডাকতে পারে।

বল্টুভাই বললেন, একটু কি কষ্ট করে দেখবে 'ফুতুরি' বলে কোনো শব্দ আছে কি না?

আমি ডিকশনারি উল্টেপাল্টে বললাম, নাই।

বল্টুভাইয়ের চোখমুখ হঠাতে খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, বাংলায় নতুন একটি শব্দ যুক্ত করলে কেমন হয়? ফুতুরি!

এর অর্থ কী?

ফুঁ দিয়ে যে বাঁশি বাজায়—ফুতুরি। বাঁশি, সানাই, ব্যাগপাইপ, ট্রাম্পেট সব হবে ফুতুরি এন্পের বাদ্যযন্ত্র। তোমার কাছে কি পরিষ্কার হয়েছে? নাকি আরও পরিষ্কার করব?

পরিষ্কার হয়েছে।

নতুন নতুন শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত করা প্রয়োজন।

অবশ্যই প্রয়োজন।

বল্টুভাইয়ের চোখ চকচক করে উঠল। নিশ্চয়ই নতুন কিছু মাথায় এসেছে। এই শ্রেণীর মানুষ আমি আগেও দেখেছি। মুখে কথা বলার আগে এদের চোখ কথা বলে। সারাক্ষণ মাথায় নতুন নতুন আইডিয়া আসতে থাকে।

বল্টুভাই বললেন, তুমি ডিকটেশন নিতে পারো? আমি বলব, তুমি লিখবে। পারবে না?

পারব।

টেবিলের ড্রয়ারে হোটেলের কাগজ আছে, কলম আছে। কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে বসো। আমি খুবই লজ্জিত, তোমার নাম ভুলে গেছি।

আপনার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। আমি এখনো আপনাকে নাম বলার সুযোগ পাই নি। আমার নাম হিমু।

হিমু, তুমি কি তৈরি? ডিকটেশন দেওয়া শুরু করব?

করুন।

লিখো—

সভাপতি

বাংলা একাডেমী

শ্রদ্ধাভাজনেন্দ্রু।

বিষয় : বাংলা শব্দভাণ্ডারে নতুন শব্দ সংযোজন।

জনাব,

ফুতুরি নামের একটি শব্দ আমি বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত করতে চাচ্ছি। ফুঁ দিয়ে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তাদের সাধারণ নাম হবে ফুতুরি। যেমন, বাঁশি, সানাই, ট্রাঙ্কেট, ব্যাগপাইপ।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাকে বাধিত করুন।

বিনীত

বল্টু

আমি বললাম, বল্টু নাম ব্যবহার করবেন? পোশাকি নামটা দিন।

তিনি বললেন, তুমি বল্টুভাই বল্টুভাই করছ তো, এ জন্যে মাথায় বল্টু নামটা ঘুরছিল। বল্টু কেটে দিয়ে আমার ভালো নাম দিয়ে দাও—চৌধুরী আখলাকুর রহমান। তবে বল্টু নামটা আমার পছন্দের। আমি যখন স্বপ্নে নিজেকে দেখি, তখন সবাই আমাকে বল্টু ডাকে। স্বপ্ন-বিষয়ে তোমাকে একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিতে পারি। দেব?

দিন।

একমাত্র স্বপ্নেই মানুষ নিজেকে নিজে দেখতে পায়। বাস্তব জগতে মানুষ নিজেকে দেখে না।

আয়নায় তাকালেই তো নিজেকে দেখবে।

না, দেখবে না। আয়নায় দেখবে তার ফিরুর ইমেজ। এখন বুঝেছ?
জি।

গুড, ভেরি গুড। তোমাকে চাকরিতে বহাল করা হলো। কাল সকালে জয়েন করবে। সকাল দশটা থেকে ডিউটি।

আমি সব সময় অন্যদের চমকে দিয়ে আনন্দ পাই। এই প্রথম বল্টুভাই আমাকে চমকালেন। আমি তাঁর কাছে কানো চাকরির জন্যে আসি নি।
কয়েকটা জিনিস দিতে এসেছিলাম

বল্টুভাই বললেন, এসি আছে এমন একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করবে।
এই মাইক্রোবাস দশ দিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা নেতৃত্বে জেলার সোহাগী গ্রামে চলে যাব। দশ দিন থাকব।

আমি বললাম, জি আছা স্যার।

স্যার বলছ কেন?

আপনি আমার বস, এইজন্যে স্যার বলছি।

তুমি বল্টুভাই ডাকছিলে, শুনতে ভালো লাগছিল। আমি ট্রেডিশন্যাল
বস না। তোমার চাকরিও চুক্তিভুক্তি। আমি বই লেখা যেদিন শেষ করব,
তার পরদিন তোমার চাকরিও শেষ।

বল্টুভাই, আমার কাজটা কী?

মিসেস মাজেদা তোমাকে কিছু বলেন নি?

জি-না।

তুমি নানানভাবে আমাকে সাহায্য করবে, যেন বইটা লিখে শেষ করতে
পারি।

কী বই?

বইয়ের নাম হচ্ছে ‘সিশুর শূন্য আত্মা শূন্য’। বইয়ে প্রমাণ করব, সিশুর বলে কিছু নেই। আত্মা বলেও কিছু নেই।

আমি বললাম, আপনার তো রগ কেটে ফেলবে।

বল্টুভাই অবাক হয়ে বললেন, কে রগ কাটবে?

আমাদের রগ কাটার লোক আছে। এনাটমিতে বিশেষ পারদর্শী। এরা আল্লাহ, ধর্ম, এইসব বিষয়ে উল্টাপাল্টা কিছু বললে হাসিমুখে রগ কেটে দিয়ে চলে যায়।

কী অস্ত্রুত কথা!

আমি বললাম, বল্টুভাই! আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা শুধু রগ কাটে, মেরে ফেলে না। যাদের রগ কেটেছে, তারা বলেছে যে ব্যথাও তেমন পাওয়া যায় না। শুধু বাকি জীবন বিছানায় শয়ে থাকতে হয়। ভাইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হয়।

লেগ পুলিং করছ নাকি?

জি-না স্যার। সত্যি কথা বলছি।

প্রবলেম হয়ে গেল তো।

স্যার, আপনি বরং অন্য একটা বই লিখুন। বই লিখে প্রমাণ করুন ‘ভূত আছে’।

ভূত আছে প্রমাণ করব কীভাবে?

জটিল সব ইকোয়েশন লিখে প্রমাণ করবেন ভূত আছে। হার্ডিংডের Ph.D. যদি বই লিখে প্রমাণ করে ভূত আছে, তাহলে হইচই পড়ে যাবে। হাজার হাজার কপি বই বিক্রি হবে। নানান ভাষায় অনুবাদ হবে। হিন্দি ভাষায় বইটার নাম হবে ‘ভূত হ্যায়’।

বল্টুভাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, আপনি চাইলে বাংলাদেশের নানান শ্রেণীর ভূতদের বিষয়ে আমি আপনাকে তথ্য দেব। মামদো ভূতের নাম শুনেছেন স্যার?

মামদো ভূত?

মুসলমান মরে যে ভূত হয় তাকে বলে মামদো ভূত। হিন্দু ব্রাহ্মণ মারা গেলে হয় ব্রহ্মদত্তি। খাভারনী মহিলা মারা গেলে পেত্তী হয়। শাকচুম্বি নামের আরেক শ্রেণীর মহিলা ভূত আছে। এরা ভয়ঙ্করটাইপ। হিন্দু বিধবারা মরে হয় শাকচুম্বি। ফিজিঙ্গের Ph.D. মারা গেলে কী ভূত হয়, তা অবশ্য আমার জানা নেই।

বল্টুভাই হাত উঁচিয়ে আমাকে থামালেন। শান্ত গলায় বললেন, তুমি
অতি বিপদজনক মানুষদের একজন। তুমি আমাকে কনফিউজ করার চেষ্টা
করছ এবং খানিকটা করেও ফেলেছ। তোমার চাকরি নট। তোমাকে আমার
এখানে আসতে হবে না। Now get lost!

স্যার, চলে যেতে বলছেন?

হ্যাঁ। খুব অব্দুভাবে বলেছি, তার জন্যে দৃঢ়থিত।

যাওয়ার আগে একটা কথা কি বলব?

বলো। মনে রেখো, এটা হবে তোমার লাস্ট কথা।

আমি বললাম, স্যার, ফিজিস্কের জটিল বিষয় পড়ে আপনার মাথায়
গিটু লেগে গেছে। কেরামত চাচার সঙ্গে দেখা করলে আপনার গিটু কেটে
যাবে। আপনি বললে আপনাকে উনার কাছে নিয়ে যাব। উনি আপনার
মাথার গিটু ছুটিয়ে দিবেন।

কেরামত কে?

গেণ্টারিয়ায় থাকেন। বিসমিল্লাহ হোটেলের হেড বাবুর্চি।

সে কী করবে?

আপনার সঙ্গে হাসিতামাশা করবে, আপনার মাথার গিটু ছুটে যাবে।

বল্টুভাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি প্রচণ্ড রেগে গেছি।
অনেক কষ্টে নিজের রাগ সামলাচ্ছি। খুব খুশি হব তুমি যদি বিদায় হও।

জি আচ্ছা স্যার।

হোটেলের ঘর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ করে বল্টুভাই
দরজা বন্ধ করলেন। বেচারা নিষ্প্রাণ দরজাকে বল্টুভাইয়ের রাগ ধারণ
করতে হলো। দরজার কথা বলার শক্তি থাকলে সে চেঁচিয়ে বলত, ‘উফরে
গেছিরে!’ ফাইভ স্টার হোটেলের দরজার ভাষা ‘উফরে গেছিরে’ টাইপ হবে
না। সে বলবে, ‘ওহ শিট!'

আমি চৌধুরী আখলাকুর রহমান বল্টু

আমি প্রচণ্ড রেগে গেছি। রাগ সামলানোর চেষ্টা করছি। প্রচণ্ড শব্দে দরজা
বন্ধ করে রাগ কমানোর হাস্যকর চেষ্টা করেছি। রেগে গেলেই মানুষ
হাস্যকর কর্মকাণ্ড করে। আমার ipad এ পিংপড়া টিপে মারার একটা খেলা
আছে। রেগে গেলে আমি পিংপড়া মারি। তিন চার শ' পিংপড়া মারতে
পারলে রাগ কমে যেত। ipad-টা খুঁজে পাচ্ছি না।

হিমু নামের ছেলেটির সঙ্গে রাগ করার তেমন যৌক্তিকতাও এখন খুঁজে পাচ্ছি না। সে সরল ভঙ্গি করে কিছু পেঁচানো কথা বলেছে। এ রকম করে কথা বলাই হয়তো তার স্বভাব। সে যদি আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করত, তাহলে তার ওপর রাগ করা যেত।

বিজ্ঞান অনেকদূর এগিয়েছে, কিন্তু মানবিক আবেগের কোনো সমীকরণ এখনো বের করতে পারে নি।

পদাৰ্থবিদ এবং ম্যাথেমেটিশিয়ানদের উচিত নিউরো বিজ্ঞান পড়া। নিউরো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরা অংক জানেন না। পদাৰ্থবিদ্যা জানেন না।

শ্রেডিনজারের মতো কেউ একজন আবেগের সমীকরণ বের করে ফেললে মানবজাতির কল্যাণ হতো। আবেগের সমীকরণ বের করা কি সম্ভব হবে? এই বিষয়ে আমি একটা চেষ্টা করব কি না ভাবছি।

নিউরো বিজ্ঞানীরা ছেলেখেলাটাইপ বিজ্ঞান করছে। তারা বলছে, অমুক আবেগের জন্য মন্তিক্ষের ফ্রন্টাল লোবে, তমুক আবেগের জন্য থেলামসে। যত বুলশিট! জন্য কোথায় তা দিয়ে কী হবে? আবেগটা কী তা বের করো। সময়ের সঙ্গে আবেগের পরিবর্তন বের কৰো। আমাদের দরকার টাইম ডিপেনডেন্ট সমীকরণ এবং সমীকরণের সমাধান।

লক্ষ করলাম, আমার রাগ পড়ে গেছে এবং আমি এক ধরনের অবসাদ বোধ করছি। রাগের সময় মন্তিক্ষের প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে। রাগ কমে যাওয়ার পর হঠাতে শরীরে অক্সিজেনের সাময়িক ঘাটতি দেখা যায়। আমার যা হচ্ছে। অক্সিজেন ট্যাবলেট ফরমে পাওয়া গেলে ভালো হতো। টপ করে একটা গিলে ফেলা।

আমি হোটেলের রিসেপশনে টেলিফোন করলাম, হলুদ পাঞ্জাবি পরা কেউ বের হচ্ছে কি না, তারা জানাল, না।

হিমু ছেলেটিকে ‘সরি’ বলা উচিত। সমস্যা হচ্ছে, সে যোগাযোগ না করলে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না। মিসেস মাজেদাকে বললে তিনি হয়তো ব্যবস্থা করবেন। তাঁর টেলিফোন নম্বর আমার কাছে নেই। তিনি নম্বর লিখে দিয়েছিলেন, আমি হারিয়ে ফেলেছি। জিনিস হারানোতে আমার দক্ষতা সীমাহীন। আমার Ph.D. থিসিসের ফাস্ট ড্রাফট হারিয়ে ফেলেছিলাম। বাংলাদেশে এসে হারিয়েছি আমেরিকান পাসপোর্ট। অ্যাম্বাসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা সন্দেহজনক কথাবার্তা বলছে। ভাবটা এ রকম যেন আমি কাউকে পাসপোর্টটা দিয়ে দিয়েছি।

আমি ড্রয়ার খুলে কাগজ নিয়ে লিখলাম, হিমু। এটি একটি অর্থহীন কাজ। আমরা অর্থহীন কাজ করতে পছন্দ করি। অর্থহীন কাজ শুধু না, অর্থহীন প্রশ্ন করতেও পছন্দ করি।

একবার ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছি, আমার এক ছাত্রী বলল, স্যার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং থেকে। বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?

অর্থহীন প্রশ্ন। আমি পড়াচ্ছি স্পেশাল থিওরি অব রিয়েলিটি। বিগ ব্যাং না।

আমি বললাম, তোমার নাম কী?

সে বলল, সুশান।

আমি বললাম, সুশান, সময়ের শুরু হয়েছে কোথেকে?

সে বলল, বিগ ব্যাং থেকে।

আমি বললাম, সময় যেহেতু বিগ ব্যাং থেকে শুরু হয়েছে, তার আগে তো কিছু থাকতে পারে না।

সুশান বলল, বিগ ব্যাং-এর আগে কি ঈশ্঵রও ছিলেন না?

আমি বললাম, ইয়াং লেডি, ঈশ্বরও ছিলেন না। সবকিছুর শুরু বিগ ব্যাং থেকেই। ঈশ্বর বলে কিছু থেকে পরিষ্কালেও তার শুরু বিগ ব্যাং থেকে।

সুশান মেয়েটি অর্থহীন প্রশ্ন করে আমার ভেতর অনেক অর্থহীন প্রশ্ন তৈরি করে দিয়েছে। মাথা খাসিকটা এলোমেলো করে দিয়েছে। আমি এলোমেলো মাথা ঠিক করার জন্য বড় ডেকেশন নিয়েছি। প্রথম গেলাম স্পেনে। কারণ শ্রোডিনজারের মাথা যখন এলোমেলো হয়ে গেল, তখন মাথা ঠিক করার জন্য তাঁর এক গোপন বান্ধবী নিয়ে গেলেন স্পেনের বার্সেলোনায়। বান্ধবীর সঙে যৌনক্রিয়ার মাঝখানে তাঁর মাথার এলোমেলো ভাব হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি পেয়ে গেলেন বিখ্যাত ‘শ্রোডিনজার ইকোয়েশন’।

বান্ধবীকে ফেলে লাফ দিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে বসলেন। বান্ধবী বলল, কী হয়েছে?

শ্রোডিনজার বললেন, হয়েছে তোমার মাথা। You get lost!

স্পেনে আমার মাথার জট কাটে নি। আমার কোনো বান্ধবী ছিল না— এটা একটা কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশে এসে দায়ি হোটেলে বসে সময় কাটাচ্ছি। জানালা দিয়ে একবার বাইরেও তাকাচ্ছি না। হিমু বলেছে জনেক কেরামত আমার মাথার

জট খুলে দেবে। সে নাকি কোন রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি। আমি হিমু নামের পেছনে লিখলাম ‘কেরামত’, তারপর লিখলাম ‘তুতুরি’। ‘তুতুরি’ নাম লেখার পেছনে কোনো ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজি কি কাজ করছে?

আমি ‘তুতুরি’ নামটা কেটে দিলাম। নারীসঙ্গ আমার প্রিয় না। তাদের আমার আলাদা প্রজাতি মনে হয়। পৃথিবী নারীশূন্য হলে ভালো হতো।

হিমু মাথায় ‘ভূত’ ঢুকিয়ে গেছে। এই বিষয়গুলো Catalyst-এর মতো কাজ করে। Catalyst নিজে কোনো রিঅ্যাকশনে অংশগ্রহণ করে না। তবে অন্য রিঅ্যাকশন শুরু বা শেষ করতে সাহায্য করে।

আমার সিস্টেমে ভূত ঢুকিয়ে দেওয়ায় হয়তো অন্য কোনো সমস্যা তৈরি হবে।

রুমের টেলিফোন বেজে যাচ্ছে। নিতান্ত অনিচ্ছায় আমি টেলিফোন ধরলাম।

বল্টুভাই, স্নামালিকুম।

আপনি কে?

আমি হিমু।

কিছুক্ষণ আগেই তো তোমার সঙ্গে কথা হলো, আবার টেলিফোন করেছ কেন?

আপনি যে ভূতের বইটালিখবেন তা নিয়ে আরেকটা আইডিয়া এসেছে। স্যার, বলব?

আমি বুঝতে পারছি রেগে যাচ্ছি, তারপরেও রাগ সামলে বললাম, বলো শুনছি।

বাংলা ভূতের সঙ্গে আমেরিকান ভূতের একটা তুলনামূলক আলোচনা করলে কেমন হয়?

এই বিষয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না।

হিমু বলল, স্যার! পিজ, আমাকে দুটা মিনিট সময় দিন। ভূতের বইয়ে বিজ্ঞান নিয়ে আসুন। মানুষ মরলে ভূত হয়। ভূত মরলে কী হয় এই ধরনের আলোচনা। মাঝে মাঝে বিকট সব ইকোয়েশন দিয়ে দিন। যে ইকোয়েশনের আগামাথা কেউ কিছু বুঝবে না।

তোমার কথা কি শেষ হয়েছে?

মাত্র এক মিনিট পার হয়েছে। আরও এক মিনিট বাকি আছে স্যার। আর এক মিনিট কি পাব?

আমি বললাম, You go to hell. বলেই খারাপ লাগল।

কাউকে নরকে যেতে বলার অর্থ হচ্ছে নরকে বিশ্বাস করা। যে নরকে বিশ্বাস করবে তাকে স্বর্গেও বিশ্বাস করতে হবে। স্বর্গে বিশ্বাস করলে ইশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে। ইশ্বরে বিশ্বাস করলে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করতে হবে। ভাগ্যে বিশ্বাস করতে হবে। কোনো মানে হয়?

হিমু হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছে। আমি টেলিফোন রেখে দিলাম। হ্যালো হ্যালো করতে থাকুক। আমার রাগ আরও বেড়েছে। লেখক মার্ক টোয়েন বলেছেন, রাগ কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে পছন্দের কোনো বইয়ের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ফেলা। ছেঁড়ামাত্র মনে হবে, হায় হায় কী করলাম! প্রবল হতাশা তৈরি হবে। হতাশার নিচে রাগ চাপা পড়ে যাবে।

আমার হাতে বাংলা ডিকশনারি ছাড়া কোনো বই নেই। তার চারটা পাতা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে বাতাসে উড়িয়ে দিলাম। ছেঁড়া কাগজের একটা টুকরা পড়ল আমার কোলে। সেখানে লেখা—‘অনিকেত’। অনিকেত শব্দটার মানে কী? আমার কাছে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে শব্দটার মানে জানা দরকার।

যে করে হোক ipad খুঁজে বের করে শিপড়া মারতে হবে। সেখানে আরেকটা খেলা আছে, নাম মনে হয় offline jerk. তার গায়ে নানান জিনিসপত্র ছুড়ে মারা যায়। সে ব্যথা পেয়ে আহ উহ করে, তাতেও রাগ কমে।

অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের চেনা যায় ‘কান’ দিয়ে। তাদের দুটি কানের একটি চ্যাষ্টো ধরনের হয়। কানের সঙ্গে মোবাইল ধরে সারাক্ষণ কথা বলার কারণে কর্ণ বেচারার এই দশা। মোবাইল ফোন ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

আমি বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবের সামনে এক ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে বসে আছি। মোবাইল কানে ধরে তিনি সারাক্ষণ কথা বলে যাচ্ছেন। একজনের সঙ্গে না, নানানজনের সঙ্গে। মাঝে মাঝে আঙুলের ইশারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বলছেন। এই সময় তাঁর মুখ হাসিহাসি হয়ে যাচ্ছে। আমার দিকে হাসিমুখে তাকানোর একটাই কারণ—ডিজি সাহেব আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কেউ ভাবছেন। গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকেই শুধু তাঁর পিএস খাসকামরায় চুকতে দেয়। অভাজনরা সেই সুযোগ পায় না। যেহেতু আমি পেয়েছি আমি গুরুত্বপূর্ণ কেউ।

আমার এই বিশেষ ঘরে ঢোকার রহস্য সরল মিথ্যাভাষণ। আমি পিএস সাহেবের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলেছি, আমি প্রধানমন্ত্রীর একটি গোপন চিঠি নিয়ে এসেছি। এই চিঠি স্যারের হাতে হাতে দিতে হবে।

কারও সঙ্গে গলা নামিয়ে কথা বললে সেও গলা নামিয়ে কথা বলে, এটাই নিয়ম। পিএস সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, চিঠিতে কী লেখা?

আমি বললাম, প্রধানমন্ত্রীর চিঠির বিষয়বস্তু তো আমার জানার কথা না, তবে অনুমান করছি ডিজি সাহেবের দিন শেষ।

বলেন কী?

ডিজি সাহেব প্রধানমন্ত্রীর ব্ল্যাকবুকে চলে গেছেন। কালো খাতায় তাঁর নাম উঠে গেছে।

পিএস বললেন, এরকম ঘটনা যে ঘটবে তার আলামত অবশ্যিনী পেয়েছি। যান আপনি স্যারের ঘরে চলে যান। আমি স্যারকে জানাচ্ছি যে আপনি যাচ্ছেন।

উনাকে আগেভাগে কিছু জানানোর দরকার নেই। যা বলার আমি সরাসরি বলব। গোপনীয়তার ব্যাপার আছে।

অবশ্যই! অবশ্যই!

ডিজি সাহেবের টেলিফোন শেষ হয়েছে। তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, আপনার জন্যে কী করতে পারি?

আমি বললাম, আপনি আমার জন্যে কিছু করতে পারেন না। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে কিছু করতে পারেন।

তার মানে?

এক ভদ্রলোক বাংলা শব্দভাষারে নতুন একটি শব্দ যোগ করতে চাচ্ছেন। আমি সেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। শব্দটা হলো ‘ফুতুরি’। ফুতুরি হবে ফুঁ দিয়ে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তার সাধারণ নাম।

ডিজি সাহেব চোখ-মুখ কঠিন করে বললেন, এইসব ব্রেইন ডিফেন্সের সকাল-বিকাল থাপড়ানো দরকার।

আমি বললাম, যথার্থ বলেছেন স্যার। উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটাতে কি একটু চোখ বোলাবেন?

চিঠি আপনি আঁকাকুড়ে ফেলুন এবং আপনি এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে যাবেন। আপনাকে এই ঘরে এন্ট্রি দিল কীভাবে?

আমি বললাম, আপনার পিএস সঙ্গে ব্যক্তিগত বিবেচনায় দিয়েছেন। উনার দোষ নাই। যখন শুনেছেন আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছি তখনই উনি নরম হয়ে গেছেন। অবশ্যি নরম হওয়াটা উচিত হয় নাই। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আলতু-ফালতু লোকজন তো আসতে পারে। তাই না স্যার?

ডিজি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গেলেন। তার চেহারায় হাবাগোবা ভাব চলে এল। আমি বললাম, যে ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় নতুন একটি শব্দ দিতে চাচ্ছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসেছেন। ভদ্রলোক পদার্থবিদ্যায় হার্ডোর্ড থেকে Ph.D. করেছেন। এখন আছেন সোনারগাঁ হোটেলে। রুম নম্বর চার শ' সাত। আপনি কি উনার সঙ্গে কথা বলবেন? আপনার পিএসকে বললেই সে ফোন লাগিয়ে দিবে।

অবশ্যই কথা বলব। কেন কথা বলব না! উনার চিঠিটা দিন। পড়ি। এর মধ্যে সোনারগাঁ হোটেলে লাইন লাগাতে বলছি।

ডিজি স্যারের মুখ তেলতেলে হয়ে গেল। শরীরের ভেতরের তেল ছুইয়ে বের হওয়া শুরু হয়েছে। দর্শনীয় দৃশ্য। বল্টুভাইয়ের সঙ্গে তাঁর টেলিফোনে কথাবার্তা হলো। বল্টুভাই^{ক্ষী} বললেন শুনতে পারলাম না, তবে ডিজি সাহেবের তৈলাক্ত কথা শুনলাম।

আপনার চিঠি পড়ে ভালুকে লাগল। বাংলা ভাষাকে আপনার মতো মানুষরা সমৃদ্ধ করবে না তো কারা করবে? শব্দটাও সুন্দর বের করেছেন—ফুতুরি। শুরু হয়েছে ফু দিয়ে। ধ্বনিগত মাধুর্য আছে। আগামী মাসের পনের তারিখ কাউন্সিল মিটিং আছে। আপনার প্রস্তাব কাউন্সিল মিটিংয়ে তোলা হবে। আশা করছি, পাস হয়ে যাবে। যদি পাস হয় তাহলে বাংলা একাডেমীর অভিধানে এই শব্দ চলে আসবে। আপনাকে অগ্রিম অভিনন্দন। আমি খুবই খুশি হব যদি একদিন সময় করে বাংলা একাডেমীতে ঘুরে যান।

আমার কাজ শেষ। ডিজি স্যারের দিকে তাকিয়ে বিনয়ে নিচু হয়ে বললাম, স্যার যাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে বিমল আনন্দ পেয়েছি।

ডিজি স্যার বললেন, আচ্ছা আচ্ছা।

আমি বললাম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামান্য সেবা করার সুযোগ যদি দেন। আমি একটা নতুন শব্দ দিতে চাই। শব্দটা হলো ‘ভুতুরি’।

ভুতুরি?

জি স্যার, ভুতুরি। এর অর্থ হবে ভূতের নাকে ফুঁ দিয়ে বাজানো বাঁশি।

ভূতের বাঁশি?

জি স্যার, ভূতের বাঁশি। এটা বিশেষ। বিশেষণ হবে ভূতুরিয়া। ডাকাতিয়া বাঁশির মতো ভূতুরিয়া বাঁশি। শচীন কর্তার ডাকাতিয়া বাঁশি গানটা কি শুনছেন?

আমি সুর করে গাইবার চেষ্টা করলাম—‘বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি।’ ডিজি সাহেব অস্তুত চোখে তাকিয়ে আছেন। হিসাব মিলাতে পারছেন না। আমি হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, কাউন্সিল মিটিংয়ে বল্টুভাইয়ের ‘ফুতুরি’ শব্দটার সঙ্গে আমার ‘ভূতুরি’ শব্দটা যদি তোলেন খুব খুশি হব।

বল্টুভাই কে?

হার্ভার্ডের Ph.D.-র ডাকনাম বল্টু। সবাই তাকে ‘বল্টু’ নামে চেনে। এই নামেই ডাকে। আপনি যদি তাকে মিস্টার বল্টু ডাকেন, উনি রাগ করবেন না। খুশই হবেন। তাঁর ভাইয়ের নাম নাট। দুই ভাই মিলে নাট-বল্টু। স্যার যাই।

হতাশ এবং খানিকটা হতভম অবস্থায় ডিজি সাহেবকে রেখে আমি বের হয়ে এলাম। ফুতুরির সঙ্গে ভূতুরি মুক্তি হওয়ায় তিনি খানিকটা বিপর্যস্ত হবেন—এটাই স্বাভাবিক। বেচারার আজ সকালটা খারাপভাবে শুরু হয়েছে। তাঁর কপালে আজ সারা দিনে ঝুঁয়ে কী কী ঘটে কে জানে!

আমার জন্য দিনটা ভালোভাবে শুরু হয়েছে, এটা বলা যেতে পারে। দিনের প্রথম চায়ের কাপে একটা মরা মাছি পেয়েছি। মৃত মাছি চায়ে ভেসে থাকার কথা, এটি আর্কিমিডিসের সূত্র অগ্রহ্য করে ঢুবে ছিল। চা শেষ করার পর স্বাস্থ্যবান মাছিটাকে আমি আবিষ্কার করি। চায়ের কাপে মৃত মাছি ইঙ্গিতবহু। চায়নিজ ওপুবিদ্যায় চা শেষ করে কাপের তলানির চায়ের পাতার নকশা বিবেচনা করা হয়। চায়ের পাতায় যদি কোনো কীটপতঙ্গের আকার দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে আজ বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটবে। আমার চায়ের কাপের তলানিতে চায়ের পাতায় কীটপতঙ্গের নকশা না, সরাসরি মাছি।

আজ নিশ্চয়ই কিছু ঘটবে।

মনে মনে ‘সোনার মাছি খুন করেছি’ কবিতার লাইন বলে বাংলা একাডেমী থেকে বের হলাম। হাতের মুঠোয় ডিজি সাহেবের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের নম্বর। পিএস সাহেব অগ্রহ করে লিখে দিয়েছেন। এই

নম্বর ইটলাইনের নম্বরের মতো। যত রাতেই ফোন করা হোক, ডিজি সাহেব লাফ দিয়ে টেলিফোন ধরবেন। ফুতুরি-ভুতুরি নিয়ে তিনি কী পরিকল্পনা করেছেন মাঝে মাঝে টেলিফোন করে জানতে হবে।

আকাশে মেঘ আছে। মেঘ সূর্যকে কাবু করতে পারছে না। মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, চনমনে রোদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। গায়ে রোদ মাখতে মাখতে এগোচ্ছি। শরীরে ভিটামিন ‘ডি’ জমা করে নিচ্ছি। সূর্যের আলো ছাড়া শরীরে এই ভিটামিন তৈরি হয় না। সূর্য থেকে ধার করে চন্দ্র যে আলো ছড়াচ্ছে সেখানে কি কোনো ভিটামিন আছে? নরম-টাইপের ভিটামিন?

কয়েকজন ভিক্ষুকের সঙ্গে দেখা হলো। এরা ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখল, কাছে এগিয়ে এল না। ভিক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে ভিক্ষুকদের সিঙ্গথ সেল প্রবল হয়ে থাকে। এরা ধরে ফেলেছে আমার কাছে কিছু পাওয়ার আশা নেই।

কদমফুল বিক্রেতা দু'জন ফুলকন্যাকে দেখলাম। এদের নজর প্রাইভেট কারে বসা যাত্রীদের দিকে, আমার মতো ভবঘূরের দিকে না। তারপরেও একজন হেলাফেলা ভঙ্গিতে বলল, ফুলপুনবেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

এমন তো হতে পারে, যে বিশেষ ঘটনা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে সেই ঘটনার প্রধান চরিত্র ফুলকন্যা। মেয়েটার চেহারা মিষ্টি, তবে হাতভর্তি ফুলের কারণেও চেহারা মিষ্টি মনে হতে পারে। ফুল হাতে নেওয়ামাত্র যে-কোনো মেয়ের চেহারা মিষ্টি হয়ে যায়। একইভাবে বন্দুক হাতে সুশ্রী মহিলা-পুলিশকেও কর্কশ দেখায়। বন্দুকের কারণেই দেখায়। তাদের নাকের নিচে হালকা গৌফের মতো ভেসে ওঠে। বন্দুক হাত থেকে নামানোমাত্র গৌফ মিলিয়ে যায়।

আমি ফুলকন্যার দিকে তাকিয়ে বললাম, ফুলের দাম কত?

দুই টেকা পিস।

এত দাম! পাইকারি দর কত?

ফুলকন্যা আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রেড লাইটে দাঁড়িয়ে পড়া লাল রঙের প্রাইভেট কারের দিকে ছুটে গেল। আমি বুঝলাম, আজকের বিশেষ ঘটনার সঙ্গে এই মেয়ে যুক্ত না।

‘নাক বরাবর এগিয়ে যাওয়া’ বলে একটা ভুল কথা প্রচলিত আছে। নাক বরাবর অর্থ হলো সোজা যাওয়া। কেউ যদি ডানদিকে ফিরে তার নাক ডানদিকে ফিরবে, সে নাক বরাবরই যাবে। আমি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে নাক বরাবরই হাঁটছি। রাস্তায় যতবার ডান-বাঁ গলি পাওয়া যাচ্ছে ততবারই আমি ডানে মোড় নিছি। গোলকধাঁধা থেকে বের হতে হলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ঢাকা শহরকে গোলকধাঁধা ভাবলে হাঁটার এই পদ্ধতি শেষটায় আমাকে কোথায় নিয়ে যায় তা দেখা যেতে পারে। গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার এই পদ্ধতি ব্রিটিশ ম্যাথমেটিশিয়ান তুরিন বের করেছেন। শেষটায় অবশ্য তাঁর নিজের মাথায় গোলকধাঁধা চুকে যায়। তিনি পিস্তল দিয়ে গুলি করে তাঁর মাথার খুলি গুঁড়িয়ে দেন। পৃথিবীর সেরা অংকবিদদের প্রায় সবার মাথায়ই এক পর্যায়ে জট লেগে যায়। তারা পাগল হয়ে যান। যারা পাগল হতে পারেন না তারা আত্মহত্যা করেন। অংকবিদদের জীবনে এই ঘটনা কেন ঘটে তা বল্টু স্যারকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে।

ভানে মোড় নিয়ে এগুতে এগুতে আগে চোখে পড়ে নি এমনসব জিনিস চোখে পড়তে লাগল। একটা বাঁদরের দোকান দেখতে পেলাম। খাঁচার ভেতর নানান আকৃতির বাঁদর। বাঁদরের সঙ্গে হনুমানও আছে। সবগুলো বাঁদর ও হনুমান খাঁচার ভেতর শিকল দিয়ে বাঁধা। দোকানের সামনে দাঁড়াতেই প্রতিটি বাঁদর একসঙ্গে আমার দিকে তাকাল। তারা চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না, তবে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করছে। বাঁদরের দোকানের মালিক সবুজ লুঙ্গ পরে লাঠি হাতে টুলের উপর বসা। তার বাঁদরের মতোই লোমশ গা। চোখ তক্ষকের চোখের মতো কোটির থেকে বের হয়ে আছে। আমি বললাম, বাঁদর কত করে?

তক্ষক-চোখা বিরক্ত গলায় বলল, বিক্রি হয় না।

বিক্রি হয় না তাহলে এতগুলো বাঁদর নিয়ে সে বসে আছে কেন, এই প্রশ্ন করা হলো না। কারণ এই লোক লাঠি হাতে তেড়ে এসেছে। তার দোকানের সামনে কিছু ছেলেপিলে জড়ে হয়েছে। বাঁদরদের ভেংচি দিচ্ছে। তক্ষক-চোখা লোকের লক্ষ্য এইসব ছেলেপিলে। শিশুর দল তাড়া খেয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হলো।

তারা আবার আসছে। এটাই মনে হয় তাদের খেলা।

একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল, যার সাইনবোর্ডে লেখা-‘স্পেশাল মালাই চা’। বড় টিনের গ্লাসে করে চা দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি গ্লাসের সঙ্গে

পত্রিকার কাগজ ভাঁজ করে দেওয়া, গরম টিনের প্লাস ধরার সুবিধার জন্যে। এই চামের মনে হয় ভালো কাটিত। কিছু কাস্টমার দোকানের বাইরে ফুটপাতে বসে চা থাচ্ছে।

একটা রেস্টুরেন্ট পাওয়া গেল যার বাইরে লেখা—‘গোসলের সুব্যবস্থা আছে। পরিষ্কার গামছা দেওয়া হয়। মহিলা নিষেধ।’ একবার এসে ভালোমতো খোঁজ নিতে হবে ব্যাপারটা কী। রেস্টুরেন্টে গোসলের সুব্যবস্থা থাকার প্রয়োজনইয়া পড়ল কেন? মহিলা নিষেধ কেন, তাও বোঝা গেল না। তাদেরও তো গোসলের অধিকার আছে।

ঘানি দিয়ে সরিষা ভাঙানোর প্রাচীন কল পাওয়া গেল। গরুর বদলে আধমরা এক ঘোড়া ঘানি ঘোরাচ্ছে। এদের সাইনবোর্ডটি চোখে পড়ার মতো—‘আপনার উপস্থিতিতে সরিষা ভাঙাইয়া তেল করা হইবে। ফাঁকি ঝুঁকি নাই।’

বোতল হাতে বেঞ্চিতে কয়েকজন বসে আছে। এরা নিশ্চয়ই নিজে উপস্থিত থেকে সরিষা ভাঙিয়ে খাঁটি তেল নিয়ে বাঢ়ি ফিরবে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে রংগু তিনটি গাভীর বাথান পাওয়া গেল। খাঁটি সরিষার তেলের মতো খাঁটি গরুর দুধের প্রক্ষালনে মনে হয় লোকজন এখানে আসে। কিংবা গাভীদের নিয়ে যাওয়া হয় বাঢ়ি বাঢ়ি। খরিদ্দারের সামনে দুধ দোয়ানো হয়। তিনটি গুল্মীর সামনেই খড় রাখা আছে, তারা থাচ্ছে না। হতাশ চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাচ্চুরগুলো একটু দূরে বাঁধা। তাদের চোখেও রাজ্যের বিষণ্ণতা। তাদেরই মায়ের দুধ, অথচ তাদের কোনো অধিকার নেই।

ডানদিকে ঘোরা ভ্রমণ একসময় শেষ হলো। এমন এক জায়গায় এসেছি ডানে ঘোরার উপায় নেই। অঙ্গগলি। শেষ প্রান্তে লালসালু দেওয়া মাজার শরিফ।

মনে হচ্ছে যে বিশেষ ঘটনা ঘটবে বলে সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল, সেই বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। ডানে আর যাওয়ার উপায় নেই, আমার ভ্রমণের সমাপ্তি।

মাজার মানেই কিছু হতাশ লোকজন উন্ন হয়ে বসে থাকবে, কেউ কেউ মাজারের রেলিং ধরে বিড়বিড় করবে। থালা হাতে ভিখিরি থাকবে। সারা রাত গাঁজা খেয়ে চোখ টকটকে লাল হওয়া খালি গায়ের রংগু দুঃএকজন থাকবে। এরা মাজারের খাদেম না, তবে খাদেমের সাহায্যকারী। এই

মাজার শূন্য : খাদেমের ঘরে খাদেম বসে আছেন। আর কেউ নেই। সম্ভবত অক্ষগলিতে মাজার হওয়ার কারণে নাম ফাটে নি।

খাদেমের চোখ বাথানের গাভীগুলোর মতোই বিষণ্ণ। তিনি সবুজ রঙের পাঞ্জাবি পরেছেন। মাথায় পাগড়ি আছে। পাগড়ির রঙ সবুজ। বয়স ষাটের মতো হবে। দাঢ়ি মেন্দি দিয়ে রাঙানো। খাদেমদের চোখেমুখে ধূর্তভাব থাকে, ইনার নেই। বরং চেহারায় খানিকটা আলাভোলাভাব আছে। খাদেম মোবাইল ফোনে কথা বলছেন। তাঁর মাথার উপর লেখা—‘বাচ্চাবাবার গরম মাজার’।

এই লেখার নিচেই লাল হরফে লেখা, ‘পকেটমার হইতে সাবধান’।

আমি খাদেমের দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। মোবাইল ফোন কানে ধরেই বললেন, দোয়া খায়ের করার জায়গা বাঁ দিকে। মহিলারা যাবেন ডানে। দানবাক্স মহিলা-পুরুষের আলাদা।

আমি বাঁ দিকে ঢুকেই দানবাক্স পেলাম। ‘লেড়কা সে লেড়কা কা গু ভারী’র মতো দানবাক্সের তালা বড়। দান বাক্সে লেখা ‘পুঁ’ অর্থাৎ পুরুষদের।

বাচ্চাবাবা সম্ভবত বালক ছিলেন। ফ্রেলিং ঘেরা ছেট্ট কবর। কবরের ওপর একসময় গিলাফ ছিল, বৃষ্টির আনিতে ভিজে রোদে পুড়ে গিলাফ নানা ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সেঁটে বসেছে। মাজারের পায়ের কাছে দর্শনীয় নিমগাছ। কংক্রিটের শহরে এই গাছ ভালোমতো শিকড় বসিয়ে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে বলমল করছে। এত বড় নিমগাছ আমি আগে দেখি নি। নিমগাছের একটি প্রজাতির নাম মহানিম। মহানিম বটবৃক্ষের মতো প্রকাণ হয়। এটি হয়তোবা মহানিম।

খাদেমের মোবাইলে কথা বলা শেষ হয়েছে। তিনি হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, পবিত্র কোরান শরিফে শয়তানের নাম কতবার আছে জানো?

আমি বললাম, জি-না।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্঵াস ফেলে বললেন, বাহান্নবার। এর মরতবা জানো? জি-না।

শয়তান এমনই জিনিস যে, স্বয়ং আল্লাহপাককে বাহান্নবার তার নাম নিতে হয়েছে। আমাদের চারিদিকে শয়তান। তার চলাফেরা রক্তের ভেতরে। বুঝোছ?

জি।

খাদেম হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে বললেন, আমার পক্ষে মাজার ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না। একটু চা খাওয়া প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে এক কাপ চা খিলাতে পারবে? গলির মাথায় একটা চায়ের দোকান আছে, আবুলের চায়ের দোকান। আমার কথা বললে চা দিবে। টাকা নিবে না।

হজুর, চায়ের সাথে আর কিছু খাবেন? টোস্ট বিস্কুট, কেক?

সিঞ্চেট খাব। একটা সিঞ্চেট নিয়ে আসবে।

আমি বললাম, সিঞ্চেট কি আবুল ভাই মাগনা দিবে? নাকি খরিদ করতে হবে?

হজুর জবাব দিলেন না, খানিকটা বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। এর অর্থ, আবুল ভাই চা মাগনা দিলেও সিগারেট দিবে না।

আবুল ভাইয়ের চেহারা মনে রাখার মতো। মানুষের কিছু দাঁত মুখের বাইরে থাকতে পারে, উনার প্রায় সবগুলোই মুখের বাইরে। মুখের বাইরে থাকার কারণেই মনে হয় দাঁতের যত্ন বেশি। প্রতিটি দাঁত ঝকমক করছে। ক্লোজআপ এই দাঁতের একটা বিজ্ঞাপন করলে ইন্টারেস্টিং হতো। বিজ্ঞাপনের ভাষা—‘মুখের বাইরের দাঁতের জন্যেও ক্লোজআপ’।

হজুরের জন্যে মাগনা চা নিজে এসেছি শুনে আবুল ভাই ক্ষিণ হয়ে গেলেন। অতি অশালীন কিছু কথা বললেন। অশিক্ষার কারণেই হয়তো বললেন। গরম চা শরীরের এক বিশেষ প্রবেশদ্বার দিয়ে সাইকেলের পাম্পার দিয়ে চুকাতে বললেন। আমাকে চা এবং টোস্ট বিস্কুট নগদ টাকায় কিনতে হলো।

হজুরের সামনে চা, একটা টোস্ট বিস্কুট এবং এক প্যাকেট বেনসন এন্ড হেজেস রাখলাম। সিগারেটের প্যাকেট দেখে হজুরের চেহারা কোমল হয়ে গেল। তিনি নরম গলায় বললেন, বাবা, ম্যাচ এনেছ? আমি বললাম, জি হজুর।

তোমার উপর আমি দিলখোশ হয়েছি। আমার যেমন দিলখোশ হয়েছে বাচ্চাবাবাও সত্ত্বষ্ট হয়েছেন। উনার সন্তোষ আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি। তোমার কোনো মানত থাকলে বাচ্চাবাবারে বলো। আমি নিজেও দোয়া বখশায়ে দিব। আছে কোনো মানত?

জি আছে। বাংলা ভাষায় দুটা শব্দ চুকাতে চাই।

হজুর চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তৃপ্তি নিয়ে বললেন, দুটা কেন, দশটা চুকাও। কোনো সমস্যা নাই। বাবাৰ দৱবাৰে এসেছ, খেয়াল রাখবা, বাবা কৃপণ না। যা চাবা অধিক চাবা।

হজুরের মোবাইলে কি একটা ফোন করতে পারব?

অবশ্যই পারবে, তবে কথা অল্প বলবে। বেশি কথা আমাদের নবীজী সাল্লালাহু আলেয়স সালাম পছন্দ করতেন না। আমিও করি না। সৰ্ব কৰ্মে আমি নবীজীকে অনুসূরণ কৱাৰ চেষ্টা কৰি।

আমি বাংলা একাডেমীৰ ডিজি সাহেবকে টেলিফোন কৱলাম। তিনি গঙ্গীয় গলায় বললেন, কে বলছেন?

আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার আমাৰ নাম হিমু। সকালে আপনাৰ সঙ্গে দুটা নতুন শব্দ নিয়ে কথা হয়েছে। একটা ফুতুৰি, আৱেকটা ভুতুৰি। ভুতুৰি শব্দটাৰ বানানে দুটা চন্দ্ৰবিন্দু লাগবে। ভূতেৰ বিষয় তো, এইজন্য চন্দ্ৰবিন্দু। শব্দটা হবে 'ভুঁতুৰি'।

ডিজি সাহেব লাইন কেটে দিলেন।

বৃষ্টি শুক হয়েছে। আমি হজুরের স্মারনে বসে আছি। হজুর সিগারেট টানতে টানতে বৃষ্টি দেখছেন। তাৰঁচেহারায় উদাসভাব চলে এসেছে। আমি বললাম, হজুর, আৱেক কাপ ছাঁকি আনব?

হজুর দীৰ্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, প্ৰয়োজন নাই। তুমি কি পা টিপতে পাৰো?

আমি বললাম, আমোৰা বাঞ্ছালি। বাঞ্ছালি আৱ কিছু পাৰুক না-পাৰুক, পা টিপতে পাৰে। হজুরেৰ পা কি টিপে দিব?

হজুর উদাস গলায় বললেন, দাও। মুৰুক্বিদেৱ পা দাবানোৰ মধ্যে সোয়াব আছে। মুৰুক্বিদেৱ সঙ্গে আদবেৱ সঙ্গে কথা বলাতেও সোয়াব। জন্মেৰ সময় আল্লাহপাক প্ৰত্যেকেৱ নামে ব্যাংকে একটা সোয়াবেৱ একাউন্ট খুলে দেন। আমাদেৱ কাজ হলো একাউন্টে সোয়াব জমা দেওয়া। বুৰোছ?

আমি হজুরেৰ পা দাবাতে গিয়ে দেখলাম, তাৰ দুটা পা হাঁটুৱ ওপৰ থেকে কাটা। পা কাটা মানুষেৱ সঙ্গে ক্র্যাচ থাকে। ইনার নেই বলে কাটা পা'ৰ বিষয়টা এতক্ষণ ধৰতে পাৰি নি। তা ছাড়া লুঙ্গিও কায়দা কৱে পৱেছেন। লুঙ্গিৰ শেষ প্ৰান্তে স্যাঙ্গেল আছে।

আমি বললাম, হজুরের পা কাটল কীভাবে?

হজুর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহর হকুমে পা কাটা গেছে। এর সঙ্গে ডাঙ্কারের বদমাইশিও আছে। ডাঙ্কারের কানে শয়তান ধোয়া দিয়েছে। শয়তানের অচওয়াছায় ডাঙ্কার আমার দুটা ঠ্যাং কেটে ফেলে দিয়েছে। একটা কাটলেও চলত।

আমি বললাম, অবশ্যই নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

হজুর লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কাটা ঠ্যাং আমাকে দেয় নাই, এটা একটা আফসোস।

কাটা ঠ্যাং দিয়ে করবেন কী?

হজুর বিষণ্ণ গলায় বললেন, কবর দিবার জন্য চেয়েছিলাম। কবর দিতাম। ঠ্যাং শরীরের একটা বড় অংশ। এর কবর হওয়া প্রয়োজন।

হজুরের পা নেই, পা কীভাবে দাবাবো বুঝতে পারছি না। হজুর বললেন, পা কাটা পড়েছে, কিন্তু ব্যথা বেদনা ঠিকই আছে। পা নাই, তার পরেও ব্যথা বেদনা হয়। রংগে টান পড়ে। আঙুল পর্যন্ত কটকট করে। পায়ের আঙুলগুলা আগে ফুটায়ে দাও। অনুস্তুতি করে যেখানে আঙুল থাকার কথা সেখানে টান দাও, আঙুল ফোটিছোর শব্দ শুনবে। খুবই আচানক ঘটনা।

আমি হজুরের অদৃশ্য পা দাবাচ্ছি। অদৃশ্য আঙুল টানছি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আঙুল টানার সময় কট করে একটা আঙুল ফুটল।

হজুর বললেন, আঙুল ফোটার শব্দ শুনেছ?

জি।

আচানক হয়েছ?

জি।

আল্লাহপাকের আজির বিষয় বুঝতে পেরেছ?

বুঝার চেষ্টায় আছি।

এইসব দেখেও কেউ কিছু বুঝে না। মূর্খের মতো বলে, আল্লাহ নাই, বেহেশত-দোজখ নাই। বলে কি না বলো?

বলে।

এই ধরনের কথা বলে এমন কাউরে যদি পাও আমার কাছে নিয়া আসবা, আল্লাহপাকের কেরামতি বুঝায়ে দিব। তোমার জনামতো এমন কেউ আছে?

একজন আছে। তার নাম বল্টু। তিনি বলেন, সৈশ্বর নাই, আত্মা নাই।

হজুর তৃতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, সৈশ্বর নাই বলে—এটা ঠিক আছে। সৈশ্বর হিন্দুদের বিষয়। তবে আত্মা নাই যে বলে—এটা ভয়ঙ্কর কথা। তাকে আমার কাছে নিয়া আসবা, আত্মা গুলায়ে তারে খাওয়ায়ে দিব। বদমাইশ!

হজুরের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার আরেকটা অদৃশ্য আঙুল ফুটল।

হজুর তৃতীয়খাঁ গলায় বললেন, শুনেছ?

জি।

আগের চেয়েও শব্দে ফুটেছে, ঠিক না?

জি ঠিক।

আল্লাহপাকের কেরামত বুঝতে পারছ?

আমি পা দাবাতে দাবাতে বললাম, আল্লাহপাকের না, আপনারটা বুঝেছি। আমি যখন অদৃশ্য আঙুল টান দেই তখন আপনি নিজের হাতের আঙুল ঘটকান। সেই শব্দ হয়। ম্যাজিক প্রথমবার করা ঠিক আছে, দ্বিতীয়বার ঠিক না। দ্বিতীয়বারে ধরা খেতে হয়। ভবিষ্যতে আপনি পায়ের অদৃশ্য আঙুল ফোটানোর ম্যাজিক দ্বিতীয়বার দেখাবেন না।

হজুর বিষর্ষ হয়ে গেলেন। আমি তার অদৃশ্য পা দাবাতেই থাকলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে, তবে এখন কের হওয়া যাবে না। গলিতে হাঁটুপানি। অচেনা গলির কোথায় ম্যানহোল কে জানে! হাঁটতে গেলে ম্যানহোলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হজুর গলা খাঁকারি দিলেন। আমি বললাম, কিছু বলবেন?

হজুর বললেন, তুমি পা দাবাছ আরাম পাচ্ছি। তোমার উপর সমানে দোয়া বকসে দিচ্ছি।

ভালো করেছেন।

তোমার মতো একটা চালাক চতুর ছেলে আমার দরকার। আগে একজন ছিল, নাম হেকিম। কাজে কর্মে ভালো ছিল। কেরাতের গলা চমৎকার। মাজারের নিয়মকানুন জানে। কী করলে মাজারের আয় হয়, তাও জানে। জানবে না কেন, মাজারে মাজারে খাদেমের অ্যাসিস্টেন্টগিরি করাই তার কাজ। হেকিম কী করেছে শোনো, দানবাঙ্গের তালা ভেঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে পালায়ে গেল। আমি মাফ করতে গিয়েও করি নাই। আল্লাহপাকের দরবারে নালিশ দিয়ে দিয়েছি। ইশারায় পেয়েছি, আল্লাহপাক নালিশ কবুল করেছেন। এখন যে-কোনো একদিন দেখা যাবে, হেকিম এসে আমার পা চাটছে।

আমি বললাম, আপনার পা নাই, চাটবে কীভাবে?

হজুর হতাশ গলায় বললেন, সেটাও একটা কথা। পা না চাটলেও হেকিম
আবার যদি আসে, ক্ষমা চায়, ক্ষমা করে দিব। নবীজীকে একবার জিজ্ঞাস করা
হলো, হজুরে পাক! দুশ্মনকে কতবার ক্ষমা করব? নবীজী বললেন, প্রথম
দফায় সত্ত্বের বার। ভালো কথা, তুমি কি আমার এখানে চাকরি করবে?

বেতন কত দিবেন?

হজুর বিরক্ত গলায় বললেন, মাজারের খাদেমের চাকরিতে বেতন
জিজ্ঞাসা করা মাজারের প্রতি অসম্মান। বলো, আন্তাগফিরুল্লাহ!

আন্তাগফিরুল্লাহ!

তোমাকে মাজারের আয়ের অংশ দিব।

মাজারের কোনো আয় আছে বলে তো মনে হয় না।

হজুর বললেন, কথা সত্য। এখন আয় নাই। দানবাত্র বলতে গেলে
খালি। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। মাজারের চন্দ্রের সাথে
যোগাযোগ। চন্দ্রের কারণে জোয়ারভাটা হয়। মাজারেও জোয়ারভাটা
আছে। এখন ভাটা চলতেছে।

আপনি তো দুপুরে কিছু খান নাই। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কী?

আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি। স্তুন একটা ব্যবস্থা নিবেন। দেখবা
সন্ধ্যার পর কোনো ভক্ত খানা খেয়া চলে আসবে। অনেকবার এ রকম
হয়েছে। কথা নাই, বার্তা নাই, বিয়ে-বাড়ির খানা আসে। আকিকার খানা
আসে, সুন্নতে খৎনার খানা আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকো, দেখো কী হয়।

আমি সন্ধ্যা পার করলাম। মাজার ঝাঁট দিলাম। দানবাত্রের ওপর ধূলা
বসেছিল, ধূলা পরিষ্কার করলাম। মাজারের ভেতর পানি জমেছিল, পানি
বের করার ব্যবস্থা করলাম। হজুর বললেন, মোমবাতি জুলাও। বেজোড়
সংখ্যায় জুলতে হবে, তিন অথবা পাঁচ। আল্লাহ একা বলে তিনি বেজোড়
পছন্দ করেন।

তাহলে একটা জুলাই?

জুলাও, একটাতেও চলবে।

রাত আটটার দিকে সন্দেহজনক চেহারার একজন মাজারে ঢুকল।
মাজারের পেছনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে চলে গেল। হজুর বললেন,
দানবাত্রে কিছু দিয়েছে?

আমি বললাম, না।

হজুর চাপা গলায় বলল, বদমাইশ।

রাত দশটা বাজল, খানা নিয়ে কাউকে আসতে দেখা গেল না। হজুরের নির্দেশে দানবাঞ্চি খোলা হলো। ভাঙ্গি পয়সা আর নোট মিলিয়ে একাত্তর টাকা পাওয়া গেল। হজুর বললেন, দুই প্রেট ভুনা খিচুড়ি আর হাঁসের মাংস নিয়া আসো। বৃষ্টি বাদলার দিনে ভুনা খিচুড়ির উপর জিনিস নাই। রাত অধিক হয়ে গেছে, তুমি থেকে যাও। বিছানা বালিশ সবই আছে। হেকিম বিছানা-বালিশ নেয় নাই। রাত বারোটার সময় আমি জিকিরে বসব। আমার সঙ্গে জিকিরে সামিল হতে পারো। ব্যাংকের একাউন্টে সোয়াব বাড়বে। কি রাজি আছ?

জি হজুর।

হজুর গলা নামিয়ে বললেন, রাতে ঘূম ভাঙলে যদি দেখ অস্বাভাবিক লম্বা কিছু মানুষ নামাজে দাঁড়ায়েছে, তখন তয় পাবা না। এরা ইনসান না, জীন। মানুষের বেশ ধরে আসে, মাজারে মাজারে নামাজ পড়ে।

হজুর খুব আরাম করে ভুনা খিচুড়ি খেলেন। খিচুড়ি খেতে খেতে বললেন, পায়ের আঙুল ফোটার বিষয়ে তুমি যা বলেছ তা ঠিক আছে। আমি কায়দা করে হাতের আঙুল ফোটাই। তবে শুরুতে পায়ের আঙুল ফুটতো। ভাত হাতে নিয়া মিথ্যা বলব না। তিন মাস ফুটেছে, তারপর বন্ধ। আমার কথা কি বিশ্বাস করলা?

জি হজুর।

আমার সাথে থেকে যাও, আমার সেবা করো, বিনিময়ে অনেক বাতেনি জিনিস তোমাকে শিখায়ে দিব। পরী দেখেছ কখনো?

জি-না।

আমি ইচ্ছা করলে পরীর সাথে মুহার্বতের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তবে জীন পরীদের কাছ থেকে দূরে থাকা ভালো। ‘আল্লাহহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুরুসি আল খাবায়িত।’

এর অর্থ কী?

অর্থ হলো, হে আল্লাহপাক! দুষ্ট পুরুষ জীন এবং দুষ্ট মহিলা জীনের অনিষ্ট থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরী হলো মহিলা জীন।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বাড়তে লাগল। আরামদায়ক আবহাওয়া। হজুর একমনে জিকির করতে লাগলেন। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে জিকিরের শব্দ মিলে অদ্ভুত এক পরিবেশ তৈরি হলো।

রাত তিনটা পর্যন্ত আমি হজুরের সঙ্গে জিকির করলাম। হজুর বললেন, জিকির তোমার কলবের ভেতর চুকায়ে দিব। দিনরাত জিকির হতে থাকবে, তোমার নিজের কিছু করতে হবে না। বলো, আলহামদুলিল্লাহ।

আমি বললাম, আলহামদুল্লাহ।

হজুর বললেন, তুমি আমার সঙ্গে থেকে যাও। দিনরাত চবিশ ঘণ্টা থাকো। দেখবা কী তোমারে দিব।

আমি বললাম, হজুর অনুমতি দিলে ফ্রি-ল্যান্স কাজ করব।

সেটা আবার কী?

সময়-সুযোগমতো মাজারের কাজ করব। হজুরের পা টিপব। পার্টটাইম চাকরি, ফুলটাইম না।

হজুর উদাস গলায় বললেন, ঠিক আছে তোমার বিবেচনা। জোর জবরদস্তি নাই।

চেষ্টা করব রাতে এখানে থাকতে। দিনে পারব না। কাজকর্ম আছে।

কী কাজকর্ম?

আমি জবাব দিলাম না, হজুরের মতো উদাস হয়ে গেলাম।

হজুর বললেন, খারাপ কোনো কাইজ কাম যদি করো তাহলে কাজ শেষ হওয়ামাত্র পীর বাচ্চাবাবার সুপারিশ নিয়া আল্লাহপাকের কাছে মাফ চাবা, মাফ পায়া যাবে। দেরি করে ক্ষমাচাহিলে কিন্তু হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মাফি মাংতে হবে।

আমি বললাম, ভালো জিনিস শিখলাম হজুর। এখন আপনার মোবাইলটা দেন, একটা টেলিফোন করব।

এত রাতে কারে টেলিফোন করবা? আচ্ছা থাক, আমারে বলার প্রয়োজন নাই। মানুষের সবকিছু জানতে চাওয়া ঠিক না। সবকিছু জানবেন শুধু আল্লাহপাক।

আমি ডিজি স্যারকে টেলিফোন করলাম। কয়েকবার রিং হতেই তিনি ধরলেন। আতঙ্কিত গলায় বললেন, কে?

স্যার আমি হিমু। ওই যে আপনার কাছে দুটা শব্দ নিয়ে গিয়েছিলাম— ফুতুরি ও ভুঁতুরি।

কী চাও?

ভুঁতুরি বানানটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমার মনে হয় একটা চন্দ্রবিন্দু থাকলেই চলবে। দুটা চন্দ্রবিন্দুতে বাড়াবাঢ়ি হয়ে যাবে।

ডিজি স্যার লাইন কেটে দিলেন। তবে লাইন কাটার আগে চাপা গলায় বললেন, সান অব এ বিচ!

আমি ডিজি, বাংলা একাডেমী

আমি সচরাচর গালাগালি করি না। আমার রুচিতে বাঁধে। আমার গালাগালি স্টুপিডে সীমাবদ্ধ। তবে কিছুক্ষণ আগে হিমু নামধারী একজনকে 'সান অব এ বিচ' বলেছি। এই বদ আমার পেছনে লেগেছে। রাত বাজে তিনটা পঁয়তাল্লিশ। এত রাতে আমার ঘূম ভাঙিয়ে 'ভূতুরি' বানান নিয়ে কথা বলে? এ চাচ্ছে কী? বুঝতেই পারছি কোনো একটা বিশেষ মতলব নিয়ে সে ঘূরছে। বাংলাদেশ ভরতি হয়ে গেছে মতলববাজে। কে কোন মতলব নিয়ে ঘূরে বোবার উপায় নেই। সব মতলববাজের পেছনে দু-তিনটা মন্ত্রী-মিনিস্টার থাকে। এটাই সমস্য।

আমার হটলাইনের টেলিফোন নম্বর হিমু মতলববাজটাকে কে দিল? যে দিয়েছে সেও হিমুর সঙ্গে জড়িত। আমার পেছনে একটা চক্র কাজ করছে। চক্রের প্রধানটা কে? আমার পিএস দবির কি জড়িত? কম্পাসের কাঁটা তার দিকে ঘূরে।

দবির অতি ভদ্র অতি বিনয়ী ছেলে। ভদ্রতা ও বিনয়ের ভেতর শয়তান বসে থাকে। ভদ্রতা-বিনয়-ভালোমানুষি হলো শয়তানের মুখোশ।

আমি ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। ভোর হলেই দবিরকে টেলিফোন করব। অতি ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করব হিমু নামের বদটাকে সে আমার গোপন নম্বর দিয়েছে কি না। যদি দিয়ে থাকে তাহলে কেন দিল? হিমু এমন কে যে তাকে আমার গোপন নম্বর দিতে হবে!

আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এটা পরিষ্কার। কে করছে, কেন করছে— এটাই বুঝতে পারছি না। আমার প্রধান সমস্যা, আমি কাউকে না বলতে পারি না। সরকারি ছাত্রদলের একসময়ের বড় নেতা এসে পাঞ্জুলিপি জমা দিল। পাঞ্জুলিপির নাম 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা শুটকির একশত রেসিপি'। তাকে কষে চড় দেওয়া দরকার। তা না করে বললাম, একটি দেশের কালচারের অংশ রান্নাবান্না। পাঞ্জুলিপি এখনই রিভিউয়ারদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে বলে কী, রিভিউয়ার লাগবে না, মন্ত্রীর সুপারিশ আছে। মন্ত্রী মহোদয় আপনাকে টেলিফোন করবেন।

আমি বললাম, অবশ্যই, অবশ্যই। তবে আমাদেরও তো কিছু নিয়মকানুন আছে।

যেখানে তিনজন মন্ত্রীর সুপারিশ সেখানে আবার নিয়মকানুন কী?

আমি আবারও বললাম, অবশ্যই, অবশ্যই ।

নিন পূর্ত মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন ।

আমাকে মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলো ।

এখন রাত প্রায় চারটা । হিমু বদমাইশ্টা যদি এখন বলে, রেল মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন, আমাকে কথা বলতেই হবে । মন্ত্রী মহোদয়ের রাতে কম ঘুমান । তাঁরা অস্তৃত অস্তৃত সময়ে কথা বলেন । আমি ফ্রিজ থেকে বোতল বের করে একগুস্ত ঠাণ্ডা পানি খেলাম । বারান্দায় বসে একটা সিগারেট শেষ করলাম । মন অস্থির হয়েছে । অস্থির অবস্থায় বিছানায় ঘুমুতে যাওয়া ঠিক না । অস্থির অবস্থায় ঘুমুতে যাওয়া মানুষ দুঃস্ফপ্ত দেখে ।

সিগারেট খাওয়ার কারণেই কি না জানি না, অস্থিরতা খানিকটা কমল । বিছানায় পিয়েছি, চোখ লেগে এসেছে । আবার টেলিফোন । বদটাই কি আবার করেছে? নম্বর সেভ করা নাই বলে বুঝতে পারছি না । টেলিফোন ধরব নাকি ধরব না? কিছুক্ষণ কথা বলে তার মতলবটা ধরা যেতে পারে ।

স্যার, আমি হিমু । ভুঁতুরির হিমু ।

কী ব্যাপার?

হজুর জানতে চাচ্ছিলেন আমি এত রাতে কার সঙ্গে কথা বললাম । আপনার সঙ্গে কথা বলছি শুনে স্বশ্র হয়েছেন ।

আচ্ছা ।

হজুর বললেন, ফজর ওয়াক্ত হয়ে গেছে, নামাজটা যেন আদায় করেন । আপনি কি হজুরের সঙ্গে কথা বলবেন?

আমি টেলিফোন বন্ধ করে বারান্দায় এসে বসলাম ।

সালমা ঘুম থেকে উঠে বলল, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, কোনো ব্যাপার না । চা করে দাও, চা খাব ।

সালমা বলল, রাতে কোনো খারাপ স্বপ্ন-টপ্প দেখেছ?

আমি বললাম, না ।

সালমা বলল, আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি । খুবই খারাপ । তুমি আমাকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ । ছাদ থেকে মাটিতে পড়তে পড়তে আমার ঘুম ভেঙেছে ।

আমি বললাম, এটা খুবই ভালো স্বপ্ন । স্বপ্নে যা দেখা যায় তার উল্টোটা হয় । পতন দেখা মানে উঠান ।

সকাল সাড়ে সাতটায় আমি দবিরকে টেলিফোন করলাম। নানা কথার পরে জিজেস করলাম সে হিমু নামের কাউকে আমার প্রাইভেট নম্বর দিয়েছে কি না।

দবির বলল, অসম্ভব। সে কি বলেছে যে আমি দিয়েছি?

আমি বললাম, না। সে সময়ে অসময়ে আমাকে টেলিফোন করে বিরক্ত করছে। কাল রাত তিনটা পঁয়তাল্লিশে একবার টেলিফোন করেছে। শেষরাতে আরেকবার করেছে।

দবির বলল, যে নম্বর থেকে টেলিফোন করেছে সেই নম্বর আমাকে দিন, আমি ব্যবহা নিছি।

এই ছেলে কি সাংবাদিক?

তা তো স্যার জানি না। আপনি বললে আমি খোঁজ নিতে পারি।

আমি ইতস্তত করে বললাম, একাডেমীতে আমার বিরুদ্ধে কি কোনো কথাবার্তা হয়?

দবির বলল, আপনার বিরুদ্ধে কি কথাবার্তা হবে? আপনি হচ্ছেন হার্ডকোর অনেস্ট।

আমি বললাম, থ্যাংক যুজ।

দবির বলল, তবে 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা শুটকির একশত রেসিপি' বইটি যে আপনি প্রেসে ছাপতে জন্মে পাঠিয়ে দিয়েছেন এটা নিয়ে কথা হবে। পত্রপত্রিকায় লেখা হবে।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। দবির বলল, চেপা শুটকির লেখক আরও একটা পাঞ্জলিপি জমা দিয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ এবং গ্রামবাংলার ভর্তাভাজি'। সে দুটা বইয়ের রয়েলটির টাকা অ্যাডভান্স চায়। রয়েলটির টাকা পরিশোধ করার জন্মে রেল এবং ধর্মস্তুর জোরালো সুপারিশও আছে।

আমি বললাম, ও আচ্ছা আচ্ছা। আমার বিরুদ্ধে কঠিন ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ, বাংলার ঐতিহ্য চেপা শুটকি—সব এক সুতায় গাঁথা মালা। 'এ মণিহার আমার নাহি সাজে।'

মন শান্ত করার জন্মে কী করতে পারি কিছুই বুঝতে পারছি না। ফজরের নামাজ পড়ে ফেলব নাকি? অনেকদিন নামাজ পড়া হয় না।

অজু করে জায়নামাজে দাঁড়িয়েছি। সালমা অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার?

ব্যাপার কিছু না। নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছি।

সালমা বলল, কেন?

আমি বললাম, কেন মানে? মুসলমানের ছেলে, নামাজ পড়ব না?
কোনোদিন তো পড়তে দেখি না।

আমার সামনে থেকে যাও। ঘ্যানঘ্যান করবে না।

সালমা বলল, ঘ্যানঘ্যান কী করলাম?

আমি বললাম, ঘ্যানঘ্যান কী করছ বুঝতে পারছ না? স্টুপিড মহিলা!

আমাকে স্টুপিড বললে?

যে স্টুপিড তাকে স্টুপিড বলব না? তুমি এই মুহূর্তে আমার চোখের
সামনে থেকে দূর হও।

সালমা চলে গেল। আমার নামাজ পড়া হলো না। কারণটা অভ্যন্তর।
অনেক চেষ্টা করেও সূরা ফাতেহা মনে করতে পারলাম না। সব সূরা মনে
পড়ছে, শুধু সূরা ফাতেহা মনে পড়ছে না। এর কোনো মানে হয়!

সকালে নাশতার টেবিলে বসে শুনলাম সালমা কিছুক্ষণ আগে সুটকেস
নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

এটা নতুন কিছু না। এর চেয়ে অনেক স্থুচ্ছ কারণে সালমা বাপের বাড়ি
চলে গেছে। তাকে ফিরিয়ে আনতে অনেক কলকজা নাড়াতে হয়েছে।
একবার তার গাবদা পায়ে পর্যন্ত ঝরেছি।

টেলিফোন বাজছে। মনে হচ্ছে আমার শুঙ্গর সাহেব টেলিফোন
করেছেন। সাধারণত সালমা তার বাড়িতে উপস্থিত হওয়ামাত্র তিনি
টেলিফোন করেন। গলা কঠিন করে বলেন, বাবা, তোমার কাছ থেকে এই
ব্যবহার আশা করা যায় না। তুমি ঢাকা শহরের কোনো রিকশাচালক না।
তুমি বাংলা একাডেমীর ডিজি। তোমার একটা পজিশন আছে।

আমি টেলিফোন ধরে ‘হ্যালো’ বলতেই ওপাশ থেকে হিমু বলল, ভুঁতুঁরি
বিষয়টা নিয়ে শেষ কথাটা বলব, আর বিরক্ত করব না। চন্দ্রবিন্দু কটা
রাখবেন তা আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। যদি মনে করেন তিনটা চন্দ্রবিন্দু
দেবেন, তাও দিতে পারেন। শুনতে খারাপ লাগবে না—ভুঁতুঁরি...।

আমি ভাবলাম বলি, চুপ থাক শালা! নিজেকে শেষ মুহূর্তে সামলালাম,
কিছুই বললাম না। আমি ঢাকা শহরের কোনো রিকশাচালক না। আমি
বাংলা একাডেমীর ডিজি। আমার একটা পজিশন আছে।

মাইকেল এঞ্জেলো বলেছেন, ‘মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর দেখায় তাদের কেঁদে ফেলার আগমহূর্তে।’

মাইকেল এঞ্জেলোর কথা সত্যি হতে পারে। মাজেদা খালার বসার ঘরের সোফায় রোগা-পাতলা এক তরুণী বসে আছে। সে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি পরেছে। শাড়ির সবুজ রঙ ছায়া ফেলেছে মেয়েটির মুখে। সবুজ আভায় তার চেহারা খানিকটা করুণ হয়েছে। সে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার চেখের পাতা যেভাবে কাঁপছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাঁদবে। তাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। মাইকেল এঞ্জেলো এই মেয়েকে দেখলে বাটালি দিয়ে পাথর কাটা শুরু করতেন। যে ভঙ্গিতে মেয়েটি বসে আছে, তিনি সেই ভঙ্গি হয়তো সামান্য পাটাতেন, যাতে মেয়েটির মুখ ভালোভাবে দেখা যায়। এখন মেয়েটির মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না।

আমি তার কেঁদে ফেলার দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে চোখ তুলে আমাকে দেখে তার কান্না সামলে ফেলল। কিছু কিছু মেয়ে দ্রুত কান্না সামলাতে পারে। এ মনে হয় সেই দলের। আমি মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম। মাজেদা খালা রান্নাঘরের টুলে বসে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনিও কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁদবেন। তবে তাঁকে রূপবতী দেখাচ্ছে না। বরং কদাকার লাগছে। কেঁদে ফেলার আগে সব মেয়েকে রূপবতী মনে হয়, এই তথ্য ট্রিক্সমা।

খালা, সমস্যা কী?

এই বাড়িতে সমস্যা তো একটাই—তোর খালু। অপরিচিত এক মেয়ের সামনে তোর খালু আমাকে কুণ্ঠি ডেকেছে।

আমি বললাম, বাংলায় কুণ্ঠি বলেছেন, নাকি ইংরেজিতে বলেছেন? বাংলায় কুণ্ঠি ভয়ক্ষর গালি, ইংরেজিতে ‘বিচ’ তেমন গালি না। বাংলা ‘গু’ শব্দ ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করা যায় না, কিন্তু ইংরেজিতে ‘শিট’ কথায় কথায় বলা যায়।

খালা মনে হয় অনেকক্ষণ কান্না ধরে রেখেছিলেন, আর পারলেন না। শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। শোবার ঘর থেকে খালু ইংরেজিতে হঞ্চার দিলেন। কঠিন গলায় বললেন, Get lost! হঞ্চার বাংলায় অনুবাদ করলে হয়, ‘হারিয়ে যাও।’ Get lost হলো গালি, আর ‘হারিয়ে যাও’ হলো বেদনাত্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস। বাংলা ভাষায় ঝামেলা আছে। বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

মাজেদা খালা নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, তোর খালুকে
কি তুই বলে আসতে পারবি যে আমি তার সঙ্গে আর বাস করব না?

আমি বললাম, আমাকে কিছু বলে আসতে হবে না। তুমি কথাবার্তা
যথেষ্ট উঁচু গলায় বলছ। খালু শোবার ঘর থেকে পরিষ্কার শুনতে পারছেন।
আশপাশের অ্যাপার্টমেন্টের লোকজনও শুনছে।

তারপরেও তুই বলে আয়।

ঘটনার সূত্রপাত কীভাবে হলো?

তোর খালুকে জিজ্ঞেস কর কীভাবে হলো।

সোফায় বসে যে মেয়ে কাঁদার চেষ্টা করছে, সে কে?

আমার এক বাঙ্কীর মেয়ে। আর্কিটেক্ট। ডিজাইনে গোল্ড মেডেল
পাওয়া মেয়ে। হেজিপেজি কেউ না।

আমি বললাম, গোল্ড মেডালিস্ট কাঁদার চেষ্টা করছে কেন?

তোর খালু সুপার ট্যালেন্টেড এই মেয়েকে পেত্রী বলেছে। বলেছে
পেত্রীটাকে বিদায় করো। তাকে কোনো একটা বাঁশগাছে পা ঝুলিয়ে বসে
থাকতে বলো।

আমি বললাম, ঘটনা যথেষ্ট জটিল রঁজল মনে হচ্ছে। তুমি কড়া করে চা
বানাও। চা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করি, তাঁরপর অ্যাকশান।

চা বানাচ্ছি, তুই তোর খালুকে বলে আয়, আমি তার সঙ্গে এক ছাদের
নিচে বাস করব না।

আমি খালু সাহেবের শোবার ঘরের দিকে (অনিচ্ছায়) রওনা হলাম।
ছুটির দিনের সকালে মাজেদা খালার বাড়িতে আসাটা বোকায়ি হয়েছে।
খালা-খালুর সব ঝগড়া ছুটির দিনের সকালে শুরু হয়। দুপুরের দিকে শেষ
হয়। দুপুরে খালু সাহেব দুটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমান। তবে আজ
মনে হয় ঘুমাবেন না। কিংবা বাসায় ঘুমের ট্যাবলেট নেই।

খালু সাহেব ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন। তাঁর ঠোঁটে
পাইপ। ছুটির দিনে তিনি পাইপ টানেন। তাঁর কোলের ওপর ওরহান পামুকের
বই My name is red। খালু সাহেবের চেহারা শান্ত। বাড়ের কোনো চিহ্নই
নেই। তিনি আমাকে দেখে মিষ্টি গলায় বললেন, কেমন আছ হিমু?

আমি মোটামুটি ঘাবড়ে গেলাম। গত দশ বছরে খালু এমন গলায়
'কেমন আছ হিমু' জিজ্ঞেস করেন নি। আমি তাঁর কাছে কীটপতঙ্গের
কাছাকাছি। আমার ভালো থাকা না-থাকায় তাঁর কিছু আসে যায় না।

খালু সাহেবের মধুর ব্যবহারে হকচকিয়ে গিয়ে বিনীত গলায় বললাম,
আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

খালু সাহেব বললেন, আমি ভালো আছি। ব্রিলিয়ান্ট একটা উপন্যাস
পড়ছি। ওরহান পামুকের। বাংলাদেশের উপন্যাসিকেরা কীসব অখাদ্য
লেখে, তাদের উচিত ওরহান সাহেবের পায়ের কাছে বসে থাকা।

আমি ওই ভদ্রলোকের কিছু পড়ি নি। তারপরেও বললাম, অবশ্যই।
শুধু পায়ের কাছে বসে থাকলে হবে না, মাঝে মাঝে পা চাটতেও হবে।

খালু সাহেব বললেন, বসার ঘরের সোফায় সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটা কি
এখনো আছে, না চলে গেছে?

এখনো আছে।

কাঁদছে নাকি?

না, তবে কাঁদবে কাঁদবে করছে।

খালু সাহেব বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন, এই একটি
মেয়েকে আমি পেঁতু ডেকেছি—তার জন্যে লঙ্ঘিত। তুমি তাকে বলে দিয়ো
যে, আই অ্যাপোলোজাইজ। উপন্যাসে একটা জায়গায় পেঁতুর বর্ণনা
পড়ছিলাম, সেই থেকে পেঁতু মাথায় ধূরাছল। উঙ্গেজনার মুহূর্তে মুখ থেকে
পেঁতু বের হয়েছে। আচ্ছন্ন অবঙ্গিয় ছিলাম।

আমি বললাম, খুবই স্বাভাবিক। মহান লেখা মানুষকে আচ্ছন্ন করবেই।
খালাকেও নিশ্চয়ই এই কারণে বিচ ডেকেছেন। পামুক সাহেবের বইয়ে
মহিলা কুকুরের বর্ণনা পড়েছেন। সব দোষ ওরহান পামুক সাহেবের।

খালু সাহেব শান্ত গলায় বললেন, তোমার খালাকে আমি মন থেকেই
বিচ বলেছি। বাইরের প্রভাবমুক্ত উচ্চারণ।

ও আচ্ছা।

তুমি তোমার খালাকে গিয়ে বলো, সে যেন চলে যায়। আমি এই
বিচের মুখ দেখতে চাই না।

আপনাদের দুঃজনের মধ্যে তাহলে তো আভারস্ট্যান্ডিং হয়েই গেল।
খালা বলেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে এক ছাদের নিচে বাস করবেন না।

সে মুখে বলছে, আসলে যাবে না। নানান যত্নগা করে আমাকে পাগল
বানিয়ে পাবনার পাগলাগারদে পাঠাবে।

আমি বললাম, ঘটনার সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে, একটু কি বলবেন?

খালু' সাহেব বললেন, আমি একটা বই পড়ছি, যথেষ্ট আনন্দ নিয়ে পড়ছি, এখন ঘটনার সূত্রপাত কিংবা মৃত্যুপাত কিছুই বলব না। তুমি তোমার খালাকে এবং পেত্তীটাকে নিয়ে আধাঘষ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়বে। যদি সম্ভব হয় আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দাও। তুমি নিজে বানাবে, বিচটাকে বলবে না।

সব বড় ম্যাজিকের কৌশল যেমন সহজ হয়, সব বড় ঝগড়ার কারণও হয় তুচ্ছ। শেষ পর্যন্ত খালু সাহেবের মুখ থেকেই কারণ জানা গেল। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, চা তুমি বানিয়েছ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। খালু সাহেব বললেন, চুমুক দিয়েই বুঝেছি ওই গুড় ফর নাথিং মহিলা চা-ও বানাতে পারে না। সে শুধু পারে ঝামেলা বাঢ়াতে। আমার বস্তুর ছেলে এসেছে, হার্ডিঙ্গ Ph.D., তোমার খালা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাকে বিয়ে দিবে। মেয়ে একটা জোগাড় করেছে, তুতুরি ফুতুরি কী যেন নাম।

সোফায় যে মেয়ে বসে আছে সে নাকি?

হ্যাঁ সে। আজ সকালে কী হয়েছে শোনো—আরাম করে বই পড়তে বসেছি, ওই মেয়ে গজ ফিতা নিয়ে দেঁকেল মাপামাপি শুরু করেছে। আমি শান্ত গলায় বললাম, কী করছ? সে বেলেল, দেয়াল মাপছি।

আমি বললাম, দেয়াল মাপছি তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কেন? হঠাৎ দেয়াল মাপার প্রয়োজন পড়ল কেন?

সব দেয়াল ভেঙে নতুন ইন্টেরিয়ার হবে। ঘরে আলো-হাওয়া খেলবে।

আমি বললাম, আমার আলো-হাওয়ার দরকার নেই। তোমার যদি দরকার হয় তুমি বাঁশগাছে চড়ে বসে থাকো। পেত্তী কোথাকার!

খালু সাহেব বইয়ে মন দিলেন। বইয়ে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু নিশ্চয়ই পেয়েছেন। নিজের মনেই বললেন, Oh God!

খালা একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করলেন। আমরা তিনজন রাস্তায় নেমে এলাম। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে খালা শোবার ঘরে ঢুকলেন। খালু সাহেবকে বললেন, এই যে যাচ্ছি, আর কিন্তু এ বাড়িতে ঢুকব না। আমার বাবা'র কসম, আমার মা'র কসম।

খালু সাহেব বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন, শুনে আনন্দ পেলাম, Go to hell.

বাড়ির গেট থেকে বের হয়ে আমরা এখন ফুটপাতে। প্রবল উজ্জেব্জনার কারণে খালা স্যান্ডেল না পরে খালি পায়ে বের হয়ে এসেছেন। এবং এই মুহূর্তে তিনি ভয়ঙ্কর কোনো নোংরা জিনিসে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। খালা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, ও হিমু, কিসে পাড়া দিলাম!

আমি বললাম, মনুষ্যবর্জ্য পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ।

মনুষ্যবর্জ্য আবার কী?

সহজ বাংলায় ‘গু’।

খালা কুঁ কুঁ জাতীয় শব্দ করলেন। তুতুরি খিলখিল করে হেসে ফেলল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এই মেয়ের হাসির শব্দে মধুর বিষাদ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—‘কাহারও হাসি ছুরির মতো কাটে। কাহারও হাসি অশ্রজলের মতো।’ হিমু না হয়ে অন্য যে-কেউ হলে আমি এই মেয়ের প্রেমে পড়ে যেতাম। হিমু হয়ে পড়েছি বিপদে। প্রেমে পড়া যাচ্ছে না।

খালা বললেন, দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস নাকি? পা ধোয়ার ব্যবস্থা কর। সাবান আন, পানি আন। সাধারণ সাবানে হবে না, কার্বলিক সাবান আন। সারা শরীর ঘিনঘিন করছে। গোসল করব।

ফুটপাতে তোমাকে গোসল করাব কীভাবে?

গাধা কথা বলিস না, ব্যবস্থা কর।

খালা আবার আর্টিংকার করলেন। তিনি একটু পিছনে ঘুরতে চেয়েছিলেন, নিষিদ্ধ বস্তু তার অন্য পায়েও লেগে গেছে। তিনি চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, কোন হারামজাদা ফুটপাতে হাগে?

মানবপ্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হলো, অন্যের দুর্দশা দেখে আনন্দ পাওয়া। খালাকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড় তৈরি হয়েছে। নানান মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। একজন হাসিমুখে বলল, সিস্টার, গুয়ে পাড়া দিয়ে খাড়ায়ে আছেন কেন? সরে দাঁড়ান।

খালা প্রশ়ঙ্কর্তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি ফেলে আমাকে বললেন, দাঁড়ায়ে মজা দেখছিস কেন? সাবান-পানি নিয়ে আসতে বললাম না!

আমি বললাম, পকেটে একটা ছেঁড়া দুটাকার নোটও নেই। তুতুরি বলল, আমার কাছে টাকা আছে। চলুন যাই।

আমরা রাস্তা পার হলাম। আশপাশে কোনো দোকান দেখতে পাচ্ছি না। একজন চাওয়ালাকে দেখা গেল চা বিক্রি করছে। গরম চা দিয়ে পা

ধোয়া ঠিক হবে কি না তাও বুঝতে পারছি না। আমি তুতুরিকে বললাম, সবচেয়ে ভালো হয় খালাকে ফেলে আমাদের দু'জনের দু'দিকে চলে যাওয়া।

তুতুরি বিশ্বিত গলায় বলল, কেন?

আমি বললাম, খালা পনের-বিশ মিনিট আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। আমাদের ফিরতে না দেখে বাধ্য হয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফেরত যাবেন। খালা-খালুর মিলন হবে। এই মিলনের নাম মধুর মিলন না, গু মিলন।

আপনি তো অস্ত্রুত মানুষ, তবে আপনার কথা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চলুন দু'জন দু'দিকে চলে যাই।

যাওয়ার আগে তোমার পক্ষে কি সম্ভব আমাকে এক কাপ গরম চা খাওয়ানো? চাওয়ালাকে দেখে চা খেতে ইচ্ছে করছে।

তুতুরি ভুরু কুঁচকে বলল, আমাকে হঠাতে তুমি তুমি করে বলছেন কেন?

আমি বললাম, সাত কদম পাশাপাশি হাঁটলেই বস্তুত হয়। আমরা এক শ' কদম হেঁটে ফেলেছি।

আমাকে দয়া করে আপনি করে বলবেন। চা খেতে আপনার কত লাগবে?

পাঁচ টাকা লাগবে। চায়ের সঙ্গে একটা টোস্ট বিস্কুট খাব। একটা কলা খাব। টোস্ট বিস্কুটের দাম দু'টাকা। কলা দু'টাকা। সব মিলিয়ে নটাকা। সকালে নাস্তা না খেয়ে বের হয়েছি।

তুতুরি বলল, আমার কাছে ভাংতি নটাকা নেই। একটা এক হাজার টাকার নোট আছে।

আমি বললাম, নটাকার জন্য কেউ এক হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাবে সে রকম মনে হয় না। তারপরেও চেষ্টা করা যেতে পারে।

আপনার কি চা খেতেই হবে?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। তুতুরি অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। আমি বললাম, এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিলে এক হাজার টাকার ভাংতি পাওয়া যাবে।

তুতুরি বিশ্বিত গলায় বলল, আমি আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিব?

আমাকে না, আমার বসকে। আমার বস হলেন পীর বাচ্চাবাবা
মাজারের খাদেম।

আপনি মাজারে কাজ করেন?

জি। হজুরের পা দাবাই। মাজার ঝাড়পোছ দিয়ে পরিষ্কার করি।
সন্ধ্যাবেলা মোমবাতি-আগরবাতি জুলাই। ভালো কথা, আপনি কি
আমাদের মাজারের জন্য সুন্দর একটা ডিজাইন করে দিতে পারেন? এমন
একটা ডিজাইন হবে যেন মাজারে ঢোকামাত্রই আধ্যাত্মিক ভাব হবে। মন
উদাস হবে। সৃষ্টির অসীম রহস্যের অনুভবে মন বিষণ্ণও হবে।

তুতুরি অবাক হয়ে বলল, আমি পীর বাচ্চাবাবা মাজারের ডিজাইন
করব?

আমি বললাম, আপনারা আর্কিটেক্টরা যদি পেট্রলপাম্পের ডিজাইন
করতে পারেন, মাজারের ডিজাইন করতে অসুবিধা কী? পৃথিবী বিখ্যাত
আর্কিটেক্টরা মাজার ডিজাইন করেছেন।

তুতুরি চোখ সরু করে বলল, কয়েকজনের নাম বলুন।

আমি বললাম, ইশা আফেন্দি।

তুতুরি বলল, আমি আর্কিটেকচারের ছাত্রী। ইশা আফেন্দির নাম প্রথম
শুনলাম।

আমি বললাম, তাজমহল স্মার্ট শাজাহানের স্তুর মাজার ছাড়া কিছু
না। তাজমহলের ডিজাইন করেন ইশা আফেন্দি। তিনি স্মার্টের চোখ
এড়িয়ে গম্ভুজে তাঁর নাম লিখে গেছেন।

তুতুরি বলল, এই তথ্য জানতাম না।

আমি বললাম, অটোমান সাম্রাজ্যে একজন আর্কিটেক্ট ছিলেন, তাঁর নাম
সিনান। এই নাম তো আপনার জানার কথা।

হঁয় জানি। উনার ডিজাইন আমাদের পাঠ্য।

সিনান অনেক মাজারের ডিজাইন করেছেন। এখন বলুন, আপনি কি
আমাদের মাজারের ডিজাইন করে দেবেন?

তুতুরি বলল, আসুন আপনাকে চা খাওয়াচ্ছি, সিগারেটও কিনে দিচ্ছি।
সত্যি কি আপনি মাজারে কাজ করেন? আমি কি আপনার মোবাইল নম্বর
পেতে পারি?

আমার কোনো মোবাইল ফোন নেই। আমার হজুরের নম্বরটা রেখে
দিন। হজুরের নম্বরে টেলিফোন করলেই আমাকে পাবেন, নম্বর দিব?

তুতুরি শান্ত গলায় বলল, দিন।

আমি চা খাচ্ছি, তুতুরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে বিশ্ময় এবং বিরক্তি। বিরক্তির কারণ বুঝতে পারছি, বিশ্ময়ের কারণ বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, চলুন আপনাকে পীর বাচ্চাবাবার মাজার শরিফ দেখিয়ে নিয়ে আসি। বিশেষ কোনো ডিজাইনের আগে আশপাশের স্থাপত্য দেখতে হয়।

তুতুরি বলল, দয়া করে আমাকে উপদেশ দেবেন না।

আমি বললাম, যারা উপদেশ নিতে পছন্দ করে না তারা উপদেশ দিতে পছন্দ করে। আপনি বরং আমাকে একটা উপদেশ দিন।

তুতুরি কঠিন মুখ করে বলল, উপদেশ চাচ্ছেন উপদেশ দিচ্ছি। কোনো মেয়ে আপনাকে চা খাওয়াচ্ছে, তা থেকে ভেবে বসবেন না সে আপনার প্রেমে হাবুড়বু থাচ্ছে। মেয়েরা এত সহজে প্রেমে পড়ে না।

আমি বললাম, আমি এ রকম ভাবছি না। তা ছাড়া খালিপায়ে যে সব ছেলে হাঁটে কোনো মেয়ে তাদের প্রেমে পড়ে না।

তুতুরি অবাক হয়ে বলল, আপনি খালিপায়ে হাঁটেন নাকি? আশ্চর্য তো! আসলেই তো তা-ই। আমি আপেক্ষে কেন লক্ষ করলাম না? খালিপায়ে হাঁটেন কেন?

জুতা নেই, এই কারণে খালি পা।

তুতুরি চোখ পিটিপিট করছে। দ্রুত কিছু ভাবছে। কী ভাবছে অনুমান করতে পারছি। সে আমাকে একজোড়া জুতা কিনে দিতে চাচ্ছে।

আমি চায়ের কাপ নিয়েই দ্রুত স্থান ত্যাগ করলাম। তুতুরির কাছ থেকেও বিদায় নিলাম না। আমার ধারণা, তুতুরি এখন রাগে কিড়মিড় করছে।

আমি তুতুরি

আমি এই মুহূর্তে একটা সাড়ে বত্রিশভাজা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দোকানে সবই পাওয়া যায়। চা বিক্রি হচ্ছে, বিস্কুট-কলা বিক্রি হচ্ছে, পান-সিগারেট বিক্রি হচ্ছে, বাচ্চাদের খেলনা বিক্রি হচ্ছে, এক কোনায় প্যানথারের ছবি আঁকা কনডম সাজানো আছে।

আমার সামনে হিমু নামের একজন চায়ে টোস্ট বিস্কুট ডুবিয়ে থাচ্ছে। চায়ে চুমুক দেওয়ার আগে সে কপ কপ করে বড় একটা সাগরকলা নিমিষে খেয়ে ফেলেছে। চা, টোস্ট বিস্কুট, কলা আমি তাকে কিনে দিয়েছি। এক প্যাকেট বেনসন এন্ড হেজেস সিগারেট তার জন্যে কিনেছি। এই সিগারেট সে নিয়েছে তার বসের জন্যে। এই বস নাকি পীর বাচ্চাবাবা নামের এক মাজারের খাদেম। হিমু সেই খাদেমের খিদমতগার, সহজ বাংলায় চাকর। বিষয়টা আমার কাছে যথেষ্ট খটমটে মনে হচ্ছে। আমি প্রায় নিশ্চিত হিমু আমার সঙ্গে চালবাজি করছে।

পুরুষদের জিনে নিশ্চয়ই চালবাজির বিষয়টা প্রকৃতি চুকিয়ে দিয়েছে। প্রাণীজগতে নারী প্রাণীদের ভোলানোর জন্যে পুরুষ প্রাণীরা নানান কৌশল করে। নাচানাচি করে, ফেরোমেন নামের সুগ্রাম বের করে, নানান বর্ণে শরীর পাল্টায়। মানুষের প্রকৃতিদণ্ড এই সুবিধাগুলো নেই বলে সে চালবাজি করে মেয়েদের ভোলাতে চায়। তাদের প্রধান চেষ্টা থাকে আশপাশের তরুণীদের ভুলিয়ে এবং চমকে দিয়ে তাদের দষ্টি আকর্ষণ করা। হিমু তা-ই করছে। প্রথম সুযোগেই সে আমাকে ‘তুম্হি’ ডাকা শুরু করেছিল, আমি তাকে ‘আপনি’তে ফিরিয়ে দিয়েছি।

স্থাপত্যবিদ্যার কিছু জ্ঞান দিয়ে শুরুতে সে আমাকে খানিকটা চমকে দিয়েছিল। সেই চমক এখন স্বার আমার মধ্যে নেই। এখন আমি নিশ্চিত স্থাপত্যবিদ্যার বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। সে নিশ্চয়ই তার মাজেদা খালার কাছ থেকে আমার কথা শুনেছে। শোনার কথা। কারণ, এই বুদ্ধিহীনা রমণীর স্বভাব হচ্ছে বকরবকর করা। মহিলা আগ বাড়িয়ে অবশ্যই হিমুকে নানান গল্প করেছেন। হিমু ইন্টারনেটে ঘেঁটে কিছু তথ্য জেনে এসেছে আমাকে চমকে দেওয়ার জন্যে। ইন্টারনেটের কল্যাণে মূর্খরাও এখন সবজাতার মতো কথা বলে। স্থপতি সিনানের কথা গাধা হিমুর জানার কথা না।

সে মাজারের খাদেমের সেবায়েত—এই তথ্যও আমাকে দিয়েছে চমকানোর জন্যে। সে আমাকে মাজারের একটা ডিজাইন করতে বলবে— এটা আগেই ঠিক করে রেখেছে। আমি কিছুটা হলেও তার ফাঁদে পড়েছি। কারণ, সে মাজারে চাকরি করে এটা বিশ্বাস করেছি। বোকা মেয়েরা এইভাবে ফাঁদে পড়ে এবং একসময় ফাঁদ থেকে বের হতে পারে না।

আমার কলেজ জীবনের এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী শর্মিলা এমন একজনের ফাঁদে পড়েছিল। যিনি ফাঁদ পেতেছিলেন, তিনি আমাদের অংক স্যার জহির

খন্দকার। জহির খন্দকার সুপুরূষ ছিলেন না, কিন্তু সুকথক ছিলেন। অংক ভালো শেখাতেন। অংকের সঙ্গে সঙ্গে অস্তৃত অস্তৃত গল্প করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ির পুরুরে নাকি একটা মাছ আছে, সেই মাছের মুখ দেখতে অবিকল মানুষের মতো। স্যার বললেন, তোমরা কেউ দেখতে আগ্রহী হলে আমার সঙ্গে যেতে পারো। আমরা সবাই বললাম, স্যার দেখতে চাই দেখতে চাই। মুখে বলা পর্যন্তই, স্যারের বাড়ি বরিশালের এক গ্রামে। সেখানে গিয়ে মানুষের মতো মাছ দেখার প্রশ্ন ওঠে না।

শর্মিলা আলাদাভাবে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করল এবং কাউকে কিছু না জানিয়ে মানুষের মতো মাছ দেখতে গেল। সে সাত-আট দিন স্যারের সঙ্গে থেকে ফিরে এল, তার পরপরই ইন্টারনেটে তার যৌনকর্মের ভিডিও চলে এল। ভিডিওতে তার পুরুষসঙ্গী যে জহির স্যার তা বোঝা যায় না। কারণ পুরুষসঙ্গী সচেতনভাবেই অঙ্ককারে নিজের চেহারা আড়াল করেছিল।

শর্মিলা দুই ফাইল ডরমিকাম খেয়ে আত্মহত্যা করে। দুই ফাইলের কথা আমি জানি, কারণ ডরমিকাম কেনার সময় আমি তার সঙ্গে ছিলাম। রাতে ঘুম হয় না বলে এতগুলো ডরমিকাম সে কিনেছিল। স্যারের সঙ্গে তার কী কী হয়েছিল শর্মিলা সবই আমাকে জানিয়েছিল। স্যারের এক বন্ধুও যুক্ত ছিল। সেই বন্ধুর চোখ কটা এবং খুতনিতে একটা দাগ। বন্ধুর নাম পরিমল এবং তার বন্ধু পরিমল নিচয়ই আরও অনেক বেকুব মেয়েকে মানুষের মতো দেখতে সেই অস্তৃত মাছ দেখিয়েছেন। তিনি একটা কোচিং সেন্টারও উরু করেছেন। কোচিং সেন্টারের নাম ‘ম্যাথ হাউজ’। ম্যাথ হাউজে মেয়ের সংখ্যাই বেশি। স্যারের জন্যে সুবিধাই হয়েছে।

কোচিং সেন্টারে আমি একদিন জহির স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করলেন। শর্মিলার মৃত্যুসংবাদ শুনে ব্যথিত গলায় বললেন, আহারে, কীভাবে মারা গেল! ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা গেছে শুনে তিনি হতাশ গলায় বললেন, মেয়েগুলো এত বোকা কেন? মৃত্যু কোনো সলিউশন হলো! লাইফকে ফেস করতে হয়।

আমি বললাম, স্যার, শর্মিলার খুব ইচ্ছা ছিল আপনার গ্রামের বাড়ির পুরুরের মাছটা দেখতে, যেটার মুখ দেখতে মানুষের মতো।

স্যার বললেন, এই শখ ছিল জানতাম না তো! জানলে নিয়ে যেতাম।

আমি বললাম, আমাকে কি নিয়ে যাবেন স্যার? আমারও খুব শখ। আমি বন্ধুর হয়ে তার শখ মিটাব।

স্যার বললেন, সত্যি যেতে চাও?

আমি বললাম, অবশ্যই। তবে গোপনে যাব স্যার। জানাজানি যেন না হয়। আমাদের দেশের মানুষ তো খারাপ, আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, শিক্ষক পিতৃত্বে, তারপরেও নানান কথা উঠবে।

স্যার বললেন, তোমার টেলিফোন নম্বর রেখে যাও, ব্যবস্থা করতে পারলে খবর দিব। কোচিং সেন্টার নিয়ে এমন ঝামেলায় আছি, সময় বের করাই সমস্যা।

কষ্ট করে একটু সময় বের করবেন স্যার প্লিজ।

স্যার বললেন, একটা কাজ করা যায়, বাই রোডে বরিশাল যাওয়া যায়। একটা রিকভিশন গাড়ি কিনেছি, সকাল সকাল রওনা দিলে রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে পৌছে যাব। এক রাত থেকে পরদিন চলে এলাম, ঠিক আছে? ওই বাড়িতে আমার মা থাকেন। তুমি রাতে মা'র সঙ্গে ঘুমালে।

আমি বললাম, এক রাত কেন! আমি কয়েক রাত থাকব। কত দিন গ্রামে যাই না। বরিশাল হচ্ছে জীবনানন্দ দাশের প্রিয় ভূমি, ভাবতেই কেমন লাগছে!

স্যার বললেন, তোমരা শহরের মেঝেরা গ্রাম থেকে দূরে সরে গেছ, এটা একটা আফসোস। গ্রামে যেতে হয়। ফার ফ্রম দ্যা মেডিং ক্রাউড। আমার এক বন্ধু আছে, নাম পরিমল। একটা কোচিং সেন্টারে অংক পড়ায়। পনের দিনে একবার সে গ্রামে যাবেই।

আমি বললাম, হাউ সুইট!

স্যার বললেন, পরিমল ট্যালেন্টেড ছেলে। বাংলা একাডেমী থেকে তার বই বের হচ্ছে—বাংলার ঐতিহ্য সিরিজের বই। একটার কস্পোজ চলছে, সে প্রক্ষ দেখছে। আরেকটার পাঞ্জুলিপি জমা পড়েছে।

বলেন কী স্যার!

তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। কথা বললে তোমার ভালো লাগবে। তার মাথায় নতুন আইডিয়া এসেছে—ঢাকার মাজার। এই নিয়ে বই লিখছে। তার ইচ্ছা মুনতাসির মামুন সাহেবের সঙ্গে কলাবরশনে বইটা করা। মামুন সাহেব রাজি হচ্ছেন না।

রাজি হচ্ছেন না কেন?

নিজেকে বিরাট ইন্টেলেকচুয়াল ভাবেন তো, এইজন্যে রাজি হচ্ছেন না। খ্যাতি শেয়ার করতে চান না। যাই হোক, ঢাকার মাজার সম্পর্কে তুমি

যদি কিছু জানো তাহলে পরিমলকে জানিয়ো, সে খুশি হবে। তোমার নামও বইয়ে চলে আসতে পারে।

আমি বললাম, তাহলে তো স্যার খুবই ভালো হয়। আপনার সঙ্গে কথা বলে এত ভালো লাগছে। এখন যাই।

যাও। খুব ভালো লাগল তোমার সঙ্গে কথা বলে। খুব শিগগিরই একটা তারিখ করব। আমি, তুমি আর পরিমল।

স্যার কয়েকবার তারিখ ফেলেছেন, আমি নানা অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়েছি। তবে আমি যাব—শয়তানটাকে শিক্ষা দিব। আমার বিশেষ পরিকল্পনা আছে। আচ্ছা হিমুটাকে কি সঙ্গী করা যায়? পরিকল্পনা আমার, বাস্তবায়ন করবে হিমু।

শুধু শয়তানটাকে না, আমার সব পুরুষ মানুষকেই শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে। কারণ সব পুরুষের ভেতরই শয়তান থাকে। ছোট শয়তান, মাঝারি শয়তান, বড় শয়তান। চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। যে যত বড় শয়তান, তার চেহারা ততটাই ‘ভাজা মাছ’ উল্টে খেতে পারি না’-টাইপ। মেয়েদের প্রতি মনোভাব একজন বিকল্পওয়ালার যা, জহির খন্দকারেরও তা, হার্ডের ফিজিঙ্গের Ph.D.-রও তা। পদার্থবিদ্যার মাথা স্বয়ং আইনস্টাইনের একটি জারজ স্টেয়ে ছিল। মেয়ের নাম লিসারেল, তার মা’র নাম ম্যারিক। যেখানে স্বয়ং আইনস্টাইনের এই অবস্থা, সেখানে হার্ডের Ph.D. কী হবে বোঝাই যায়।

এই Ph.D.-ওয়ালার সঙ্গে আমার দেখা হয় আমার মায়ের স্কুল জীবনের বদ্ধ মাজেদা খালার বাসায়। Ph.D.-ওয়ালার চেহারা ‘ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারি না’ টাইপ। তিনি আমাকে বললেন, খুকি, তোমার নাম কী?

তরুণী মেয়েকে বয়স্করা ইচ্ছা করে খুকি ডাকে। খুশি করার চেষ্টা। আমি বললাম, তুতুরি।

তিনি চোখ বড় বড় করে কয়েকবার বললেন, তুতুরি! তুতুরি! নাম নিয়ে বাজনা বাজালেন। তারপর বললেন, নামের অর্থ কী?

আমি বললাম, অর্থ জানি না।

আমি তাকে মিথ্যা কথা বললাম। নামের অর্থ কেন জানব না! অর্থ অবশ্যই জানি। তুতুরি আমার নিজের দেওয়া নাম। ডিকশনারি দেখে বের

করেছি। এর অর্থ সাপুড়ের বাঁশি। বাঁশি বাজলেই সাপ ফণা তুলে নাচবে।
পুরুষ নামধারী সাপ নাচাতে আমার ইচ্ছে করে।

Ph.D.-ওয়ালা আমি নামের অর্থ জানি না শুনে বিচলিত হয়ে গেলেন
বলে মনে হলো। তিনি বললেন, যিনি নাম রেখেছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন।
তোমার বাবা কিংবা মা।

আমি বললাম, তারা দু'জনই মারা গেছেন, আমার বয়স যখন সাত
তখন। তাদের নামের অর্থ জিজেস করা হয় নি।

উনি আরও বিচলিত হলেন এবং বললেন, আমি নামের অর্থ বের করার
চেষ্টা করব। তুমি আমার হোটেলের নম্বরে টেলিফোন করে জেনে নিয়ো।

এইবার থলের বিড়াল বের হতে শুরু করেছে। ‘হোটেলে টেলিফোন
করে জেনে নিয়ো’ দিয়ে থলের মুখ খোলা হলো। এরপর বলবে, হোটেল
চলে এসো, গল্প করব। তারপর একদিন বলবে, জানো আজ আমার
জন্মদিন। তুমি আজ রাত থেকে যাও, সারা রাত গল্প করব।

আমি একদিন পরই হোটেলে টেলিফোন করে বললাম, আমি তুতুরি।
তিনি বললেন, তুতুরি কে?

এটা এক ধরনের খেলা। ভাবটা একইরকম যেন নামও ভুলে গেছি।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে মিসেস মাজেদার বাসায় দেখা হয়েছিল।
আপনি আমার নামের অর্থ জানতে চাইলেন, অর্থ বলতে পারলাম না।

ও আচ্ছা আচ্ছা। তুমি হলে ডিজাইনে গোল্ড মেডেল পাওয়া
আর্কিটেক্ট। আমি তোমার নামের অর্থ বের করেছি। অর্থ হলো সাপুড়ের
বাঁশি।

আমি বললাম, কী ভয়ঙ্কর!

উনি বললেন, ভয়ঙ্কর কিছু না। সুন্দর নাম। তোমার নাম থেকে আমি
একটা আইডিয়া পেয়েছি, এটা শুনলে তোমার ভালো লাগবে। শুনতে চাও?

আমি উৎসাহে চিঢ়বিড় করছি এমন ভঙ্গিতে বললাম, অবশ্যই শুনতে
চাই স্যার। (আমার নাম থেকে আইডিয়া পেয়েছে। বিরাট আইডিয়াবাজ
চলে এসেছেন। আইডিয়া তো একটাই—মেয়ে পটানো আইডিয়া।)

উনি বললেন, তুতুরির সঙ্গে মিল রেখে নতুন একটা শব্দ মাথায় এল।
ফুতুরি। আমি ভাবলাম শব্দটা বাংলা ভাষায় চুকিয়ে দিলে কেমন হয়।
ফুতুরি হবে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয় এমন সব বাদ্যযন্ত্রের ‘কমন নেম’। আমি
বাংলা একাডেমীর ডিজিকে এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখলাম।

আমি অবাক হওয়ার মতো করে বললাম, ডিজি সাহেব কি চিঠির জবাব দিয়েছেন?

না। তবে উনি টেলিফোন করেছিলেন। উনি বলেছেন, নতুন এই শব্দটা কাউন্সিল মিটিংয়ে তোলা হবে। কাউন্সিল পাস করলে বাংলা ভাষায় একটা নতুন শব্দ মুক্ত হবে।

আমি আনন্দে লাফাচ্ছি এমন ভঙ্গি করে বললাম, স্যার বলেন কী, বাংলা ভাষায় আপনার একটা শব্দ চলে আসছে! মনে মনে বললাম, আষাঢ়ে গল্প বলার জায়গা পাও নি? বাংলা একাডেমীর ডিজি শিশি থান? তুমি নতুন শব্দ দেবে আর বাংলা একাডেমীর ডিজি তা নিয়ে নিবেন! তাহলে আমি বাদ যাব কেন? আমি একটা শব্দ দেই ‘বৃত্তরি’। বৃত্তরি হলো বদপুরুষ।

বাসায় ফেরার পথে ভাবলাম মাজেদা নামের বোকা মহিলার অবস্থাটা দেখে যাই, সে কি এখনো হাণুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে? থাকলেই ভালো হয়, উচিত শিক্ষা। এই মহিলার কারণে তার স্বামী আমাকে পেঁতু বলার স্পর্ধা দেখিয়েছে, বাঁশগাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে বলেছে। মাজেদা নামের এই মহিলার উচিত সারা জীবন হাণুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা।

মাজেদা বেগম

আমি অনেক বদ ছেলে দেখেছি, হিমুর মতো বদ এখনো দেখি নাই। ভবিষ্যতে কোনোদিন দেখব তাও মনে হয় না। আরে তুই দেখেছিস আমি হাণুর উপর দাঁড়িয়ে আছি। সাবান-পানি আনতে গিয়ে উধাও হয়ে গেলি? মেয়েটা তার সঙ্গে গেছে, আমি নিশ্চিত এখন হিমুর পিছনে পিছনে মেয়ে ঘূরছে। হিমু তাকে জানু করে ফেলেছে।

হিমুর কাজই হলো জানু করা। আমাকেও জানু করেছে। জানু না করলে তাকে আমি প্রশ্ন দেই? রাজে্যের ধূলাবালি মেঝে পথে পথে হাঁটে। এই নোংরা পা নিয়ে আমার ঘরে ঢোকে। আমি তো কখনো বলি না, যা বাথরুম থেকে পা ধুয়ে আয়। বরং বলি, নাশতা খেয়ে এসেছিস? যা খাবার টেবিলে বোস। কী খাবি বল। দুধ-কলা দিয়ে পুষলেও কালসাপ কালসাপই থাকে।

আচ্ছা, বাংলাদেশের মানুষদের কি কাজকর্ম নাই? তোরা আমার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? একজন নোংরার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—এটা দেখার কিছু আছে? তোরা কি জীবনে হাণু দেখস নাই? প্রতিদিনই তো বাথরুমে যাস। নিজের হাণু দেখস না? ঠিক আছে দাঁড়িয়ে

আছিস দাঁড়িয়ে থাক । চুপচাপ থাক । নানান রঙের কথা বলার দরকার কী? একজন চোখ-মুখ শুকনা করে পাশের জনকে বলল, ‘খালাম্মা! কাঁচাগু’র উপরে খাড়ায়া আছেন।’ আরে বদের বাচ্চা, কাঁচা গু পাকা গু আবার কী? থাপড়ানো দরকার ।

আমি দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। হিমুর দেখা নাই, তুতুরিরও দেখা নাই। আমি এখন কী করব? শরীর উল্টিয়ে বমি আসছে। বমি করলে আমার চারপাশের পাবলিকের সুবিধা হয়। তারা মজা পায়। বাংলাদেশের মানুষদের মজার খুব অভাব ।

যখন বুবলাম বদ হিমু ফিরবে না, তখন লজ্জা-অপমান ভুলে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। গোপনে বাথরুমে চুকব। গোপনে বের হয়ে আসব। মনে মনে বলছি, হে আল্লাহপাক, মানুষটার সঙ্গে যেন দেখা না হয়। দরজা যেন খোলা পাই। যদি দেখি দরজা খোলা, যদি মানুষটার সঙ্গে দেখা না করে বের হয়ে আসতে পারি তাহলে একটা মুরগি ছদ্ম দিব। তিনজন ফকির খাওয়াব ।

দরজা খোলা ছিল, ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখি, মানুষটা ইঞ্জিচেয়ারে কাত হয়ে আছে। গড়গড় শব্দ হচ্ছে। হাঁট অ্যাটাক নাকি? আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে? সে জবাব দিতে পারল না, গোঙানির মতো শব্দ করল। তার সারা শরীর ঘামে ভেজা মাথায় হাত দিয়ে দেখি মাথা বরফের মতো ঠাণ্ডা ।

আমি তাকে কীভাবে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম তা বলতে পারব না। মহাবিপদের সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়। মোবাইল ফোন খুঁজে পাওয়া যায় না, হাসপাতালের টেলিফোন নম্বর যে খাতায় লেখা সেই খাতা খুঁজে পাওয়া যায় না, ঘরে তখনই শুধু ক্যাশ টাকা থাকে না, ড্রাইভার বাসায় থাকে না, আর থাকলেও গাড়ি স্টার্ট নেয় না। গাড়ির চাবি লক হয়ে যায়।

হাসপাতালে ডাক্তাররা যমে-মানুষে টানাটানির মতোই করল। নতুন নতুন ওষুধপত্র বের হওয়ায় যমের শক্তি কমে গেছে। একসময় ডাক্তার বলল, মনে হয় বিপদ কেটে গেছে। ম্যাসিভ হার্টঅ্যাটাক হয়ে গেছে। আর দশ মিনিট দেরি হলে রোগী বাঁচানো দুঃসাধ্য ছিল। আপনার হাজব্যান্ড ভাগ্যবান মানুষ। হেপারিন নামের ড্রাগটা খুব কাজ করেছে।

হঠাৎ মনে হলো, হিমু সাবান-পানি নিয়ে আসে নাই বলে মানুষটা বেঁচে গেল। হিমু কি কাজটা জেনে শুনে করেছে? ফুটপাতে কাঁচা গুয়ে পাড়া না

পড়লে আমি চলে যেতাম। মানুষটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে পড়ে থাকত। মানুষটার বেঁচে থাকার পেছনে ফুটপাতের হাগুরও বিরাট ভূমিকা। এই দুনিয়ার অস্তুত হিসাব-নিকাশ। কী থেকে কী হয় কে জানে।

আমি সিসিইউ-র সামনের বেঞ্চিতে বসা। রাত তিনটার উপর বাজে। ডাক্তার এসে বলল, আপনার হাজব্যান্ডের জ্ঞান ফিরেছে। আপনার সঙে কথা বলতে চাচ্ছে।

আমি মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছি। মানুষটা এমন অস্তুত চোখে তাকাচ্ছে। কী যে যায়া লাগছে! সে ক্ষীণ গলায় বলল, মাজেদা, ভালো আছ?

আমি বললাম, আমি যে ভালো আছি তা তো দেখতেই পারছ। তুমি কেমন আছ?

সে বলল, বুকের ব্যাথাটা নাই।

আমি বললাম, কথা বলতে হবে না। চোখ বন্ধ করে ঘুমাও।

সে বলল, মরে টুরে যদি যাই, একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি এটা জানো না। যে অ্যাপার্টমেন্টে আমারা থাকি, সেটা তোমার নামে কেনা। উত্তরাতে আমার আরেকটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সেটাও তোমার নামে কেনা। তোমাকে বলা হয় নাই, সরি।

এখন চুপ করো তো। শুনলাম।

সে বলল, তোমার অ্যাপার্টমেন্টে দেয়াল টেয়াল ভেঙে কী করতে চাও করবে। আমার বলার কিছু নাই। ওই মেয়ে তুতুরি না কী যেন নাম তাকে কাজ শুরু করতে বলো।

তোমার শরীর কি এখন যথেষ্ট ভালো বোধ হচ্ছে?

হঁ। শুধু শ্বেল সেঙ্গে সমস্যা হয়েছে। তুমি যে সেন্ট মাখো তার গন্ধ পাচ্ছি না। তোমার গা থেকে কঠিন গুয়ের গন্ধ পাচ্ছি।

মানুষটার কথা শুনে মনে পড়ল, আমি নোংরা পায়েই ছোটাছুটি করছি। এখন পর্যন্ত পা ধোয়া হয় নি।

আমার ইচ্ছা ছিল সারা রাতই মানুষটার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা, সম্ভব হলো না। আমাকে বের করে দিল।

বারান্দায় এসে দেখি হিমু বদটা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে নতুন কেনা গায়ছা, লাইফবয় সাবান, একটা স্যাভলন। হিমু বলল, পা নিশ্চয়ই এখনো পরিষ্কার হয় নি। তোমার গা থেকে খোলা পায়খানার গন্ধ আসছে।

আমি বললাম, তুই জীবনে কখনো কোনোদিনও এক সেকেত্তের জন্যে
আমার সামনে পড়বি না। তোকে আমি ত্যাজ্য করলাম।

হিমু নির্বিকার গলায় বলল, খালু সাহেবের অবস্থা কী আগে বলো। সে
কি স্টেবল?

আমি বললাম, আমার সঙ্গে কোনো কথা বলবি না। চুপ হারামজাদা।

হিমু হেসে ফেলল। আচ্ছা, একজন পুরুষমানুষ এত সুন্দর করে
কীভাবে হাসে? আমার বলতে ইচ্ছা করছে, কাছে আয়। মাথায় চুম্ব দিয়ে
আদর করে দেই। তা না বলে বললাম, Go to hell! আমার স্বামীর কাছ
থেকে শোনা বাক্য।

হিমু আবারও আগের মতোই সুন্দর করে হাসল।

বল্টু স্যারের ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ভেতরে কী হচ্ছে
বাইরে থেকে উকি দিয়ে দেখা যায়। আমি উকি দিতেই বল্টু স্যার বললেন,
হিমু, প্রিজ গেট ইন।

স্যার যেভাবে বসে আছে, আমাকে তাঁর দেখার কথা না। তাঁর সামনে
আয়নাও নেই যে আয়নায় আফ্টেক দেখবেন। সব মানুষই কিছু রহস্য নিয়ে
জন্মায়।

আমি ঘরে ঢুকতেই স্যার বললেন, গত রাতে অকল্পনীয় এক ঝামেলা
গেছে। কী হয়েছে মন দিয়ে শোনো। ঘুমুতে গেছি রাত দশটা একুশ
মিনিটে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম আমি ইলেক্ট্রন হয়ে
গেছি।

কী হয়ে গেছেন?

ইলেক্ট্রন। ইলেক্ট্রন চেনো না?

চিনি।

ইলেক্ট্রন হয়ে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘূরপাক খাচ্ছি।

আমি বললাম, আপনার তো তাহলে ভয়ঙ্কর অবস্থা।

বল্টুভাই বললেন, ভয়ঙ্কর অবস্থা তো বটেই। তবে আমি কণা হিসেবে
ছিলাম না, তরঙ্গ হিসেবে ছিলাম।

ইলেক্ট্রন হওয়ার পর আপনার ঘুম ভাঙল?

না, আমি সারা রাত ইলেকট্রন হিসেবেই ছিলাম। এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করেছি। বর্ণনা করার বাইরের অবস্থা। কখনো যে বিছানায় শয়ে ছিলাম তার খাটে ঢুকে যাচ্ছি। একবার আয়নায় ঢুকে নিজের মিরর ইমেজ দেখলাম।

বলেন কী? অদ্ভুত তো।

অদ্ভুতেরও অদ্ভুত। আমি নতুন নতুন জায়গায় যাচ্ছি, আর মুখে বলছি অনিকেত।

অনিকেত আবার কী?

বাংলা শব্দ। ডিকশনারি ছিঁড়ে ফেলেছি বলে মানে জানতে পারছি না।

আমি আনন্দিত ভঙ্গিতে বললাম, ইলেকট্রন বাংলা ভাষায় কথা বলে জেনে ভালো লাগছে। যাই হোক, স্যার কি সকালের নাশতা খেয়েছেন?

এক মগ ব্ল্যাক কফি খেয়েছি। ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে আমি চিন্তায় অন্ধির। ব্রেকফাস্ট করব কী!

আমি বললাম, যে যে লাইনে থাকে তার স্বপ্নগুলো সেই লাইনেই হয়। মাছ যে বিক্রি করে, তার বেশির ভাগ স্বপ্ন হয় মাছ নিয়ে। রুই মাছ, পুঁটি মাছ, বোয়াল মাছ। আপনি ইলেকট্রন প্রোটন নিয়ে আছেন, এইজন্য ইলেকট্রন প্রোটন স্বপ্ন দেখছেন।

বোকার মতো কথা বলবে আহমু। আমি ইলেকট্রন প্রোটন স্বপ্নে দেখছি না। আমি ইলেকট্রন হ্যায় যাচ্ছি। মাছওয়ালা কখনোই স্বপ্নে দেখে না সে একটা বোয়াল মাছ হয়ে গেছে। বলো সে দেখে?

সেই সম্ভাবনা অবশ্যি কম।

ইলেকট্রন হয়ে যাওয়া যে কী ভয়াবহ তা তুমি বুঝতেই পারছ না। চিন্তা করতে পারো, আমি একটা ওয়েভ ফাংশান হয়ে গেছি! ওয়েভ ফাংশান কী জানো?

জি-না স্যার।

কাগজ-কলম আনো, চেষ্টা করে দেখি তোমাকে বোঝাতে পারি কি না।

জটিল অংক আমার মাথায় ঢুকবে না স্যার।

বোকার মতো কথা বলবে না। অংক মোটেই জটিল কিছু না। অংক খুবই সহজ। অংকের পেছনের কিছু ধারণা জটিল।

পরবর্তী আধা ঘণ্টা আমি অনেক রকম অংক দেখলাম। স্যার খাতায় অনেক আঁকিবুকি করে একসময় নিজের অংকে নিজেই অবাক হয়ে বললেন, এটা কী?

আমি বললাম, কোনটা কী?

স্যার জবাব দিলেন না। নিজের অংকের দিকে হা করে তাকিয়ে
রইলেন। তিনি এতক্ষণ আমাকে অংক বোঝাচ্ছিলেন না। নিজেকেই
বোঝাচ্ছিলেন। আমি বললাম, স্যার, আপনার মাথার গিট্টু আঙ্কা গিট্টুর রূপ
নিচে। চলুন গিট্টু ছুটানোর ব্যবস্থা করি। কেরামত চাচার কাছে যাবেন?

স্যার লেখা থেকে চোখ না তুলে বললেন, কার কাছে যাব?

কেরামত চাচার কাছে। উনি হাসি-তামাশা করে আপনার মাথার গিট্টু
ছুটিয়ে দিবেন। আপনাকে তাঁর কথা আগেও বলেছি।

স্যার বললেন, আমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি। এখন আমাকে
বিরক্ত করবে না।

জি আচ্ছা স্যার।

চুপ করে বসে থাকো, নড়বে না।

আমি চুপ করে বসে আছি। স্যারের হাতে কলম। তিনি কলম দিয়ে
কিছু লিখতে যাচ্ছেন, আবার না লিখে কলম হাতে সরে আসছেন। আমি
মোটামুটি মুক্ষ হয়েই তার কলম ওঠানামা দেখেছি।

হিমু, তুমি অধ্যাপক ফাইনম্যানের মাঝ শুনেছ?

জি-না স্যার।

তিনি ইলেকট্রন নিয়ে ডিরাক (Dirac)-এর মূল কাজ পরীক্ষা করতে
গিয়ে অস্তৃত একটা বিষয় দেখতে পান। তিনি ডিরাকের সমীকরণে সময়ের
প্রবাহ উল্টো করে দেখলেন, সমীকরণ যে রূপ নেয় ইলেকট্রনের চার্জ উল্টো
দিলেও একই রূপ নেয়। অস্তৃত না?

আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই অস্তৃত।

আমি বলব কেন? প্রফেসর ফাইনম্যান নিজেই বলেছেন অস্তৃত।

জি জি বুঝতে পারছি।

কেন অস্তৃত সেটা বুঝতে পারছ?

জি-না স্যার।

অস্তৃত, কারণ এই সমীকরণের সমাধান বলছে ইলেকট্রন সময়ের
উল্টোদিকে চলে যাচ্ছে।

স্যার বলেন কী?

তুমি ‘স্যার বলেন কী’ বলে যেভাবে চি�ৎকার করলে, তা থেকে পরিকার
বুঝতে পারছি, তুমি কিছুই বুঝতে পারো নি। অবশ্যি তোমাকে দোষ দিচ্ছি

না। অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয় বোঝা যায় না। তুমি কি আমার একটা উপকার করবে?

অবশ্যই করব।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তুতুরি নামের একটা মেয়ের কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার এখানে আসার কথা। সে যেন আসতে না পারে।

আমি বললাম, দরজা বন্ধ করে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেই—Don't Disturb.

আমার ক্লিস্টোফোবিয়া আছে। সব সময় দরজা-জানালা কিছুটা খোলা রাখি। মূল দরজা বন্ধ করা যাবে না। কামের টেলিফোন লাইনটা কেটে দাও। জটিল সময়ে টেলিফোন বেজে উঠলে সব এলোমেলো হয়ে যাবে।

আমি দরজার বাইরে। তুতুরির অপেক্ষা করছি। দরজার ফাঁক দিয়ে স্যারের দিকেও নজর রাখছি। স্যার কলম হাতে ওঠানামা করেই যাচ্ছেন। কলম এখনো কাগজ স্পর্শ করে নি। কে জানে কখন করবে! দেখা যাবে সারা দিন ওঠানামা করে তিনি রাতে ঘুমুতে গিয়ে আবার ইলেকট্রন হয়ে যাবেন। ইলেকট্রন হয়ে সময়ের উল্টোদিকে চলে যাবেন।

তুতুরি দরজার বাইরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই অবাক হলো। বল্টু স্যারের সঙ্গে আমার স্মল্পর্কের বিষয়টা সে মনে হয় জানে না। তুতুরি বলল, আপনি এখানে কী করছেন?

আমি বললাম, যা বলার ফিসফিস করে বলুন। গলা উঁচিয়ে কথা বলা নিষেধ।

কার নিষেধ?

স্যারের নিষেধ। স্যার কাল রাতে ইলেকট্রন হয়ে গিয়েছিলেন, এখন অবশ্যি স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন। তবে কতক্ষণ স্বাভাবিক থাকেন কে জানে! হয়তো আবার ইলেকট্রন হয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে সময়ের বিপরীত দিকে চলে যাবেন। সময়ের বিপরীতে যাওয়া স্যারের জন্যে সুখকর না হওয়ার কথা।

তুতুরি চোখ কপালে তুলে বলল, হড়বড় করে কী বলছেন? যা বলার পরিষ্কার করে বলুন।

আমি বললাম, বিজ্ঞানের জটিল কথা তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারব না। চলুন কোথাও বসে চা খেতে খেতে বলি। এক হাজার টাকার নোট কি আপনার কাছে আরও আছে?

তুতুরি বেশ কিছু সময় আমার চোখে চোখ রেখে একসময় বলল,
আছে।

আমি এবং তুতুরি রাস্তার পাশের চায়ের দোকানের সামনে। আমাদের
একটা টুল দেওয়া হয়েছে। টুলটা লম্বায় খাটো। দুজনের বসতে সমস্যা
হচ্ছে। গায়ের সঙ্গে গা লেগে যাচ্ছে। তুতুরির অস্বস্তি দেখে আমি চায়ের
কাপ হাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। তুতুরির দিকে তাকিয়ে বললাম, আরাম করে
বসো।

তুতুরি বলল, আপনি আবার তুমি বলা শুরু করেছেন।

আমি বললাম, সরি। আপনি-তুমি চক্র ভুলে গিয়েছিলাম। আর ভুল
হবে না।

তুতুরি বলল, আপনি কি আপনার মাজেদা খালার খোঁজ নিয়েছিলেন?

নিয়েছিলাম। তার সঙ্গে কথাবার্তা হয় নি। তিনি আমাকে ত্যাজ্য
করেছেন। ত্যাজ্য করেই ক্ষান্ত হন নি, আমাকে হারামজাদাও বলেছেন।

আপনি মনে হয় তাতে খুশি।

হঁয়া খুশি।

কেন খুশি তা কি জানতে পারি?

আমি দাশনিকের ভঙ্গিতে বললাম, একজন মানুষের অনেক পরিচয়
থাকে। মানুষ নিজেও সব পরিচয় সম্পর্কে জানে না। যে যত বেশি জানে
ততই তার জন্যে মঙ্গল। আমার মধ্যে একজন হারামজাদাও আছেন, এটা
জেনে ভালো লাগছে।

হারামজাদা ছাড়া আপনার ভেতর আর কী আছে?

সেটা আমার বলা ঠিক হবে না। আমার আশপাশে যারা আছে তারা
বলবে।

তুতুরি বলল, আমি আপনার বিষয়ে মাজেদা খালার কাছে জানতে
চেয়েছিলাম।

কী বলেছেন?

আপনার খালার ধারণা আপনি অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে
এসেছেন।

ভুঁয়া কথা।

তুতুরি বলল, আমি জানি ভুঁয়া কথা। মানুষ কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে আসে না। দুষ্টুমি করার ক্ষমতা নিয়ে আসে। কুকর্ম করার ক্ষমতা নিয়ে আসে। আপনি নিশ্চয়ই অনেক কুকর্ম করেছেন।

আমি বললাম, এখনো করি নি, তবে করব। একজনকে জন্মের শিক্ষা দেব, সেটা তো কুকর্মের মতোই।

কাকে শিক্ষা দেবেন?

আপনার পরিচিত একজনকে।

তুতুরি অবাক হয়ে বলল, সে কে?

এখনো বুঝতে পারছি না সে কে। ভাসা ভাসা ভাবে মনে হচ্ছে, সে তোমার অংকের শিক্ষক। সরি, তুমি বলে ফেলেছি।

তুতুরি বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, আমার এই শিক্ষকের কথা আপনাকে কে বলেছে? নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ বলেছে। আপনি অলৌকিক ক্ষমতায় বিষয়টা জেনেছেন—এটা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না।

আমি বললাম, খামাখা কেন বিশ্বাস করবে? পৃথিবী অবিশ্বাসীদের জন্যে উভয় বাসস্থান। তুমি বরং এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দাও হজুরের জন্য, নিয়ে চলে যাই।

তুতুরি বলল, সিগারেট আমি আপনাকে কিনে দিচ্ছি, তার আগে প্লিজ বলুন, কোথেকে জেনেছেন? কে বলেছে আপনাকে?

তুমি বলেছ।

আমি কখন বললাম?

মনে মনে বলেছ। আমি মনে মনে বলা কথা হঠাত হঠাত বুঝতে পারি।

এই মুহূর্তে আমি মনে মনে কী বলছি বলুন।

তুমি মনে মনে বলছ, হিমু নামের মানুষটা ভয়কর এক শয়তান। এর কাছ থেকে সব সময় এক 'শ' হাত দূরে থাকতে হবে। তুমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দাও, আমি এক 'শ' হাত দূরে চলে যাচ্ছি।

আপনি তো আমাকে কনফিউজড করে দিচ্ছেন।

আমি বললাম, কনফিউজড অবস্থায় থাকা ভালো। প্রকৃতি চায় না আমরা কোনো বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হই। হাইজেনবার্গের Uncertainty principle নিশ্চয়ই জানেন। ব্যাখ্যা করব?

তুতুরি বলল, আপনাকে আর কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে না। সিগারেট কিনে দিচ্ছি, বিদায় হোন।

হজুরের সামনে সিগারেটের প্যাকেট রাখতেই হজুর বললেন, অজু করে ফেলো ! আছরের নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে । অজুর নিয়মকানুন জানো তো ? কঠিন নিয়ম । উনিশ-বিশ হলে কিন্তু নামাজ হবে না । আমাকে দেখো—পা নাই, তারপরেও অজুর সময় পা যেখানে ছিল সেই জায়গা ধূই । পায়ের আঙুলের ফাঁকে পানি দেই ।

আমি বললাম, হজুর! দুপুরে কিছু খেয়েছেন?

হজুর বললেন, না । খাওয়া খাদ্যের সমস্যা হচ্ছে । এইজন্যে গত রাতে নিয়ত করে রোজা রেখে ফেলেছি । রোজা রাখায় খাওয়াদাওয়ার সমস্যা কিছু কমল, আবার সোয়াবের খাতায় জমা পড়ল । কাজটা ভালো করেছি না ?

অবশ্যই ভালো করেছেন । সিগারেট ধরাচ্ছেন কেন? রোজা নষ্ট হবে না?

ধোঁয়াজাতীয় কিছুতে রোজা নষ্ট হয় না । গাড়ির ধোঁয়া নাকে গেলে রোজা নষ্ট হয় না । ফুলের গন্ধ নাকে গেলেও রোজা নষ্ট হয় না ।

এমন কোনো মাসালা কি আছে?

এটা আমার মাসালা । চিন্তাভাবনা করে বের করেছি । এখন বাবা যাও, এক কাপ চা এনে দাও ।

চা খেলে রোজা ভাঙবে না

চায়ের গন্ধটা নাকে নিব। চায়ের গন্ধের সঙ্গে সিগারেট খাব । আরেকটা মাসালা শোনো, ত্ত্বষ্টির সাথে কিছু খেলেও রোজার সোয়াব লেখা হয় ।

আপনি তো হজুর প্রচুর সোয়াব জমা করে ফেলেছেন ।

হজুর বললেন, তা করেছি । একজীবনে একটা বড় সোয়াব করাই যথেষ্ট । ব্যাংকে টাকা যেমন বাড়ে, আল্লাহর ব্যাংকে সোয়াবও বাড়ে । লাইলাতুল কদরে আল্লাহপাক সব জমা সোয়াব ডাবল করে দেন । বিরাট সোয়াব একটা করেছি ঘৌবন ব্যসে ।

কী সোয়াব?

এটা বলা যাবে না । সোয়াবের গন্ধ করলে আল্লাহপাক সঙ্গে সঙ্গে সোয়াব অর্ধেক করে দেন । দুইজনের সঙ্গে গন্ধ করলে সোয়াব অবশিষ্ট থাকে চাইরের এক অংশ । তিনজনের সঙ্গে গন্ধ করলে থাকে মাত্র আটের এক অংশ ।

আপনি কারও কাছেই কী বড় সোয়াব করেছেন এটা বলেন নাই?

নাহ। সোয়াব যতটুকু করেছি, সবটা আল্লাহপাকের দরবারে জমা আছে। প্রতি বছর বাড়তেছে। যাও বাবা, চা-টা নিয়ে আসো; তৃণি করে সিগারেট খেয়ে আরেকটা সোয়াব হাসিল করি। যা করে তৃণি পাওয়া যায়, তাতেই সোয়াব।

খাদেম (পীর বাচ্চাবাবার মাজার)

হিমু অজু করছে। অজু করা দেখে মনটা খারাপ হয়েছে। অনেক ভুলভাস্তি। ডান পা আগে ধূবে, তারপর বাম পা। সে করেছে উল্টা। তিনবার কুলি করার জায়গায় সে করেছে চারবার। হাতের কনুই পর্যন্ত অজুর পানি পৌছেছে বলে মনে হয় না। এইসব বরখেলাফ আল্লাহপাক পছন্দ করেন না। হিমুকে ধরে ধরে সব শিখাতে হবে। সে ছেলে ভালো। আদব-কায়দা জানে। আমার প্রতি তার আলাদা নজর আছে। রোজা রেখেছি শুনেই আমার মোবাইল নিয়ে কাকে যেন বলল, হজুর রোজা রেখেছেন। হজুরের জন্যে ইফতার আর খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

হিমু টেলিফোন ফেরত দিয়ে বলল হজুর, ভালো খাবারের ব্যবস্থা করেছি। বিছমিল্লাহ হোটেলের বাবুটি কেরামত চাচা নিজে খানা নিয়ে আসবেন।

আমি বললাম, হিমু, তুমি শেশন এক কথা বলেছ যে আল্লাহপাক গোস্বা হয়েছেন। খাবারের ব্যবস্থা তুমি করো নাই। খাবারের ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহপাক। তুমি উচিলা মাত্র। বলো, আস্তাগফিরুল্লাহ।

হিমু বলল, আস্তাগফিরুল্লাহ।

বলো, সোবাহানাল্লাহ। আলহামদুল্লাহ, আল্লাহ আকবর।

সে ভঙ্গি নিয়ে বলল, সোবাহানাল্লাহ, আলহামদুল্লাহ, আল্লাহ আকবর।

আমি বললাম, আচ্ছা এখন যাও, কাজকর্ম করো। সে ঝাঁটা নিয়ে মাজার পরিষ্কার করতে লাগল। এই ছেলের উপর আমার দিলখোশ হয়েছে। আমি তাকে গোপন কিছু জিনিস শিখিয়ে দিব। যেমন, ফজরের নামাজের পর তিনবার সূরা হাসরের শেষ তিন আয়াত পড়লে সত্ত্বর হাজার ফেরেশতা তার জন্যে দোয়া করবে। বিরাট ব্যাপার।

আমি যে সোয়াবের একটা কাজ করেছি—এটা আমি ছেলেটাকে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঘটনাটা হলো, অনেক বছর আগে আমি ফুটপাত দিয়ে

হাঁটছি। হঠাৎ দেখি একটা বাচ্চা মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, আর তার দিকে ট্রাক আসছে। মেয়েটা ট্রাক দেখে নাই, আমি মেয়েটার উপর ঝাপ দিয়ে পড়লাম। মেয়েটা বাঁচল, ট্রাকের চাকা চলে গেল আমার পায়ের উপর দিয়ে। দুটা পা শেষ। অবশ্যি যা হয়েছে আল্লাহপাকের হকুমে হয়েছে। ট্রাকচালকের এখানে কোনো দোষ নাই। তার উপর আল্লাহপাকের হকুম হয়েছে ট্রাকের চাকা আমার পায়ের উপর দিয়ে নিতে। সে নিয়েছে। তার কী দোষ?

মেয়েটার নাম জয়নাব। নবী-এ করিমের স্ত্রীর নামে নাম। অনেক দিন মেয়েটার জন্য দোয়া খায়ের করা হয় না। আগে নিয়মিত দোয়া করতাম। আবার শুরু করা প্রয়োজন। অন্যের জন্য দোয়া করলেও নেকি পাওয়া যায়।

আছুর ওয়াকে হিমুর পরিচিত এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। মাশাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর চেহারা। সুন্দর চেহারা আল্লাহপাকের নিয়ামত। হ্যারত ইউসুফ আলাহেস সালামের সুন্দর চেহারা ছিল। ভদ্রলোককে দেখে হিমুর ব্যস্ততা চোখে পড়ে মনটা ভালো হয়ে গেল। মানুষকে সম্মান এইভাবে দিতে হয়। যে অন্যকে সম্মান দেয়, আল্লাহপাক তাকে সম্মান দেয়।

হিমু বলল, স্যার, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলেন?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিকানা কৈভাবে জোগাড় করেছি এটা জানা কি অত্যাবশ্যক?

হিমু বলল, জি-না স্যার। আপনাকে এত অস্ত্রির লাগছে কেন?

ভদ্রলোক বললেন, দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েছিলাম। আবারও সেই জিনিস।

ইলেক্ট্রন হয়ে গেলেন?

হ্যাঁ, তবে চার্জ নেগেটিভ না হয়ে পজেটিভ ছিল। অর্থাৎ আমি হয়েছি পজিট্রন। ভয়াবহ ব্যাপার!

ভয়াবহ কেন?

পজিট্রন হলো ইলেক্ট্রনের অ্যান্টি ম্যাটার। পজিট্রন ইলেক্ট্রনের দেখা পেলেই এনিহিলেট করবে। এখন চারিদিকে ইলেক্ট্রনের ছড়াছড়ি। পজিট্রন হয়ে আমি ভয়ে অস্ত্রি—কখন না ইলেক্ট্রনের সঙ্গে দেখা হয়! আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছ?

জি স্যার। একে সহজ বাংলায় বলে বেকায়দা অবস্থা। স্যার কোনো খাওয়াদাওয়া কি করেছেন?

না ।

সকালের ঝ্যাক কফির পর আর কিছু খান নাই?

না ।

মাগরেবের ওয়াকে ইফতার চলে আসবে, তখন হজুরের সঙ্গে ইফতার
করবেন ।

হজুরটা কে?

পীর বাচ্চাবাবা মাজারের প্রধান খাদেম ।

আমি লক্ষ করলাম, হিমুর স্যার সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে ।
আমি বললাম, জনাব! আসসালামু আলায়কুম । উনি বললেন, ওয়ালাইকুম
সালাম । কিছু মনে করবেন না, মাজারের খাদেম হিসেবে আপনার কাজটা
কী?

পীর বাচ্চাবাবা মাজার রক্ষা করাই আমার কাজ ।

মাজার কীভাবে রক্ষা করেন?

আমি বললাম, আপনি যে-কোনো কারণেই হোক অস্থির হয়ে আছেন ।
আপনার আত্মা কষ্ট পাচ্ছে । আত্মা শান্ত হোক, তখন কথা বলব ।

অদ্রলোক বললেন, আত্মা বলে কিছু নাই ।

আমি হাসলাম । এই বুরবাকষ্টী বলে?

অদ্রলোক চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন, আপনি বলুন আত্মা কী?
মানুষের শরীরের কোথায় সে থাকে?

আমি বললাম, ইফতারের পর এই বিষয়ে জনাবের সঙ্গে কথা বলব ।

হিমু এই ফাঁকে আমার কানে কানে বলল, হজুর, আপনি বলেছিলেন না
আত্মা গুলায়ে খাওয়ায়ে দিবেন । খাওয়ায়ে দেন । উনি বিরাট জ্ঞানী মানুষ ।
ফিজিঝে Ph.D. । উনাকে একটা আত্মা খাওয়ায়ে দিতে পারলে লাভ
আছে ।

আমি একটু চিন্তায় পড়লাম । অতিরিক্ত জ্ঞানী মানুষ নানান সমস্যা
করে । কারণ তারা সমস্যায় বাস করে । যত বই পড়ে তত তাদের মাথায়
সমস্যা ঢোকে । এ রকম এক সমস্যাওয়ালা মানুষের সঙ্গে একবার আমার
বাহাস হয়েছিল । সে আমাকে বলল, হজুর, রোজকেয়ামত কবে হবে? আমি
বললাম, এই জ্ঞান শুধু আল্লাহপাকের আছে । তবে আছরের ওয়াকে রোজ
কেয়ামত হবে ।

সে বলল, আছরের ওয়াক্ত তো পৃথিবীর এক জায়গায় একেক সময় হয়। বাংলাদেশে এক সময় আবার আমেরিকায় আরেক সময়। তাহলে রোজকেয়ামত একেক জায়গায় একেক সময়ে হবে?

প্যাচের প্রশ্ন। আমাকে প্যাচে ফেলা এত সহজ না। আমি বললাম, বাবা শোনো! রোজ কেয়ামত হবে আল্লাহপাকের ঠিক করা আছরের ওয়াক্তে।

হিমুর স্যার মনে হয় আমাকে প্যাচে ফেলবে। যারা প্যাচের মধ্যে আছে তারাই অন্যকে প্যাচে ফেলতে চায়। হে আল্লাহপাক, হে গাফুরুল্লাহ! তুমি মানুষকে প্যাচ থেকে মুক্ত করো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অহ্মাহ লা শরিকা লাহু, লাহুল মুলকু অ-লাহুল হামদ অ হয়া আনা কুল্লে শাইন কাদির।

হিমু তার স্যারকে মাজার দেখাচ্ছে। তার স্যার একটু পর পর বলছেন, ‘ইলেকট্রন’।

ইলেকট্রন ব্যাপারটা কী আমি জানি না। বেশি না-জানাই ভালো। কম জানার মধ্যেই মুক্তি। ছোবাহানাল্লাহ, আলহুমদুল্লাহ, আল্লাহ আকবর।

অনেক কিছুই বই পড়ে শেখা যায়নি। যে কোনোদিন মিষ্টি খায় নাই, সে কি কোনো বই পড়ে বুঝতে পারবে মিষ্টির স্বাদ কী! যে কোনোদিন লাল রং দেখে নাই, বই পড়ে সে কি বুঝবে লাল রং কী?

আমরা আয়োজন করে ইফতার খেতে বসেছি। পাটি পেতে সবাই বসেছি। হজুরকে যখন চেয়ার থেকে নামানো হলো, বল্টু স্যার তখনই লক্ষ করলেন হজুরের পা নেই। স্যার অবাক হয়ে বললেন, আপনার পা কোথায়?

হজুর বললেন, আল্লাহপাক নিয়ে গেছেন। উনি নির্ধারণ করেছেন আমার পায়ের প্রয়োজন নাই। এই কারণেই নিয়ে গেছেন। তিনি অপ্রয়োজনীয় জিনিস পচন্দ করেন না।

বল্টু স্যার বললেন, আপনার অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে। তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আপনার পা আবার গজাবে।

হজুর অবাক হয়ে বললেন, জনাব কী বললেন, বুঝতে পারলাম না। আমার পা আবার গজাবে?

স্যার বললেন, নিম্নশ্ৰেণীৰ পোকামাকড়দেৱ ভেঙে যাওয়া নষ্ট হওয়া
প্ৰত্যঙ্গ আবাৰ জন্মায়। মাকড়সাৰ ঠ্যাং গজায়। টিকটিকিৰ লেজ গজায়।
এখন স্টেমসেল নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে তাতে মানুষেৰ অঙ্গপ্ৰত্যঙ্গ গজাবে।

হজুৱ বিড়বিড় কৰে বললেন, আন্তাগফিৰল্লাহ।

বল্টু স্যার প্ৰবল উৎসাহে বলতে লাগলেন—বিজ্ঞানেৰ উন্নতিৰ ধাৰাটা
হলো এক্সপোনেনশিয়াল। এই ধাৰায় উন্নতিৰ রেখা শুৱতে সৱলৱেখাৰ
মতো থাকে। একটা পৰ্যায়ে রেখায় শোল্ডাৰ অৰ্থাৎ কাঁধ দেখা যায়, তাৱপৰ
এই রেখা সৱাসিৰ উঠতে থাকে। বিষ্ফোৱণ যাকে বলে।

হজুৱ বললেন, এইসব হাবিজাবি কী বলতেছেন জনাব!

বল্টু স্যার বললেন, এক 'শ' ভাগ সত্যি কথা বলছি। আমোৱা পয়েন্ট অব
সিঙ্গুলারিটিৰ দিকে এগুচ্ছি। পৃথিবীৰ নামান জায়গায় সিঙ্গুলারিটি সোসাইটি
হচ্ছে। এইসব সোসাইটি ধাৰণা কৰছে, দুই হাজাৰ দু 'শ' সনেৱ দিকে
আমোৱা সিঙ্গুলারিটিৰ দিকে পৌছে যাব। তখন আমোৱা অমৱত্ব পেয়ে যাব।
আজৱাইল বেকাৰ হয়ে যাবে।

হজুৱ বললেন, জনাব, আপনি কী কৰছেন? আজৱাইল বেকাৰ হয়ে
যাবে?

মানুষ যদি মৃত্যু রোধ কৰে ফেলে, তাহলে আজৱাইল তো বেকাৰ
হবেই। আজৱাইলেৰ তখন কৃষ্ণ কী?

হজুৱ বললেন, ইফতারিৰ আগে আপনি আৱ কোনো কথা বলবেন না।
কথা বলব না কেন?

হজুৱ বিৱৰণ গলায় বললেন, আপনাৰ কথা শুনলে অজু নষ্ট হয়ে যাবে,
এইজন্যে কথা বলবেন না। আসুন আমোৱা আল্লাহৰ নামে জিকিৰ কৱি। সবাই
বলেন—আল্লাহ, আল্লাহ।

সবাই বলতে আমোৱা তিনজন। হজুৱ, আমি আৱ বল্টু স্যার। কেৱামত
চাচা টিফিন কেৱিয়াৱ ভৰ্তি ইফতার রেখে চলে গেছেন। বলে গেছেন রাতে
আবাৰ আসবেন। হজুৱেৰ নিৰ্দেশে আমি বাংলা একাডেমীৰ ডিজি স্যারকে
ইফতারেৰ দাওয়াত দিয়েছি। ঠিকানা দিয়েছি। ডিজি স্যার ইংৰেজিতে
বলেছেন, I don't understand what you are cooking. বাংলায় হয়, তুমি
কী রাঁধছ বুৰতে পাৱছি না। তাৰ এই উক্তিতে তিনি ইফতারেৰ সামিল
হবেন এমন বোৰা যাচ্ছে না।

ইফতারের আয়োজন চমৎকার। বিছমিল্লাহ হোটেলের বিখ্যাত মোরগপোলাও, সঙ্গে খাসির বটিকাবাব। মামের পাঁচ লিটার বোতলে এক বোতল বোরহানি।

মাগরেবের আজান হয়েছে। হজুর আজানের দোয়া পাঠ করেছেন। আমরা ইফতার শুরু করেছি। হজুর বললেন, যারা রোজা না তারাও যদি কখনো অতি তৃষ্ণিসহকারে খাদ্য খায়, তাহলে এক রোজার সোয়াব পায়।

বল্টু স্যার বললেন, তাহলে রোজা রাখার প্রয়োজন কী? তৃষ্ণি করে ভালো ভালো খাবার খেলেই হয়।

হজুর বললেন, যত ভালো খাদ্যই হোক, আল্লাহর হৃকুম ছাড়া তৃষ্ণি হবে না। একবার রসুন শুকনা মরিচের বাটা দিয়ে গরম ভাত খেয়েছিলাম, এত তৃষ্ণি কোনোদিন পাই নাই।

আমার মনে হয়, রোজা না-রেখেও আজ সবাই রোজার তৃষ্ণি পেয়েছে। বল্টু স্যার বললেন, অসাধারণ। তেহারির রেসিপি নিয়ে যাব। রেসিপিতে কাজ হবে না, রান্নার প্রসিডিউর ভিডিও করে নিয়ে যেতে হবে। যেসব স্পাইস এই রান্নায় ব্যবহার হয়, সেসব আংশেরিকায় পাওয়া যায় কি না কে জানে! পাওয়া না গেলে বন্তাভর্তি করে নিয়ে যেতে হবে। শুধু একটা জিনিস মিস করছি—এক বোতল রেড ওয়াইন।

হজুর আমাকে বললেন, তুম্হার স্যার কিসের কথা বলছেন?

আমি বললাম, রেড ওয়াইনের কথা বলছেন।

জিনিসটা কী?

মদ।

আস্তাগফিরুল্লাহ! ইফতারের সময় এইসব কী শুনলাম! হে আল্লাহপাক, তুমি এই বান্দার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ো। আমিন।

বল্টু স্যার খাওয়ার পর নিমগাছের নিচে পাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে ইলেক্ট্রন বা প্রোটন হয়ে গেলেন কি না তা বোঝা গেল না। তবে তার যে তৃষ্ণির ঘুম হচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে। ঘুমের সময় চোখের পাতা যদি দ্রুত কাঁপে, তাহলে বুঝতে হবে ঘুম গাঢ় হচ্ছে। চোখের পাতার দ্রুত কম্পনকে বলে Rapid Eye Movement (REM)। স্যারের REM হচ্ছে।

হজুর বললেন, হিমু! তোমার স্যারের পায়ের কাছে একটা মশার কয়েল জুলায়ে দেও। উনারে মশায় কাটিতেছে। মানুষের সেবা করার মধ্যে নেকি আছে। ব্যাংক একাউন্টে নেকি জমা করো।

আমি বললাম, হজুর! মশার কি আত্মা আছে?

হজুর বললেন, মন দিয়া কোরান মজিদ পাঠ করো নাই, এই কারণে বোকার মতো প্রশ্ন করলা। কোরান মজিদে আল্লাহপাক বলেছেন, ‘আত্মা হলো আমার হৃকুম’। তাঁর হৃকুম মানুষের উপর যেমন আছে, মশামাছির উপরও আছে।

আমি বললাম, মশার কয়েল জুলানো তো তাহলে ঠিক হবে না। মশার আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হবে।

হজুর বললেন, পঁ্যাচের প্রশ্ন করবা না। আল্লাহপাক পঁ্যাচ পছন্দ করেন না। উনার দুনিয়ায় কোনো পঁ্যাচ নাই। পঁ্যাচ যদি থাকত হঠাৎ দেখতা আমগাছে কাঁঠাল ফলে আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি নাই, শীতকালে বৃষ্টি ঝড় তুফান। নদীর মিঠা পানি হঠাৎ হয়ে যেত লোনা। আবার সাগরের পানি হয়ে যেত মিঠা। এ রকম কি হয়?

জি-না।

আমি বল্টু স্যারের পায়ের কাছে মশার কয়েল জুলালাম। তার মাথার নিচে বালিশ ছিল না, একটা বালিশ দিয়ে দিলাম। হজুর বললেন, তোমার যদি বিড়ি-সিগারেট খেতে ইচ্ছা হয় আমার দিকে পিছন ফিরে খেয়ে ফেলবা। নেশাজাতীয় খাদ্য খাওয়া ঠিক না। খাওয়ার পর পর বলবা, আস্তাগফিরহুল্লাহ। এতে দোষ কষ্ট যাবে।

জি আচ্ছা হজুর। শুকরিয়া।

আমার মোবাইলটা তোমারে দিয়া দিলাম। তোমার বয়স অল্প। এইসব যন্ত্রপাতি তোমার প্রয়োজন। আমার না। আল্লাহপাকের মোবাইল নম্বর কি জানো?

জি-না হজুর।

উনার মোবাইল নম্বর হলো ২৪৪৩৪।

বলেন কী?

এই নম্বরে মোবাইল দিলেই উনারে পাওয়া যায়। ২ হলো ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ, ৪ হলো জোহরের চাইর রাকাত ফরজ নামাজ, আরেক ৪ হলো আসরের চার রাকাত, ৩ হলো মাগরেবের তিন রাকাত, আর এশার চার রাকাতের ৪। এখন পরিষ্কার হয়েছে?

জি হজুর।

প্রতিদিন একবার উনারে মোবাইল করবা। দেখবা সব ঠিক।

হজুরের কাছ থেকে উপহার হিসাবে মোবাইল হাতে নেওয়ামাত্র রিং
হতে লাগল।

আমি হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে তুতুরি বলল, হিমু।

আমি বললাম, গলা চিনে ফেলেছ?

তুতুরি বলল, চিনেছি। এই মুহূর্তে আপনি কী করছেন?

তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

সেটা বুঝতে পারছি। কথা বলার আগে কী করছিলেন?

স্যারের মাথার নিচে বালিশ দিলাম। বালিশ ছাড়া ঘুমাচ্ছিলেন তো।

স্যার মানে কি পদার্থবিদ্যার হার্ডডি Ph.D.?

হ্যাঁ।

উনি মাজারে ঘুমাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আপনাদের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। উনি কি সত্যিই
মাজারে ঘুমাচ্ছেন?

এসে দেখে যাও।

রাতে আসব না। সক্ষ্যার পর আমি এর থেকে বের হই না। ভোরবেলা
আসব। ততক্ষণ কি স্যার থাকবেন?
থাকার কথা।

আমি আপনাকে বিশেষ একটা কারণে টেলিফোন করেছি। আমার জন্য
ছোট একটা কাজ করে দিতে পারবেন?

পারব। কী কাজ?

আপনি তো অনুমান করে অনেক কিছু বলতে পারেন। অনুমান করুন।
আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাচ্ছি। জিনিসটার প্রথম অক্ষর ‘বি’?

বিচালি চাচ্ছ? বিচালি দিয়ে কী করবে?

বিচালি আবার কী?

ধানের খড়। গরু যেটা খায়।

আপনি ইচ্ছা করে আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। আমি বিষ চাচ্ছি।
বিষ। বিচালি না। Poison.

কী করবে? খাবে?

না, জহির স্যারকে খাওয়াব। পটাসিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করে
দিতে পারবেন?

কোথায় পাওয়া যায়?

কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে পাবেন।

বাজারে যে সব বিষ পাওয়া যায় তা দিয়ে হবে না? ইন্দুর মারা বিষ,
ধানের পোকার বিষ?

না। এসব বিষের স্বাদ ভয়ঙ্কর তিতা। মুখে দেওয়ামাত্র ফেলে দেবে।
সায়ানাইডের স্বাদ মিষ্টি। আমি বইয়ে পড়েছি। তারচেয়ে বড় কথা, সায়ানাইড
খেয়ে মারা গেলে কারও ধরার সাধ্য নেই বিষ খেয়ে মারা গেছে।

তোমার কতৃকু লাগবে?

অল্প হলেই চলবে। মনে করুন দুই গ্রাম। দু'টা গ্লাসে শরবতের সঙ্গে
মিশিয়ে দু'জনকে দেব। জহির স্যার আর তার বন্ধু পরিমল।

খাওয়াবে কোথায়? খাওয়ানোর পর তোমাকে দ্রুত পালিয়ে যেতে হবে।

আপনাদের মাজারে কি খাওয়ানো যায়?

কেন যাবে না? মাজারের তবারকের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দেব। খেয়ে
চিং হয়ে পড়ে থাকবে।

তুভুরি বলল, আপনার কথা শনে মনে হচ্ছে আপনি পুরো বিষয়টা ঠাণ্ডা
হিসেবে নিয়েছেন।

তুমি যদি সিরিয়াস হও তাহলে আমি সিরিয়াস। তোমাকে মোটেই
সিরিয়াস মনে হচ্ছে না।

আমি যে সিরিয়াস তার ঝুঁমাণ দেই? সায়ানাইড আমি জোগাড় করেছি।
আপনাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে সায়ানাইড জোগাড় করতে বলেছি।

কাজ তো তুমি অনেক দূর গুছিয়ে রেখেছ। তুমি সায়ানাইড দিয়ে যাও,
আর দুই কালপ্রিটকে পাঠিয়ে দিয়ো।

আপনি এখনো ভাবছেন আমি ঠাণ্ডা করছি। সরি, আপনাকে বিরক্ত
করলাম।

তুভুরি লাইন কেটে দিল।

তুভুরি

আমি সায়ানাইড কোথায় পাব? মিথ্যা করে বলেছি সায়ানাইড আছে। হিমু
যেমন মিথ্যা বলছে, আমিও বলছি। সে কথায় কথায় ফাজলামি করে।
আমিও কি তা-ই করছি? হতে পারে। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে
সর্বনাশ। আমার সর্বনাশ হতে দেরি নাই।

ଶୁନେଛି ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକାରା ଏକେ ଅନ୍ୟେର ସ୍ଵଭାବ ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ଧାରଣ କରତେ ଚାଯ, ଯାତେ ତାରା ଆରଓ କାହାକାହି ଆସତେ ପାରେ । ହିୟ ଆମାର କୋନୋ ପ୍ରେମିକ ନା । ତାର ସ୍ଵଭାବ କେନ ଆମି ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ନିଯେ ନେବେ? ତବେ ଏହି ଘଟନା ଘଟିଛେ । ଆମି ହିୟର ମତୋ କିଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତ ବଲତେ ଶୁରୁ କରେଛି । ଉଦାହରଣ ଦେଇ । ଆମି ମାଜେଦା ଖାଲାର ବାଡ଼ିତେ ଗିଯେଛି । ଇନ୍ଟେରିୟରେର କାଜ ଶୁରୁ କରବ—ଏହି ନିଯେ କଥା ବଲବ, ଏସିଟିମେଟ କରବ । ବାସାୟ ତୁକେ ଦେଖି କୁରକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ । ସ୍ଵାମୀ-ଶ୍ରୀ ପାରଲେ ଏକେ ଅନ୍ୟେର ଗଲା କାମଡେ ଧରେ ।

ସ୍ଵାମୀ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଚୋଖ ଲାଲ କରେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଉଁଚିଯେ ଶ୍ରୀକେ ବଲଲେନ, ଏହି ମୁହଁରେ ବାଡ଼ି ଥେକେ ବେର ହୟେ ଯାଓ ।

ଶ୍ରୀ ଗଲା ସ୍ଵାମୀର ଚେଯେଓ ତିନଶ୍ଚ ଉଁଚିଯେ ବଲଲେନ, ତୁମି ବେର ହୟେ ଯାଓ । ଏହି ଅୟାପାର୍ଟମେନ୍ଟ ଆମାର ।

ତୋମାର?

ଅବଶ୍ୟାଇ ଆମାର ।

ଆଜ୍ଞା ତାଇ?

ତାଇ କରବେ ନା । ବେର ହୟେ ଯେତେ ବଲଛି ବେର ହୟେ ଯାଓ ।

ଏଟା ତୋମାର ଶେଷ କଥା?

ହଁବା, ଶେଷ କଥା । Go to hell!

Go to hell!—ବାକ୍ୟଟି ଏହି ମହିଳା ସ୍ଵାମୀର କାହିଁ ଥେକେ ଶିଖେହେନ । ପ୍ରଯୋଗ କରେ ମନେ ହଲୋ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ପେଲେନ । ଆମାର ଦିକେ ତାକିଯେ ବିଜୟୀର ଭଞ୍ଜିତେ ହାସଲେନ । ସ୍ଵାମୀ ବଲଲେନ, OK ଯାଚିଛି । ଆର ଫିରବ ନା ।

ଶ୍ରୀ ବଲଲେନ, ଭୁଲେଓ ଉତ୍ତରାର ଅୟାପାର୍ଟମେନ୍ଟେ ଯାବେ ନା । ଓଇଟାଓ ଆମାର ।

ସ୍ଵାମୀ ବେଚାରା ଦରଜାର ଦିକେ ଯାଚେନ, ତଥନ ଆମି ବଲଲାମ, ସ୍ୟାର ଦୟା କରେ ଖାଲି ପାଯେ ଯାବେନ ନା । ସ୍ୟାନ୍ଡେଲ ବା ଜୁତା ପରେ ଯାନ ।

ତିନି ଉକ୍କାର ବେଗେ ଖାଲି ପାଯେ ବେର ହୟେ ଗେଲେନ । ମାଜେଦା ଖାଲା ବଲଲେନ, ତୁତୁରି, କାଗଜ-କଲମ ନିଯେ ବସୋ । ଆମାକେ ବୋକାଓ ତୁମି କୀ କୀ କାଜ କରବେ । ତାର ଭାବଭଞ୍ଜି ଯେନ କିଛୁଇ ହୟ ନି । ସବ ସ୍ଵାଭାବିକ । ତିନି ଆନନ୍ଦିତ ଗଲାଯ ବଲଲେନ, ହିୟର ଜନ୍ୟ ଏକଟା ଘର ରାଖବେ । ଓ ଯଥନ ଇଚ୍ଛେ ତଥନ ଏଥାନେ ଥାକବେ । ହିୟର ଘରେର ରଙ୍ଗ ହବେ ହଲୁଦ ।

খালু সাহেবের পছন্দের রং কী?

মাজেদা খালা চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন, তাঁর ঘর এমন করে বানাবে যেন আলো-হাওয়ার বংশ না ঢোকে। চিপা বাথরুম রাখবে। বাথরুম এমনভাবে বানাবে যেন বাথরুমে সামান্য পানি জমলেই সেই পানি ছাইয়ে লোকটার ঘরে তুকে যায়। পারবে না?

অবশ্যই পারব। আপনি ঢাইলে রান্নাঘর এমন ডিজাইন করব যেন রান্নাঘরের ধোয়াও উনার ঘরে ঢোকে। কাশতে কাশতে জীবন যাবে।

ভালো তো। খুব ভালো। চা খাবে? আসো চা খাই।

আমি চা খেয়ে চলে গেলাম জহির স্যারের কোচিং সেন্টারে। অতি দুষ্ট এই মানুষটার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে আমার রক্তে আগুন ধরে যায়। আগুন ধরার এই ব্যাপারটা আমি পছন্দ করি।

জহির স্যারের কাছে আজ আমি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি। তার সঙ্গে হিমুর মতো কিছুক্ষণ কথা বলে তাকে বিভ্রান্ত করব। জহির স্যারকে কী বলব তাও আমি শুনিয়ে রেখেছি। তবে শুনিয়ে রাখা কথা সব সময় বলা হয় না। এক কথা থেকে অন্য কথা চলে আসে। দেখা যাক কী হয়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

জহির স্যার আমাকে দেখে খুশি খুশি গলায় বললেন, তোমার জন্য অসম্ভব ভালো খবর আছে।

আমি বললাম, কী খবর স্যার?

গ্রামের পুকুরের মানুষের মুখের মতো দেখতে মাছটা সবাই ভেবেছে মারা গেছে। অনেক দিন দেখা যেত না। গতকাল দেখা গেছে।

বলেন কী!

এই উইকএডে যাবে? এরপর আমি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ব। কোচিং সেন্টারে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে?

অবশ্যই ঠিক আছে। আপনার বক্তৃ যাবেন না? পরিমল সাহেব।

জহির স্যার হাই তুলতে তুলতে বললেন, বলে দেখব। যেতেও পারে। বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় রওনা হব। তোমাকে কোথেকে তুলব?

পীর বাচ্চাবাবার মাজার থেকে তুলে নেবেন। আমি শুইখানে রেডি হয়ে থাকব।

পীর বাচ্চাবাবার মাজার মানে?

আমার পরিচিত একজন ওই মাজারের অ্যাসিস্টেন্ট খাদেম। তার নাম হিমু। ঢাকা শহরের সবচেয়ে গরম মাজার।

মাজারের আবার ঠাণ্ডা-গরম কী?

ঠাণ্ডা-গরম আছে স্যার। হার্ভার্ডের ফিজিক্স-এর একজন Ph.D. সোনারগাঁ হোটেলের চার শ' সাত নম্বর রুমে উঠেছিলেন। কী মনে করে একদিন মাজার দেখতে গিয়েছিলেন, তারপর আটকা পড়লেন।

আটকা পড়লেন মানে কী?

এখন তিনি মাজারে থাকেন। মাজারেই ঘুমান। এশার নামাজের পর হজুরের সঙ্গে জিকির করেন।

অ্যাবসার্ড কথাবার্তা বলছ।

অনেক বড় বড় লোকজন সেখানে যান। মন্ত্রী-মিনিস্টারেরা গোপনে যান, গোপনে চলে আসেন। বৃহস্পতিবার আপনি তো আমাকে তুলতে যাচ্ছেন, নিজেই দেখবেন।

তুমি কি নিয়মিত মাজারে যাও?

জি-না স্যার। আমার মাজারভক্তি নাই। এই মাজারের ডিজাইন করার দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে। অল্প জায়গাটো, ডিজাইন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমি ঠিক করেছি ওপরের দিকে উঠে যাব। স্পাইরেল ডিজাইন হবে। ফিবোনাচি রাশিমালা ব্যবহার করব। কয়েক কোটি টাকার প্রজেক্ট।

কোটি টাকা কে দিচ্ছে?

উনার নাম গোপন। কাউকে জানাতে চাচ্ছেন না।

জহির স্যারকে খানিকটা হকচকিয়ে বের হয়ে এলাম। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।

হিমুর মতো ইঁটব? আমার সমস্যা কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। মাজারের একটা ডিজাইন সত্যি সত্যি আমার মাথায় এসেছে। ফিবোনাচি সিরিজের চিন্টাও আছে। ১-১-২-৩-৫-৮,... প্রতিটি সংখ্যা আগের দুটি সংখ্যার যোগফল।

পুরো স্ট্রাকচার হবে কংক্রিটের। ওপরটা হবে ফাঁকা। রোদ আসবে, বৃষ্টি আসবে। স্ট্রাকচারের রং হবে হলুদ।

আচ্ছা আমার মাথায় হলুদ ঘুরছে কেন? আজ যে শাড়িটা পরেছি, তার রঙও হলুদ। ইচ্ছা করে হলুদ পরি নি। হাতে উঠেছে পরে ফেলেছি। কোনো মানে হয়? Something is wrong, something is very wrong.

আমি জহির

তুতুরি মেয়েটা বড়শির টোপ গিলেছে। আমি বুঝতে পারি না, মেঘগুলো টোপ গেলার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে থাকে কেন? সব ক্ষুধার্ত মৎসকুমারী।

আমার বড়শিতে টোপ গিলেছে তিনজন। এর মধ্যে একজন যরেই গেল। এটা ঠিক হয় নাই। পরিমল ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে আমেলাটা করেছে। তাকে এই কাজ আর করতে দেওয়া যাবে না। ডকুমেন্ট হিসেবে ভিডিও হাতে থাকতে পারে, প্রয়োজনে ব্যবহার করা গেল। ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়ে সবাইকে জানানোর কিছু নেই।

আমি বড়শি ফেলে আরামে মাছ ধরে যাব। মাছগুলোর কঠিন চক্ষুলজ্জা আর মান-সম্মানের ভয়। তারা কাউকে কিছু জানাবে না। আর বাবা-মা'র কাছে যদি বলেও ফেলে, তারা ধরক দিয়ে চুপ করাবেন। একবার প্রচার হয়ে গেলে বিয়ে বন্ধ। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে 'বিবাহ' অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনা ঘটে যাওয়া মেয়ের বিবাহ বাংলাদেশে হয় না। অতি বদ ছেলেও খৌজে পরিত্ব কুমারী কন্যা।

পরিমল বদটা বিয়ে করবে। পরিত্ব কন্যা খৌজা হচ্ছে। বাইশ ক্যারেট মেয়ে লাগবে। আঠার ক্যারেটে হবে না।

তুতুরি বিষয়ে আমার পরিকল্পনা হলো, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া। পুরুষাটো মাছের সন্ধানে কিছুক্ষণ বসে থাকা। এর মধ্যে পরিমল জগভর্তি করে বরফ দেওয়া মার্গারিটা নিয়ে উপস্থিত হবে।

মার্গারিটা এমনই ঘজাদার ককটেল যে লাগবে শরবতের মতো। সঙ্গে টাকিলা মেশানো। তা নাবালকরা বুঝতে পারবে না। তিন পেগেই খবর হয়ে যাবে। কাত হয়ে পড়ে যাবে। তখন তাকে কোলে করে বিছানায় নিয়ে যাওয়া।

না, আমি এই নিয়ে কখনো মানসিক সমস্যায় ভুগি না। যে মেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে একা রওনা হতে পারে, তার উচিত পরবর্তী আমেলার জন্যে তৈরি থাকা। তোমরা বদের হাজিড়, আমিও বদের হাজিড়। হা হা হা। হাজিড়তে হাজিড়তে কাটাকাটি।

তবে তুতুরি অতিরিক্ত চালাক বলে আমার ধারণা। পীর বাচ্চাবাবার মাজারে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে, হিমুও সঙ্গে যাচ্ছে। চিন্তার কিছু নাই, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

প্রথম যে মেয়ে আমার সঙ্গে মানুষের মুখের মতো দেখতে মাছ দেখতে গেল তার কথাই ধরা যাক। মেয়েটার নাম মালা। সে একা যাবে এমনই

কথা। বদ মেয়ে তার সঙ্গে এগার-বার বছরের ছেলে নিয়ে উপস্থিতি। তার মামাতো ভাই। এই ছেলেও নাকি মাছ দেখবে। আমি বললাম, O.K., খোকা তোমার নাম কী?

সে বলল, আমার নাম সবুজ।

আমি ছড়া বানিয়ে বললাম,

তুমি হচ্ছ সবুজ
তুমি খুবই অবুরু
মাছ দেখতে যাবে
মাছের দেখা পাবে
মাছ কিন্তু মন্দ
মাছের গায়ে গন্ধ।

ছড়া শুনে সবুজ হেসে কুটিকুটি। যাই হোক, আমে পৌছে যথারীতি মার্গারিটা ককটেল ট্রিটমেন্ট হলো। দু' পেগ খেয়েই মালা জড়ানো গলায় কথা বলতে লাগল। আমি বললাম, মালা! শরীরটা খারাপ লাগছে নাকি?

মালা বলল, জি স্যার।

আমি বললাম, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো। দীর্ঘ জার্নি করে এসেছ, এইজন্য মনে হয় শরীর খারাপ করেছে। এসো তোমাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দেই। আমার বক্স পরিমল আছে তোমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। পরিমল তাকে মাছ দেখাবে। মাছটা সূর্য ডোবার পর মাঝে মাঝে মাথা ভাসায়। ভাগ্য ভালো থাকলে আজও ভাসবে।

মালা বলল, স্যার আমি দেখব না?

তুমি আগামীকাল সন্ধ্যায় দেখবে। এখন শরীরটা ঠিক করো।

আমি মালাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম। মেয়েদের সিঙ্গুলারি সেস প্রবল থাকে। সে ঘরে চুকেই আতঙ্কিত গলায় বলল, স্যার আপনার মা কোথায়?

আমি বললাম, মা গেছে তার বোনের বাড়ি। তাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। চলে আসবে।

মালা আতঙ্কিত গলায় বলল, আপনি ঘরের দরজা কেন বন্ধ করছেন?

আমি বললাম, তোমায় মাথায় বিলি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব তো, এইজন্য দরজা বন্ধ করলাম।

মালা ব্যাকুল গলায় ডাকল, সবুজ! সবুজ!

আমি বললাম, সবুজকে নিয়ে মোটেই চিন্তা করবে না। পরিমল তাকে মাছ দেখাবে।

পরিমল তাকে এমন মাছ দেখিয়েছে যে, তার জীবন থেকে মাছ পুরোপুরি মুছে গেছে বলে আমার ধারণা।

আমার সঙ্গে ফাজলামি! একা যাবে ঠিক করে মামাতো ভাই নিয়ে উপস্থিত। যেমন কর্ম তেমন ফল। বোন গেছে যেই পথে, মামাতো ভাই গেছে সেই পথে। হা হা হা।

বল্টু স্যার পীর বাচ্চাবাবার মাজারে পড়ে আছেন। ঝামেলামুক্ত মানুষকে যেমন দেখায় তাকে সেরকম দেখাচ্ছে। এখানে তিনি ঘুমের মধ্যে ইলেক্ট্রন, প্রোটন বা পজিট্রন হচ্ছেন না। তাকে ঘূরপাক খেতে হচ্ছে না। রাতে শান্তিময় ঘূম হচ্ছে। মাঝে মাঝে তাকে মাথা দুলিয়ে ‘London bridge is falling down’ বলতে দেখা যাচ্ছে। বাচ্চাদের এই রাইম কেন তাঁর মাথায় ঢুকেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে হজুর খুশি। হজুরের ধারণা বল্টু স্যার জিকিরের মধ্যে আছেন মাজারে তাঁর গোসলের সমস্যা ছিল, আমি তাঁকে ‘গোসলের সুব্যবস্থা’ আছে।....মহিলা নিষেধ’ লেখা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গোসল করিয়ে এনেছি। গোসল করে তিনি মোটামুটি ত্ণ্ণ। তাঁকে দুই বালতি পানি দেওয়া হয়েছিল। এক বালতি গরম পানি, এক বালতি ঠাণ্ডা। একটা মিনিপ্যাক শ্যাম্পু এবং এক টুকরা সাবান।

গোসলখানা থেকে বের হয়ে তিনি মুক্খ গলায় বলেছেন, বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি করছে। টার্কিশ বাথের স্টাইলে স্নানের ব্যবস্থা করছে। পথেঘাটে যারা চলাফেরা করে তাদের স্নানের প্রয়োজন। এরা এই প্রয়োজন মেটাচ্ছে। আমি নিশ্চিত বাংলাদেশ দ্রুত মধ্য-আয়ের দেশ হয়ে যাবে।

বাঁদরের দোকান দেখেও বল্টু স্যার অভিভূত হলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, বাঁদরের দোকান নাকি?

আমি বললাম, স্যার বাঁদরের দোকান বলেই মনে হয়, তবে এরা বাঁদর বিক্রি করে না।

বাঁদর বিক্রি করে না তাহলে এতগুলো বাঁদর নিয়ে দোকান সাজিয়েছে কেন?

জানি না স্যার।

জানবে না? জানার ইচ্ছা কেন হবে না? কৌতুহলের অভাব মানেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মৃত্যু। গ্যালিলিও যদি কৌতুহলী হয়ে আকাশের দিকে দূরবীন তাক না করতেন তা হলে আমরা এক শ' বছর পিছিয়ে থাকতাম।

আমি বললাম, বাঁদরের বিষয়ে অনুসন্ধান না করলে আমরা কত দিন পিছাব?

স্যার আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজেই অনুসন্ধানে গেলেন। যা জানা গেল তা হলো এরা হচ্ছে ‘ট্রেনিং বান্দর’। ওস্তাদ এদের ট্রেনিং দেন। ট্রেনিংয়ের শেষে যারা বাঁদর নিয়ে খেলা দেখায়, তারা কিনে নিয়ে যায়। তখন দাম জোড়া দশ হাজার টাকা। সিঙ্গেল বিক্রি হয় না। ট্রেনিংয়ের খরচ আলাদা।

বল্টু স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দশ হাজার টাকায় দুটা ট্রেইনড মাংকি পাওয়া যাচ্ছে। প্রাইস আমার কাছে রিজনেবল মনে হচ্ছে। পার পিস পঞ্চাশ ডলারের সামান্য বেশি পড়ছে।

আমি বললাম, কিনবেন নাকি স্যার?

এখনো বুঝতে পারছি না। তবে কেনা যেতে পারে। দুটা বাঁদর পাশে থাকলে জীবন যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং হবে বলে আমার ধারণা। ট্রেনিংয়ের পর এরা কী কী খেলা দেখাবে?

আমি বললাম, জানি না। আচ্ছুম ভালোমতো খোজখবর করি।

দোকানের মালিক তক্ষক-চোখা বলল, তিন আইটেমের খেলা পাবেন। স্বামী-স্ত্রীর শুশ্রবাঢ়ি যাত্রা, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, স্বামী-স্ত্রীর মিল মহৱত। তিনটাই হিট আইটেম।

স্যার চকচকে চোখে বললেন, ইন্টারেস্টিং! আমেরিকায় ট্রেইনড পশুপাখির অসম্ভব কদর। হলিউডে ট্রেইনড পশুপাখির একটা শো দেখে মুক্ত হয়েছিলাম। আমরাও যে পিছিয়ে নেই এটা জেনে আনন্দ পাচ্ছি।

দোকানি বলল, স্যার নিয়া যান। খেলা দেখায়ে দৈনিক তিন-চার শ' টাকা আয় করতে পারবেন।

স্যার আমার দিকে সমর্থনের আশায় তাকালেন। অতি মেধাবীরা তারছেঁড়া মানুষ হয়। দুই বাঁদর নিয়ে উনি কী করবেন কিছুই ভাবছেন না। এই মুহূর্তে তাঁর বিষয়টা মনে ধরেছে। তারছেঁড়া মানুষের জন্য মুহূর্তের বাসনার মূল্য অসীম।

আমি বললাম, এখনই কিনে ফেলতে হবে তা-না। স্যার, আপনি চিন্তাভাবনা করুন। এদের রাখাও তো সমস্যা। ফাইভ স্টার হোটেল নিশ্চয় বাঁদর রাখতে দিবে না।

দোকানি উদাস গলায় বলল, কার্ড নিয়া যান। চিন্তাভাবনা করেন। যদি মনে করেন কিনবেন মোবাইল করবেন। মাল ডেলিভারি দিয়া আসব। দাম নিয়া মূলামূলি চলবে না।

স্যারকে নিয়ে ফিরছি। তাঁর হাতে বাঁদরের দোকানের ভিজিটিং কার্ড। স্যারের চেহারা একটু মলিন। ঘানি ভাঙানো তেলের দোকানে এসে আবার তাঁর চোখ উজ্জ্বল হলো। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, সবাই বোতল হাতে নিয়ে বসে আছে কেন?

আমি ব্যাখ্যা করলাম।

স্যার বললেন, এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে মেশিনে তেল না ভাঙিয়ে ঘোড়া দিয়ে কেন ভাঙাচ্ছে?

আমি বললাম, ঘোড়াদের মুখের দিকে তাকিয়েই এটা করা হচ্ছে। ঘোড়াদের এখন কোনো কাজ নেই। এরা বেকার। কেউ ঘোড়ায় চড়ে শুশুরবাড়ি যায় না। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যান্ত করার রেওয়াজও উঠে গেছে। এই কারণেই এদের আমরা ঘানিতে লাগিয়ে ঘোরাচ্ছি।

স্যার বললেন, ভেরি স্যাড!

তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই আটকে যাচ্ছেন। তাঁকে নড়ানো যাচ্ছে না। ঘানির দোকানের সামনেও তিনি আটকে গেলেন। আমি বললাম, স্যার, এক ছটাক খাঁটি সরিষার তেল কি আপনার জন্য কিনব?

স্যার বললেন, এক ছটাক তেল দিয়ে আমি কী করব?

বাংলাদেশে খাঁটি সরিষার তেল নাকে দিয়ে ঘুমানোর সিস্টেম আছে স্যার। ঘূম খুব ভালো হয়।

কেন?

নাকের এয়ার প্যাসেজ ক্লিয়ার থাকে। সরিষার ঝঁঝও হয়তো কাজ করে।

স্যার বললেন, ইন্টারেস্টিং।

আমি তাঁর জন্য এক ছটাক তেল কিনে মাজারে ফিরে এলাম। তার দুঃস্টা পর আমাদের সঙ্গে খালু সাহেব যুক্ত হলেন। মাজেদা খালার তাড়া খেয়ে তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত। আমাকে বললেন, হিম! বেঁচে থাকার বিষয়ে কোনো আগ্রহ বোধ করছি না। তোমার মাজেদা খালা আমাকে বলেছে, Go to hell.

আমি বললাম, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেয়েছেন?

খালু ক্ষিণ গলায় বললেন, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলাম এটা ইম্পরটেন্ট, নাকি তোমার খালা যে বলল, গো টু হেল, সেটা ইম্পরটেন্ট।
খালার কথাই ইম্পরটেন্ট।

আমি ঠিক করেছি, আত্মিয়স্বজন বঙ্গবাঙ্কির কারও বাড়িতে গিয়ে উঠব না। কারও করণা ভিক্ষা করব না। পথেঘাটে থাকব।

আমি বললাম, সোনারগাঁ হোটেলের একটা রুম আমাদের নেওয়া আছে। রুমটা ডষ্টের চৌধুরী আখলাকুর রহমান ওরফে বল্টু স্যারের। সেখানে উঠবেন? রুম খালি আছে।

সে গেছে কোথায়?

ওই যে কোনায় মশারি খাটিয়ে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর নাকে দু'ফোটা খাঁটি সরিষার তেল দেওয়া হয়েছে। নেজাল প্যাসেজ ক্লিয়ার থাকায় ভালো ঘুম হচ্ছে। আগে ঘুমের মধ্যে ইলেক্ট্রন, পজিট্রন এইসব হয়ে যেতেন। এখন হচ্ছেন না।

খালু সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সে এসানে বাস করে নাকি?

জি। তাঁর জন্যে নতুন মশারি কেন্দ্র হয়েছে।

খালু মশারি তুলে উঁকি দিয়ে বললেন, আসলেই তো সে! যাথা পুরো মনে হয় কলাপস করেছে। তাঁর ভাই নাটের মতো অবস্থা। নাট লালমাটিয়া কলেজে জিওফিজ পড়াত। হঠাৎ একদিন বলে কী, কাক হলো মানবসভ্যতার মাপকাঠি। কাকের সংখ্যা গোনা দরকার। কাকের সংখ্যার সঙ্গে সভ্যতা ইনভারলি রিলেটেড।

তারপর উনি কি কাক গোনা শুরু করলেন?

বাকি খবর রাখি না। আমার রাখার প্রয়োজন কী? তাঁর নিজের ভাই বল্টু কোনো খবর রাখে? সে তো নাকে সরিষার তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটির এত বড় প্রফেসরশিপ ছেড়ে চলে এসেছে। এখন এক মাজারের চিপায় শয়ে আছে। পদ্মার পাড়ে তাদের বিশাল দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। দুই ভাইয়ের কেউই নেই। একজন মাজারে শয়ে আছে, আরেকজন কাকশুমারি করছে। দুজনকেই থাপড়ানো দরকার।

হজুর মনে হয় আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, জনাব আপনার মন মেজাজ মনে হয় অত্যধিক খারাপ।

খালু সাহেবে জবাব দিলেন না। হজুর বললেন, একমনে জিকির করেন, মন শান্ত হবে।

কী করব?

জিকির। আপনার কানে কানে আল্লাহপাকের একটা জাতনাম বলে দিব। দমে দমে জিকির করবেন। প্রতি দমের জন্য সোয়াব পাবেন।

খালু সাহেবে বললেন, স্টুপিড!

হজুর বললেন, অত্যধিক খাঁটি কথা বলেছেন। আমি মূর্খ। ইহা সত্য। আমি একা না। আমরা সবাই মূর্খ। শুধু আল্লাহপাক জ্ঞানী। উনার এক নাম আল আলীমু। এর অর্থ মহাজ্ঞানী। এই নাম জালালী শুণ সম্পন্ন। উনার আরেক নাম আল মুহচিউ। এর অর্থ সর্বজ্ঞানী। এই নামও জালালী। উনার কিছু নাম আছে জামালী, যেমন আর রায়বাকু। এর অর্থ মহান অনুদাতা।

খালু সাহেব একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন আরেকবার হজুরের দিকে তাকাচ্ছেন। মাথায় জট পাকানো অবস্থায় খালু এসেছেন। সময় যতই যাচ্ছে জট না খুলে আরও পাকিয়ে যাচ্ছে। তাঁর জন্যেও মশারি কিনতে হবে কি না, কে জানে!

বল্টু স্যারের সঙ্গে খালু সাহেবের দোষ বৈঠক হলো। খালু এক নাগাড়ে কথা বলে গেলেন, বল্টু স্যার শুনে গেলেন।

খালু সাহেব বললেন, তোমাদের ‘জিনে’ কিছু সমস্যা আছে। তোমার এক ভাই কাক গুনে বেড়াচ্ছে আর তুমি মাজারে শুয়ে ঘুমাচ্ছ। শুনলাম নাকে সরিষার তেলও দিয়েছ।

স্যার বললেন, এক ফোঁটা করে দিয়েছি। এতে সুনিদ্রা হয়েছে। আমেরিকানরা টেন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইডের সলিউশন দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। সরিষার তেলের পাশে ওই জিনিস দাঁড়াতেই পারবে না। আমি চিন্তা করছি সরিষার তেলের বিশেষ এই ব্যবহার পেটেন্ট করে ফেলব।

খালু সাহেব বললেন, পেটেন্ট করতে চাও করো। যাদের কাজকর্ম নাই তারা তো এই সবই করবে। আমি জানতাম না যে, তুমি প্রফেসরশিপ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ। কয়েকদিন আগে জেনেছি। চাকরি ছাড়ার কারণটা কী?

স্যার বললেন, স্ট্রিং-এর সমস্যা।

খালু সাহেব বললেন, স্ট্রিং-এর সমস্যা মানে কী?

এই জগৎ শেষটায় খেমেছে String খিওরিতে। এই খিওরি বলছে, মহাবিশ্বে যা আছে সবই কম্পন। স্ট্রিংয়ের মতো কম্পন।

কম্পন?

জি কম্পন। সুপার স্ট্রিং থিওরিটা কি ব্যাখ্যা করব? পাঁচ ডাইমেনশন, একটু জটিল মনে হতে পারে।

না।

আমি, আপনি, চন্দ, সূর্য—সবই কম্পনের প্রকাশ।

কিসের প্রকাশ?

কম্পনের।

খালু সাহেব বললেন, তোমার মাথায় তো দমকল দিয়ে পানি ঢালা দরকার। সবকিছু মাথা থেকে দূর করো। বিয়ে করো। এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করো যার মাথা ঠিক আছে। মাজেদা তুভুরি নামে যাকে ঠিক করেছে, এই মেয়ে তোমার জন্য খারাপ হবে না। সে ক্ষু ড্রাইভার টাইপ মেয়ে। তোমাকে টাইট দিতে পারবে। বুঝেছ?

জি।

তাকে নিয়ে তোমার ধামের বাড়িতে সংসার পাতো।

জি আচ্ছা।

নাট-কে খুঁজে বের করো। নাট-বল্টু একসঙ্গে থাকো।

হজুর খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি উনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না। উনি মাসুক অবস্থায় আছেন।

খালু সাহেব বললেন, মাসুক অবস্থাটা কী?

হজুর বললেন, আল্লাহর পথে যে দেওয়ানা হয় সে মাসুক। যেমন, লাইলী মজনু।

খালু সাহেব কঠিন গলায় বললেন, আমি তো যতদূর জানি মজনু লাইলীর প্রেমে দেওয়ানা হয়েছিল।

হজুর বললেন, মূলে আল্লাহপাকের প্রেমে মাসুক। মাজারে কিছুদিন থাকেন। জিকির করেন বা না-করেন, আপনার মধ্যেও মাসুকভাব হবে।

খালু সাহেব গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁকে খানিকটা উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তাঁর স্ট্রিংয়ের কম্পন বেশি হচ্ছে। সেই তুলনায় বল্টু স্যার শান্ত। খালু সাহেবকে গোসল করিয়ে আনব কি না বুঝতে পারছি না। রেস্টুরেন্ট থেকে সিঙ্গেল শাস্পু দিয়ে গোসল করে আনানোর ফল শুভ হতে পারে। ফেরার পথে বাঁদরের খেলা দেখিয়ে আনা যেতে পারে। বাঁদর দেখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।

খালু সাহেব বল্টু স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাথা থেকে Physics দূর করে দাও। অন্য কিছু নিয়ে ভাবো। ডিরেকশন চেঙে করো। Physics যদি হয় উত্তর তাহলে চলে যাও দক্ষিণে। পদাৰ্থবিদ্যার ‘অপজিট’ কী হবে?

বল্টু স্যার বললেন, ভূত-প্রেত হতে পারে।

খালু সাহেব বললেন, ভূত-প্রেত খারাপ কী? ওই নিয়ে চিন্তা করো। প্রয়োজনে বই লিখে ফেলো। ফিজিস্কের ওপর তোমার লেখা কী বই নাকি আছে? New York Times-এর Best seller। নাম কী বইটার?

ফিজিস্কের বই না। ম্যাথমেটিক্স—The Book of Infinity.

আমি বললাম, ‘বাংলার ভূত’ এই নামে স্যারের একটা বই লেখার পরিকল্পনা আছে। গবেষণাধৰ্মী বই। ভূতদের পরিচিতি থাকবে। তাদের কর্মকাণ্ড থাকবে।

খালু সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সত্যি কি এরকম কিছু লিখছ নাকি?

বল্টু স্যার বললেন, ট্র্যাক বদলের জন্যে লেখা যেতে পারে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

খালু সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হজুর অত্থন বললেন, সব সমস্যার সমাধান জিকির। দমে দমে সোয়াব।

খালু সাহেব বললেন, আমি বল্টুর সঙ্গে জটিল কিছু কথা বলছি। আপনি এর মধ্যে জিকির জিকির করবেন না।

হজুর বললেন, জটিল কথার মধ্যেও জিকির করা যায়। আপনি মুখে কথা বলতে থাকবেন, আপনার ‘কলব’ জিকির করতে থাকবে।

খালু সাহেব ক্ষিণ্ণ গলায় বললেন, চুপ!

হজুর উদাস গলায় বললেন, আপনি চুপ করতে বলেছেন, চুপ করলাম। আমার ‘কলব’ কিন্তু চুপ করে নাই। সে জিকির করেই যাচ্ছে। আল্লাহপাকের কী অপূর্ব লীলা। একইসঙ্গে কথা, একইসঙ্গে না-কথা। সোবাহানাল্লাহ।

আজ বৃহস্পতিবার। আজকের আবহাওয়া ব্যাঙ্গদের জন্যে উত্তম। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। বল্টু স্যারকে A4 সাইজের কাগজ কিনে দিয়েছি, তিনি ‘বাংলার ভূত’ গ্রন্থ লেখা শুরু করেছেন। ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে। অনুবাদ করে বাংলা একাডেমীতে জমা দেওয়া হবে। মূল ইংরেজিটি Penguin-ওয়ালাদের গচ্ছানোর চেষ্টা করা হবে।

বাংলার ভূতের শুরুটা এ রকম—

"Because the ghosts are not there" might be reason enough to write a book about ghosts. But fortunately, there are better reasons than that.

Ghosts in its various guises, has been a subject of enduring fascination for millennia...

বই লেখা শুরু হয়েছে, এই সুসংবাদটা বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবকে দেওয়ার জন্যে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি মনে হয় খুবই বিরক্ত হয়েছেন।

কর্কশ গলায় বললেন, আপনি হিমু? সেই হিমু যে অসময়ে টেলিফোন করে আমাকে বিরক্ত করে?

জি স্যার। একটা সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে টেলিফোন করেছি। বই লেখা শুরু হয়ে গেছে স্যার।

কী বই লেখা শুরু হয়েছে?

'বাংলার ভূত' নামের বইটা। ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে, আপনাদের কষ্ট করে বাংলায় অনুবাদ করে নিতে হবে।

ডিজি সাহেব দীর্ঘনিঃশ্঵াস ফেললেন। আমি বললায়, ইংরেজি ভার্সানটা আমরা পেঙ্গুইন থেকে বের করতে চাচ্ছি। স্যার, ওদের কোনো নম্বর কি আপনার কাছে আছে?

না।

বইটার ইংরেজি ভার্সান যদি পড়তে চান চলে আসবেন। আমার ঠিকানাটা কি দেব?

ডিজি সাহেব কঠিন গলায় বললেন, হ্যাঁ ঠিকানা লাগবে। আমি আসব। আমি অবশ্যই আসব। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

আরেকটা ছোট কথা স্যার। একটা বাংলা শব্দের মানে জানা অতীব প্রয়োজন। বল্টু স্যার চাচ্ছেন। শব্দটা হলো 'অনিকেত'। স্যার, এই শব্দের অর্থ কি আপনাদের জানা আছে?

ডিজি স্যার বললেন, এর অর্থ তোমার মাথা।

খালু সাহেব রাগকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ বাড়িতে চুকতে গিয়েছিলেন। অনেকবার বেল টেপার পরও মাজেদা খালা দরজা খোলেন নি। দরজার ফাঁক দিয়ে বললেন, Go to hell.

খালু সাহেব মিনমিন করে বললেন, যা হওয়ার হয়েছে। বাদ দাও। আমি নিজের বিছানা ছাড়া সারা রাত এক মাজারে না ঘুমিয়ে বসে ছিলাম।

মাজেদা খালা বললেন, শুনে খুশি হয়েছি। এখন আবার মাজারে চলে যাও। আমি তুতুরিকে দিয়ে বাড়িঘর ভাংচুর করে ঠিক করব, তখন এসো বিবেচনা করব।

মাজেদা। আমি সরি। মাজারে আমার পক্ষে ঘুমানো অসম্ভব ব্যাপার।

তাহলে ফুটপাতে ঘুমাও। কিংবা রেলস্টেশনের প্লাটফরমে চলে যাও। খবরের কাগজ বিছিয়ে ঘুমাও। পুরানো খবরের কাগজ আছে। দেব?

খালু সাহেব ফিরে এসেছেন। নিমগাছের নিচে বসে আছেন। তাঁর চেহারায় তীব্র বৈরাগ্য প্রকাশিত হয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে নিমগাছ ছেড়ে হাঁটা শুরু করতে পারেন। কিংবা নিমগাছে চড়ে বসতে পারেন। দুই ক্ষেত্রেই ফিফটি ফিফটি সম্ভাবনা।

হজুর আনন্দে আছেন। তাঁর মাথার ওপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে। বল্টু স্যার সিলিং ফ্যান কিনে দিয়েছেন। হজুর আমাকে ডেকে কানে কানে বলেছেন, তোমার এই স্যার মাসুক অংকিত। উনার জন্যে খাসদিলে দোয়া করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয়ে জুন দিয়ে দোয়া করালে। আগামী শনিবার বাদ এশা জুনের মাধ্যমে দোয়া করাব।

আমি বললাম, ইনশাল্লাহ।

তোমার খালুকে বলো আমি একটা তাবিজ লিখে দিব। এই তাবিজ গলায় পরে স্তী বা হাকিমের সামনে উপস্থিত হলে তাদের দিল নরম হয়।

সকাল দশটার দিকে চোখে সানগ্লাস পরা একজন এসে আমাকে বলল, এক্সকিউজ মি! আমি একটি মেয়ের খোঁজ করছি। তার নাম তুতুরি। সে আমার ছাত্রী। তার আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা।

আমি বললাম, তুতুরি এখনো আসে নি। নিশ্চয়ই চলে আসবে। আপনি হজুরের সঙ্গে বসুন। ফ্যান আছে, আরাম পাবেন।

তুতুরির যে নম্বর আমার কাছে আছে, সেটা ধরছে না। আপনার কাছে তার অন্য কোনো নম্বর কি আছে?

জু-না। আপনি হজুরের ঘরে বসুন। এত অস্ত্রির হবেন না। আপনি আসল জায়গায় চলে এসেছেন। এই জায়গা থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে না। আপনিও তুতুরি ছাড়া ফিরবেন না। জনাব, আপনার নামটা বলুন।

জহির ।

জহির সন্দেহজনক দৃষ্টিতে মাজারের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি
বললেন, কার মাজার?

পীর বাচ্চাবাবার মাজার। তবে আমার ধারণা ঘটনা অন্য।

কী ঘটনা?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, মাজারের প্রধান খাদেমকে দেখছেন না?
উনার দুই পা কাটা পড়েছিল। আমার ধারণা কাটা দুই পা কবর দিয়ে তিনি
মাজার সাজিয়ে বসেছেন।

জহির বললেন, মাজারের সাইজ অবশ্য খুবই ছোট। টাউটে দেশ
ভরতি হয়ে গেছে। কাটা পায়ের ওপর মাজার তুলে ফেলা বিচিত্র কিছু না।
এদের ক্রসফায়ারে দেওয়া উচিত।

আমি বললাম, আমাদের হজুরের অবশ্য কেরামতিও আছে।

কী কেরামতি?

উনার যেখানে পায়ের আঙুল থাকার কথা সেখানে টান দিলে আঙুল
ফোটে।

জহির বললেন, এই সব বুলশিট খাদেমকে শুনিয়ে লাভ নেই। আপনি
কে?

আমি খাদেমের প্রধান খান্দাম। আমার কাজ উনার পা টেপা। পায়ের
যেখানে আঙুল ছিল সেই আঙুল ফুটানো।

উদ্ভট কথাবার্তা আমার সঙ্গে বলবেন না। আমি শিশি খাওয়া পাবলিক
না।

আমি বললাম, জগতটাই উদ্ভট। হার্ডার্ডের ফিজিঝের Ph.D. বলেছেন,
আমরা কিছু না। আমরা সবাই স্ট্রিং-এর কম্পন।

জহির বললেন, ননসেস কথাবার্তা বন্ধ রাখুন।

আমি বললাম, জি আছা। বন্ধ।

জহির ঘড়ি দেখে বিড়বিড় করে বললেন, দেরি করছে কেন বুঝলাম
না।

আমি বললাম, পটাসিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করতে মনে হয় দেরি
হচ্ছে।

পটাসিয়াম সায়ানাইড?

জি। খাওয়ামাত্র সব শেষ।

কে খাবে?

আপনি খাবেন। আর আপনার বক্স খাবেন। আপনাদের দু'জনকে খাওয়ানোর জন্যেই তুতুরি এই জিনিস জোগাড় করছে। কেমিস্ট্রির এক চিচার তুতুরির বান্ধবী। তিনি একগ্রাম পটাসিয়াম সায়ানাইড দিতে রাজি হয়েছেন। মার্গারিটা নামের এক ধরনের ককটেলের সঙ্গে মিশিয়ে আপনাদের খাইয়ে দেওয়া হবে। মার্গারিটার নাম শুনেছেন? টাকিলা দিয়ে বানানো হয়।

জহিরের মাথা নিশ্চয়ই চক্র দিয়ে উঠল। তিনি মাজারের রেলিং ধরে চক্র সামলালেন।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আপনি দুশ্চিন্তাপ্রস্ত হবেন না। পটাসিয়াম সায়ানাইডে মৃত্যু অতি দ্রুত হয়। কিছু বুঝবার আগেই শেষ। বমি, খিচুনি, ছটফটানি কিছুই হবে না। টেরও পাবেন না। হাসিমুখে যদি খান, মৃত্যুর পরেও হাসিমুখ থাকবে। মুখের হাসি মুছে যাবে না।

জহির মাজারের রেলিং ধরে তাকিয়ে আছেন। তার কপালে ঘাম। দেখেই বোৰা যাচ্ছে, পটাসিয়াম সায়ানাইড ঘটিত প্রবল ধাক্কায় তার স্বাভাবিক মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় সাজেশন খুব কার্যকরী হয়। আমি যদি বলি, জহির সাহেব! আপনি দুষ্টপ্রকৃতির লোক। অতি দুষ্ট। অতি দুষ্টরা এই মাজার ধরলে সমস্যা আছে। তারা আটকা পড়ে যাবে। হাত ছুটিয়ে নিতে পারবে না।—এই সাজেশন জহিরের মন্তিক গ্রহণ করবে। মন্তিক থেকে হাতে কোনো সিগনাল পৌছাবে না। অতি দ্রুত হাত ও পায়ের মাসল শক্ত হয়ে যাবে।

বিশেষ এই সাজেশন দেওয়ার আগে আরও হকচকিয়ে দেওয়া দরকার। আমি সহজ গলায় বললাম, আপনি নিশ্চয়ই মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছেন। আপনার বক্স কোথায়? মাইক্রোবাসে? সে এলে ভালো হতো, দুজন হজুরের কাছে তওবা করে নিতে পারতেন। মৃত্যুর আগে তওবা জরুরি। আপনার বক্স হিন্দু, এটা একটা সমস্যা। তবে সব সমস্যারই সমাধান আছে। উনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন। তারপর তওবা। তারপর মৃত্যু। তারপর বেহেশতের হৱদের সঙ্গে লদকা-লদকি।

জহির চাপা আওয়াজ করলেন, আমি বললাম, জহির ভাই, বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। অতি দুষ্ট কেউ মাজারের রেলিং ধরলে আটকে যায়। অতীতে কয়েকবার এরকম ঘটনা ঘটেছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে,

আপনি আটকে গেছেন। হাজার চেষ্টা করেও হাত ছুটাতে পারবেন না। যত চেষ্টা করেন হাত তত আটকাবে। আমার অনুরোধ, অঙ্গির হবেন না।

অটো সাজেশন কাজ করেছে। জহিরের পকেটে মোবাইল ফোন বাজছে। তিনি টেলিফোন ধরছেন না। মাজারের রেলিং থেকে হাত উঠাচ্ছেন না। তার মুখের মাসল শক্ত হয়ে উঠছে।

অনেকক্ষণ ‘আপনি আপনি’ করে জহির প্রসঙ্গ বলা হলো, এখন তুমি করে বলা যাক। সবচেয়ে ভালো হতো জাপানিদের মতো ‘সর্বনিম্ন তুই’ করে বললে। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় তুই-এর নিচে কিছু নেই। বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে হবে। আপাতত জহিরকে ‘তুমি’ সম্মোধন করেই চালাই।

জহির খুকখুক করে কাশছে। নাক টানছে। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার চাপা এবং কাতর গলা শোনা গেল, ভাই, একটু সাহায্য করেন।

আমি বললাম, অবশ্যই সাহায্য করব। ভূপেন হাজারিকা বলে গেছেন, মানুষ মানুষের জন্য। কী সাহায্য চান?

পানি খাব।

জহির ভাই, পানি খাওয়া ঠিক হচ্ছেন। পানি খেলেই প্রস্তাবের বেগ হবে। মাজারে প্রস্তাব করা ঠিক হবে না। পীর বাচ্চাবাবা রাগ করতে পারেন। সিগারেট ধরিয়ে মুখে দিয়ে?

ধূমপান করি না। আমাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করেন।

জহির ভাই! আমার অনুরোধ, অঙ্গির হবেন না। মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। ভাবি চলে এলে আপনার অঙ্গিরতা কমবে। উনাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।

ভাবিটা কে?

আপনার স্ত্রীর কথা বলছি।

জহির ভাই বললেন, বদমাইশ! মেরে তোর হাত্তি গুঁড়া করে দেব।

তিনি ঘটা পার হয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, জহির রেলিংয়ে আটকে আছে। হজুর একটু পর পর বলছেন, সোবাহানাল্লাহ! আল্লাহপাকের এ-কী কেরামতি।

জহিরের বক্স পরিমল এসেছিল। সে কিছুক্ষণ হতভম হয়ে দেখল। জহির কাতর গলায় বলল, কোমর ধরে টান দাও। দেখার কিছু নাই।

পরিমল বলল, পাগল হয়েছ? তোমার কোমরে ধরলে আমিও আটকে যাব। বলেই দাঁড়াল না, অতি দ্রুত স্থান ত্যাগ করল।

এর মধ্যে মাজারের কেরামতি আশপাশের লোকজনের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই এসে দেখছে মাজারে মানুষ আটকে আছে। 'দৈনিক সাতসকাল' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার এসে গেছে। রিপোর্টারের ধারণা, ইচ্ছা করে কেউ একজন রেলিংয়ে আটকে থাকার ভান করছে যেন মাজারের নাম ফাটে। এই রিপোর্টার হজুরের কাছে গোপনে দশ হাজার টাকা চেয়েছে। টাকা পেলে পজেটিভ রিপোর্ট করা হবে, না পেলে নেগেটিভ রিপোর্ট। এমন রিপোর্ট যে ফ্রডবাজির দায়ে হজুরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে।

হজুর বললেন, আপনার যা রিপোর্ট করার করবেন। আমার হাতে কিছুই নাই, সবই পীর বাচ্চাবাবার হাতে। সোবাহানাল্লাহ।

সাংবাদিক থাকতে থাকতেই বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেব চলে এলেন। তিনি হতভম্ব। আটকে পড়া মানুষটিকে দেখে বললেন, আপনার নাম জহির না? আপনি বাংলা একাডেমীতে একটা পাঞ্চালিপি জমা দিয়ে টাকা নিয়ে গেছেন। পাঞ্চালিপির নাম 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা' শুটকির একশত রেসিপি'।

জহির বলল, পাঞ্চালিপি আমার স্ট্রাইক পরিমলের লেখা। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম।

এখন মাজারে আটকে আছেন?

জি। স্যার, আমার জন্য একটু দোয়া করেন।

ডিজি স্যার বিড়বিড় করে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

হজুর বললেন, বলেন সোবাহানাল্লাহ। এই ধরনের মাজেজা দেখলে সোবাহানাল্লাহ বলা দুরস্ত।

ডিজি স্যার আমাকে দেখেও চিনতে পারলেন না বলে মনে হলো। মাজারে মানুষ আটকা দেখে তার সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম।

স্যার, আমাকে চিনেছেন? আমি হিমু। ওই যে ফুতুরি ভুতুরি। আপনি হজুরের ঘরে বসুন। পাঞ্চালিপি দিয়ে দেই, দশ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। নিরিবিলি বসে পড়ুন।

কিসের পাঞ্চালিপি?

বাংলার ভূত।

ডিজি স্যার বিড়বিড় করে কী বললেন বুঝলাম না।

আমি বললাম, স্যার কিছু বলেছেন?

ডিজি স্যার বললেন, একজন ডাক্তার দেকে আনা উচিত, ডাক্তার দেখুক। একটা লোক মাজারে আটকে আছে, এটা কেমন কথা?

হজুর বললেন, জনাব, এই জিনিস মেডিকেলের আভারে না। এটা গায়েবি।

ডিজি স্যার বললেন, আপনি কে?

হজুর বললেন, আমি এই মাজারের প্রধান খাদেম। হিমু আমার শিষ্য। জনাব, আপনার পরিচয়টা?

আমি ডিজি, বাংলা একাডেমী।

হজুর আনন্দিত গলায় বললেন, সোবাহানাল্লাহ। বিশিষ্ট লোকজন আসা ওরু করেছেন। সবই পীর বাচ্চাবাবার কেরামতি।

এত বড় ঘটনা ঘটেছে, বল্টু স্যার এবং খালু সাহেব দু'জনের কেউ নেই। তারা জোড়া বাঁদর কিনতে গেছেন। জোড়া বাঁদর কেনায় খালু সাহেব কীভাবে যুক্ত হলেন আমি জানি না।

মাজারের সামনে প্রচুর লোক জমে গেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আপনাআপনি কিছু ভলেন্টিয়ার ক্রেতে হয়। লাঠি হাতে একজন ভলেন্টিয়ারকে দেখা যাচ্ছে। ভলেন্টিয়ারের পরনে লাল পাঞ্জাবি মাথায় লাল ফেঁকি। ভলেন্টিয়ার কঠিন গলায় বলেছে, লাইন দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে আসেন। ছবি তোলা নিষেধ। মোবাইল বন্ধ করে রাখেন। গরম মাজার! কেউ হাত দিবেন না। হাত দিলে কী অবস্থা নিজের চোখে দেখে যান।

জহিরের শিক্ষাসফর হয়ে গেছে। সে এখন হার্ট অ্যাটাকের সময় যেভাবে ঘামে সেইভাবে ঘামছে। ঘামে শার্ট ভিজে গেছে। প্যান্টও ভিজেছে। তবে এই ভেজা ঘামের ভেজা না, অন্য ভেজা।

তুতুরিকে আসতে দেখা যাচ্ছে। সে ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছে। জহির তুতুরিকে দেখে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমাকে বাঁচাও।

তুতুরি বলল, স্যার, আপনার কী সমস্যা?

জহির বলল, রেলিংয়ে হাত রেখেছি আর ছুটাতে পারছি না।

তুতুরি বলল, আমরা তাহলে আপনার গ্রামের বাড়িতে যাব কীভাবে?

জহির বলল, রাখো গ্রামের বাড়ি। একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করো। প্রিজ প্রিজ প্রিজ।

তুতুরি বলল, আপনি মাজারের রেলিংয়ে হাত দেওয়ামাত্র হাত আটকে গেল? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? মাজারের রেলিং কোনো চুম্বক না, আর আপনিও লোহা না।

জহির ইংরেজিতে বলল, Please, no argument, do something.

তুতুরি বলল, আপনার বন্ধু পরিমল! সে আটকায় নি কেন? তারও তো আটকানোর কথা।

তুতুরি

একজন মানুষ নাকি সারা জীবনে সাতবারের বেশি বিস্ময়ে অভিভূত হতে পারে না। এই সাতবারের মধ্যে একবার জন্মের পর পর পৃথিবী দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়। আরেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে। এই দুইবারের শৃঙ্খল কোনো কাজে আসে না। বাকি থাকে পাঁচ।

এই মাজারে এসে পাঁচের মধ্যে দুটা কাটা গেল। আমি দু'বার বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।

জহির স্যার মাজারের রেলিং ধরে আটকে আছেন—এটা দেখে প্রথম বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া। এই ঘটনার পেছনে হিমুর নিশ্চয়ই হাত আছে। মাজারের রেলিংয়ে সুপার গু লেপে থাকে না যে হাত দিলেই হাত আটকে যাবে। এরচেয়ে বড় বিস্ময় জ্ঞানীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। মাজারের প্রধান খাদেম পা কাটা হজুর সেই বিস্ময়। এই হজুর আমাকে ট্রাকের নিচে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, এই খবর ছোটবেলায় পেয়েছিলাম। বাবা কয়েকবারই আমাকে হজুরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। উনি অচেতনের মতো ছিলেন, কোনোবারই ঠিকমতো আমাকে দেখেন নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, হজুর আমাকে দেখেই বললেন, জয়নাব না? সোবাহানাল্লাহ। কেমন আছ মা? আহারে কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম। এত বড় হয়ে গেলা কীভাবে? সোবাহানাল্লাহ! সোবাহানাল্লাহ!!

আমি জানি তাঁর পা নেই, তারপরেও আমি কদমবুসি করার জন্যে নিচু হলাম। হজুর বললেন, পা নাই তাতে কোনো সমস্যা নাই গো মা। তুমি কদমবুসি করো—জিনিস জায়গামতো পৌছে যাবে। তোমার পিতামাতা কেমন আছেন?

তাঁরা দু'জনই মারা গেছেন।

আহারে আহারে আহারে। চিন্তা করবা না মা, আল্লাহপাক এক হাতে নেন আরেক হাতে ডাবল করে ফেরত দেন। এটাই উনার কাজের ধারা। মা, তুমি কি বিবাহ করেছ?

জি-না।

এই বিষয়েও চিন্তা করবে না। খাসদিলে দোয়া করে দিব। প্রয়োজনে জিনের মারফত দোয়া করাব, জিনের সুবিধা যখন আছে। সুবিধা কেন নিব না? মা, ফ্যানের নিচে বসো। মাথাটা ঠাণ্ডা করো। তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই— ইনি ডিজি বাংলা একাডেমী। বিশিষ্টজন। মাজারের টানে চলে এসেছেন।

আমি ডিজি সাহেবকে সালাম দিলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, তুমি একজন আর্কিটেক্ট?

জি স্যার।

নাম কী?

ভালো নাম জয়নাব, ডাকনাম তুতুরি।

তুতুরি?

জি স্যার তুতুরি।

ডিজি স্যার বিড়বিড় করে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তুতুরি থেকেই কি ফুতুরি ভুতুরি?

জি স্যার।

ডিজি স্যার হতাশ গলায় বললেন, আমি তো মনে হয় ভালো চক্রে পড়ে গেছি।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বাইরে হইচই হতে লাগল। আমি এবং ডিজি স্যার ঘটনা কী দেখার জন্যে বের হলাম।

ঘটনা হচ্ছে—অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে একজন ডাক্তার এসেছেন। ডাক্তারের সঙ্গে পরিমল। এই বদমায়েশ মনে হয় ডাক্তার নিয়ে এসেছে।

ডাক্তার জহির স্যারকে বললেন, হাতের সব মাসল স্টিফ হয়ে গেছে। আপনি কি পা নাড়াতে পারেন?

জহির স্যার বললেন, পারি। তবে পায়ের তালু গরম হয়েছে। কাউকে বলেন, জুতা-মোজা খুলে দিতে।

হিমু আগ্রহী হয়ে জুতা-মোজা খুলল। জহির স্যার কয়েকবার পা ওঠানামা করলেন। তখন হিমু বলল, জুতা-মোজা খোলা মনে হয় ঠিক হয় নাই। এখন মেঝের সঙ্গে পা আটকে যেতে পারে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, হিমুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জহির স্যার কাঁদো কাঁদো কঠে বললেন, পা আটকে গেছে।

ডাঙ্কার সাহেব ঘটনা দেখে ঘাবড়ে গেছেন, মাসল রিলাক্সের ইনজেকশন দিয়ে লাভ হবে না। প্রবলেমটা নিওরো। নিওরো মেডিসিনের কাউকে আনতে হবে।

ডিজি স্যার নিচু গলায় আমাকে বললেন, হিমু নামের ওই যুবকের এখানে কিছু ভূমিকা আছে। অতি দৃষ্টপ্রকৃতির যুবক। আমাকে নানান ভূজৎ ভাজৎ দিয়ে সে এখানে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। মাজারের খাদেমটাও বদ। সে এই ঘটনায় যুক্ত।

আমি বললাম, স্যার, হিমু বদ না ভালো—এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারছি না। তবে যিনি খাদেম, তিনি চলন্ত ট্রাকের নিচে পড়া থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। ট্রাকের চাকা তার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। তার পা কেটে বাদ দিতে হয়।

ডিজি স্যার বললেন, কী বলো তুমি! উনি তো তাহলে সুফি পর্যায়ের মানুষ। উনার সম্পর্কে অতি বাজে ধারণা ছিল ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আমি এবং ডিজি স্যার হজুরের সামনে বসে আছি। হিমু আমাদের জন্যে চা নিয়ে এসেছে, আমরুল চা খাচ্ছি। হিমু নিজে জহির স্যারকে চা খাওয়াচ্ছে। চায়ের কাপ স্যারের মুখে ধরছে, স্যার চুক চুক করে খাচ্ছে।

হজুর চোখ বন্ধ করে জিকিরে বসেছেন। ডিজি স্যারের হাতে কিছু কাগজ। কাগজগুলো হিমু তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, হার্ডার্ডের ফিজিস্কের একজন Ph.D. ভূত নিয়ে বই লিখছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

আমি বললাম, একজন মানুষের মাজারের রেলিংয়ে আটকে যাওয়া যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহলে হার্ডার্ডের Ph.D.-র ভূতের ওপর বই লেখা বিশ্বাসযোগ্য। আমি উনাকে চিনি। তিনি ম্যাথমেটিস্কের একটি বই লিখেছেন, The Book of Infinity. বইটি New York Times-এর বেস্ট সেলারের তালিকায় আছে। ম্যাকমিলন বুক কোম্পানি বইটির প্রকাশক।

ডিজি স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, বলো কী!

আমি বললাম, আপনি কয়েক পাতা পড়ে দেখুন। হয়তো দেখা যাবে এই বইটিও হবে বেস্ট সেলার।

ডিজি স্যার পড়া শুরু করেছেন। আগ্রহ নিয়ে পড়ছেন।

আমি বাইরে কী হচ্ছে দেখার জন্যে বের হলাম। পরিস্থিতি শান্ত। জনসমাগম বেড়েছে। পুলিশ চলে আসায় শৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। ছেলে এবং মেয়ের জন্যে আলাদা লাইন হয়েছে। জহির স্যারের স্ত্রী চলে এসেছেন। মহিলা মেনাক পর্বত সাইজের। তিনি খড়খড়ে গলায় বলছেন, তুমি যে কতটা ভয়ঙ্কর মানুষ এটা আমি জানি। এত দিন মুখ খুলি নি। আজ খুলব। তুমি এখানে আটকা পড়েছ, আমি খুশি। সারা জীবন এখানে আটকে থাকো এই আমি চাই।

হিমু মহিলাকে বলল, ম্যাডাম, আপনি উদ্বেজিত হবেন না। যেভাবেই হোক আমরা জহির ভাইকে রিলিজ করে আপনার হাতে তুলে দিব। তখন আপনি ব্যবস্থা নিবেন। প্রয়োজনে ডাঙ্কারের উপস্থিতিতে কজি কেটে উনাকে রিলিজ করা হবে। জহির ভাই! রাজি আছেন?

জহির স্যার গোঙ্গনির মতো শব্দ করলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি হিমুর দিকে। এই মানুষটা কে? মাজেদা খালা যেমন বলেছিলেন তেমন কিছু? অলৌকিক শক্তিধর কেউ?

ডিজি স্যার থতমত অবস্থায় আছেন। তিনি লেখা পড়ে শেষ করেছেন। বুঝতে পারছি লেখা তাকে অভিভূত করেছে। তিনি নিজের মনে বললেন, ব্রিলিয়ান্ট! এমন স্বাদু রচনা বহুসম্ম পাঠ করি নি। এই লেখককে রয়েল স্যালুট দিতে ইচ্ছা করছে। এই বইটির বঙ্গানুবাদ বাংলা একাডেমী থেকে অবশ্যই বের হবে। এতে যদি আমার চাকরি চলে যায় চলে যাবে।

ডিজি স্যারকে হজুর তাবিজ লিখে দিয়েছেন। ডাবল একশান তাবিজ। এই তাবিজ ডান হাতে মুঠো করে নিলে স্ত্রী এবং হাকিম এই দুই শ্রেণীর দিলই নরম হবে।

ডিজি স্যার আগ্রহ নিয়ে তাবিজ হাতে নিয়েছেন। বাইরে তুমুল উদ্বেজন। কী হয়েছে দেখার জন্য বের হলাম।

পরিমলকে ধরে আনা হয়েছে। কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে নিমগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। একটি চোখে কালশিটা পড়েছে। ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। পা টেনে হাঁটছে। মনে হয় মেরে পা ভেঙে ফেলেছে।

পরিমল নামের মানুষটার মনে ভয়াবহ আতঙ্ক। সে একবার কোমরে বাঁধা দড়ির দিকে তাকাচ্ছে আর একবার নিমগাছের উঁচু ডালের দিকে

তাকাছে। সে কি ভাবছে তাকে এই দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে বুলিয়ে দেওয়া হবে? হতেও পারে। উত্তেজিত জনতা ভয়ঙ্কর জিনিস। তারা পারে না এমন কাজ নেই।

ডিজি স্যারের কথা শেষ হওয়ার আগেই শিকলে বাঁধা দুই বাঁদর নিয়ে বল্টু স্যার এবং মাজেদা খালার হাজব্যাঙ্গ চুকলেন। বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তা নিয়ে দুজনের কাউকেই আগ্রহী মনে হলো না। দু'জনের সমগ্র চিন্তাচেতনা বাঁদর দম্পত্তিকে নিয়ে। আমি ডিজি স্যারের সঙ্গে দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিলাম। এই বিষয়েও তাদের কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। বল্টু স্যার বললেন, শুশুরবাড়ি যাত্রা।

মাজেদা খালার স্বামী বললেন, এই আইটেম সবচেয়ে ফালতু। প্রথমে দেখাও স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন।

দুই বাঁদর স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন অভিনয় করে দেখাচ্ছে। হজুর বললেন, সোবাহানাল্লাহ!

ডিজি স্যার একবার বাঁদর দুটিকে দেখছেন, একবার হার্ডেডি Ph.D.-র দিকে তাকাচ্ছেন, একবার তার হাতের কাগজের তাড়াতে চোখ বুলাচ্ছেন। একইসঙ্গে মানবজাতির তিনটি আবেগ জ্ঞান মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিশ্বিত, হতভম এবং স্তুতি।

বাইরে বিরাট হইচই। দুটিনটিডি চ্যানেলের লোকজন চলে এসেছে। কালো পোশাকের কিছু র্যাব দেখতে পাচ্ছি। হিমুকে কোথাও দেখছি না। আমি নিশ্চিত, হিমু এখানে নেই। সে সবাইকে এখানে জড়ো করেছে। তার কাজ শেষ হয়েছে। মাজেদা খালা বলেছিলেন, হিমু একটা ঘটনা ঘটিয়ে ঢুব দেয়। অনেক দিন তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। আবার উদয় হয়, নতুন কিছু ঘটায়। তৃতুরি, তুমি এর কাছ থেকে দূরে থাকবে।

ভেতর থেকে হজুর ডাকলেন, জয়নূর মা। ভেতরে আসো।

আমি ঘরে চুকে দেখি, দুই বাঁদরের শুশুরবাড়ি যাত্রা দেখানো হচ্ছে। বল্টু স্যার এবং মাজেদা খালার স্বামী দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের ওপর ভেঙে পড়ে যাচ্ছেন। শুধু ডিজি স্যার চোখমুখ শক্ত করে আছেন। বাংলা ভাষার মানুষ হয়েও ইংরেজিতে বলছেন, I can't believe it.

আমাকে কাছে ঢেকে হজুর বললেন, বাঁদর-বাঁদরির খেলাটা দেখো। মজা পাবে।

আমি বাঁদর-বাঁদরির খেলা দেখছি। তেমন মজা পাচ্ছি না।

বল্টু স্যার হজুরের দিকে তাকিয়ে আনন্দময় গলায় বললেন, এই দুই প্রাণীকে আপনি এত পছন্দ করেছেন বলে ভালো লাগছে। এরা আপনার সঙ্গেই থাকবে।

হজুর বললেন, আল্লাহপাক আমাকে স্তৰী দেন নাই, পুত্র-কন্যা কিছুই দেন নাই, উল্টা আমার দুটা ঠ্যাং নিয়ে গেছেন। এখন বুঝতে পারছি তিনি আমাকে সবই দিয়েছেন। আমি মূর্খ বলে বুঝতে পারি নাই।

তাঁর চোখ ছলছল করছে। বাঁদর দুটি দেখাচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর ঘন্ধুর মিলনের দৃশ্য।

আমি হিমু

মাজার জমজমাট অবস্থায় রেখে আমি বের হয়ে এসেছি। তুতুরির সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো লাগত। দেখা হয় নি। এও বা মন্দ কী? আমাদের সবার জগৎ আলাদা। তুতুরি থাকবে তার জগতে, বল্টু স্যার তাঁর জগতে। আমি বাস করব আমার ভূমণে। শুধু পশ্চদের আলাদা কোনো ভূবন নেই। সেটাও খারাপ না। পশ্চদের আলাদা ভূবন নেই বলেই তারা অন্যরকম আনন্দে থাকে। যে আনন্দের সঙ্গান মানুষ জানে না। আমি হাঁটছি, আমার পেছনে পেছনে একটা কুকুর হাঁটছে। আমি আমার মতো চিন্তা করছি। কুকুর চিন্তা করছে তার মতো। আমি কুকুরের চিন্তায় চুক্তে পারছি না, কুকুর আমার চিন্তায় চুক্তে পারছে না।

বুম বৃষ্টি শুরু হতেই কুকুর দৌড়ে এক গাড়ি-বারান্দায় আশ্রয় নিল। অবাক হয়ে দেখল আমি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এগিছি। সে কী মনে করে আবারও আমার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল।

রাস্তায় পানি জমেছে। আমি পানি ভেঙে এগিছি। আমার পেছনে পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে আসছে একটা কালো কুকুর। আমি তাকে চিনি না, সেও আমাকে চেনে না। বস্তুত তখনই গাঢ় হয় যখন কেউ কাউকে চেনে না।